# নবজীবন।

২য় ভাগ } মাঘ ১২৯২ { ৭ম সংখ্যা।

## আর্য্যধর্ম্মের ভাবী রূপ।

### প্রথম অধ্যায়—দুরদৃষ্টবাদের অপনয়ন।

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যোবিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্ম হানিঃ প্রজায়তে ॥

ইতি অঘোর নাথ ধৃত বৃহস্পতি বচন।

"কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া কোন বিষয় নির্ণয় করিবে না, যেহেতু যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মহানি হয়।"

বৃহস্পতির যেমন অলৌকিক ধীশক্তির খ্যাতি, এই বচন তাঁহার তেমনই উপযুক্ত। বিবেকশক্তি দ্বারা মনুষ্য পশু হইতে বিভিন্ন। অতএব যিনি যে পরিমাণে বিবেক বা যুক্তিমার্গ ত্যাগ করেন, তিনি সেই পরিমাণে মনুষ্যত্ব-ভ্রষ্ট হন। শাক্য মুনির শিক্ষার প্রভাবে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের মধ্যে অনেকেই ভক্তিমার্গ একবারে ত্যাগ করিয়া যুক্তি-মার্গ-মাত্র অবলম্বন করিয়া নিরীশ্বর বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। এজন্য বৌদ্ধাধিকারের শেষ হইতে এতদ্দেশে জনসাধারণের যুক্তি মার্গের উপর বিদ্বেষ জন্মিয়াছে। কিন্তু এই বিদ্বেষ অমূলক। স্ত্রীপুরুষের যাদৃশ সম্বন্ধ, ভক্তি ও যুক্তির তাদৃশ সম্বন্ধ। ইহাদের বিচ্ছেদ হইলে সুফল উৎপন্ন হইবে না। ইহাদিগকে সম্পৃক্ত রাখিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে।

আমাদের কোন শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু যুক্তির অকর্ম্মণ্যতা ও ভক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে গিয়া, কয়েকটি যুক্তি দর্শাইয়াছেন; অর্থাৎ মুখে যুক্তি অকর্ম্মণ্য বলিয়া কার্য্যে তাহার কর্ম্মণ্যতা স্বীকার করিয়াছেন।

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র মহাসমুদ্র স্বরূপ। ইহাতে অনেক রত্ন আছে, এবং মনুষ্যের অনিষ্টকর বস্তুরও অভাব নাই। এই রত্নাকর হইতে রত্নোদ্ধার করিতে হইলে যুক্তি ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

এতদ্দেশীয় ধর্ম্মার্থীর পক্ষে বাইবেল বা কোরাণের আশ্রয় লইবার প্রয়োজন নাই। বিবেকশক্তি অপ্রতিহত রাখিয়া স্বদেশের ধর্ম্মশাস্ত্রানুশীলন করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে।

ব্যাস-সংহিতায় লিখিত আছে যে, যে স্থলে বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হয়, তথায় বেদই প্রমাণ। আর স্মৃতি ও পুরাণে পরস্পরে বিরোধ হইলে—স্মৃতিই প্রমাণ (১)।

এক্ষণে বিবেচনা করা উচিত, যে, সত্যের সহিত সত্যের কখনই বিরোধ হইতে পারে না। সত্যের সহিত অসত্যের নিত্য বিরোধ আছে এবং অসত্যের সহিত অসত্যেরও বিরোধ হইতে পারে। সুতরাং ব্যাসের বচনে বেদের অভ্রান্ততা এবং স্মৃতি ও পুরাণের আংশিক অসত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে।

বেদ সম্পূর্ণরূপে অভ্রান্ত কি না, ইহার মীমাংসা করিবার অধিকার বাঙ্গালিদের এখনও হয় নাই। আমরা মুখে বেদের প্রাধান্য স্বীকার করি; কিন্তু বহুকাল আমাদের দেশে বেদানুশীলন নাই। ইহা পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল নহে; বরং সম্প্রতি যে দুই চারি জন বাঙ্গালি বেদাধ্যয়ন করিতেছেন, তাহা পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে। ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের অতি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে। বেদ দূরে থাকুক, অনেক স্মার্ত্তের মনুসংহিতাতেই অধিকার নাই। বাঙ্গালার ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ীদিগের পক্ষে রঘুনন্দন সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছেন। এখন "মোগল পাঠান হদ্দ হলো, পার্সি পড়ান তাঁতি"। যেখানে বেদচর্চ্চা একবারে লুপ্ত হইয়াছে বলিলেই হয়, সেখানে বৈদিক বচনের বিচারের সময় উপস্থিত হয় নাই। তবে এস্থলে এইমাত্র বলিব, যে, মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্থ বেদের উল্লেখই নাই। মনু বলিয়াছেন, যে, ব্রহ্মা অগ্নি হইতে ঋক্, বায়ু হইতে যজুঃ, এবং সূর্য্য হইতে সামবেদ উদ্ধৃত করিলেন (২)।

---

(১) শ্রুতি স্মৃতি পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা॥ বিদ্যাসাগর ধৃত ব্যাসবচন।

(২) অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্মসনাতনং।
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমৃগ্‌যজুঃসামলক্ষণং॥ মনু ১অ।২৩

মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৭৬।৭৭ শ্লোকে লিখিত আছে, যে বেদত্রয় হইতে প্রণব ও গায়ত্রী উদ্ধৃত হইয়াছে। তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে লিখিত আছে, যে শিষ্য গুরুকুলে বাস করিয়া ১৮ বা ৩৬ বৎসর বেদত্রয় অধ্যয়ন করিবেন। সপ্তম অধ্যায়ের ৪৩ শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট আছে, যে ত্রিবেদীর নিকট বেদত্রয় পাঠ করিবে। শ্রুতির একটি নাম ত্রয়ী; ইহাতে প্রতীত হইতেছে, যে মনুর সময়ে অথর্ব্ববেদ শ্রুতি বলিয়া পরিগণিত ছিল না। এক্ষণে তাহা শ্রুতি বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে কি না, বেদপারগ পণ্ডিতগণ তাহার বিচার করিবেন।

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি, যিনি ধর্ম্মোপদেশক বলিয়া বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, মুখে মহর্ষি মনুকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু কার্য্যদ্বারা তিনি দেখাইতেছেন, যে, মনুর কোন কোন উপদেশ তিনি আদৌ গ্রাহ্য করেন না। মনুর মতে শূদ্রকে ধর্ম্মোপদেশ দিলে উপদেষ্টার উপদিষ্টের সহিত অসংবৃত্ত নরকে বাস করিতে হইবে (১)। ইহা জানিয়াও তর্কচূড়ামণি মহাশয় শূদ্রাকীর্ণ সভায় ধর্ম্মোপদেশ দিতে-ছেন এবং শূদ্রের সম্পাদিত সংবাদ পত্রে শূদ্র ম্লেচ্ছাদি পাঠকদিগের হিতার্থ ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন। ইহাতে প্রতীত হইতেছে, যে, কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলেই লোকে মনুর দোষ ধরে না। যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষার বিদ্বেষী তাঁহারাও সর্ব্বতোভাবে মনুকে অভ্রান্ত বলিয়া মানেন না। মনুর প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি আছে। তিনিই নিষ্কাম ধর্ম্মের আদি শিক্ষাগুরু (২)। মনু ও বেদব্যাসের ন্যায় মহাপুরুষ এই পৃথিবীতে অত্যল্প জন্মিয়াছেন; কিন্তু মহাপুরুষ হইলেও তাঁহারা মানুষ। মানুষ মাত্রেই ভ্রমপ্রবণ। ঈশ্বর ব্যতীত কেহই অভ্রান্ত নাই। অতএব আমার সদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তি যদি উক্ত মহাপুরুষদ্বিগের ভ্রম দেখাইবার চেষ্টা করে, সদাশয় ব্যক্তিরা আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। যাহাতে চন্দ্রের

---

(১) ন শূদ্রায়মতিং দদ্যান্নোচ্ছিষ্টং ন হবিষ্কৃতং।
ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মং ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ॥
যোহ্যস্য ধর্ম্মমাচষ্টে য শ্চৈবাদিশতি ব্রতং।
সোহসংবৃতং নামতমং সহতেনৈব মজ্জতি॥

মনু ৪অ, ৮০।৮১।

(২) কামাত্মতা ন প্রশস্তা ইত্যাদি মনু ২অ ২।৩।৪।৫

সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র নাই, সেও চন্দ্রকলঙ্ক দেখিতে পায় এবং তাহারও চন্দ্রকলঙ্কের কথা বলিবার অধিকার আছে।

৩—দুরদৃষ্টবাদ *। সাধারণ হিন্দুদের মত ও বিশ্বাসের বিষমতম ভ্রম। কালে এই ভ্রম অপনীত হইবে।

সাধারণ হিন্দুদের বিশ্বাস এই যে, কলিযুগের প্রভাবে মনুষ্যগণ ধর্ম্মে, বুদ্ধিতে, বলে, এবং আয়ুতে উত্তরোত্তর অবনত হইতেছে এবং হইবে। যদি এইমত সত্য হয়, তবে আমাদের উন্নতির চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। যদি আমরা যুগধর্ম্মে নিশ্চয়ই অধার্ম্মিক হইব, তবে আমাদের পুরুষকার কোথায়? আর পুরুষকার না থাকিলে ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম দুইটি অনর্থক শব্দমাত্র। এমত সত্য হইলে, তর্কচূড়ামণির ধর্ম্মোপদেশ, হরিসভা ও ধর্ম্মসভা উপহাসের বস্তু মাত্র। যখন কলি আমাদিগকে নিশ্চয় ভবসাগরে নিমগ্ন করিবে, তখন আর ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া কেন চীৎকার করি? আমরা কি মনে করি, বক্তৃতার ভেলায় ভবসাগর পার হইতে পারিব? এমন অবস্থায় চার্ব্বাক হওয়াই ভাল। বস্তুত দুরদৃষ্টবাদ আমাদের মহা অনিষ্টের কারণ হইয়াছে। যে সময়ে তেজ ও উৎসাহের সহিত কর্ম্ম করিতে হইবে, সে সময়ে আমরা নিস্তেজ, নিশ্চেষ্ট, নিরুৎসাহ ও জড়বৎ হইয়া পড়ি; তাহার কারণ এই যে আমাদের নিজ শুভাদৃষ্টে আমাদের বিশ্বাস নাই। মনুর মতে (১) সত্যযুগে সকল ধর্ম্মই সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ ছিল। মনুষ্য মাত্রেই মিথ্যা কথা কহিত না। অধর্ম্মদ্বারা কেহ কিছু উপার্জন করিত না। ক্রমশ ধর্ম্মহানি হইতে লাগিল। ত্রেতায় ত্রিপদ, দ্বাপরে দ্বিপদ ও কলিতে এক পদ মাত্র ধর্ম্ম রহিল। সত্যযুগে লোকে নীরোগ ও সর্ব্বসিদ্ধার্থ ছিল, এবং তাহাদের পরমায়ু চারিশত বৎসর ছিল।

---

* Pessimist Fatalism

(১) চতুষ্পাৎ সকলোধর্ম্মঃ সত্যঞ্চৈব কৃতেযুগে।
নাধর্ম্মেনাগমঃ কশ্চিন্মনুষ্যান্ প্রতিবর্ত্ততে॥
ইতরেষ্বাগমাদ্ধর্ম্মঃ পাদশস্ত্ববরোপিতঃ।
চৌরিকানৃত মায়াভির্ধর্ম্মশ্চাপৈতি পাদশঃ॥
অরোগাঃ সর্ব্বসিদ্ধার্থাশ্চতুর্ব্বর্ষ শতায়ুষঃ।
কৃতেত্রেতাদিষু হ্যেষামায়ুর্হ্রসতি পাদশঃ॥

মনু ১ অ ৮১।৮২।৮৩।

ত্রেতায় পরমায়ু ৩০০ বৎসর, দ্বাপরে ২০০ বৎসর এবং কলিতে ১০০ বৎসর হইল।

মহাভারতে লিখিত আছে (১) যে কলিযুগে মনুষ্যগণ স্বল্পায়ু, স্বল্পবল, স্বল্পবীর্য্য, খর্ব্বদেহ ও মিথ্যাবাদী হইবে। ব্রাহ্মণ সর্ব্বভক্ষ্য ও অজপ হইবে, এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কর্ম্মহীন হইবে। ঐ যুগে শক যবনাদি অনেক মৃষানুশাসী, মিথ্যাবাদী ম্লেচ্ছরাজাদের অধিকার হইবে।

সমগ্র মহাভারত বেদব্যাস প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রায় সকল হিন্দুরই বিশ্বাস এই, যে, বনপর্ব্বে কলিযুগ সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহা মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত। পুনশ্চ বেদব্যাসের বাক্য প্রায় বেদবাক্য স্বরূপ আদৃত। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বচন সমূহ মহা অনিষ্টের কারণ হইয়াছে (২)।

যখন মুসলমানগণ ভারতাক্রমণ করিল, হিন্দুরাজারা তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে যুদ্ধ হতাশের যুদ্ধ। হিন্দুদের মনে হইল আমরা মানবের সহিত যুদ্ধ করিতেছি না—অদৃষ্টের সহিত যুদ্ধ করিতেছি। এযুদ্ধ দেশের জন্য নহে; কারণ বেদব্যাসের বাক্য বিফল হইবার নহে; ম্লেচ্ছাধিকার

---

(১) ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বভক্ষ্যাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌযুগে।
অজপাব্রাহ্মণাস্তাত শূদ্রা জপ-পরায়ণাঃ॥
বহবো ম্লেচ্ছারাজানঃ পৃথিব্যাং মনুজাধিপ।
মৃষানুশাসিনঃ পাপা মৃষুবাদ পরায়ণাঃ॥
অন্ধ্রা শকাঃ পুলিন্দাশ্চ যবনাশ্চ নরাধিপাঃ।
কাম্বোজা বহ্লীকাঃ শূরাস্তথাভীবা নরোত্তম॥
যুগান্তে মনুজব্যাঘ্র তথাকারাশ্চ ভারত।
ন তদাব্রাহ্মণঃ কশ্চিৎ স্বধর্ম্মমুপজীবতি॥
ক্ষত্রিয়াশ্চাপি বৈশ্যাশ্চ বিকর্ম্মস্থা নরাধিপ।
অল্পায়ুষঃ স্বল্পবলাঃ স্বল্পবীর্য্যপরাক্রমাঃ।
অল্পসারাল্প দেহাশ্চ তথা সত্যাল্পভাষিণঃ॥

মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১৮৮ অধ্যায়।

(২) কল্কি পুরাণেও ম্লেচ্ছাধিকারের প্রসঙ্গ আছে; কিন্তু এই পুরাণ যে নিতান্ত আধুনিক এবং ভারতে ইংরেজাধিকার স্থাপিত হওয়ার পর রচিত, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত তিন পংক্তি পাঠ করিলেই বিদিত হইবে।

কলেঃ পঞ্চসহস্রাব্দে কিঞ্চিন্ন্যূন দ্বিজর্ষভা।
ম্লেচ্ছানীকাশ্বেতবর্ণা শূরাবস্ত্রোপশোভিনঃ।
ভবিষ্যন্তি মহিপালাঃ কলৌ বৈ বেদনিন্দকা॥

হইবেই হইবে। এ যুদ্ধ ধর্মের জন্য নহে, কারণ আমরা যাহাই করি না কেন, কলিযুগে ধর্ম্ম এক পাদের অধিক থাকিবে না। তবে যদি বল কেন যুদ্ধ করি? আমরা মান রক্ষার্থ যুদ্ধ করিতেছি। ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধং দেহি বলিয়া কেহ আহ্বান করিলে পরাজয় নিশ্চয় জানিয়াও যুদ্ধ দিতে হইবে। যাহাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে তাহারা পরাজিত হইয়া ম্লেচ্ছাধীন হইবে, তাহারা কোন কোন সময়ে চিতোর দুর্গরক্ষক বীরদিগের ন্যায় পৌরুষ দেখাইতে পারে, কিন্তু প্রায়ই এরূপ ঘটে, যে তাহাদের বাহু হইতে অর্দ্ধবল চলিয়া যায় এবং তাহাদের পরাজয় অনিবার্য্য হইয়া উঠে। আশান্বিতের বল হইতে হতাশের বলের অনেক পার্থক্য আছে। ওদিকে মুসলমানগণ শুভাদৃষ্টবাদ জনিত বলে বলীয়ান হইয়া ছিল। তাহাদের ধ্রুব ও জলন্ত বিশ্বাস ছিল "আমাদের যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ, আল্লা আমাদের সহায়। আমরা পৌত্তলিকদিগকে পরাজিত ও মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া আল্লার পবিত্র নাম বিস্তৃত করিব। এ যুদ্ধে আমাদের মৃত্যু হইলে নিশ্চয় স্বর্গলাভ হইবে; আর যদি বাঁচি, তবে ইহলোকে রাজ্যলাভ, পরলোকে হুরনারী সহবাস লাভ হইবে (১)।

এই বিশ্বাস যতকাল প্রবল ছিল, ততকাল তাহারা আসিয়া ইউরোপ ও

---

(১) A religion of peace was incapable of withstanding the fanatic cry of "Fight! fight! Paradise! paradise!" that re-echoed in the ranks of the Saracens..............In an action under the walls of Edessa, an Arabian youth, the cousin of Caled, was heard to exclaim, "Methinks I see the black-eyed girls looking upon me, one of whom, should she appear in this world, all mankind would die for love of her"—*Gibbon.*

দুরদৃষ্টবাদ যেমন ভারতের স্বাতন্ত্র্য নাশের একটি প্রধান কারণ, তেমনই পারস্যের অধঃপতনের কারণ হইয়াছিল। After the defeat of Cadesia, a country intersected by rivers and canals might have opposed an insuperable barrier to the victorious cavalry, and the walls of Ctesiphon and Madyan which had resisted the battering rams of the Romans would not have yielded to the darts of the Saracens; but the flying Persians were *overcome by the belief that the last day of their religion and empire was at hand.*

*Gibbon.*

আফ্রিকার দিগ্বিজয়ী হইয়াছিল। পরে তাহারা রাজ্য-ভোগ-মদ্যে বিলাস-পরায়ণ হইয়া উঠিল এবং তাহাদের পূর্ব্বোক্ত বিশ্বাসও দুর্ব্বল হইয়া তাহাদের অধঃপতনের কারণ হইল।

অনেকে বলিতে পারেন বিশ্বাসে কি আসিয়া যায়? প্রায় সকল মানবেরই বিশ্বাস এই, যে, পরলোকে পাপকর্ম্মের শাস্তি আছে; অথচ নিষ্পাপ মনুষ্য এমন বিরল কেন? ইহার উত্তর এই যে, পরলোক সম্বন্ধে অধিকাংশ মনুষ্যের বিশ্বাস অতি দুর্ব্বল; আর যাহাদের প্রবল বিশ্বাস আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে মনে করে, যে, প্রায়শ্চিত্তে, গঙ্গাস্নানে, তীর্থ যাত্রায়, মকাদর্শনে বা ঈশার রক্তে পাপ ধৌত হইয়া যায়। বিশ্বাস দৃঢ় ও বদ্ধমূল হইলে তাহা কার্য্যে পরিণত হইবেই হইবে। বাঙ্গালায় দুরদৃষ্টবাদ এমন প্রবল ছিল, যে, বঙ্গরাজ ম্লেচ্ছাধিকার অবশ্যম্ভাবী জানিয়া যুদ্ধই করিলেন না, এবং চোরের মত গোপনে পলাইয়া স্বদেশ ও স্বজাতিকে কলঙ্কিত করিলেন। দুরদৃষ্টবাদ ভারতের অধোগমনের একমাত্র কারণ নহে; কিন্তু ইহা যে প্রধান কারণ, তাহার সন্দেহ নাই। যাহাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে মনুষ্যের ক্রমশ অধোগতি হইতেছে, তাহাদের অধোগতিই হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল শিখগণ ঐ ভ্রমাত্মক ও অনিকষ্টর বিশ্বাস অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিল, এবং কেবল শিখরাই বিশিষ্টরূপে দেখাইয়াছিল, যে, ভারত পরজাতির পদে বহুকাল দলিত হইয়াও একেবারে বীরশূন্য অথবা নির্জীব হয় নাই। যে পাঠানদের ভয়ে সমস্ত ভারত কম্পিত হইত, শিখব্যতীত অন্য হিন্দু সে পাঠানদের দৌরাত্ম্য দমন করিতে পারে নাই। গুজরাণওয়ালার তুমুল সংগ্রামে চরৎসিংহ মহারাষ্ট্রবিজয়ী পাঠানদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন,* এবং তাঁহার পৌত্র রণজিৎ সিংহ যুদ্ধে পাঠানদিগকে বারম্বার পরাভূত করিয়া পেসবার অধিকার করিয়াছিলেন। শিখ ব্যতীত ব্রিটিশসিংহের উপযুক্ত শত্রু ভারতে ছিল না। ইহার প্রধান কারণ শিখেরা মুসলমানদের ন্যায় শুভাদৃষ্টবাদী ছিল; দুরদৃষ্টবাদ তাহাদিগকে নির্জীব ও নিশ্চেষ্ট করে নাই (১)। লাল সিংহ ও তেজ সিংহ প্রভৃতি

---

* এই যুদ্ধ ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের এক বৎসর পরে হইয়াছিল।

(১) They are persuaded that God himself is present with them, that He supports them in all their endeavours, that

দুরাত্মা স্বদেশদ্রোহী না হইলে বোধ হয় পঞ্জাব অদ্যাপি স্বাধীন থাকিতে পারিত। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে শিখদিগের যে প্রবল ও জলন্ত বিশ্বাস ছিল, তাহা এক্ষণে নাই; তথাপি যদি ভারতোদ্ধার কেবল উষ্ণমস্তিষ্ক যুবক কতিপয়ের স্বপ্নমাত্র না হয়, তাহার সূত্রপাত পঞ্জাববাসী শিখদিগের মধ্যেই হইবে। কোন মত অনিষ্টকর বলিয়াই যে তাহা অমূলক হইবে, তাহা আমি বলি না। দুরদৃষ্টবাদদ্বারা আমাদের পৌরুষের হানি হইয়াছে বলিয়াই যে তদ্বিষয়ে আমাদের বিশ্বাস ভ্রান্তিমূলক ইহা সিদ্ধান্ত করা ন্যায়সঙ্গত নহে। এক্ষণে দুরদৃষ্টবাদ যে অমূলক, তদ্বিষয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

(ক) ঋগ্বেদের ন্যায় প্রাচীন গ্রন্থ পৃথিবীতে নাই। পণ্ডিতবর মোক্ষমূলর অর্দ্ধশতাব্দী ব্যাপিয়া এই গ্রন্থ অধ্যয়ন ও সমালোচন করিতেছেন। আমরা কার্য্যদ্বারা এই গ্রন্থের প্রতি এত আদর দেখাই না; কিন্তু আমাদের মৌখিক আদরের ত্রুটি নাই। আমরা বলিয়া থাকি ব্রহ্মা স্বয়ং এই গ্রন্থের প্রণেতা। এই বেদের প্রথম মণ্ডলের ২৪ সূক্তে বরুণের নিকট এই প্রার্থনা আছে. "হে রাজন্ আমাদিগের এই যজ্ঞে বাস করিয়া আমাদের কৃত পাপ শিথিল কর।" প্রথম মণ্ডলের ১০০ সূক্তে ইন্দ্রের নিকট ঐরূপ প্রার্থনা আছে। যদি সত্যযুগে পাপ ছিল না, তবে পাপ হইতে মুক্ত হইবার প্রার্থনা কেন? ঐ বেদে দস্যু, রাক্ষস ও অসুর কর্ত্তৃক গবাপহরণ ও অন্যান্য প্রকার দৌরাত্ম্যের উল্লেখ আছে। তাহাতে যুদ্ধেরও উক্তি আছে। উভয় পক্ষে ন্যায় যুদ্ধ হইতে পারে না। একথা স্বতঃসিদ্ধ; হয় উভয় পক্ষের অন্যায়াচরণ থাকে, অথবা কোন এক পক্ষের অন্যায়াচরণ থাকে। যাহারা অন্যায় যুদ্ধ করে, তাহার নরহত্যার পাপে পাপী হয়। অতএব ঋগ্বেদ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, যে সত্যযুগে নরহত্যাদি পাপ ছিল।

---

sooner or later He will confound their enemies for His own glory. Those who have heard a follower of Guru Govind declaim on the destinies of his race, his eye wild with enthusiasm and every muscle quivering with excitement, can understand that spirit which impelled the naked Arab against the mail-clad troops of Rome and Persia—*Cunningham's History of the Sikhs. 2nd Ed. P. 13.*

(খ) পরাশর-সংহিতায় লিখিত আছে, যে, মনু সত্যযুগের ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তা। "কৃতেতু মানবা ধর্ম্মাঃ" এই বচন প্রায় সর্ব্বহিন্দু গ্রাহ্য; কারণ মনু চারিযুগের ধর্ম্মপ্রয়োজক হইলে, এক্ষণে ব্রাহ্মণ,শূদ্রাণীকে বিবাহ করিতে পারে না কেন? অথবা গোপাল ও নাপিতের অন্ন গ্রহণ করিতে পারে না কেন? মনুসংহিতায় প্রায় সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও দণ্ডবিধান আছে। যদি সত্যযুগে পাপ ছিল না, তবে মনু পাপের প্রায়শ্চিত্ত নির্ণয় ও দণ্ডবিধান কেন করিলেন? সংহিতার সপ্তমাধ্যায়ের ৪১ শ্লোকে কথিত আছে, যে. বেণ, নহুষ, যবনকুলসম্ভূত সুদাস, সুমুখ ও নিমি ইহারা অবিনয় দোষে নষ্ট হইয়াছিলেন। ইহারা সকলেই সত্যযুগের রাজা; তাঁহাদের অবিনয়াতিশয্য যে পাপ তাহার সন্দেহ নাই। ইহা প্রসিদ্ধই আছে, যে, সুদাসবংশ বিশুদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যবন হইয়াছিল। সত্যযুগে ধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হইলে, ঐ যুগে যবনাচার কিরূপে হইল?

(গ) পৌরাণিক আখ্যায়িকা সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে বিদিত হইবে, যে, সত্যযুগে পাপের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব ছিল। ইন্দ্র ও চন্দ্র যে পাপ করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে আমাদের এখনও কাণে আঙ্গুল দিতে হয়। তবে যদি কেহ বলেন,—

"দেবতাদের লীলা খেলা,
পাপ হয় মানুষের বেলা"

তাঁহার সহিত আমাদের তর্ক নাই। দুর্ব্বাসা দুর্জ্জয় ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া দেবরাজ হইতে অতি ক্ষুদ্র মানব পর্য্যন্ত সকলকেই শাপ দিতেন। ক্রোধাতিশয্য কি পাপ নহে? হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুর দৌরাত্ম্য সত্যযুগেই হইয়াছিল। দৈত্যের পাপদ্বারা কি সত্যযুগের ধর্ম্মের সম্পূর্ণতা খর্ব্ব হয় নাই? কচ, দেবযানী, শর্ম্মিষ্ঠার উপাখ্যান পাঠ করিলে বিদিত হইবে, যে, সত্যযুগে দ্বেষ ও হিংসা বিলক্ষণ ছিল। বশিষ্ঠের সহিত বিশ্বামিত্রের শত্রুতার উক্তি কেবল রামায়ণে আছে এমন নহে, ঋগ্‌বেদেও আছে।

বিশ্বামিত্রের বিদ্বেষ বিলক্ষণ ছিল; কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয় হইয়া তপোবলে ব্রহ্মর্ষি হইলেন, এই কারণেই বোধ হয় বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণের বিদ্বেষানল প্রথমত প্রজ্বলিত হইয়াছিল। ফলত যাঁহাদের আমাদের ন্যায় রক্তমাংসের শরীর ছিল, তাঁহারা সত্যযুগে জন্মিয়া ছিলেন বলিয়াই নিষ্পাপ ছিলেন, একথা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে।

(ক) সত্য যুগের মনুষ্যগণ বৃহৎকায় ও দীর্ঘায়ু ছিল কি না, তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। পৌরাণিক হস্তীর কঙ্কাল (elephas primigenius) আধুনিক হস্তীর কঙ্কাল অপেক্ষা বৃহৎ। শিবালিক পর্ব্বতোপত্যকায় অধ্যাপক ফকনার যে মহাকূর্ম্মের কঙ্কাল পাইয়াছিলেন, তাহা ভারতবর্ষীয় চিত্র শালিকায় আছে। চৌরঙ্গিতে গিয়া সকলেই তাহা দেখিতে পারেন। তাহার পা গণ্ডারের পায়ের ন্যায় স্থূল। তাহার পৃষ্ঠাবরণের পরিধি ১০।১২ হাত হইবে। তাহাকে দেখিলে মহাভারতোক্ত গজকচ্ছপের যুদ্ধ ব্যাসদেবের স্বকপোলকল্পিত বর্ণনা বলিয়া বোধ হয় না।

পৌরাণিক গো (Bos primigenius & Sivatherium giganteum) এবং পৌরাণিক আয়র্লণ্ডীয় মহামৃগ (Megaceros Hibernicus) আধুনিক গো ও মৃগ হইতে বড় ছিল। অতএব সত্যযুগের মনুষ্য আধুনিক মনুষ্য হইতে মহাকায় হওয়া অসম্ভব নহে (১)। তবে খনিকারগণ এবং ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ আধুনিক নরকঙ্কাল অপেক্ষা বৃহত্তর নরকঙ্কাল অদ্যাপি প্রাপ্ত হন নাই। পুরাণে লিখিত আছে,যে, কোন কোন রাজা ৮,০০০, কেহ বা ১০,০০০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এ সমস্ত কবির অত্যুক্তি মাত্র। মনু স্বয়ং বলিয়াছেন, যে সত্যযুগে মনুষ্যের পরমায়ু ৪০০ বৎসরের অধিক ছিল না। স্মৃতি ও পুরাণে বিরোধ হইলে, স্মৃতিই মাননীয়, সুতরাং মনুর বচনই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। দুর্ভাগ্যবশত এতদ্বিষয়ে মনু সংহিতাতেও ব্যাঘাত দোষ দৃষ্ট হইতেছে (২)। সত্যযুগে ৪০০ বৎসর পরমায়ু ছিল, একথা প্রথমাধ্যায়ে বলিয়া, মনু তৃতীয়াধ্যায়ে ব্রাহ্ম দৈব আর্ষ ও প্রাজাপত্য বিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজ সন্তানগণ সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

"রূপসত্ত্বগুণোপেতা ধনবন্তো যশস্বিনঃ।

পর্য্যাপ্তভোগা ধর্ম্মিষ্ঠা জীবন্তিচ শতং সমাঃ॥ ৩অ।৪০।

"তাহারা রূপবন্ত, ধনবন্ত, সত্ত্বগুণবিশিষ্ট, যশস্বী, ভোগসম্পন্ন ও ধার্ম্মিক হয়, এবং শত বৎসর জীবিত থাকে।"

---

(১) We live in a zoologically impoverished world from which all the largest, fiercest & strangest forms have recently disappeared—*Wallace, Geographical Distribution of Animals*—*P. 150.*

(২) কোন এক গ্রন্থে পরস্পর বিরুদ্ধ বচন থাকিলে, নৈয়ায়িকগণ তাহাকে ব্যাঘাত দোষে দূষিত বলেন।

মনু যখন সত্যযুগের ধর্ম্মপ্রয়োজক এবং তিনি যখন আপন সংহিতার তৃতীয়াধ্যায়ে স্বীকার করিতেছেন, যে, ১০০ বৎসর আয়ু দীর্ঘায়ু, তখন যে সত্যযুগে ১০০ বৎসরের অধিক বয়সেঅনেক লোক মরিত এমন বোধ হয় না। মনুর সময়ে যে যক্ষ্মা, অপস্মার, শ্বিত্রি, কুষ্ঠাদি মহাব্যাধি ছিল, তাহা মনু-সংহিতার ৩য় অধ্যায়ের ৭ম শ্লোক পাঠে বিদিত হইবে। ঐ সময়ে যে অকাল মৃত্যু ছিল, দুই বৎসরের বালকও মরিত, তাহা ৫ম অধ্যায়ের ৬৭। ৬৮ শ্লোকে প্রকাশিত আছে।

ইংলণ্ডের টমাস্ পার্ ১০০ বৎসরের অধিক বয়সে সন্তানোৎপাদন করিয়াছিল এবং প্রায় ১৫০ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। সুতরাং কলিযুগেও মনুর প্রথমাধ্যায়োক্ত দ্বাপরের পরমায়ু প্রাপ্তি নিতান্ত অসম্ভব নহে। অনেক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক বলিয়া থাকেন, যে, সুস্থ, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘায়ু দম্পতির সন্তান যদি বাল্যকাল হইতে সমস্ত শারীরিক নিয়ম উত্তম রূপে পালন করে, সে ২০০ বৎসর জীবিত থাকিতে পারে।

(ঙ) সত্যযুগে মহাতপা বিশ্বামিত্র ঋষি মেনকা অপ্সরাকে দেখিয়া কিয়ৎকাল বৈরাগ্য ত্যাগ করিয়াছিলেন। কলিযুগে যবন-কুলোদ্ভব বৈষ্ণব চূড়ামণি হরিদাস ঠাকুর পরম সুন্দরী রমণী কর্ত্তৃক প্রলোভিত হইয়াও বিশ্বামিত্র অপেক্ষা সংযম দেখাইয়া ছিলেন। কলিযুগের শাক্যমুনি বুদ্ধ ও চৈতন্য মহাপ্রভু প্রাচীন ঋষিদের অপেক্ষা ধর্ম্মবিষয়ে কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। অতএব যিনি বলেন, যে কলিতে সকলেরই দুর্ব্বল প্রকৃতি, এবং সত্যযুগে সকলেই ধর্ম্ম কর্ম্মে দৃঢ় ব্রত ছিলেন, তাঁহার উক্তি ভ্রান্তিমূলক। ক্রোধজ, দ্বেষজ ও কামজ পাপের প্রাদুর্ভাব যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর হইয়াছে, তাহার প্রমাণ নাই। তবে সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, যে, এক মহাপাপে আমরা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের অপেক্ষা পাপী। এই মহাপাপ মিথ্যাকথন ও কূট লেখন। যদি পূর্ব্ব কালে আর্য্যজাতির সত্যের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা না থাকিত, তাহা হইলে রামায়ণের ন্যায় গ্রন্থ কখনই প্রণীত হইত না। আমরা মুখে রামচন্দ্রের প্রতি গাঢ় ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকি, কিন্তু মনে মনে স্থির করিয়াছি, "বেটা কি মূর্খ! স্ত্রৈণ পিতার সত্য পালন জন্য রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে গেল!" সকল যুগেই মিথ্যা কথন ছিল। তাহা না হইলে মনু সত্যযুগে মিথ্যা কথনের দণ্ডবিধান করিতেন না। তবে যে অধুনা মিথ্যার অধিকতর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

যখন যুনানী বীর আলেক্জাণ্ডার পঞ্জাবের পুরুরাজকে পরাভূত করিয়াছিলেন, তৎকালে এবং তৎপর মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তের সময় পর্য্যন্ত যুনানীদিগের (গ্রীক্‌দিগের) ভারতবর্ষে যাতায়াত ছিল। যুনানী গ্রন্থকারগণ ভারতবাসীদিগের সত্যানুরাগের ভূয়োভূয় প্রশংসা করিয়াছেন। অতএব প্রতীত হইতেছে যে মিথ্যার বিশিষ্টরূপ প্রাদুর্ভাব আধুনিক। মুসলমানগণ হিন্দুদিগকে পরাজিত করিলে, হিন্দুদিগের প্রকৃত আত্মাদর অন্তর্হিত প্রায় হইল। যাহাদের সিংহ প্রতাপ ছিল, তাহারা শৃগালবৎ হইয়া পড়িল। শৃগাল ব্যাঘ্রের সহিত এক বনে বাস করিয়া ধূর্ত্ত হইয়া পড়ে; ধূর্ত্ততা ব্যতীত শৃগালের রক্ষা নাই। যতকাল আমরা পরাধীন থাকিব, অন্তত যতকাল কানেডীয় ও অষ্ট্রেলীয় ঔপনিবেশিকদিগের ন্যায় ইংরেজদিগের সমকক্ষ না হইতে পারিব, ততকাল আমাদের প্রকৃত আত্মাদর হইবে না। আমাদের মৌখিক বড়াই বিলক্ষণ আছে। আমরা মুখে বলিয়া থাকি, "আমরা আর্য্যজাতির শ্রেষ্ঠ, আমাদের জেতারা ম্লেচ্ছ"; কিন্তু যখন আমাদের অবস্থা ভাবি, যখন ভাবি, যে একটি শ্বেতমুখ দেখিয়া একখানি গ্রামের সমস্ত লোক কম্পিত হয়, তখন মনে হয় গড্ডলিকা হইতে আমাদের কিছুই পার্থক্য নাই। এমন অবস্থায় প্রকৃত আত্মাদর থাকিতে পারে না। যখন আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস হইবে যে আমরা মানুষ, মিথ্যাকথন দ্বারা মনুষ্যত্বের হানি করিয়া শৃগালবৎ হইয়া পড়িতেছি, তখন মিথ্যার হ্রাস হইবে। আমাদের সমাজের অনেক প্রাচীন ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে কলিযুগের দোহাই দিয়া বলিয়া থাকেন, "ভায়া হে! একি সত্যযুগ? বিষয় কর্ম্মের জন্য দুই চারিটা মিথ্যা না বলিলে কলিতে বিষয়কর্ম্ম চলে না" (১)। আধুনিক শিক্ষিত সমাজে এই ভাবের কতকটা হ্রাস দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সুলক্ষণ। শিক্ষিত যুবকদের আত্মাদর সঞ্চার সুখের বিষয়, কিন্তু ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলা ভাল, যে ভারত

(১) ইহাদের নিন্দা করা অথবা নব্যসম্প্রদায়ের প্রশংসা করা—আমার উদ্দেশ্য নহে। ইহাদের অনেক গুণ ছিল, সে সকল আমাদের মধ্যে বিরল হইয়া উঠিতেছে। আমরা স্বাবলম্বনের দোহাই দিয়া অধিকতর স্বার্থপর হইতেছি। ইংরেজদিগের গুণের অনুকরণ করিতে পারি না পারি, মদ্যপান আদি দোষের অনুকরণ করিতেছি। আমাদের পিতৃ পিতামহগণ উৎকোচ গ্রহণে দোষ দেখিতেন না; কিন্তু উপার্জ্জিত অর্থ আত্মীয় কুটুম্ব প্রতিপালনে এবং দেব সেবায় ব্যয় করিতেন। আমরা উৎকোচ গ্রহণ গর্হিত কার্য্য বলি, কিন্তু নিজের উদর তৃপ্ত এবং গৃহিণী অলঙ্কারে ভূষিতা হইলেই সন্তুষ্ট হই।

অন্তত কানেডা বা অষ্ট্রেলিয়ার সমকক্ষ না হইলে, ভারতবাসীদিগের প্রকৃত আত্মাদর জন্মিবে না।

(৮) সম্প্রতি কেহ কেহ পাশ্চাত্য শিক্ষাকে 'শিক্ষাবিভ্রাট' বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। "আমরা অধঃপাতে যাইতেছি এবং যাইব"—ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা বলিব, মনু এবং বেদব্যাস যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন তাহাই যথার্থ শিক্ষাবিভ্রাট। যাহাই হোক, পাশ্চাত্য বিদ্যাচর্চ্চা দ্বারা যদি আমরা আর কিছু না শিখি, কেবল এইমাত্র জানিতে পারি, যে, আমাদের পুরুষকার আছে, এবং আমরা সাধনা করিলে জ্ঞান ও ধর্ম্মে উত্তরোত্তর উন্নত হইতে পারিব, তাহা হইলে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিফল হইবে না।

শ্রীতারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

---

# ফুলের স্বপ্ন ভঙ্গ।

এমন সাধের ঘুমে,
কে মোরে জাগা'ল রে!
সে বড় নিষ্ঠুর।

আধ-দেখা স্বপ্ন টুকু,
কে মোর ভাঙিল রে!
করে চুর চুর।

স্বপন সুধার ধারা,
অর্দ্ধেক মরমে রে,
গড়াইয়ে ছিল!

অতৃপ্ত স্বপনে,—হেন
প্রাণভরা ঘুমে রে
কেন দাগা দিল!

## নবজীবন।

আমি তো কাহারো প্রাণে
জনমে কখন গো
দিই নাই ব্যথা।

জগতের এক ধারে
বনের আঁধারে গো
গুঁজে থাকি মাথা।

এমন সাধের ঘুমে,
কে মোরে জাগা'ল রে!
সে বড় নিষ্ঠুর।

আধ-দেখা স্বপ্ন টুকু,
কে মোর ভাঙিল রে!
করে চুর চুর।

---

লতার মধুর দোলে, পাতার কোমল কোলে
ঘুমা'য়ে ছিলাম চির সুখের আবেশে।

পরাণেতে ধীরে ধীরে, মরমের শিরে শিরে
স্বপনের ছায়া এক পড়েছিল হেসে।

পূরিয়ে প্রাণের ক্ষুধা, সেই স্বপনের সুধা
পিতেছিনু—হতেছিনু হরষে বিভোর।

সহসা বহিল বায়, শিহরি উঠিল কায়;
সুখ স্বপনের নিশি হয়ে গেল ভোর!

নয়ন পল্লবপুটে, প্রভাত কিরণ ফুটে
প্রাণের সে দ্রব ভাব তরল করিল;

চকিত হইল প্রাণ, অশ্রুত প্রভাত গান
সুধামাখা বিষ মত মরমে পশিল!

---

কেন নিশি হ'লি ভোর, কেন রে প্রভাত চোর
হরিয়া লইলি মোর স্বপনের সুধা?
না পূরিতে পরাণের আবেশের ক্ষুধা।

হায় হায় একি একি,— কেন বা এমন দেখি,
স্বপনের স্মৃতিটুকু হারাইনু কোথা!—
হারাইনু কোথা মোর প্রাণের মত্ততা!

যে দিকে তাকা'য়ে থাকি, নূতনে নয়ন রাখি
এ নূতন দৃশ্য—ভাল লাগে না নয়নে,
এ নূতন ভাব—ভাল থাপে না পরাণে।

---

কোমল প্রাণের সেই ঘুমন্ত আবেশ,
অস্ফুট প্রাণের সেই ফুটন্ত জোচ্ছনা,
হ'ল বুঝি একেবারে সকলেরি শেষ!
এ জীবনে সে স্বপন আর দেখিব না।

হায় সে স্বপন কোথা!— স্বপনের স্মৃতি কোথা
কি বাদ সাধিলি ও রে প্রভাত অনিল!
কেন রে মরম-গ্রন্থি করিলি শিথিল?

---

আমারি প্রাণের সুধা
মিটা'ত আমার ক্ষুধা,
স্বপনের ভালবাসা
পুরা'ত আমার আশা,

হেসেছি খেলেছি আমি আপনার মনে,
আমি তো চাই না কভু কারো মুখপানে।
পাতার আঁধার ছায়ে, লতার সরল কায়ে
আপন সংকোচে আমি ছিনু জড়সড়,
আপন গরবে ছিনু মনে মনে বড়।

এ ঘোর নিকুঞ্জে পশি' সাধের আঁধারে মিশি
কেন জ্বেলে দিলে, উষে, খরতর আল ?
এ আলো আমার প্রাণে লাগে না গো ভাল

———

সমীরণ, স্বার্থপর পেয়ে বড় অবসর
সরমের কলি মোর ফুটাইয়ে দিলে,
সুরভি ভাণ্ডার মোর উড়াইয়ে নিলে।
রবিকর, স্বার্থপর পেয়ে বড় অসবর
কোমল পরাণে মোর প্রবেশ করিলে,
সুধার ভাণ্ডারে মোর আগুন জ্বালিলে।

———

সরমের কুঁড়ি আমি স্বপন পরাণী,
স্বপন টুটিল যবে, সে কুঁড়ি ফুটিল তবে,
কি সুখে বাঁচিয়া এবে রবে অভাগিনী ?
কাঁদিয়া কুসুম বালা
ভিজা'ল পাতার কোল ;
যতই বাড়িল বেলা
নীরব হইল বোল।
মুর্চ্ছিত হইয়া শেষে
পড়িল পাতার কোলে !
বায়ু গন্ধ হরে নিল,
রবিকর ঝলসিল,
একেকটি পাপ্‌ড়ি খসে পড়িল রে তরুমূলে ;
বৃন্তটি কাঁদিল তার লতা সঙ্গে দুলে দুলে।

# ঋগ্বেদের দেবগণ।

## তৃতীয় প্রস্তাব। আলোকদেব। (সমাপ্ত)

আলোক দেবদিগের মধ্যে আদিত্যগণ ভিন্ন ঋগ্বেদে পূষা, অশ্বিদ্বয়, এবং উষার অনেক স্তুতি দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন ঋভুগণও সূর্য্যের রশ্মিস্বরূপ বলিয়া বোধ হয়।

পূষা সূর্য্যের একটি নাম। সায়ণাচার্য্য প্রথম মণ্ডলের ৪২ সূক্তের টীকায় পূষাকে পৃথিবী অভিমানী দেব বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু এটি তাঁহার ভ্রম। যাস্ক নিরুক্তে লিখিয়াছেন, পূষা "সর্ব্বেষাং ভূতানাং গোপয়িতা আদিত্যঃ," এবং এই অর্থই প্রকৃত। সূর্য্যই পূষা তাহা বেদের অনেক সূক্ত হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। সরলহৃদয় গোমেষপালকগণ সূর্য্যের যে প্রকৃতিকে অর্চ্চনা করিত, পূষা সেই প্রকৃতির সূর্য্য। তাহারা সর্ব্বদা এক গোচর হইতে অন্য গোচরে গমনাগমন করিত, এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে ভ্রমণ করিত, এবং পথে অনিষ্ট বা বিপদ না হয়, ভোজনীয় অন্ন ও পানীয় জল পাওয়া যায়, এই জন্য সরলহৃদয়ে পূষাকে সর্ব্বদাই স্তুতি করিত; সুতরাং পূষা একরূপ পথভ্রমণকারীদিগের বিশেষ দেব হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিক পূষার স্তুতিগুলি পাঠ করিলে তৎকালে পথভ্রমণে কি বিপদ আপদ ছিল তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়; আমরা এখানে একটি স্তুতি উদ্ধৃত করিতেছি।

"হে পূষা! পথ পার করাইয়া দাও, বিঘ্নহেতু পাপ বিনাশ কর। হে মেঘ-পুত্র-দেব! আমাদিগের অগ্রে যাও।

"হে পূষা! আঘাতকারী, অপহরণকারী ও দুষ্টাচারী, যে কেহ আমাদিগকে বিপরীত পথ দেখাইয়া দেয়, তাহাকে পথ হইতে দূর করিয়া দাও।

"সেই মার্গ প্রতিবাধক তস্কর কুটিলাচারীকে পথ হইতে দূরে তাড়াইয়া দাও।

"যে কেহ প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে অপহরণ করে, এবং অনিষ্ট সাধন ইচ্ছা করে, হে পূষা! তাহার পর-সন্তাপক দেহ তোমার পদ দ্বারা দলিত কর।

"হে শত্রু বিনাশী ও জ্ঞানবান্ পূষা! যেরূপ রক্ষণদ্বারা পিতৃগণকে উৎসাহিত করিয়াছিলে তোমার সেই রক্ষণা প্রার্থনা করিতেছি।

"হে সর্ব্বধন সম্পন্ন, অনেক সুবর্ণায়ুধযুক্ত, ও লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পূষা! তুমি ধনসমূহ দানে পরিণত কর।

বিঘ্নকারী শত্রুদিগকে অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে লইয়া, যাও সুখগম্য শোভনীয় পথদ্বারা আমাদিগকে লইয়া যাও, হে পূষা! তুমি এই পথে আমাদিগের রক্ষণের উপায় অবলম্বন কর।

"শোভনীয় তৃণযুক্ত দেশে আমাদিগকে লইয়া যাও, পথে যেন নূতন সন্তাপ না হয়। হে পূষা! তুমি এই পথে আমাদিগের রক্ষণের উপায় অবলম্বন কর।"

১ মণ্ডল, ৪২ সূক্ত, ১ হইতে ৮ ঋক্।

অন্যান্য স্থানেও পূষার এইরূপ আরাধনা আছে। আমারা আর দুই একটি অংশ উদ্ধৃত করিব।

"পূষা আমাদিগের গো সমূহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইসুন, পূষা আমাদিগের অশ্বসমূহ রক্ষা করুন, পূষা আমাদিগকে অন্ন প্রদান করুন।

"হে পূষা! অভিষবকারী যজমানের গো সমূহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস, আমরা স্তব করিতেছি, অতএব আমাদিগের প্রতিও সেইরূপ কর।

"(পথে) যেন কিছু নষ্ট না হয়, কিছু ক্ষতি না হয়, কিছু গর্ত্তে পতিত না হয়, সমস্ত (গাভীর) সহিত নিরাপদে আইস।

"পূষা আপন দক্ষিণ হস্ত চারিদিকে বিস্তৃত করুন, আমাদিগের নষ্ট (গাভী সকল) পুনরুদ্ধার করিয়া দিন।"

৬ মণ্ডল, ৫৪ সূক্ত, ৫, ৬, ৭ ও ১০ ঋক্।

"ছাগই পূষার বাহন, তিনি পশুসমূহ পালন করেন তিনি অন্নের ঈশ্বর, আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির উত্তেজক, এবং বিশ্ব ভুবনে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন।" ইত্যাদি। ৬ মণ্ডল, ৫৮ সূক্ত, ১ ঋক্।

আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ পূষারূপী সূর্য্যকে কিরূপে আরাধনা করিতেন, কি ভাবে পূজা করিতেন, তাহা উপরিউক্ত ঋক্ গুলি হইতেই প্রতীয়মান হইবে। চারিদিকে অনার্য্য শত্রু বেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আর্য্যপল্লীর অধিবাসীগণ আপনাদিগের গো অশ্বাদির রক্ষার জন্য, পথে বিপদের অপনয়নার্থ, এবং সুন্দর তৃণপূর্ণ নূতন নূতন গোচর প্রদেশ প্রাপ্তির জন্য, সরলহৃদয়ে পূষাকে উপাসনা করিতেন।

যে সকল "আঘাতকারী, অপহরণকারী, দুষ্টাচারীর" কথা উল্লিখিত হইয়াছে, বোধ হয় তাহারা অনার্য্য আদিমবাসীগণ ভিন্ন আর কেহ নহে। আর্য্যগণ আসিবার পূর্ব্বে তাহারাই ভারতবর্ষের অধীশ্বর ছিল, আর্য্যগণ সিন্ধুতীরে বাস করিলে পর সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তাহারা উপদ্রব করিত। অদ্য ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ইংরাজদিগের শাসন স্থিরীকৃত হওয়াতেও যে ভাক্তিয়া ভিল সচ্ছন্দে কয়েক বৎসরাবধি গো অশ্ব ও ধন অপহরণ করিতেছে, পথে ও গ্রামে লোকের অর্থ অপহরণ করিতেছে, তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সিন্ধুতীরবাসী আর্য্যপল্লীগুলিতে সেই রূপ উপদ্রব করিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ কি আছে?

ঋভুগণ সম্বন্ধে আমাদিগের অধিক বলিবার নাই। একটি বৈদিক প্রবাদ আছে, যে, ঋভুগণ পূর্ব্বে মনুষ্য ছিলেন, পরে ত্বষ্টৃ নির্ম্মিত একখানি সোম পাত্র নিজ শিল্পচাতুর্য্যে চারিখান করিয়া দেবদিগকে তুষ্ট করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইলেন, এবং সূর্য্যালোকে বাস করিতে লাগিলেন। সায়ণাচার্য্য ১ মণ্ডলের ১১০ সূক্তের ৬ ঋকের ব্যাখ্যায় একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, যে, ঋভুগণ সূর্য্যরশ্মি। যদি ঋভুগণ সূর্য্যরশ্মি হয়েন, তবে তাঁহাদিগের শিল্পচাতুর্য্যের প্রবাদ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? পণ্ডিতপ্রবর মক্ষমূলর বলেন, যে, পূর্ব্বকালে বৃবু নামে এক সূত্রধারবংশ কার্য্যগুণে ঋত্বিক্ সম্প্রদায় প্রবেশে পাইয়া ঋত্বিক্ হইয়াছিল। তাহাদিগের বিশেষ কোনও উপাস্য দেব ছিল না অতএব তাহারা ঋভুগণের উপাসনাপরায়ণ হইল, এবং কালক্রমে সেই বৃবুবংশীয়দিগের পাত্রাদি নির্ম্মাণে নৈপুণ্য হইতে সেই কুলের দেব ঋভুগণও সেই নৈপুণ্যের খ্যাতি লাভ করিলেন। এই মীমাংসাটি ঠিক—কি না, তাহার বিচার করিতে আমরা অক্ষম।

গ্রীকদিগের মধ্যে একটি গল্প আছে যে Orpheus নামক এক গায়কের স্ত্রীর কাল হইলে তিনি তাঁহার গীত দ্বারা মৃত্যু রাজকে তুষ্ট করিয়া স্ত্রীকে ফিরিয়া পাইলেন, কিন্তু পথে তিনি ঔৎসুক্যের সহিত স্ত্রীর দিকে চাহাতে তাঁহার স্ত্রী পুনবার অদৃশ্য হইলেন। মক্ষমূলর বলেন যে Orpheus ঋভু বা অর্ভুর রূপান্তর মাত্র, এবং গল্পের মূল অর্থ এই যে সূর্য্য উষার দিকে চাহিলেই, অর্থাৎ উদয় হইলেই, উষা অদৃশ্য হইয়া যান।

এক্ষণে আমরা অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। পুরাণে তাঁহারা অশ্বিনীকুমারদ্বয় নামে পরিচিত এবং তাঁহাদিগের অশ্বিনীর গর্ভে জন্ম হওয়ার

উপাখ্যান আছে। কিন্তু বেদ রচনার প্রথমাবস্থায় সে উপাখ্যান সৃষ্ট হয় নাই, বেদে তাহাদিগের নাম অশ্বিনীকুমার নহে, তাহাদিগের নাম "অশ্বিন্" অর্থাৎ অশ্ববিশিষ্ট।

প্রকৃতির মধ্যে কোন্ বস্তুকে প্রথম আর্য্যেরা অশ্বিদ্বয় বলিয়া পূজা করিত, সে বিষয়ে অনেক প্রাচীন পণ্ডিতের অনেক প্রকার মত আছে। যাস্ক নিরুক্ততে লিখিয়াছেন "অশ্বিদ্বয় কাহারা? কেহ কেহ বলেন আকাশ ও পৃথিবীই অশ্বিদ্বয়। কেহ কেহ বলেন দিবা ও রাত্রি। কেহ কেহ বলেন চন্দ্র সূর্য্য, কেহ কেহ বলেন অশ্বিদ্বয় দুই জন পুণ্যবান্ রাজা ছিলেন।"

যাস্কের নিজের মত যতদূর বুঝা যায় তাহাতে বোধ হয় শেষ রাত্রিতে আকাশে যে অন্ধকার ও আলোকে বিজড়িত থাকে, তাহাকেই প্রথম আর্য্যগণ অশ্বিদ্বয় বলিয়া উপাসনা করিতেন। প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ পণ্ডিত, আমার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষাগুরু, গোল্ডষ্টুকর এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। মক্ষমূলর বলেন উভয় সন্ধ্যা; অর্থাৎ প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ং সন্ধ্যাকেই আর্য্যগণ অশ্বিদ্বয় বলিয়া উপাসনা করিতেন।

যদি সায়ংকালের বা প্রথম উষার আলোকই যমজদেব বলিয়া উপাসিত হইলেন, তবে তাঁহাদিগের অশ্বিদ্বয় নাম দেওয়া হইল কেন? বেদজ্ঞ পণ্ডিত মাত্রেই জানেন যে এটি বৈদিক উপমা মাত্র। সূর্য্যের আলোক আকাশে ধাবমান হয়, ইন্দ্রের (অর্থাৎ—আকাশের) আলোক ধাবমান হয়, অগ্নির আলোক ধাবমান হয়, সেই জন্য সেই আলোক সমূহকে সর্ব্বদাই অশ্ব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; হরি, হরিৎ, বা রোহিত নামক যে ইন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির অশ্ব আছে, তাহার প্রথম অর্থ উজ্জ্বলবর্ণ আলোক ভিন্ন আর কিছুই নহে। এটি অতি প্রাচীন বৈদিক উপমা এবং বেদের সকল স্থানেই দৃষ্ট হয়। "অশ্বিন্" শব্দের ও সেই অর্থ,—অশ্বযুক্ত, অর্থাৎ আলোক যুক্ত। কালক্রমে লোকে সে বৈদিক উপমার প্রকৃত অর্থ ভুলিয়া গেল, এবং "অশ্বিদ্বয়" নাম হইতে একটি গল্প উৎপন্ন হইল যে সূর্য্য ও উষা—অশ্ব ও অশ্বিনীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগেরই পুত্র অশ্বিদ্বয়। তখন বেদের "অশ্বিদ্বয়" পুরাণের "অশ্বিনীকুমারদ্বয়ে" পরিণত হইলেন।

অশ্বিদ্বয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ১৭ সূক্তে অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে যথা;—"ত্বষ্টা কন্যার বিবাহ দিতেছেন এই বলিয়া বিশ্বভুবন একত্র হইল। যমের মাতার বিবাহ হওয়ায় বৃহৎ বিবস্বানের স্ত্রীর মৃত্যু

হইল; মর্ত্ত্যগণের নিকট হইতে অমর দেবীকে লুকাইয়া রাখিল। তাহার ন্যায় একজনকে সৃষ্ট করিয়া বিবস্বান্‌কে দান করিল। এই ঘটনার সময় তিনি অশ্বিদ্বয়কে জন্ম দিলেন; সরণ্যু মিথুনদিগকে ত্যাগ করিয়া গেলেন।”

এই সূক্তের অর্থ পরিষ্কার নহে, কিন্তু এইটুকু বুঝা যায় যে ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যুর সহিত বিবস্বানের বিবাহ হয় এবং সরণ্যু অশ্বিদ্বয়কে প্রসব করিয়া ত্যাগ করেন।

বিবস্বান্ অর্থ—সূর্য্য এবং সরণ্যু—উষা। কিন্তু তাহাদিগের অশ্ব ও অশ্বিনী রূপ ধারণ করার কোনও কথা এখানে নাই।

সে গল্প যাস্কের নিরুক্তে পাওয়া যায়। তিনি উক্ত সূক্তের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন “ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যুর বিবস্বান্ বা সূর্য্যের দ্বারা যমক সন্তান হয়। সরণ্যু তাঁহার স্থানে তাঁহার ন্যায় আর একজন দেবীকে রাখিয়া অশ্বিনীরূপ ধরিয়া পলায়ন করিলেন। বিবস্বান্‌ও অশ্বরূপ ধরিয়া তাঁহার পশ্চাতে যান ও তাঁহার সহিত সংসর্গ করেন। এইরূপ অশ্বিদ্বয়ের জন্ম হয়।” যাস্ক আরও বলেন অশ্বিনীরূপ ধারণ করিবার পূর্ব্বে বিবস্বানের দ্বারা সরণ্যুর যে যমজ সন্তান হইয়াছিল তাহারা যম ও যমী, এবং সরণ্যু আপন পরিবর্ত্তে যে দেবীকে বিবস্বানের নিকট রাখিয়া গিয়াছিলেন সে দেবীর নাম সবর্ণা, এবং বিবস্বানের দ্বারা সবর্ণার যে পুত্র হয় তিনিই বৈবস্বত মনু। এইরূপে পুরাণের অনন্ত উপাখ্যান আরম্ভ হইল।

কিন্তু যদিও প্রথম আর্য্যগণ আকাশের ধাবমান আলোককে অশ্বিদ্বয় বলিয়া উপাসনা করিতেন, তথাপি অচিরেই সেই অশ্বিদ্বয় চিকিৎসা-কুশল দেবদ্বয় বলিয়া পরিগণিত হইলেন, এবং ঋগ্বেদের অনেক সূক্তে তাঁহাদিগের কৃত আরোগ্য বর্ণিত আছে। তাঁহারা শত্রু দগ্ধ অত্রি ঋষিকে শান্তি দিয়াছিলেন, গোতম ঋষিকে মরুভূমিতে জল দিয়াছিলেন, সমুদ্রে মজ্জমান্ তুগ্র পুত্রকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, বৃদ্ধ জীর্ণাঙ্গ চ্যবন ঋষিকে যৌবন দিয়াছিলেন, * বন্দন ঋষিকে কূপ হইতে উঠাইয়াছিলেন, ইন্দ্র দধীচির শিরশ্ছেদন

* Kuhn, Max Muller এবং Benfey বলেন যে বার্দ্ধক্যের পর পুনরায় যৌবন প্রাপ্তি কেবল সূর্য্যের অস্তের পর পুনরুদয় সম্বন্ধে একটি উপমা মাত্র, এবং রেভ, বন্দন, পরাবৃজ, ভুজ্যু প্রভৃতি যাহাকে যাহাকে অশ্বিদ্বয় উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া গল্প আছে, সে সমস্ত গল্পের মূল প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বন্ধে উপমা মাত্র।

করিলে তাঁহার মস্তক জুড়িয়া দিয়াছিলেন, বধ্রিমতীকে পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন; বৃক-গৃহীত বর্ত্তিকা পক্ষীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, বিশ্‌পলা রাজ্ঞীর একটি পা ছিন্ন হইলে সেই পা জুড়িয়া দিয়াছিলেন,—নেত্রহীন ঋজ্রাশ্বকে চক্ষু দিয়াছিলেন, জাহুষ ও প্রথুশ্রবা রাজাকে শত্রু হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, কৃষ্ণের পুত্র বিশ্বকায় ঋষি আপন পুত্র হারাইলে অশ্বিদ্বয় সেই পুত্র আনিয়া দিয়াছিলেন, বিমদ রাজের স্ত্রীকে তাঁহার নিকট পঁহুছিয়া দিয়াছিলেন, এবং দেবদিগের মধ্যে একটি দৌড় হওয়ায় অশ্বিদ্বয় সকলের অগ্রগামী হইয়া সবিতার কন্যা সূর্য্যাকে লাভ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে এইরূপ অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে, পাঠকগণ প্রথম মণ্ডলের ১১২ অথবা ১১৬ সূক্তটি পাঠ করিলেই তাহা অবগত হইবেন।

এক্ষণে আমরা উষাদেবী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। প্রকৃতির মধ্যে উষা অপেক্ষা সুন্দর দৃশ্য আর নাই, ঋগ্বেদের ঋষিদিগের পক্ষে উষা সম্বন্ধে স্তুতিগুলি যেরূপ সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী, সেরূপ স্তুতি আর নাই।

কিন্তু কেবল ঋগ্বেদের ঋষিগণ কেন? প্রাচীন আর্য্যমাত্রেই উষাকে উপাসনা করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। ঋগ্বেদে উষার যে সকল নাম পাওয়া যায়, তাহার অনেকগুলিই গ্রীকদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়;—ইহার অর্থ এই যে হিন্দু আর্য্য ও গ্রীক আর্য্যগণ ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগের সাধারণ পূর্ব্ব পুরুষগণ যখন একত্র মধ্য-আসিয়াতে বাস করিতেন, তখনই উষাকে এই নামগুলি দিয়া ডাকিতেন ও উপাসনা করিতেন।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ঋগ্বেদের | অর্জ্জুনী | গ্রীকদিগের | Argynoris, |
| ঋগ্বেদের | বৃসয় | গ্রীকদিগের | Briseis, |
| ঋগ্বেদের | দহনা | গ্রীকদিগের | Daphne, |
| ঋগ্বেদের | অহনা | গ্রীকদিগের | Athena, |
| ঋগ্বেদের | উষা | গ্রীকদিগের | Eos, |
| ঋগ্বেদের | সরমা | গ্রীকদিগের | Helena, |
| ঋগ্বেদের | সরণ্যু | গ্রীকদিগের | Erinys, * |

* See Dr. Rajendra Lal Mitra's *Indo Aryans,* Vol II. *Primitive Aryans.*

ঊষা সম্বন্ধে দুই একটি সুন্দর স্তুতি আমরা এই স্থানে উদ্ধৃত করিব।

"গৃহকার্য্যনেত্রী গৃহিণীর ন্যায় সকলকে পালন করিয়া ঊষা আগমন করেন। * * * *

"তুমি চেষ্টাবান্ পুরুষকে কার্য্যে প্রেরণ কর, ভিক্ষুকদিগকে প্রেরণ কর; তুমি নীহারবর্ষী এবং ক্ষণস্থায়িনী। তুমি উদয় হইলে উড্ডীয়মান পক্ষিগণ আর কুলায় অবস্থান করে না।

"তিনি রথ যোজিত করিয়াছেন। সৌভাগ্যবতী ঊষা দূর হইতে শত রথের দ্বারা মনুষ্যগণের নিকট আগমন করিতেছেন।

"তাঁহার প্রকাশ হইবার জন্য সকল প্রাণী নমস্কার করিতেছে; নেত্রী জ্যোতি প্রকাশ করিতেছেন; ধনবতী স্বর্গদুহিতা বিদ্বেষীদিগকে ও শোষক-দিগকে দূর করিতেছেন।

"হে স্বর্গদুহিতে! আহ্লাদকর জ্যোতির সহিত উদয় হও, দিবসে দিবসে আমাদিগকে প্রভূত সৌভাগ্য আনিয়া দাও, এবং অন্ধকার দূর কর।"

১ মণ্ডল, ৪৮ সূক্ত, ৫ হইতে ৯ ঋক।

"নর্ত্তকীর ন্যায় ঊষা আপন রূপ প্রকাশ করিতেছেন। গাভী যেরূপ দোহন কালে স্বীয় উধঃ প্রকাশিত করে, ঊষাও সেইরূপ নিজ বক্ষ প্রকাশিত করিতেছেন। গাভী যেরূপ শীঘ্র গোষ্ঠে গমন করে, সেইরূপ ঊষাও পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া বিশ্ব ভুবন প্রকাশ করিতেছেন, অন্ধকার বিশ্লিষ্ট করিতেছেন।

"আমরা নৈশ অন্ধকারের পারে আসিয়াছি, ঊষা সমস্ত প্রাণীকে চৈতন্য-যুক্ত করিয়াছেন। দীপ্তিমতী ঊষা মিষ্টবাদীর ন্যায় প্রীতি পাইবার জন্য যেন স্বীয় দীপ্তিতেই হাসিতেছেন; আলোক-বিকশিতাঙ্গী ঊষা আমাদিগের সুখের জন্য অন্ধকার বিনাশ করিতেছেন।

"পশুপালক যেরূপ পশু বিচরণ করায়, সুভগা ও পূজনীয়া ঊষা সেই রূপ তেজ বিস্তার করিতেছেন। মহতী নদী যেরূপ প্রবাহিতা হয়, মহতী ঊষা সেই রূপ জগৎ ব্যাপ্ত করিতেছেন। তিনি দেবগণের যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সূর্য্যকিরণের সহিত দৃষ্ট হয়েন।"

১ মণ্ডল, ৯২ সূক্ত ৪, ৬, ও ১১ ঋক।

"অদ্যও যেরূপ কল্যও সেইরূপ, ঊষাদেবী সর্ব্বকালেই অনবদ্যা। প্রতি দিন বরুণের অবস্থিতি স্থান হইতে ত্রিংশত যোজন

অগ্রে অবস্থিত হয়েন। একই উষা উদয় কালেই গমন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। *

"দেবী! কন্যার ন্যায় নিজ শরীর বিকাশ করিয়া তুমি যোগাভিলাষী দীপ্তিমান্ সূর্য্যের নিকট গমন কর। যুবতীর ন্যায় অত্যন্ত দীপ্তি-বিশিষ্টা হইয়া ঈষৎ হাস্য করত তাঁহার সম্মুখে বক্ষ স্থল অনাবৃত কর।

"মাতা দেহ মার্জ্জন করিয়া দিলে কন্যার শরীর যেরূপ উজ্জ্বল হয়, তুমিও সেই রূপ আপন উজ্জ্বল শরীর সকলের দর্শনার্থ প্রকাশ কর। তুমি ভদ্রা, তুমি অন্ধকারকে দূর করিয়া দাও; অন্য উষা তোমার কার্য্যে ব্যাপ্ত হইবে না।

১ মণ্ডল, ১২৩ সূক্ত, ৮, ১০, ১১ ঋক্।

"উষা বিস্তৃত অন্তরীক্ষের পূর্ব্ব ভাগে উদয় হইয়া দিক সমূহের চৈতন্য সম্পাদন করিতেছেন; পিতা স্বর্গ ও পৃথিবীর উৎসঙ্গে থাকিয়া উভয়কে নিজ তেজে পরিপূর্ণ করিতেছেন, এবং বিস্তীর্ণ রূপে প্রথিত হইতেছেন।

"যুবতী উষা পূর্ব্ব দিক হইতে আগমন করিতেছেন, অরুণ বর্ণ অশ্বগণকে রথে যোজিত করিতেছেন। দিবসের সূচনা করিয়া অন্তরীক্ষে অন্ধকার নিবারণ করিতেছেন, গৃহে গৃহে অগ্নি প্রদীপ্ত হইতেছে।

"হে উষা তোমার উদয় হওয়ায় পক্ষিগণ কুলায় হইতে ঊর্দ্ধে উড়িয়া যাইতেছে, অন্নার্থী মনুষ্যগণ চারিদিকে গমন করিতেছে। হে দেবি! গৃহী হব্যদাতা মনুষ্যের জন্য ধন আনয়ন কর।

১ মণ্ডল, ১২৪ সূক্ত, ৫, ১১, ১২ ঋক্।

"মনুষ্য যেরূপ রমণীর পশ্চাদ্ধাবন করে, সূর্য্য সেইরূপ উষার পশ্চাতে আসিতেছেন †। এই সময়ে দেবত্বাকাঙ্ক্ষী মনুষ্যগণ বহু যুগ প্রচলিত যজ্ঞ কর্ম্ম

* এই ঋকের টীকার সায়ণ লিখিয়াছেন যে সূর্য্য প্রত্যহ ৫০৫৯ যোজন ভ্রমণ করেন।" The reckoning of the sun's daily journey, cited by Sayana perhaps from some text in the *vedas* is much nearer the truth than that of the *puranas,* being something more than 20,000 miles and being infact the Equatorial Circumference of the Earth.—Bentley, *Hindu Astronomy.* P. 185 Wilson's Note.

† ঋগ্বেদে যেটি উপমা মাত্র, গ্রীকদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে সেটি উপাখ্যান হইয়া গিয়াছে। Apollo দেব Daphne দেবীর পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। পলায়মানা Daphne পরিত্রাণার্থ শরীর বিসর্জ্জন দিলেন। অর্থাৎ সূর্য্য উদয় হইলে উষা অন্তর্হিত হইলেন।

বিস্তার করেন, সুকলের জন্য কল্যাণ কর্ম্ম সম্পন্ন করেন।"

১ মণ্ডল, ১১৫ সূক্ত ২ ঋক্।

"উষা কাহাকেও ধনের জন্য, কাহাকেও অন্নের জন্য, কাহাকেও অভীষ্ট লাভের জন্য জাগরিত করিতেছেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন জীবনোপায় প্রকাশ করিয়া দিবার জন্য জগৎ প্রকাশ করিতেছেন।

"ঐ নিত্য-যৌবন-সম্পন্না, শুভ্র-বসনা, আকাশ-দুহিতা অন্ধকার বিদূরিত করিয়া দর্শন গোচর হইতেছেন; তিনি পার্থিব সমস্ত ধনের ঈশ্বরী। হে সুভগে; অদ্য উদয় হও।

"কত কাল হইতে উষা উদয় হইতেছেন! কত কাল পর্য্যন্ত উদয় হইবেন। বর্ত্তমান উষা পূর্ব্ব উষাকে অনুকরণ করিতেছেন; আগামী উষা-গণ এই দীপ্তিমতী উষাকে অনুকরণ করিবেন।

"যাঁহারা পূর্ব্ব কালে উষাকে উদয় হইতে দেখিয়া ছিলেন, তাঁহারা গত হইয়াছেন। এক্ষণে আমরা দর্শন করিতেছি, ভবিষ্যতে যাঁহারা দর্শন করিবেন তাঁহারা অসিতেছেন।" ১ মণ্ডল, ১১৩ সূক্ত, ৬, ৭, ১০, ১১, ঋক্।

অনন্ত প্রবাহিনী, অতুলসৌন্দর্য্যোপেতা উষাকে দেখিয়া যে চিন্তালহরী, যে উপমালহরী আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষের হৃদয়ে উদয় হইয়াছিল, ঋগ্বেদের পত্রে পত্রে তাহা অঙ্কিত রহিয়াছে, আমরা চারি সহস্র বৎসর পরে তাঁহাদিগের সেই অনুপমেয় সুন্দর চিন্তা গুলি দেখিতে পাইতেছি। এই চিন্তা গুলি পাঠ করিতে করিতে বোধ হয় যেন আমরা অদ্যকার আড়ম্বর পূর্ণ বৃথা বিবাদ পূর্ণ আধুনিক জগতে নাই, যেন সিন্ধুতীর-নিবাসী সরলহৃদয়, সবল বাহু পূর্ব্বপুরুষদিগের শান্ত মুখ মণ্ডল অবলোকন করিতেছি, তাঁহাদিগের সহিত কথা কহিতেছি, তাঁহাদিগের মনের ভাব ও চিন্তা জ্ঞাত হইতেছি। তাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে অবস্থিতি করিতেছেন, উর্ব্বরা ক্ষেত্রে যবাদি শস্য চাষ করিতেছেন, গোচর হইতে অন্য গোচরে পশু লইয়া যাইতেছেন, অরুণ বর্ণ উষা বা জ্বলন্ত সূর্য্য দেখিয়া ভক্তি ও বিস্ময়ে দ্রবীভূত হইতেছেন, প্রাতঃকালে অগ্নি জ্বালিয়া সেই প্রকৃতির অনন্ত মহিমার স্তুতি করিতেছেন, আবার যুদ্ধের সময় সকলে অস্ত্র ধারণ করিয়া চতুর্দ্দিকস্থ অনার্য্যদিগকে পরাস্ত করিয়া আর্য্য অধিকার, আর্য্য নাম, আর্য্য গৌরব, বিস্তার করিতেছেন। চারি সহস্র বৎসর পর সেই সরলতা পূর্ণ পরাক্রান্ত মহাত্মা পিতৃদেবদিগকে নমস্কার করি।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

# বঙ্গে ইংরেজাধিকার।

৪।

যখন সিরাজের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইতেছিল, মুর্শিদাবাদের প্রধান রাজপুরুষগণ যখন ইংরেজদিগের সহযোগী হইয়া আপনাদের প্রভুকে ধনে প্রাণে নষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, সিরাজউদ্দোলা তখন আপনার কর্ত্তব্য পথ অবধারণ করিতে পারেন নাই; তখন তাঁহার গভীর সন্দেহ ক্রমে গভীরতর হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি আপনার চারিদিকে ঘোরতর বিঘ্ন বিপত্তি দেখিয়া অধিকতর উদ্বিগ্ন ও কর্ত্তব্যবিমুখ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিরূপে ইংরেজের সমক্ষে আপনার প্রাধান্য অব্যাহত রাখিতে হইবে, কিরূপে আপনাকে সমুদায় বিপদ হইতে রক্ষা করিতে হইবে, তাহা তিনি তখন কিছুই ঠিক করিতে পারেন নাই। সিরাজের আশঙ্কা কিরূপ গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তাঁহার সেই সময়ের অবস্থার বিষয় ভাবিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। তিনি যাঁহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই তাঁহারা সর্ব্বনাশ ঘটাইতে কৃতসঙ্কল্প হন। যাঁহাদের ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া তিনি আপনাকে নিরাপদ করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাঁহারাই তাঁহাকে অধিকতর বিপদে ফেলিতে সমুদ্যত হইয়া উঠেন। গুরুতর আশঙ্কা ও উদ্বেগের করাল ছায়া চারিদিক হইতে আসিয়া তাঁহার হৃদয়ে গভীর কালিমার রেখাপাত করিতেছিল। বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারিগণের ষড়যন্ত্রে তাঁহার পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার কার্য্যপ্রণালী সুনিয়মিত ছিল না। তিনি শাসনদণ্ডের গৌরব রক্ষা করিতে সুযোগ পাইতেন না। দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, প্রতিদিনই সিরাজের শোচনীয় অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিল। প্রতিদিনই সিরাজ আপনাকে শত্রুপরিবেষ্টিত ভাবিয়া, অধিকতর শঙ্কিত, অধিকতর চিন্তিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, চন্দননগর অধিকৃত হইলে কতিপয় ফরাসি-সৈন্য কাশিমবাজারে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহারা তথায় উপস্থিত হইলে, কাশিমবাজারের ফরাসিদিগের কুঠিতে ৭০ জন ইউরোপীয় ও ৬০ জন এতদ্দেশীয়

সৈন্য সমবেত হয়। 'ল' নামক এক জন ফরাসি ইহাদের সেনাপতি ছিলেন। সেনাপতির কার্য্যে তাঁহার তাদৃশ যোগ্যতা না থাকিলেও, তিনি দূরদর্শী ও সদ্বিবেচক ছিলেন। নবাবের মঙ্গলসাধনে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি নবাবের কাছে থাকিয়া আপনার স্বদেশীদিগকে রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। কিন্তু লর্ড ক্লাইব এই অল্পসংখ্যক ফরাসির ও বিরুদ্ধাচরণে নিরস্ত থাকেন নাই। তিনি বাঙ্গালার অন্যান্য ফরাসি অধিকার আক্রমণ করিবার অনুমতি দিতে নবাবকে কঠোর ভাবে পত্র লিখিয়াছিলেন। ইহাতে নবাবের ক্রোধ অধিকতর উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। নবাব ক্লাইবের এই অনুচিত প্রার্থনায় সম্মত হন নাই। কিন্তু ক্লাইবের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবার অল্পকাল পরেই তাঁহার মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন হয়। তিনি আবার ইংরেজ-ভীতিতে বিচলিত হইয়া উঠেন। ফরাসি সেনাপতি 'ল'কে স্থানান্তরিত করিয়া ইংরেজ সেনাপতির সন্তুষ্টি সাধনে এখন তাঁহার ইচ্ছা হয়। দূরদর্শী 'ল' সহসা নবাবের এইরূপ চাঞ্চল্য দেখিয়া কিছু চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। তিনি বৃথা নবাবকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, যাহারা সকল সময়ে সকল বিষয়ে তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতেছে, তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করিলে, তাঁহার বিপদ বাড়িয়া উঠিবে। বৃথা দেখাইতে লাগিলেন, যে, বিশ্বস্ত ফরাসিরা রাজধানীর নিকট থাকাতেই তাঁহার বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীদিগের দুরভিসন্ধি সিদ্ধির ব্যাঘাত হইতেছে। 'ল'র এই যুক্তিপূর্ণ কথায় নবাবের চৈতন্য হইল না। 'ল' স্থানান্তরে গেলে আপনাদের স্বার্থ সিদ্ধির অন্তরায় দূর হইবে ভাবিয়া মুর্শিদাবাদের বিশ্বাসঘাতক রাজপুরুষগণও সিরাজকে পূর্ব্বসঙ্কল্প অনুসারে কার্য্য করিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। সুতরাং নবাব 'ল'কে কাশিমবাজার পরিত্যাগ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি ফরাসি সেনাপতিকে প্রয়োজনানুসারে অর্থ ও অস্ত্র শস্ত্র দিয়া কহিলেন, যে, তিনি যেন ভাগলপুরের অধিক দূরে গমন না করেন। ভাগলপুরে থাকিলেই নবাব আবশ্যক মত তাঁহার সাহায্য লইতে পারিবেন। 'ল' তাহাতে আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। তরুণবয়স্ক যুবককে চতুরের চাতুরিজালে এইরূপ জড়িত হইতে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে গভীর বিষাদ উপস্থিত হইল। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, ক্লাইব যেরূপ চতুরতা দেখাইতেছেন, মুর্শিদাবাদের রাজপুরুষগণ যেরূপ অবিশ্বাসের পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে নবাবের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। ফরাসি সেনাপতি নবাবকে

ষড়যন্ত্র হইতে উদ্ধার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু দুরদৃষ্ট প্রযুক্ত তাহা ঘটিয়া উঠিল না। নবাবের বুদ্ধিচাঞ্চল্যে ও ষড়যন্ত্রকারিগণের কৌশলে এই হিতৈষীব্যক্তির সমস্ত যুক্তি বিফল হইল। নবাব পূর্ব্বেই তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইতে আদেশ দিয়াছিলেন, তিনি এখন এই আদেশ পালনে উদ্যত হইলেন। নবাব বিষণ্ণচিত্তে, সজলনয়নে তাঁহাকে বিদায় দিয়া কহিলেন যে, তিনি শীঘ্রই আবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। কিন্তু নবাব বিপত্তির বিষম বাগুরায় ধীরে ধীরে যেরূপ আবদ্ধ হইতেছিলেন, তাহা দূরদর্শী ফরাসিসেনাপতির অবিদিত ছিল না। সুতরাং নবাবের শেষ কথায় 'ল' কাতরতার সহিত কহিলেন, যে, বোধ হয় আর তাঁহারা কখন পরস্পর সম্মিলিত হইবেন না *। ইহার পর 'ল' আবার কাতরতার সহিত নবাবের কাছে এই ভিক্ষা করিলেন, যে, নবাব যেন তাঁহার সমস্ত কথা মনে রাখেন। নিরাশার ঘোর অন্ধকারে বিপত্তির করাল ছায়ায়, তাঁহার ভবিষ্য সুখের পথ আচ্ছাদিত হইতেছে, আপাত মনোরম দৃশ্যে, আপাত সুখের আবেশে, তিনি যেন কখনও ইহা ভুলিয়া না যান। পরস্পরের সম্ভাষণ বাক্য শেষ হইল। 'ল' সজল নয়নে নবাবের নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। তরুণবয়স্ক নবাবও একজন বিদেশীর এইরূপ সৌজন্য, এইরূপ স্নেহ ও এইরূপ সমবেদনায় মুগ্ধ হইয়া, সজল নয়নে তাঁহার গমন পথের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। 'ল' আপনার সৈন্য লইয়া ধীরে ধীরে কাশিম বাজার পরিত্যাগ করিলেন; ধীরে ধীরে তাঁহার ভবিষ্যবাণী ফলবতী হইতে লাগিল। ফরাসি সেনাপতির গমন-সংবাদে ক্লাইব সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ হইলেন। এখন অভীষ্ট কার্য্য সাধনে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ জন্মিল। তিনি কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠি রক্ষা করিতে একদল সৈন্য পাঠাইয়া, ওয়াট্‌স সাহেবকে মীরজাফরের সহিত সমুদায় বন্দোবস্ত ঠিক করিতে বিশেষ রূপে অনুরোধ করিলেন। ফরাসি সেনাপতি "ল"র প্রস্থানের কয়েক দিন পরেই নবাবের চিত্ত-বৃত্তি আবার পরিবর্ত্তিত হইল। ইংরেজদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই নবাব 'ল'কে কাশিমবাজার পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। এখন তাঁহার বিশ্বাস হইল, যে, ইহাতে তাঁহারই অনিষ্ট ঘটিবে। ইংরেজ সেনাপতি ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকেই ধনে প্রাণে বিনষ্ট করিতে সচেষ্ট হইবেন; সুতরাং আবার তাঁহার ভয় বাড়িয়া উঠিল। গভীর আশঙ্কা আবার তাঁহাকে বিচলিত করিতে লাগিল। তিনি

* *Seir Mutugherim*, p 762.

মীরজাফরকে পনের হাজার সৈন্য লইয়া রাজা দুর্লভরামের সহিত পলাশিতে থাকিতে আদেশ দিলেন, কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠি ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, এবং ইংরেজ-রণতরীর গতি নিরোধ জন্য ভাগীরথীতে বৃহৎ বৃহৎ কাঠের গুঁড়ি ডুবাইয়া রাখিলেন।

নবাব ইংরেজের ভয়েই এই সমস্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু ইংরেজদিগকে আপনা হইতে আক্রমণ করা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। নানা দুশ্চিন্তায় ও নানা দুর্ঘটনায় তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, যে ইংরেজ একদিন তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিবেন। তিনি এই আশঙ্কাতেই এইরূপ পূর্ব্ব সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। নবাবের এই কার্য্যে চতুর ক্লাইবের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ অধিকতর প্রশস্ত হইল। নবাব ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেছেন বলিয়া ক্লাইবও আটঘাট বাঁধিতে লাগিলেন, এবং এখন দুরাশয় মীরজাফরের সহিত ষড়যন্ত্রঘটিত সমস্ত বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া নবাবের সর্ব্বনাশ ঘটাইবার অবসর পাইলেন।

যখন মীরজাফর নবাবের আদেশে পলাশিতে যাত্রা করেন, তখন ইংরেজদিগের সহিত সমুদয় বিষয়ের বন্দোবস্ত করিবার জন্য মুর্শিদাবাদে একজন বিশ্বস্ত এজেন্ট রাখিয়াছিলেন। ওয়াট্‌স সাহেব ইহা অবগত হইয়া উপস্থিত বিষয়ে অতঃপর কি করিতে হইবে, জানিবার জন্য আপনার সহকারী স্ক্রাফ্‌টন সাহেবকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। এই সময়ে, নবাবের মনে কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত না হয়, নবাব আপনাকে সম্পূর্ণরূপ নিরাপদ ভাবেন, এজন্য তিনি, যে সকল সৈন্য কাশিম বাজারে আসিবার জন্য কাটোয়ায় অবস্থিতি করিতেছিল, তাহাদিগকে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিলেন।

ষড়যন্ত্র-ঘটিত সমস্ত বিষয়ের বন্দোবস্ত করিবার জন্য কলিকাতায় ইংরেজদিগের একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল *। এই সমিতি হইতে প্রথম এক খানি সন্ধিপত্র প্রস্তুত হয়। নবাব হইলে, মীরজাফরকে যে সকল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, সন্ধিপত্রে তৎসমুদয়ের উল্লেখ থাকে। এই সন্ধিপত্রে পরে লিখিত ১৩টি ধারা ছিল—

---

* এই সমিতিতে ড্রেক, কর্ণেল ক্লাইব, ওয়াট্‌স, কর্ণেল কিলপাট্রিক, বেচর ও মানিংহাম সাহেব ছিলেন।

১ম। শান্তির সময়ে, নবাব সিরাজউদ্দৌলার সহিত ইংরেজদিগের যে যে সন্ধি হয়, আমি তৎসমুদায় প্রতিপালন করিব।

২য়। ভারতবর্ষীয় হউক, কিম্বা ইউরোপীয় হউক, যে কেহ ইংরেজের শত্রু হইলেই, আমার শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইবে।

৩য়। বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যায় ফরাসিদিগের যে সকল কুঠি ও সম্পত্তি আছে, তৎসমুদায় ইংরাজদিগের অধিকারে থাকিবে। আমি এই তিন প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতে ফরাসিদিগকে কখন অনুমতি দিব না।

৪র্থ। নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ ও অধিকার করাতে ইংরেজ কোম্পানির যে ক্ষতি হয়, তাহার পূরণ জন্য আমি ঐ কোম্পানিকে এক কোটি টাকা দিব।

৫ম। উক্ত আক্রমণে কলিকাতার ইংরেজঅধিবাসীগণের যে ক্ষতি হইয়াছে, তজ্জন্য আমি তাহাদিগকে ৫০ লক্ষ টাকা দিব।

৬ষ্ঠ। কলিকাতার অন্যান্য অধিবাসীদিগের ক্ষতি পূরণ জন্য ২০ লক্ষ টাকা দেওয়া যাইবে।

৭ম। কলিকাতার আরমানিদিগের ক্ষতি পূরণ জন্য ৭ লক্ষ টাকা দিব। এই সমস্ত টাকা দেওয়ার ভার ওয়াট্‌স, ক্লাইব, ড্রেক, ওয়াট্‌সন, কিলপাট্রিক ও বেচার সাহেবের উপর থাকিবে।

৮ম। কলিকাতার প্রান্তভাগে যে মহারাষ্ট্র খাত আছে, তাহার মধ্যবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগ এবং ঐ খাতের বহিঃস্থ ৬০০ গজ পরিমিত ভূমি ইংরেজ কোম্পানির অধিকার-ভুক্ত হইবে।

৯ম। কলিকাতার দক্ষিণে কুল্পী পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ, ইংরেজ-কোম্প্যানির জমিদারির অন্তর্গত হইবে। অন্যান্য জমিদারেরা যে নিয়মে কর দেন, ইংরেজ কোম্পানিকেও সেই নিয়মে কর দিতে হইবে।

১০। ইংরেজ আমার সাহায্যের জন্য যে সৈন্য পাঠাইবেন, আমি তাহার খরচ যোগাইব।

১১। হুগলির দক্ষিণ গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত ভাগীরথীর তটে আমি কোন দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে পারিব না।

১২। উপরে টাকা দেওয়ার সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তাব হইয়াছে, আমি বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার অধিকার পাইয়াই তৎসমুদায় কার্য্যে পরিণত করিব।

মীরজাফর নবাব হইলে, প্রথমে যে সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা এইরূপে স্থির হয়। ওয়াট্‌স সাহেব কলিকাতা হইতে এই সন্ধি-লিপি প্রাপ্ত হইয়া মীরজাফরের এজেণ্টের হস্তে সমর্পণ করেন। এজেণ্ট পলাশিতে যাইয়া উহা আবার মীরজাফরকে দেখান। ইহার দুই দিন পরে, এই এজেণ্ট মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগত হইয়া ওয়াট্‌স সাহেবকে কহেন, যে, "মীরজাফর সন্ধিপত্রের সকল প্রস্তাবেই সম্মত হইয়াছেন; কিন্তু এই বিষয় উমিচাঁদের গোচর করা তাঁহার অভিপ্রেত নয়, যেহেতু তিনি উমিচাঁদের উপর কোন বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না।"

সন্ধিপত্র পারস্য ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। উহার দ্বাদশ ধারার পর মীরজাফর এই বলিয়া আপনার নাম স্বাক্ষর করেন, যে—"আমি ঈশ্বর ও ঈশ্বরের প্রেরিতের নামে শপথ করিতেছি, যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন সন্ধির নিয়ম সকল প্রতিপালনে কখনও ঔদাসীন্য দেখাইব না।" ইহার পর ত্রয়োদশ ধারায় ওয়াট্‌সন, ড্রেক, কর্ণেল ক্লাইব, ওয়াট্‌স কিলপাট্রিক ও বেচার সাহেব নিম্নলিখিত ভাবে আপনাদের নাম স্বাক্ষর করেন—"মীর-জাফর খাঁ সন্ধিপত্রের উল্লিখিত নিয়ম সকল প্রতিপালন করিবেন, এই সর্ত্তে আমরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া ঈশ্বরের নিকট শপথ করিতেছি, যে, মীরজাফর খাঁ বাহাদুরকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার করিতে যথোচিত সহায়তা করিব, এবং তাঁহাকে সমস্ত শত্রুর আক্র-মণ হইতে রক্ষা করিতে যত্ন করিব।" এইরূপে ত্রয়োদশ ধারাপূর্ণ এই ঘৃণিত সন্ধিপত্র মীরজাফর ও ইংরেজদিগের মধ্যে বিধিবদ্ধ হয়, এইরূপে মীরজাফর ও ক্লাইব-প্রমুখ ইংরেজগণ হতভাগ্য সিরাজের সর্ব্বনাশ ঘটাইবার সূত্রপাত করেন।

উল্লিখিত সন্ধিপত্রে মীরজাফর কলিকাতার ইংরেজদিগকে যে অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহাতেও ক্লাইব প্রভৃতির দুর্নিবার লালসা চরিতার্থ হয় নাই। ইংরেজ সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে অর্থ দেওয়ার সম্বন্ধে আর একখানি অঙ্গীকার পত্র প্রস্তুত হয়। এই অঙ্গীকার পত্রে পর পৃষ্ঠায় লিখিত ব্যক্তিদিগকে পার্শ্বের লিখিত মত টাকা দিবার কথা থাকে,—

| | |
|---|---|
| কলিকাতার গবর্ণর ড্রেক সাহেব ... ... ... | ২,৮০,০০০ টাকা |
| কর্ণেল ক্লাইব ... ... ... ... | ২,৮০,০০০ ,, |
| ওয়াট্স সাহেব ... ... ... ... | ২,৪০,০০০ ,, |
| কর্ণেল কিল্পাট্রিক ... ... ... ... | ২,৪০,০০০ ,, |
| মানিংহাম সাহেব ... ... ... ... | ২,৪০,০০০ ,, |
| বেচার সাহেব ... ... ... ... | ২,৪০,০০০ ,, |
| | ১৫,২০,০০০ টাকা।* |

মীরজাফর বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার আধিপত্য লাভ মানসে, এইরূপে ইংরেজদিগের ভোগ-লালসার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। ওয়াট্স সাহেব যখন তাঁহার সম্মুখে সন্ধিপত্র উপস্থিত করেন, তখন তিনি আপনাদের চির-পবিত্র কোরাণ মাথায় লইয়া, এবং আপনার পুত্রের হস্তে দক্ষিণ হস্ত সমর্পণ করিয়া, গম্ভীর ভাবে এই অঙ্গীকার করেন, যে, ইংরেজগণ যখন নবাবের বিরুদ্ধে উপস্থিত হইবেন, তখন তিনি ইংরেজদিগের সহযোগী হইতে

* এতদ্ব্যতীত ক্লাইব প্রভৃতিকে আরও অনেক টাকা দিবার কথা হয়। অতি গোপনে এই বিষয়ের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। যদিও সন্ধি সংক্রান্ত কোন প্রকাশ্য কাগজে এ বিষয়ের উল্লেখ ছিল না, তথাপি নিম্নলিখিত ব্যক্তি-দিগকে, স্বতন্ত্রভাবে পার্শ্বের লিখিত মত টাকা দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়,—

| | |
|---|---|
| কর্ণেল ক্লাইব ... ... ... | ১৬,০০,০০০ টাকা |
| ওয়াট্স সাহেব ... ... ... | ৮,০০,০০০ ,, |
| কর্ণেল কিলপাট্রিক ... ... ... | ৩,০০,০০০ ,, |
| কলিকাতার ইংরেজ কৌন্সি-লের ৬ জন সদস্য, প্রত্যেক ১ লক্ষ করিয়া ... ... | ৬,০০,০০০ ,, |
| ক্লাইবের সেক্রেটরি ওয়াল্স সাহেব ... | ৫,০০,০০০ ,, |
| স্ক্রাফ্টন সাহেব ... ... ... | ২,০০,০০০ ,, |
| লসিংটন সাহেব ... ... ... | ৫০,০০০ ,, |
| ৩৯ গণিত পদাতিক দলের অধ্যক্ষ মেজর গ্রাণ্ট | ১০০,০০০ ,, |

এতদ্ব্যতীত সৈনিক কর্ম্মচারীদিগকে যে অতিরিক্ত টাকা দেওয়া হয়, তাহার অংশস্বরূপ ক্লাইব ২,০০,০০০ টাকা প্রাপ্ত হন। এই বিলুণ্ঠন কার্য্যে ক্লাইবের ২০,৮০,০০০ টাকা লাভ হয়। এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত, যে সময়ে টাকার মূল্য বর্ত্তমান সময়ের অপেক্ষা অধিক ছিল।

সঙ্কুচিত হইবেন না। ইংরেজেরা যদি সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হন, তাহা হইলে তাঁহারা যেমন আক্রমণ করিবেন, অমনি তিনি নবাবকে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিবেন। চতুরে চতুরে মিলন হইল। বিশ্বাসঘাতকতার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা স্থান পরিগ্রহ করিল। অর্থের অপার মহিমায়, অনন্ত ভোগতৃষ্ণায় ধর্ম্ম ন্যায়পরতা সমস্তই অন্তর্দ্ধান করিল। ঘোরতর অবিচার—কলঙ্কের অসীম কালিমার মধ্যে বঙ্গে ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি স্থাপিত হইল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে, মীরজাফর উপস্থিত ষড়যন্ত্রের বিষয় উমিচাঁদের নিকট গোপন রাখিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, উমিচাঁদের সহিত ইংরেজদিগের ঘনিষ্ঠতা আছে, উমিচাঁদ অনেক সময়ে ইংরেজদিগের অনেক উপকার করিয়াছেন। এখন যদি তিনি এই ষড়যন্ত্রের বিষয় জানিতে পারেন, তাহা হইলে, তাঁহাকেও অনেক টাকা দিয়া বশীভূত করিতে হইবে। মীরজাফর এই আশঙ্কাতেই সমস্ত বিষয় উমিচাঁদের অবিদিত রাখিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু মীরজাফরের এই অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করা ওয়াট্‌স সাহেবের দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। উমিচাঁদ ওয়াট্‌স সাহেবের বিশ্বাস-ভাজন ছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদে ওয়াট্‌স সাহেবের অনেক সহায়তা করেন।

ওয়াট্‌স সাহেবের বিশ্বাস ছিল, যে, উপস্থিত ষড়যন্ত্রের বিষয় যথাসময়ে তাঁহার বিশ্বস্তপাত্রের গোচর করা হইবে; কিন্তু মীরজাফরের দূত পলাশি হইতে প্রত্যাগত হইলে, ওয়াট্‌স সাহেবের মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন হয়। এখন হইতে ওয়াট্‌স সাহেব উমিচাঁদের নিকট অনেক কথা ঢাকিবার চেষ্টা করেন। ইহাতে উমিচাঁদের সন্দেহ বাড়িয়া উঠে। উমিচাঁদ স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে, মীরজাফরের সহিত ইংরেজদিগের কোন গুরুতর ও গোপনীয় বিষয়ের বন্দোবস্ত হইতেছে। সন্দেহের আবেগে, এখন তিনি ওয়াট্‌স সাহেবকে সমস্ত বিষয় খুলিয়া বলিতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। ইতিহাস-লেখক অর্ম্ম সাহেব উপস্থিত বিষয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, যে, কথিত আছে, উমিচাঁদ এই বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন, যদি তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করা না হয়, তাহা হইলে তিনি নবাবকে ষড়যন্ত্রের কথা জানাইবেন। অন্যান্য ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ অর্ম্ম সাহেবের এই বাক্যই অতিরঞ্জিত করিয়া পবিত্র ইতিহাসে আপনাদের অপূর্ব্ব কল্পনা-চাতুরির পরিচয় দিয়াছেন। সর জন মাল্-

কথা লিখিয়াছেন, "যখন সমস্ত ঠিক হইয়াছে, তখন উমিচাঁদ ওয়াট্‌স সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া কহেন, যে, যদি তাঁহাকে ৩০ লক্ষ টাকা দিবার বন্দোবস্ত না হয়, তাহা হইলে, তিনি নবাবের নিকট সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিবেন।" লর্ড মেকলে মাল্‌কমের ছন্দানুবর্ত্তী হইয়া বলিয়াছেন,—"উমিচাঁদ ৩০ লক্ষ টাকা দাবি করিয়াছিলেন।" গ্লিগ্ সাহেবের কল্পনাময়ী লেখনী আবার এইরূপ অতিরঞ্জন-শক্তির অনন্ত মহিমা প্রকাশ করিয়াছে। "উমিচাঁদ ওয়াট্‌স সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া কহেন, যে, যদি তাঁহাকে ৩০ লক্ষ টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার করা না হয়, তাহা হইলে, তিনি সিরাজউদ্দৌলাকে সমস্ত বিষয় জানাইবেন, এবং সমস্ত ইংরেজ ও এতদ্দেশীয় ষড়যন্ত্রকারীকে ঘটনাস্থলে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিবেন *।"

ইংরেজ-ঐতিহাসিকগণের এই সকল বাক্য নিরবচ্ছিন্ন জনশ্রুতিমূলক। এই বাক্যের কোন পরিপোষক প্রমাণ অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। মাল্‌কম, মেকলে প্রভৃতি সকলেই অর্ম সাহেবের 'কথিত আছে" বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া, আপনাদের এই রূপ অতিরঞ্জন-শক্তি ও কল্পনা-প্রিয়তার পরিচয় দিয়াছেন। উমিচাঁদ নবাবের নিকট ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিবেন বলিয়া যে, সকলকে ভীত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কেহ কোন প্রমাণ দেখাইতে পারেন নাই। সে সময়ে উমিচাঁদের চরিত্র কলঙ্কিত করিতেই সকলে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। টাকা না পাইলে, পাছে উমিচাঁদ সকল কথা প্রকাশ করিয়া ফেলেন, এই আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হইয়াই সে সময়ে কলিকাতাস্থ ইংরেজগণ তাঁহার বিরুদ্ধে একটি অলীক দোষের আরোপ করেন। অর্ম সাহেব অন্য প্রমাণাভাবে কেবল "কথিত আছে" বলিয়াই, উমিচাঁদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন পূর্ব্বক ইতিহাসের সম্মান রক্ষা করিতে যত্নশীল হন। মাল্‌কম এই অর্ম সাহেবেরই "কথিত আছে" কথার অনুসরণ করিয়া, উক্ত অভিযোগটি পল্লবিত করিয়া তুলেন, আর মেকলে ও গ্লিগ্ মাল্‌কমের পরিপোষক হইয়া আপনাদের রসময়ী লেখনীর বলে জগতের সমক্ষে অপূর্ব্ব কল্পনা-বিভ্রম প্রদর্শন করেন। বস্তুত উমিচাঁদ ওয়াট্‌স সাহেবকে কোনরূপে ভয় দেখান নাই। তিনি ইংরেজদিগের যেরূপ সপক্ষতা করিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে এরূপ কোন অভিযোগ উত্থাপিত হইতে পারে না।

* *Malleson*, Lord Clive, P. 229—230.

সে সময়ে উমিচাঁদ হইতে ইংরেজদিগের অনেক উপকার হইয়াছিল। উমিচাঁদ ইংরেজদিগের স্বার্থরক্ষার জন্য অনেক যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু ইংরেজগণ শেষে আপনাদের এই উপকারীর নিকট সমুচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন নাই। ইংরেজের অসীম চাতুরি বলে ও অনন্ত কৌশলেই, শেষে উমিচাঁদ প্রতারিত ও ভগ্নহৃদয় হইয়া দুর্দ্দশার একশেষ ভুগিতে থাকেন। এ সম্বন্ধে একজন ইংরেজ-ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, যে, উমিচাঁদ সে সময়ে ইংরেজদিগের যে অসীম উপকার করিয়াছিলেন, তদ্বিষয় বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়, যে, ইংরেজেরা উমিচাঁদকে বিশেষ পারিতোষিক না দিয়া যার পর নাই আপনাদের অসাধুতা, অকৃতজ্ঞতা ও দুর্নীতির পরিচয় দিয়াছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে, তাঁহাদের আচরণেই উমিচাঁদ ভগ্নহৃদয় হন। টাকা না পাইলে তাঁহার অসন্তোষ জন্মিত কিন্তু তিনি কখনও ওয়াট্‌স সাহেবকে ভয় দেখান নাই, যথোচিত অর্থ না পাইলে নবাবকে ষড়যন্ত্রের বিষয় জানাইবেন, ইহা কখনও ওয়াট্‌স সাহেবকে বলেন নাই। উমিচাঁদের জাতির এবং উমিচাঁদের শ্রেণীর কোন হিন্দু কখনও এরূপ করেন না। *

এই ইংরেজ-লেখক ইহার পর লিখিয়াছেন, যে, কলিকাতার গুপ্ত সমিতির আচরণ ও ষড়যন্ত্রমূলক ঘৃণিত সন্ধির বিষয় পড়িয়া কোন ইংরেজ বোধ হয় লজ্জার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না। ইংরেজগণ যখন উমিচাঁদকে অর্থ দিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা আপনাদের মধ্যে অনেক টাকা ভাগাভাগি করিয়া লইবার বন্দোবস্ত করেন। তাঁহাদের ধন-তৃষ্ণা ও তাঁহাদের নীচাশয়তা কেবল ইহাতেই শেষ হয় নাই। ওয়াট্‌স সাহেব একজন বিশ্বস্ত দূত দ্বারা ক্লাইবের নিকট একখানি পত্র পাঠাইলেন, পত্রে উমিচাঁদের বিষয় উল্লেখ থাকিল। ক্লাইব এই পত্র পাইয়া ওয়াট্‌স সাহেবকে লিখিলেন, যে, ওয়াট্‌সন ও সমিতির অন্যান্য সদস্যগণ সকলেই উমিচাঁদের চরিত্রের উপর দোষারোপ করিতেছেন, সকলেরই ধারণা জন্মিয়াছে, যে,—উমিচাঁদ ঘোর দুর্ব্বৃত্ত ও নীচাশয়, এই দুর্ব্বৃত্ত নীচাশয়ের সমুচিত শিক্ষা হওয়া উচিত; † অতঃপর ক্লাইব দুইখানি অঙ্গীকার পত্র প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব করেন। তাঁহার মতে এই স্থির হয়, যে, প্রকৃত অঙ্গীকার পত্রে উমিচাঁদকে অর্থ দেওয়ার সম্বন্ধে কোন কথা লিখিত হইবে না, কিন্তু যে খানি অলীক,

---

* *Malleson*, Lord Clive, P. 232—233.

† *Malleson*, Lord Clive, P. 233 234.

তাহাতে লেখা থাকিবে,—কার্য্য সিদ্ধ হইলে উমিচাঁদ ৩০লক্ষ টাকা পাইবেন" উভয় অঙ্গীকার পত্রেই মীরজাফর, ওয়াট্‌সন, ক্লাইব ও কলিকাতাস্থ সমিতির অন্যান্য সদস্যগণের স্বাক্ষর থাকিবে বলিয়া বন্দোবস্ত হয়। ক্লাইব এইরূপ নীচাশয়তার পরিচয় দিয়া, আপনাদের স্বার্থসাধনের উপায় স্থির করেন, কিন্তু এই স্বার্থ সিদ্ধির পক্ষে প্রথম একটি অচিন্ত্যনীয় অন্তরায় উপস্থিত হয়। রণ-তরীর অধ্যক্ষ ওয়াট্‌সন সাহেব প্রথম হইতেই ক্লাইবের এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, এখন তিনি অলীক অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হন। ক্লাইব স্পষ্ট জানিতেন, যে, অঙ্গীকার পত্রে ওয়াট্‌সনের স্বাক্ষর না দেখিলে, উমিচাঁদের সন্দেহ বাড়িয়া উঠিবে, সুতরাং প্রথমে তিনি কিছু চিন্তিত হইলেন; কিন্তু এই চিন্তা দীর্ঘ কাল থাকিল না। তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং তিনি কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না। যে কোন প্রকারেই হউক, এখন আপনাদের স্বার্থ সাধনই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছিল। শেষে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির অপার কলঙ্কময় উপায় স্থির হইল। লিখিতে লজ্জা হয়, ক্লাইব অলীক অঙ্গীকার পত্রে ওয়াটসনের নাম জাল করিলেন।

ক্লাইব স্বয়ং নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে, একজন অর্থগৃধ্নু লোককে হতাশ করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ইংরেজ ও মীরজাফরের মধ্যে যে সন্ধিপত্র প্রস্তুত হয়, তাহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে, সে সময়ে আরও অনেক অর্থগৃধ্নু লোক ছিল, ক্লাইব ইহাদিগকে হতাশ করিবার কোনও চেষ্টা করেন নাই। ইংরেজেরা যখন নবাবের অর্থে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন, তাঁহাদের দুর্দ্দমনীয় অর্থলালসা যখন বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তাঁহারা কেবল উমিচাঁদকে লক্ষ্য করিয়াই দুরন্ত লোভের বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হন, এবং সেই লোভী ব্যক্তিকে যথোচিত শাস্তি দিয়া আপনাদিগের লোভশূন্যতা প্রকাশ করেন। তাঁহারা জগতের সমক্ষে এইরূপ ধার্ম্মিকতার ভাণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের ধর্ম্মভাব এইরূপ কলঙ্কের গভীর কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল। ক্লাইব আত্মপক্ষ সমর্থন জন্য যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সভ্য জগতের নিকট তাহা কখনও আদরণীয় হইবে না। লোভের কুহকে পড়িয়া, দুরাশার দাস হইয়া, তিনি যে পাপরাশি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, জগতের সমক্ষে অনন্তকাল তাহা বিদ্যমান করিবে—অনন্তকাল এই পাপময় চিত্র ইতিহাসে অঙ্কিত থাকিবে।

# সত্য।

মনেই হউক, অথবা মুখেই হউক, সকলেই সত্যের অত্যন্ত আদর করিয়া থাকেন। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে সত্যই ধর্ম্ম, সত্যই ঈশ্বর। মনু যে দশবিধ ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে সত্যও একটি।

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচং ইন্দ্রিয় নিগ্রহং।
ধীর্ব্বিদ্যা সত্য মক্রোধঃ দশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥"

হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে ঈশ্বরের প্রধান লক্ষণ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং।" যে সত্য কহে, বা সত্য কার্য্য করে, হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে সেই সৎ। রামায়ণে আছে,—

"সত্যমেক পদং ব্রহ্ম, সত্যে ধর্ম্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
সত্যমেবাক্ষয়া বেদাঃ, সত্যেনাবাপ্যতে পরং॥"

অর্থাৎ "ব্রহ্ম সত্য ভিন্ন আর কিছুই নহেন। ধর্ম্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন। অক্ষয় বেদ সমস্ত সত্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেবল সত্য দ্বারাই ব্রহ্মপদ লাভ করা যায়।" মনু মিথ্যাবাদীর শাস্তির স্থলে লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, শিশুহত্যা, মিত্রদ্রোহ, কৃতঘ্নতা প্রভৃতিতে যেরূপ পাতক হয়, মিথ্যা কথাতেও সেইরূপ পাতক হইয়া থাকে। সমস্ত জীবনে যে পুণ্য সঞ্চিত হয়, মিথ্যা কথা দ্বারা সে সমস্ত বিনষ্ট হয়।" অন্য অন্য জাতির মধ্যেও এইরূপ সত্যের আদর দেখিতে পাওয়া যায়। থ্যাকারে এক স্থলে বলিয়াছেন—"আমার পুস্তকে সত্য কথা আছে। যদি আমার পুস্তকে তাহা না থাকে, তবে ইহাতে কিছুই নাই।" ফলত কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি বৌদ্ধ, কি খ্রীষ্টান, সকলেই সত্যের অনুরাগী; এবং ইহারা সকলেই সত্যকে ধর্ম্মমূল বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।

কিন্তু সত্য কি? সত্য কাহাকে বলে? সংস্কৃতে সত্যের যে কয়টি প্রতিশব্দ আছে, আমরা এক একটি করিয়া সে গুলির আলোচনা করিতেছি।

১ম। সত্য। যাহা চিরকাল আছে ও যাহা চিরকাল থাকিবে, তাহাই সত্য। অস্ ধাতু হইতে সত্য উৎপন্ন হইয়াছে। এবং সত্যের অর্থ স্থায়ী। যাহা চিরকাল আছে ও যাহা চিরকাল থাকিবে, যাহা নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়,—তাহাই পূর্ণসত্য। যে বস্তু, যে পরিমাণে স্থায়ী, সে বস্তু সেই পরিমাণে সত্য। মিথ্যাবাদী মিথ্যাকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য কত কৌশল অবলম্বন করে, কত পরিশ্রম স্বীকার করে, কিন্তু তথাপি মিথ্যা কথা অল্পকালের মধ্যেই জগতে মিথ্যা বলিয়া রাষ্ট্র হয়। আর যিনি সত্যবাদী, তিনি কোন পরিশ্রম স্বীকার করেন না; কোন কূটতর্ক উত্থাপন করেন না, কোন বাগ্জাল বিস্তার করেন না, অথচ তাঁহার কথা উচ্চারিত হইবা মাত্রই উহা জগতে সর্ব্বত্র

আদৃত ও পূজিত হয়, উহা চিরস্থায়ী হইয়া চিরকাল নিজের প্রভাব বিস্তার করে। ঈশ্বর সত্য, কেন না, তিনি নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়। সংসার অর্থাৎ ধন, মান, প্রভৃতি অনিত্য ও পরিবর্ত্তনশীল, এজন্য হিন্দুশাস্ত্রে সংসারকে মিথ্যা বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। সত্যত্ব অথবা নিত্যত্বের তারতম্য অনুসারে সৃষ্ট-বস্তুর উৎকর্ষাপকর্ষ নির্দ্ধারিত হয়। পৃথিবী সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, কারণ ইহাতে পাঁচটি গুণ বিদ্যমান থাকাতে ইহা সর্ব্বাগ্রে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। পৃথিবী অপেক্ষা জল শ্রেষ্ঠ। কারণ জলে চারিটি গুণ বর্ত্তমান আছে। এবং এই কারণেই পৃথিবীর বিনাশের পরেও জল বর্ত্তমান থাকিতে পারে। অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচটি গুণের মধ্যে গন্ধটি বিনষ্ট হইলেও শব্দ স্পর্শ রূপ রস, বিদ্যমান থাকিবে। অর্থাৎ পৃথিবীর বিনাশ সাধন হইলেও জলের অস্তিত্ব থাকিবে। এইরূপে চতুর্গুণ বিশিষ্ট জলের একটি গুণ (রস) বিনষ্ট হইলেও ত্রিগুণ বিশিষ্ট (শব্দ-স্পর্শ-রূপ) অগ্নি বিদ্যমান থাকিবে। এইরূপে ত্রিগুণ বিশিষ্ট অগ্নির একটি গুণ (রূপ) বিনষ্ট হইলেও দ্বিগুণ বিশিষ্ট (শব্দ-স্পর্শ) বায়ু অবশিষ্ট থাকিবে। আবার বায়ুর একটি গুণ (স্পর্শ) বিনষ্ট হইলেও একগুণ বিশিষ্ট (শব্দ) আকাশ বিদ্যমান থাকিবে। শব্দগুণ বিশিষ্ট আকাশ বিনষ্ট হইলেও ঈশ্বরের কার্য্য-শক্তি অথবা ক্রিয়াশক্তি অবশিষ্ট থাকিবে। কারণ কার্য্যের বিনাশ হইলেও ক্রিয়াশক্তির বিনাশ হয় না। ক্রিয়াশক্তি বিনষ্ট হইলেও ইচ্ছাশক্তি অবশিষ্ট থাকিবে। এবং ইচ্ছাশক্তি বিনষ্ট হইলেও সর্ব্বকারণ কারণ ঈশ্বর অবশিষ্ট থাকিবেন। আমরা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত এই সৃষ্টি প্রক্রিয়া নিম্নে তালিকা করিয়া দেখাইতেছি।

১। ঈশ্বর (নিত্য অতএব পূর্ণ সত্য)
|
(মহত্তত্ত্ব) ২ (ঈশ্বরের) ইচ্ছাশক্তি (ঈশ্বর অপেক্ষা অসত্য কিন্তু অন্য সমস্ত বস্তু হইতে সত্য)
|
(অহংতত্ত্ব)৩। (ঈশ্বরের) ক্রিয়াশক্তি (ইচ্ছাশক্তি হইতে অসত্য, কিন্তু অন্য সমস্ত বস্তু হইতে সত্য)
|
৪। আকাশ (শব্দ) (ঐরূপ বুঝিয়া লইতে হইবে,
|
৫। বায়ু (শব্দ + স্পর্শ) ঐ
|
৬। অগ্নি (শব্দ + স্পর্শ + রূপ) ঐ
|
৭। জল (শব্দ + স্পর্শ + রূপ + রস) ঐ
|
৭। পৃথিবী (শব্দ + স্পর্শ + রূপ + রস + গন্ধ) ঐ

হিন্দুশাস্ত্রোক্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া এত কঠিন, ও ইহার অর্থবোধ করা এত দুরূহ ব্যাপার,যে আমরা এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। এই বিস্তৃত বর্ণনা এখানে না করিলেও চলিত। আশা করি, বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া, পাঠকগণ আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন।

পূর্ব্বোক্ত পর্য্যায় অনুসারে পৃথিবী সর্ব্বাপেক্ষা অসত্য ও পরিবর্ত্তনীয়, এবং ঈশ্বর পূর্ণ সত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়। ধাত্বর্থ অনুসারে সত্যের অর্থ নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়। ইংরাজ-দার্শনিকেরাও সত্যের এই অর্থই করিয়াছেন। মিল বলেন ("The uniformity of experienee is the test of truth." অর্থাৎ) "যাহা চিরকাল দেখিয়া আসিতেছি তাহাই সত্য।" স্পেন্সর ও লিউইস বলেন—("The unthinkableness of the negative is the test of truth." অর্থাৎ) "যাহার বিনাশ বা পরিবর্ত্তন কল্পনাতে চিন্তা করা যায় না, তাহাই সত্য। এই দুইটি মতের সমন্বয় করিলে দাঁড়ায়, এই যে, "যাহা চিরকাল আছে, ও চিরকাল থাকিবে বলিয়া আমরা অটলভাবে বিশ্বাস করি, তাহা সত্য।" সংস্কৃত অনুসারেও দেখান হইয়াছে, যে, "যাহা চিরকাল আছে ও যাহার পরিবর্ত্তন অসম্ভব তাহাই সত্য।"

সত্য কথাই স্থায়ী হইবে, মিথ্যা কথা স্থায়ী হইবে না, এ বিশ্বাস আমাদের সকলেরই মনে নিতান্ত জাগরূক থাকে। এজন্য যখনই আমরা কোন মিথ্যা কথা বলি, তখনই বাক্যের ছড়াছড়ি, শব্দের গড়াগড়ি পড়িয়া যায়। আমাদের নিজেরই মনে মনে ভয় থাকে, যে এ মিথ্যা কথা বুঝি টিকিবে না। এজন্য আমরা অলঙ্কার, সমাসচ্ছটা প্রভৃতির সাহায্যে অস্থায়ী মিথ্যাকে স্থায়ী সত্য করিতে চাই। ভারতচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর।" যে সত্যবাদী তাহাকে বিস্তর কথা কহিতে হয় না। কারণ, সে জানে যে, সত্য নিজ গুণেই জগতে আদৃত হইবে। যে কুরূপা তাহার কুরূপ আবরণ করিবার জন্য অলঙ্কারের প্রয়োজন হয়। যে সুরূপা তাহার অলঙ্কারের প্রয়োজন কি?

যিনিই যত বড় কৌশলময় হউন না কেন, কেহই মিথ্যাকে চিরস্থায়ী করিতে পারেন না। যাহা মিথ্যা তাহা অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে।
কতক্ষণ থাকে শিলা শূন্যেতে মারিলে।

সর্ব্বকালে রজনী দিবস নাহি হয়।
মিথ্যা মিথ্যা, সত্য সত্য লোকে খ্যাত হয়॥

হে কৌশলময় ধূর্ত্ত! শিক্ষা লাভ কর। "সর্ব্বকালে রজনী দিবস নাহি হয়।" ঝাড়, লণ্ঠন, গ্যাস, ইলেক্ট্রিক যাই জ্বালাও, ভাই, রাত্রি কখন দিন হইবে না। মিথ্যাকে সত্যের গিল্টি দিয়া দুই দিনের জন্য সাজাইতে পার, কিন্তু সত্যের জলটুকু ধুইয়া গেলেই মিথ্যা নিজরূপ প্রকাশ করিবে। আর ইহাও মনে রাখিও, যে, যে যত কৌশল অবলম্বন করিবে, লোকে তাহাকে তত অধিক ঘৃণা করিবে। সর্ব্বদা ইহাও মনে রাখিও, যে সত্যই নিত্য ও চিরস্থায়ী। মিথ্যা ক্ষণস্থায়ী ও জলবুদ্বুদের ন্যায় নশ্বর। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—"নাসতো বিদ্যতেভাবঃ না ভাবো বিদ্যতে সতঃ" অর্থাৎ "অসত্যের বিনাশ নিশ্চিত। সত্যের বিনাশ অসম্ভব।"

২য়। সত্যের আর এক নাম তথ্য। অর্থাৎ যে বস্তু বাহিরে এক প্রকারে, ও আমাদের অন্তরে আর এক প্রকারে উপস্থিত না হয়, সেই বস্তু সত্য। যদি সর্প সর্পের আকারে আমাদের নিকট উপস্থিত হয়, তবে উহা সত্য সর্প। আর যদি সর্প রজ্জুর ন্যায় আমাদিগের নিকট অনুভূত হয়, তবে উহা মিথ্যা সর্প। মরীচিকা মিথ্যা, কারণ উহা প্রকৃত প্রস্তাবে সূর্য্যকিরণ হইলেও আমাদের নিকট জলের আকারে প্রকাশিত হয়। যতক্ষণ কোন বস্তু রূপান্তর পরিগ্রহ না করিয়া, উহার স্বাভাবিক ও প্রকৃত আকারে আমাদিগের নিকট উপস্থিত হয়, ততক্ষণ উহা সত্য। তথ্য শব্দের ধাত্বর্থ দ্বারাও এইরূপ বুঝা যায়, এই বস্তুটি যাহা, ঠিক সেই ভাবেই ইহা আমাদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে সুতরাং "ইহা তাহাই" ("It in that.") তত্ত্ব শব্দেরও ধাত্বর্থ এইরূপ। যে বস্তুটি যাহা, সেই বস্তুটিকে ঠিক সেইরূপে জানিতে পারিলেই তাহার তত্ত্ব লাভ করা হইল। পতঞ্জলি, সত্য ও মিথ্যা জ্ঞানের এইরূপই লক্ষণ করিয়াছেন। "মনোবৃত্তি সকল, অবলম্বিত বস্তুর অবিকল সাদৃশ্যে উৎপন্ন হইলেই, উহা প্রমাণ বা সত্যজ্ঞান বলিয়া গণনায়। আর বিপরীত ভাবে উৎপন্ন হইলে (অর্থাৎ বস্তু এক প্রকার ও মনোবৃত্তি অন্য প্রকার হইলে) তাহা ভ্রম, বিপর্য্যয় বা মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া স্বীকার্য্য।"* লিউইস্, স্পেন্সর প্রভৃতি ইংরেজি-দার্শনিকেরাও সত্যের এই লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "Truth is the correspondence, between the order of ideas

* পূজ্যপাদ কালিবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের ব্যাখ্যা।

[Subjctive] and the order of phenomena [objective]") অর্থাৎ "বাহ্যবস্তুর সহিত আমাদের মনোবৃত্তি অথবা ধারণার যে সাদৃশ্য তাহার নাম সত্য।" যে বস্তু প্রকৃতরূপে আমাদিগের কর্তৃক অনুভূত হয়, তাহাই সত্য। বস্তুর বাহ্য রূপের সহিত আমাদিগের মানসিক ধারণার যে ঐক্য তাহাই সত্য।

সত্য অপরিবর্ত্তনীয় বলিলেও প্রায় এই কথাই বলা হয়। কারণ যে বস্তু যাহা, সে বস্তু যদি ঠিক সেইরূপে আমাদের বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হয়, তাহা হইলে আর আমাদিগকে ঐবোধের কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিতে হয় না। কিন্তু বস্তু যদি স্ব-রূপে আমাদিগের নিকট প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে বারম্বার মত পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

সত্যের আর এক নাম ঋত। ঋত অর্থে গতিবিশিষ্ট। সত্য ভিন্ন আর কিছুরই গতি নাই। মিথ্যা মৃত পদার্থের ন্যায় নিশ্চল ও নিস্পন্দ। জগতে সত্যই সজীব। গতি অর্থে উন্নতিও বলা যাইতে পারে। ফলত সত্যের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে ঐহিক বা পারত্রিক কোনরূপ উন্নতিই লাভ করা যায় না। রাজনীতি,ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি,চরিত্র-নীতি প্রভৃতি সমস্তই সত্যের সাহায্য অপেক্ষা করে। ইয়ুরোপ ও আমেরিকা অন্য অন্য বিষয়ে সভ্যতার উচ্চ শিখরে অবস্থিত হইলেও, সত্য সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। ভারতে ইংরেজ-শাসন হইতে দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। মেকলের জীবন-বৃত্তান্ত পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে, তিনি কৌশলক্রমে হিন্দুদিগকে অহিন্দু করিবার জন্য এদেশে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার করেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলিয়াছেন—"বৎস! দেখিও যাহাতে দেশীয়েরা খ্রীষ্টান হইতে পারে, এরূপ চেষ্টা করিও।" মেকলে বলিলেন—"পিতঃ, আমি এরূপ শিক্ষা-প্রণালী বিস্তার করিব, যে ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই হিন্দু-নর-নারী অহিন্দু হইবে, এবং তখন তাহাদিগকে খ্রীষ্টান করা সহজ হইবে।" মনে মনে এইরূপ অভিসন্ধি করিয়া, মেকলে সংস্কৃতের নিন্দা ও ইংরাজির গৌরব বিস্তার করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। তাঁহার যত্নে ও আগ্রহেই সংস্কৃত, দেশ হইতে বিতাড়িত হইল, এবং ইংরাজি শিক্ষা সমস্ত দেশ অধিকার করিল। কিন্তু দেখুন, এই মিথ্যা কি টিকিয়াছে! কিছু কালের জন্য সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত ধর্ম্ম লোকের নিকট অবজ্ঞাত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু আবার তাহারা অল্পে অল্পে নিজ গৌরব বিস্তার করিতেছে। যে প্রণালীতে মেকলের "মিথ্যা" কার্য্য-

প্রণালী সংসাধিত হইয়াছে, সে প্রণালীও আশ্চর্য্য। প্রথমে কয়েক জন হিন্দু খ্রীষ্টান হইয়াছিল। পরে তেত্রিশ কোটী দেবতার পরিবর্ত্তে এক দেবতা স্থিরীকৃত হইলেন। পরে সেই এক দেবতারও আসন টলিল। লোকে নাস্তিক হইল। নাস্তিকতার অবশ্যম্ভাবী ফল, অবাধ্যতা, ক্রূরতা, কপটতা, নির্দ্দয়তা প্রভৃতি ভীষণ পাপে সমস্ত সমাজ উত্ত্যক্ত ও ব্যথিত হইল। তখন আবার সংস্কৃতের প্রতি দৃষ্টি পড়িল, আবার জীর্ণ গৃহের পুনঃ সংস্কার আরম্ভ হইল। এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজেও গীতা পাঠ হয়। এক্ষণে আবার হরির নামে দিগ্ দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। "আমি হিন্দু" একথা বলিতে আর কেহই লজ্জিত হন না। এইরূপেই বোধ হয়, ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মেরও বিলয় হইয়া থাকিবে। বৌদ্ধেরা দেব দেবী মানেন না, পুরাণ মানেন না, কর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করেন না। এই সকল মতের জন্য, বোধ হয়, সমাজে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল, এবং সেই বিশৃঙ্খলা দূর করিয়াই হিন্দুধর্ম পুনরায় সকলের প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছে।

ইংরাজ-শাসনে আর এক মিথ্যা এই, যে, তাঁহারা সময়ে সময়ে বলিয়া থাকেন, যে, ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্যই ভারতবর্ষ। কিন্তু ইহা তাঁহারা নিজেও বিশ্বাস করেন না। গ্ল্যাড্‌ষ্টোন সাহেব একবার ইহার বড় সুন্দর অর্থ করিয়াছিলেন। পার্লেমেণ্টে মিসর যুদ্ধের ব্যয়ভার সম্বন্ধে বাদানুবাদ হইতেছিল, গ্ল্যাডষ্টোন উঠিয়া বলিলেন—"আমরা ভারতবর্ষ ভারতবাসীর জন্য শাসন করি। অতএব মিসর যুদ্ধের ব্যয়ভার তাহাদিগকেই বহন করিতে হইবে।" ব্যয়ভার ভারতবাসীদিগকে বহন করিতে হইবে, কিন্তু ঐ মিথ্যা কথা টুকু বলিবার প্রয়োজন কি। উহার কি বিষময় ফল ভাবিয়া দেখুন। যাঁহারা সরল, তাঁহারা ঐ বাক্যে বিশ্বাস করিয়া বৃথা আশায় আপনাদিগকে ও সত্যকে প্রতারিত করিতেছেন। আর যাঁহারা চতুর, তাঁহারা ইংরাজদিগকে চতুর চূড়ামণি চাণক্য বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। রাজ্যে অসন্তোষের সীমা নাই। যে বিষয়েই দেখিবেন, মিথ্যা কথা বলিলে লাভের পরিবর্ত্তে ক্ষতি, উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতি ও সজীবতার পরিবর্ত্তে নিশ্চলতা আসিয়া উপস্থিত হয়।

আমাদের সমাজেও সম্প্রতি মিথ্যার সাহায্যে জয়লাভের চেষ্টা হইতেছে। এ চেষ্টা নিষ্ফল মাত্র। রাজনীতিই বলুন, ধর্ম্মনীতিই বলুন, সমাজনীতিই বলুন, কোন নীতিতেই মিথ্যায় জয়লাভ হয় না। বঙ্গীয় সংবাদ পত্র মাত্রেই

মুখে রাজভক্তির ভাণ করিয়া থাকেন। অথচ যেরূপ দেশ কাল পড়িয়াছে, তাহাতে স্বদেশীয় রাজা; বা স্বজাতীয় রাজাই ভক্তিপ্রাপ্ত হন না। দেশশুদ্ধ, ইংরাজ আসিয়া তুরী ভেরীর নিনাদে ঘোষণা দিয়াছেন, যে, ব্রাহ্মণে—চণ্ডালে, রাজায়—প্রজায়, পুরুষেও—রমণীতে সমান। তবে আর প্রজা রাজাকে ভক্তি করিবে কেন? যখন লোকে বিশ্বাস করিত, যে, রাজা দেবতার অংশ, তখন ভক্তির সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এখন আর কি করিয়া লোকে ভক্তি করে? এতদ্ভিন্ন, এত যে রাজভক্তির কথা লিখিত হয়, ইহা কি কেহ বিশ্বাস করে? ইংরাজেরাও ইহা বিশ্বাস করেন না, এবং বোধ হয়, লেখকেরা নিজেও ইহা বিশ্বাস করেন না। তবে ইহা লিখিয়া লাভ কি? রাজনীতিক্ষেত্রে যাহাই হউক, বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে সমাজনীতি ও ধর্মনীতি উভয়ের মধ্যে মিথ্যা আসিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছে। একদিন, এক ভট্টাচার্য্য আমাকে এ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। আমি ঐ ভট্টা-চার্য্যের নিকট "রঘুনন্দন" পাঠ করিতাম। আমি একদিন সমাজের মঙ্গল সম্বন্ধে ভট্টাচার্য্যের সহিত তর্ক করিতেছিলাম। ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"বাপু, তোমরা যদি সমাজের মঙ্গল চাও, তবে অগ্রে হিন্দু হও, পরে হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিবে। সন্ধ্যা, আহ্নিক আরম্ভ কর, দেব দেবী পূজা কর, ভক্ত শাক্ত হও, পরে সমাজের মঙ্গল করিও।" বাস্তবিকও ভাবিয়া দেখুন, সম্প্রতি যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের পোষকরূপে অবতীর্ণ হইতেছেন, তাঁহাদের কথায় সর্ব্বসাধারণে আস্থা প্রদর্শন করে না। করিবেই বা কেন? মুখে মনে এক না হইলে ত সত্য হয় না। মুখে বলিলাম, হাতে লিখিলাম, তাহাতে লোকে বিশ্বাস করিবে কেন? যে দিন লোকে দেখিবে, যে, তুমি হরি-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভক্তিভাবে তুলসীদল দিয়া হরির চরণ বন্দন করিতেছ, সে দিন লোকে তোমায় বিশ্বাস করিবে। দেখ চৈতন্য বক্তৃতা করিতেন না, প্রবন্ধ লিখিতেন না, তথাপি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁহাকে বিশ্বাস করিত। তাঁহার সহবাসে লোকে পবিত্র হইত, তিনি যে গ্রামে পদার্পণ করিতেন, সে গ্রাম পুণ্যের ও ধর্ম্মের আলোকে বিভাসিত হইত। কেন হইত? তিনি সত্যময় বলিয়া।

সমাজনীতি সম্বন্ধেও এই কথা। আমরা মুখে জাতিভেদের বিপক্ষে বক্তৃতা করি, জাতিভেদের স্বপক্ষে উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতাপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জাতিভেদের কোন নিয়মই প্রতিপালন করি না। লোকে

আমাদের কথায় বিশ্বাস করিবে কেন? আমাদের কথায় লোকে আস্থা করিবে কেন? ঐ যে নিরক্ষর পুরোহিত, উনি যদি হিন্দুর কার্য্যকলাপ অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে উঁহা দ্বারাও সমাজের প্রভূত মঙ্গল হইবে। আর আপনি বিদ্যাবাগীশ হইয়া কবিত্বে, দর্শনে, আপনার প্রবন্ধকে সালঙ্কৃত করিলেও আপনার দ্বারা অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল হইবে না। মনু বলিয়াছেন,—

"সাবিত্রী মাত্রসারোঽপি বরং বিপ্রঃ সুযন্ত্রিতঃ
নাযন্ত্রিত চিত্রবেদোপি সর্ব্বাশী সর্ব্ব বিক্রয়ী।"

অর্থাৎ "যদি কোন ব্রাহ্মণ গায়ত্রীমাত্র জানিয়া সুনিয়মে থাকেন, তাহা হইলে তিনিও শ্রেষ্ঠ। আর যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বাশী ও সর্ব্ববিক্রয়ী, সে যদি ত্রিবেদজ্ঞ হয় তাহা হইলে সেও অবজ্ঞেয়।" অতএব ভাই সকল, যদি ঈশ্বর বাস্তবিকই তোমাদিগকে সুমতি দিয়া থাকেন, যদি বাস্তবিকই তোমরা শ্রুতি স্মৃতির পক্ষপাতী হইয়া থাক, যদি লোক-পাবন শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগের প্রতি বাস্তবিকই সদয় হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আর একটু অগ্রসর হও; শ্রুতি স্মৃত্যাদিত কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান কর। তাহা হইলে দেখিবে, যে, তোমাদের এক কথায় সমাজ পরিবর্ত্তিত ও সমুন্নত হইবে। চৈতন্যদেব একটি সঙ্গীতে সমস্ত ভারতবর্ষে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলেন। তিনি গাহিয়াছিলেন,

"বল হরি রাম।
এইরূপে নগরে উঠিল ব্রহ্ম নাম।"

যে এই সঙ্গীত শুনিয়াছিল, সেই উন্মত্ত হইয়া গাহিয়াছিল—

"বল হরি রাম।"

কেন না সকলে বুঝিয়াছিল, যে চৈতন্য সত্যময়। এইরূপে জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে সত্য অবলম্বন কর। দেখিবে সমাজের কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি হয়। কিছুতেই ভয় করিও না। কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিও না। সত্য চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর। আর ঈশ্বরও সত্যময়। যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছ ও অন্যকে বুঝাইতেছ, নিজ নিজ জীবনে সেই সত্যানুসারে অনুষ্ঠান আরম্ভ কর। অবশ্য, যাঁহারা সত্য নির্দ্ধারণে অক্ষম, তাঁহাদের প্রতি এ সমস্ত কথা প্রযুজ্য নহে। তাঁহাদের উচিত, যে, তাঁহারা নির্জ্জনে, সাবধানে সত্য অন্বেষণ করেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে সর্ব্বাগ্রে মনোমালিন্য দূর করেন। যতদিন সন্দেহ দূরীকৃত না হয়, ততদিন ধৈর্য্য সহকারে সকল বিষয় বিবে-

চনা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যখন সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে, এবং যখন আমরা শিক্ষকের আসনে উপবিষ্ট হইয়া সমাজকে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন আর শুদ্ধ তর্ক ও আলোচনায় আপনাদিগকে নিযুক্ত রাখা উচিত নহে। জ্ঞানালোচনা ও জ্ঞানবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠান আবশ্যক। বিনা অনুষ্ঠানে জ্ঞানের পরিপক্কতা হয় না। আর যখন জ্ঞানের পরিপক্কতা সংসাধিত হয়, তখন বিশ্বাসের দৃঢ়তা হইবেই হইবে, এবং বিশ্বাসের দৃঢ়তার সঙ্গে সঙ্গে, কার্য্যও আরব্ধ হইবে। যতদিন এই কার্য্য আরব্ধ না হয়, ততদিন আমরা ছাত্র। আমাদের ছাত্রত্বের সময় অতীত হইয়াছে, এক্ষণে নিজের ও সমাজের মঙ্গলের জন্য অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হইয়াছে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিরূপ অনুষ্ঠান আমাদের সাধ্যায়ত্ত তৎসম্বন্ধে একটি কথা বলিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি। বোধ হয়, আমাদের সকলের গৃহেই দুই একটি দেবমূর্ত্তি আছে। আসুন না কেন, আমরা সর্ব্বাগ্রে হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে সেইগুলির পূজা অর্চ্চনা আরম্ভ করি। তাহার পরে, যে, জাতিভেদ আমাদের সমাজের প্রধান ভিত্তি ও অবলম্বন, তৎসম্বন্ধে আরও কিছু সাবধান হওয়া আমাদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে; অর্থাৎ আমাদের পিতৃ পিতামহেরা যে যে নিয়মে ও যে যে প্রণালীতে জীবনযাপন করিতেন, আসুন না কেন, আমরা সেইগুলির পুনঃপ্রবর্ত্তন করি। সেই পবিত্র মহাত্মাদিগের পদানুসরণ করিলে নিশ্চয়ই আমাদের মঙ্গল হইবে। যদি চিত্তের অন্ধকার ঘুচিয়া থাকে, তবে আসুন, অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদিকে কৃতার্থ করি।

---

# বর্ণভেদ ও জাতীয় চরিত্র।

মোটা কথায় বলা যায়, যে, ইংরাজি-সভ্যতা বহির্মুখ, আর হিন্দু-সভ্যতা অন্তর্মুখ, ইংরাজি সভ্যতা ধনচর্য্যায়, আর হিন্দুসভ্যতা ধর্ম্মচর্য্যায়। অর্থাৎ ধন প্রভৃতি বাহ্যসম্পদ লইয়া ইংরাজি সভ্যতা এবং তাহার উন্নতিতে ইংরাজি সভ্যতার উন্নতি, আর ধর্ম্ম লইয়া হিন্দু সভ্যতা এবং তাহার

উন্নতিতে হিন্দু সভ্যতার উন্নতি। কিন্তু ইংরাজি সভ্যতা বহির্মুখ বা বাহ্য-সম্পদ-মূলক হইলেও তাহা যে একেবারে ধর্ম্মশূন্য এমন কথা বলা যায় না। ইংরাজের খুব ধনসম্পদ আছে সত্য, কিন্তু ইংরাজের ধর্ম্মশাস্ত্রও আছে, ধর্ম্মশিক্ষাও আছে, ধর্ম্ম মন্দিরও আছে, ধর্ম্মযাজকও আছে। ইংরাজের বৈষয়িক ভাব ও বিষয়াসক্তি প্রবল হইলেও তাহাদের অসীম মানসিক শক্তি আছে। ইদানীন্তন কালে হব্‌স্‌, হিউম, লক, বর্কলি, মিল বা হর্বর্ট স্পেন্সরের অপেক্ষা মানসিক শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ কোন দেশে যে বড় বেশি জন্মিয়াছেন তাহা বোধ হয় না। ইংরাজের মধ্যে অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাবও আছে। যতদূর জানিয়াছি তাহাতে বোধ হয়, যে, ইংরাজের মধ্যে যথার্থই ঋষিতুল্য মানুষ আছেন—অন্তরে সদাই ঈশ্বরচিন্তা, বাহিরে সদাই সদাচার সদাই পরোপকার, প্রেমিক, অমায়িক, নম্র, নির্ব্বিকার, শান্ত, শুদ্ধাচার। তথাপি ইংরাজি-সভ্যতা বহির্মুখ, ইংরাজের ধনচর্য্যাই বেশি, ধর্ম্মচর্য্যা বড়ই কম। এত দার্শনিক, এত ধর্ম্মযাজক, এত ধর্ম্মমন্দির, খৃষ্টীয় ধর্ম্মনীতির ন্যায় এমন সুন্দর ধর্ম্মনীতি,—থাকিতেও ইংরাজ প্রধানত পৃথিবী লইয়াই ব্যস্ত, ইংরাজের ধর্ম্মচর্য্যা নাই বলিলেই হয়। ইংলণ্ডে যাঁহারা ধর্ম্মভাব ও মানসিক শক্তি-সম্পন্ন তাঁহাদের ধর্ম্মভাব এবং মানসিক শক্তি বড়ই বেশি এবং উচ্চদরের। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা বড় বেশি নয় এবং তাঁহারা প্রায়ই কিছু উচ্চ শ্রেণীর লোক। ইংলণ্ডের লোক-সাধারণ এবং নিম্নশ্রেণীর লোক বড়ই বুদ্ধিহীন, ধর্ম্মহীন ও দুরাচার। ভাল ভাল ইংরাজ-লেখকেরাই একথা বলিয়া থাকেন, এবং সম্প্রতি একজন কৃতবিদ্য বাঙ্গালি ইংলণ্ড দেখিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন—

"ইতর শ্রেণীর লোকের অক্ষর পরিচয় আছে। সাধারণ সংবাদপত্রও পড়ে। কিন্তু তাহাদিগের ন্যায় নীচ ও ভয়ানক প্রকৃতির লোক মনুষ্য-শ্রেণীর মধ্যে নাই। ইহাদিগকে দ্বিপদ পশু বলিলেও হয়। ধর্ম্ম যে কাহাকে বলে, ইহারা তাহা জানে না। সেণ্টজাইল্‌সে ইহাদিগের স্ত্রীপুরুষগণকে সন্ধ্যাকালে দেখিয়া আসিয়াছি। তাহারা মদ্যপান করিয়া কলহ চীৎকার করত পথিকগণের ভয় উৎপাদন করিয়া থাকে। এখানে পথিকগণের নির্ব্বিঘ্নে ভ্রমণের সাধ্য নাই। তাহাদিগকে পুলিশের শাসনের ক্ষমতা নাই। এই সকল মনুষ্যের আকার অতি ভয়ানক। পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে এতাদৃশ ইতর শ্রেণীর লোকের উৎপাত নাই। এই সকল লোকে ভারতবর্ষীয়দিগের

প্রভৃতি অসভ্যতা প্রকাশ করে। কখন 'স্ল্যাকি' বলে; কখন বা তাহাদের সেই বানর অপেক্ষা কুৎসিৎ মুখ বিকৃত করিয়া দেখায়। এরূপ মনুষ্যনামধারী পশু আর কুত্রাপি দেখা যায় না।"*

ইহার অপেক্ষাও ভীষণ বর্ণনা ইংরাজ-লেখকদিগের সংবাদ পত্রে ও গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। ফলত ইংলণ্ডের নিম্নশ্রেণীর ন্যায় এককালে পশুবৎ ও রাক্ষসবৎ মানুষ পৃথিবীর সভ্যদেশের মধ্যে আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ। ইংরাজের ন্যায় হিন্দুদিগের বাহ্যসম্পদ নাই, ব্যবসায় বণিজ্য, কারবার কারখানা, রেলরোড টেলিগ্রাপ প্রভৃতি নাই। কিন্তু ইংরাজের অপেক্ষা হিন্দুর ধর্ম্মজ্ঞান ও চরিত্রোৎকর্ষ আছে। এ কথাটি একটু বিশেষ অর্থে বুঝিতে হইবে। ইংলণ্ডের শিক্ষিত এবং শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর লোকের ধর্ম্মজ্ঞান এবং চরিত্রোৎকর্ষ আছে, কিন্তু অশিক্ষিত ও নিম্নশ্রেণীর লোক নিতান্তই ধর্ম্মহীন ও অসচ্চরিত্র। হিন্দুর মধ্যে, কি শিক্ষিত এবং শ্রেষ্ঠশ্রেণীর লোক, কি অশিক্ষিত এবং নিম্নশ্রেণীর লোক,—সকলেরই ধর্ম্মজ্ঞান, ধর্ম্মচর্য্যা এবং চরিত্রোৎকর্ষ আছে। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর যত ধর্ম্মচর্য্যা এবং চরিত্রোৎকর্ষ আছে, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর তত নাই সত্য, তত থাকাও সম্ভব নয়। ধর্ম্মচর্য্যা অর্থ ও অবসর সাপেক্ষ। নিম্নশ্রেণীর লোকের সে দুয়েরই অভাব। অতএব উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর যত, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর তত ধর্ম্মচর্য্যা বা চরিত্রোৎকর্ষ নাই। না থাকিলেও একথা ঠিক যে, নিম্নশ্রেণীর ইংরাজের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর ধর্ম্মজ্ঞান ধর্ম্মচর্য্যা এবং চরিত্রোৎকর্ষ অনেকগুণে বেশি এবং একথাও ঠিক যে ধর্ম্মজ্ঞান ধর্ম্মচর্য্যা এবং চরিত্রোৎকর্ষ সম্বন্ধে উচ্চশ্রেণীর হিন্দু ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে যত সৌসাদৃশ্য ও সমত্ব আছে, উচ্চশ্রেণীর ইংরাজ এবং নিম্নশ্রেণীর ইংরাজের মধ্যে তাহার এক শতাংশও নাই। ধর্ম্ম এবং চরিত্র সম্বন্ধে উচ্চশ্রেণীর ইংরাজ এবং নিম্নশ্রেণীর ইংরাজ—দুইটি অতি ভিন্ন জাতীয় লোক, সভ্যতায় দুইটি অতি বিসদৃশ স্তরের লোক, এমন কথা বলিলে অত্যুক্তি বা অযথা উক্তি হয় না। ইংরাজ-জাতির শ্রেণী সকলের মধ্যে ধর্ম্মচর্য্যা ও চরিত্র সম্বন্ধে বড়ই পার্থক্য, বড়ই বিসদৃশ্য, বড়ই heterogeneity দৃষ্ট হয়। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে ধর্ম্মচর্য্যা ও চরিত্র-সম্বন্ধে শিক্ষা ও অবস্থার বিভিন্নতা বশত যতটুকু পার্থক্য বা বিভিন্নতা

---

* নব্যভারত, তৃতীয় খণ্ড, নবম সংখ্যা—'বাঙ্গালির ইউরোপ দর্শন' নামক প্র[illegible] [illegible] করিলাম।

ঘটিতে পারে, তদপেক্ষা বেশি পার্থক্য বা বিভিন্নতা নাই। এ বিষয়ে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু এক জাতীয় এবং সভ্যতার একই স্তরের লোক। সকল শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে ধর্ম্মচর্য্যা, ধর্ম্মজ্ঞান ও চরিত্র সম্বন্ধে ঐক্য বড়ই বেশি, সৌসাদৃশ্য বড়ই বেশি homogeniety বড়ই বেশি, বড়ই অপূর্ব্ব। ইংলণ্ডের শিক্ষিত ও উচ্চ শ্রেণীর লোকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের কথা বেশ ভাল রকম জানে, কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর লোকে যীশু খৃষ্টের নাম পর্য্যন্ত জানে না। একবার একখানি ইংরাজি সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম,—একজন ইংরাজ ধর্ম্মযাজক ইংলণ্ডের একটি কয়লার খনির ভিতর প্রবেশ করিয়া তথায় যে সকল মজুর খাটিতেছিল তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তোমরা যীশু খৃষ্টকে জান? তাহারা আপনারা বারকতক যীশু খৃ, ঝাশু খৃষ্ট প্রভৃতি নানা রকম বিকৃত আকারে যীশুখৃষ্টের নাম উচ্চারণ করি উত্তর করিল—what lombore, ? "লম্বোর' অর্থাৎ নম্বর কত? কয়লার খনিতে মজুরদিগের নম্বর থাকে, নম্বর ধরিয়া তাহারা পরিচয় দেয়, তাহারা মনে করিয়াছিল, যে, যীশুখৃষ্ট যদি তাহাদের মধ্যে একজন নম্বরধারী মজুর হয়, তবেই তাহারা তাহার কথা বলিতে পারিবে, নচেৎ নয়! যে জাতির মধ্যে ম্যাণিং মিলমানের ন্যায় খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত দেখিতে পাওয়া যায়, সেই জাতির মধ্যে সহস্র সহস্র লোক যীশুখৃষ্টের নাম পর্য্যন্ত জানে না! হিন্দুদিগের মধ্যে এমন হয় না। যে হিন্দু অতি নীচ এবং অশিক্ষিত সেও তাহার দেবদেবীর কথা জানে, দেবদেবীর পূজা করে, এবং সাধ্যমত ধর্ম্মচর্য্যা করে। আমাদের বাগদী দুলেরাও দোল দুর্গোৎসব করে, পুরাণ-কথা শুনে, স্ত্রী পুত্রকে প্রতিপালন করে, শ্রেষ্ঠকে সম্মান করে, দুষ্কর্ম্মকে দুষ্কর্ম্ম বলিয়া জানে ও ঘৃণা করে, ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেয়, সাধ্যমত নিঃসহায় জ্ঞাতিকুটুম্বকে অন্নদান করে। আমাদের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা যে রকম দরিদ্র এবং অশিক্ষিত, তাহাতে তাহাদের ধর্ম্মজ্ঞান এবং ধর্ম্মচর্য্যা না থাকাই সম্ভব। কিন্তু তাহাদের যে পরিমাণ ধর্ম্মজ্ঞান এবং ধর্ম্মচর্য্যা আছে তাহা নিতান্তই সম্ভবাতিরিক্ত এবং বিস্ময়কর। মোটামুটি ধরিতে গেলে এমন কথা বলা যাইতে পারে, যে, ধর্ম্মজ্ঞান এবং ধর্ম্মচর্য্যা সম্বন্ধে তাহারা অনেক উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর প্রায় সমতুল্য। তাই বলিতেছি, যে, ধর্ম্মচর্য্যা ও চরিত্রোৎকর্ষ সম্বন্ধে হিন্দুর ভিতর সকল শ্রেণীর মধ্যে যেমন অপূর্ব্ব সমত্ব,—সৌসাদৃশ্য বা homogeniety আছে, ইংরাজ বা অপর

কোন ইউরোপীয় জাতির ভিতর শ্রেণী সকলের মধ্যে তাহার এক শতাংশও নাই। এই অপূর্ব্ব সৌসাদৃশ্যের বা homogenietyর হেতু কি? কি কারণে হিন্দুর ভিতরে উচ্চ শ্রেণীর লোকের ন্যায় নিম্ন শ্রেণীর লোকেরও ধর্ম্মচর্য্যা এত বেশি এবং চরিত্র এত উত্তম?

এই আশ্চর্য্য সমত্ব বা সৌসাদৃশ্যের অনেক কারণ থাকিতে পারে, এবং বোধ হয় যে অনেক কারণই আছে। বোধ হয়, যে, প্রাকৃতিক কারণে এ দেশের লোক ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা বেশি ধর্ম্মশীল এবং সেইজন্য ধর্ম্মানুরাগ ও ধর্ম্মচর্য্যা সম্বন্ধে ইউরোপ অপেক্ষা এ দেশে উচ্চশ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বেশি সমত্ব বা সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু এই সৌসাদৃশ্যের অন্যান্য কারণ এ স্থলে নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিব না। বর্ণভেদ প্রথার সহিত এই সৌসাদৃশ্যের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহাই এ স্থলে বুঝিয়া দেখিব।

পৃথিবীতে মানুষের সম্বন্ধ দুইটি জিনিসের সহিত। একটি পার্থিবতা অর্থাৎ ধন, যশ, প্রভৃতি পার্থিব ভোগসম্পদ, আর একটি আধ্যাত্মিকতা বা পারলৌকিকতা অর্থাৎ ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মচর্য্যা। এই দুইটি ছাড়া আর কোন জিনিসের সহিত মানুষের সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। কেন না পার্থিবতা এবং আধ্যাত্মিকতা ছাড়া আর কোন জিনিস নাই। মানুষের যাহা কিছু আছে তাহা হয়, পার্থিবতার অন্তর্গত, নয় আধ্যাত্মিকতার অন্তর্গত। এই জন্য মানুষকে ধর্ম্মপ্রধান করিতে হইলে তাহার পার্থিবতা কমাইয়া দিতে হয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে জ্ঞানী লোকের কাছে ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিকতা অপেক্ষা পার্থিবতার সম্মান বা গৌরব যে বেশি, তা নয়। ইংরাজি-সাহিত্যে ধর্ম্মের যত প্রশংসা এবং মর্য্যাদা, ধনসম্পদের তত মর্য্যাদা এবং প্রশংসা নয়। ইংরাজ-লেখকেরা বলিয়া থাকেন, যে, ধনী বা বিদ্বান হওয়া অপেক্ষা ধার্ম্মিক হওয়া বেশি আবশ্যক। ইংরাজ-ধর্ম্মযাজকেরা পার্থিবতাকে অতি হেয় বা অপকৃষ্ট বলিয়া নিন্দা করিয়া আধ্যাত্মিকতারই প্রশংসা করিয়া থাকেন এবং লোককে পার্থিব পথ ছাড়িয়া ধর্ম্মপথে প্রবেশ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। তথাপি ইংরাজ জাতি সাধারণত পার্থিবতা-প্রিয় এবং ধর্ম্মহীন ও চরিত্র-ভ্রষ্ট। ইংরাজের সাহিত্য ও ধর্ম্মশিক্ষার সহিত ইংরাজের জীবনের এ অনৈক্য কেন? ইংরাজ তাহার শিক্ষাদাতার শিক্ষা বুঝে নাই বা কেন, অথবা বুঝিয়া তদনুসারে জীবন নিয়মিত করে নাই বা কেন? বোধ হয়, ইহার কারণ এই যে,

ইংরাজ শিক্ষক বা ধর্ম্মযাজক ধর্ম্মকে প্রধান বলিয়া কীর্ত্তন বা উপদেশ দিলেও ইংরাজের জীবনের এবং সমাজের ভিত্তি ধর্ম্মের উপর স্থাপিত নয়, পার্থিবতার উপর স্থাপিত। ইংরাজ ধর্ম্ম-যাজক ইংরাজকে মুখে বলেন—ধার্ম্মিক হও, ধন-সম্পদের লোভে ধন-সম্পদ লইয়া থাকিও না এবং পরকাল নষ্ট করিও না। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে বা প্রকৃত জীবন-যাত্রায় ইংরাজ দেখে, যে কর্ম্মক্ষেত্র তাহার সম্মুখে অসীম আকারে স্থাপিত, এবং বিরাট মূর্ত্তিতে বিরাজমান, কর্ম্ম হইতে কর্ম্মান্তর অবলম্বন করিতে তাহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, অর্থের উপর অর্থ সঞ্চয় করিতে সে সদাই আহূত। সে ধর্ম্ম-মন্দিরে শোনে যে, পার্থিব জীবন বড়ই অকিঞ্চিৎকর, ধনসম্পদ বড়ই অনিষ্টকর, পার্থিব ভাব সঙ্কুচিত করাই মানুষের প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়া সে দেখে যে পার্থিবতার দ্বার তাহার জন্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রহিয়াছে, সেই উন্মুক্তদ্বার দিয়া পার্থিবতা তাহাকে মোহিনী মূর্ত্তিতে আহ্বান করিতেছে। তখন সে তাহার সেই কাণে-শুনা দুই চারিটা কথা ভুলিয়া যায়, প্রবল পার্থিবতার প্রবল প্রলোভন তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে; সে পার্থিবতার নেশায় পশুবৎ হইয়া পড়ে। ইংলণ্ডে ধর্ম্মশাস্ত্র, ধর্ম্মযাজক এবং ধর্ম্মোপদেশ থাকিলে কি হইবে, ইংলণ্ডের জীবন-প্রণালী ও সমাজ-প্রণালী সে ধর্ম্মোপদেশের উপর স্থাপিত নয়, সে ধর্ম্মোপদেশকে কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে অনুকূল ও উপযোগী নয়, সে জীবন-প্রণালী সমাজ-প্রণালী সম্পূর্ণ পার্থিবতা-মূলক এবং উভয় প্রণালীই পার্থিব নেশা বাড়াইয়া মানুষকে ধর্ম্মভ্রষ্ট ও দুরাচার করিয়া ফেলে। এইজন্য ইংরাজ সাধারণতঃ এত দুশ্চরিত্র ও ধর্ম্মহীন। কিন্তু অতি সামান্য হিন্দুও অনেকাংশে সচ্চরিত্র ও ধর্ম্মশীল। তাহার কারণ এই যে, হিন্দু কেবল শাস্ত্রকার বা ধর্ম্মযাজকের মুখে পার্থিবতার অপকৃষ্টতা এবং ধর্ম্মচর্য্যার উৎকৃষ্টতার কথা শুনে না। হিন্দুর জীবন-প্রণালীতে হিন্দু দেখে যে পার্থিবতার দ্বার বড়ই সঙ্কীর্ণ, পার্থিবতার পরিমাণ বড়ই কম, পার্থিবতার আয়তন নিতান্তই মাপা—জোকা; তাহার এ দিকেও যাইবার যো নাই ও দিকেও যাইবার যো নাই, পার্থিবতা লইয়া দম্ভ আস্ফালন বা বেশি বাড়াবাড়ি করিয়া বেড়াইবার যো নাই। সেই এক স্থির নির্দ্দিষ্ট জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী কর্ম্ম,—যাহা শত সহস্র পূর্ব্বপুরুষ করিয়া গিয়াছেন, আজ আমাকেও কেবল তাহাই করিতে হইবে, আর আমার পরে আমার বংশে শত সহস্র

উত্তরপুরুষ কেবল তাহাই করিবে। তবে পার্থিব কর্ম্মক্ষেত্র ত আর একটা বাহাদুরি করিবার জায়গা নয়, সেখানে বাহাদুরি ত চলেও না। সে ক্ষেত্র এতই সঙ্কীর্ণ, যে, সেখানে পাশমোড়া দিবারও স্থান নাই। যে সঙ্কীর্ণ স্থান টুকু নহিলে নয়, তাই আছে। সে স্থানটা ভাল স্থান হইলে শাস্ত্রকারেরা কি তাহা এত ক্ষুদ্র করিয়া, এত স্বল্প পরিমাণে দিতেন? পার্থিব কর্ম্মক্ষেত্র অর্থাৎ যে কর্ম্মক্ষেত্র প্রশস্ত হইলে পার্থিবতা প্রশ্রয় পাইয়া মানুষকে পশুবৎ করিয়া ফেলে, সেই পার্থিব কর্ম্মক্ষেত্র অপকৃষ্ট বলিয়া হিন্দু তাহা এত সঙ্কীর্ণ আকারে পাইয়াছে। পাইয়া কি উচ্চশ্রেণীর হিন্দু কি নিম্নশ্রেণীর হিন্দু, সকল হিন্দুই বুঝিয়াছে, যে, পার্থিবতা অপকৃষ্ট এবং ধর্ম্মই উৎকৃষ্ট; এবং এইরূপ বুঝিয়াই কি উচ্চশ্রেণীর হিন্দু, কি নিম্নশ্রেণীর হিন্দু সকল হিন্দুই ধর্ম্মচর্য্যায় প্রায় সমান হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দুর মধ্যে বর্ণভেদে ব্যবসায়ভেদ অর্থাৎ বর্ণানুসারে স্থির নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় থাকায় এই অত্যাশ্চর্য্য ফল ফলিয়াছে।

পার্থিবতা এবং আধ্যাত্মিকতা বা ধর্ম্মচর্য্যা, মানুষের কেবল এই দুইটি জিনিসের সহিত সম্পর্ক। কারণ তৃতীয় জিনিস আর নাই। অতএব ইহার মধ্যে একটি যদি অপকৃষ্ট বলিয়া অনুভূত হয়, অপরটি কাজে কাজেই শ্রেষ্ঠতা লাভ করে। ভারতে বর্ণানুসারে নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় থাকায় হিন্দু পার্থিবতাকে অপকৃষ্ট বলিয়া অনুভব করিয়াছে এবং ধর্ম্মচর্য্যাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিয়াছে। কাজেই হিন্দুর মনে পার্থিব ভাবের উপর ধর্ম্মভাব প্রবল হইয়াছে। এখন এই কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিব, যে, বর্ণভেদ প্রথার আর কতকগুলি গুণ বা লক্ষণ আছে, যদ্দ্বারা ধর্ম্মভাবের প্রাধান্য বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে, এবং ধর্ম্মচর্য্যা সমস্ত হিন্দু-সমাজে বড়ই সম্প্রসারিত হইয়াছে। বর্ণভেদ প্রথায় মানুষ শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। ইহার একটি ফল হয় এই যে, যে নিকৃষ্ট সে শ্রেষ্ঠকে মান্য করিতে শিখে এবং শ্রেষ্ঠকে মান্য করিতে শিখিলে শ্রেষ্ঠের আচার ব্যবহার অনুসরণ করিতেও তাহার প্রবৃত্তি ও চেষ্টা হয়। সেইজন্য হিন্দুর মধ্যে নিকৃষ্ট বর্ণ শ্রেষ্ঠ বর্ণের আচার ব্যবহার অনুসরণ করে। ইহার আর একটি ফল হয় এই যে, যে শ্রেষ্ঠ, সে তাহার নিকৃষ্ট হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় না, অর্থাৎ যে শ্রেষ্ঠ সে তাহার নিকৃষ্টের সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ এবং যে নিকৃষ্ট সে তাহার শ্রেষ্ঠের সম্বন্ধে নিকৃষ্ট। অতএব একটা সূত্রে শ্রেষ্ঠ এবং নিকৃষ্ট পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট। শ্রেষ্ঠ জাতি

নিকৃষ্ট বর্ণের সহিত একটা না একটা সম্বন্ধে আবদ্ধ বলিয়া যে বর্ণে নিকৃষ্ট,তাহাকে শ্রেষ্ঠ জাতি লক্ষ্য করিয়া চলিতে হয় এবং সেইজন্য শ্রেষ্ঠবর্ণ যাহাকে উত্তম জীবন প্রণালী বলিয়া অনুসরণ করে, নিকৃষ্ট বর্ণও সেই জীবন প্রণালী অনুসরণ করে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে অর্থের পরিমাণ ছাড়া শ্রেষ্ঠ এবং নিকৃষ্ট শ্রেণীর মধ্যে প্রকৃত সামাজিক সম্বন্ধ কিছুই নাই, এবং সেইজন্য সেখানে সকল লোকও যেমন, নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকও তেমনি, কেবল অর্থের এবং পার্থিবতার অনুসরণ করিয়া বেড়ায়। শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর লোকের মধ্যে যদি কাহারো জীবন-প্রণালী ধর্ম্মমূলক হয়, নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকে সে জীবন-প্রণালী অনুসরণ করে না। এই দুই কারণে হিন্দুর ভিতর শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ জীবন-প্রণালী নিকৃষ্ট শ্রেণীর মধ্যে সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং এই দুই কারণের অভাবে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ জীবন-প্রণালী শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর মধ্যেই সম্বদ্ধ আছে, নিকৃষ্ট শ্রেণী কর্ত্তৃক অনুসৃত হয় নাই। ইহাত গেল শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট বর্ণের সম্বন্ধ-সম্ভূত ফল।

আবার ধর্ম্মচর্য্যা বৃদ্ধি করিবার পক্ষে বর্ণগত দুই একটি বিশিষ্ট কারণ আছে। সাধারণ লোকে যতই কেন ধর্ম্মভাবাপন্ন হউক না, তাহারা একেবারে পার্থিব আসক্তি বা স্পৃহা পরিহার করিতে পারে না। সমাজে যশস্বী বা ক্ষমতা-শালী হইতে তাহাদেরও ইচ্ছা হয়। কিন্তু সমাজ সমুদ্রবৎ সুদূর-প্রসারিত কুল-কিনারা শূন্য হইলে, সাধারণ লোকের যশস্বী বা ক্ষমতাশালী হইবার ইচ্ছা সহজে হয় না, হইলেও সে ইচ্ছা প্রায়ই মনের মধ্যে মিলাইয়া যায়। যেখানে লোকসমাজ অনন্ত সাগর সদৃশ, সেখানে তুমিও যেন কোথায় ডুবিয়া থাক, আমিও যেন কোথায় ডুবিয়া থাকি, তোমারও সমাজে প্রতিপত্তি লাভের আশা যেমন বামনের চাঁদ ধরিবার আশার অনুরূপ, আমারও সমাজে প্রতিপত্তি লাভের আশা তেমনি বামনের চাঁদ ধরিবার আশার অনুরূপ। যে সমাজে কত লোক রহিয়াছে এবং কত বড় লোক, আরো কত বড় লোক, আরো কত বড় লোক রহিয়াছে, সে সমাজে তোমার আমার বড় হইবার আশা হইবেই বা কেমন করিয়া? এই যে আমাদের সামান্য বাঙ্গালা সাহিত্য-মণ্ডলীতে থাকিয়া আমরা দুকলম লিখিয়া যশোলাভের আশা করিতেছি,—কিন্তু কৈ চল দেখি, ইংলণ্ডের বিরাট-সাহিত্য-মণ্ডলীতে গিয়া কেমন করিয়া লিখিয়া যশো-লাভ করিবার আশা করিতে পারি? ইংলণ্ডে মনুষ্যসমাজ সমুদ্রের ন্যায় বৃহৎ ও একাকার। সেখানে সামান্য এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকের সমাজে প্রতি-

শক্তিশালী হইবার আশা সহজে হয় না। ভারতে হিন্দুসমাজ সমুদ্রবৎ বৃহৎ, কিন্তু ইংলণ্ডের মনুষ্য সমাজের ন্যায় একাকার নয়। হিন্দু সমাজ অনেক বর্ণে বিভক্ত। প্রত্যেক বর্ণ সমস্ত সমাজের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। অতএব আপন আপন বর্ণের মধ্যে বড় হইবার ইচ্ছা সকল হিন্দুরই সহজে হইতে পারে। সীমার ভিতরে সামান্য লোকও বড হইতে পারে, অসীমের ভিতর অসীম শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহ বড় হইতে পারে না, বড় হইবার আশাও করিতে পারে না। যে আপন বর্ণের মধ্যে বড় হইতে চায়, তাহাকে সমস্ত সমাজের বড় লোকের প্রতিদ্বন্দ্বীতার ভয় করিতে হয় না, তাহার আপনার বর্ণের মধ্যে যাহারা বড় লোক, কেবল তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীতারই ভয় করিতে হয়। সে ভয় বড় বেশি ভয় নয় এবং সেইজন্য এদেশে হিন্দুর ভিতর অতি নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে অনেক লোকে সৎকর্ম্মের দ্বারা আপন আপন বর্ণের মধ্যে সম্মান ও সামাজিক ক্ষমতা লাভ করে। দেবালয়, সদাব্রত, অতিথিশালা, পথ, ঘাট, পুষ্করিণী, সরাই, কূপ, কুঞ্জ প্রভৃতি পরোপকারার্থ এবং পারলৌকিক হিতার্থ অনেক সৎকর্ম্ম এদেশে হইয়া গিয়াছে এবং এখনও কিছু কিছু হইতেছে। সকলেই বোধ হয়, জানেন যে, এই সকল সদনুষ্ঠান উচ্চশ্রেণীর হিন্দুতে যে পরিমাণে করিয়াছে, নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুতেও প্রায় সেই পরিমাণে করিয়াছে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে বর্ণভেদ নাই বলিয়া সেখানে জনকতক করিয়া খুব বড় বা ভাল লোক হয়। কিন্তু ভারতে বর্ণভেদ আছে বলিয়া সমাজের সকল শ্রেণীতে খুব বড় রকমের লোক না হউক, অসংখ্য ভাল লোক হয়—অতি নীচ জাতিতেও অনেক অতিউত্তম লোক দেখা যায়। হিন্দুসমাজে অসংখ্য গুহক চণ্ডাল দেখা যাইতে পারে, ইউরোপীয় সমাজে বোধ হয় দুই চারিটির বেশি নয়, হয়ত তাও নয়।

আবার কোন একটি বর্ণের মধ্যে কেহ সৎকর্ম্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠাবান হইলে সেই বর্ণের মধ্যে অনেকেই তাহার কার্য্যের অনুকরণ করিয়া থাকে। নিকৃষ্ট বর্ণ শ্রেষ্ঠ বর্ণকে যে কারণে অনুকরণ করে, তাহারাও সেই কারণে সেই প্রতিষ্ঠাবান্ লোকের অনুকরণ করে। অধিকন্তু প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি আপন বর্ণের মধ্যে বর্ণসম্বন্ধীয় ব্যাপারে বেশি ক্ষমতা লাভ করে বলিয়া তাহার আপন বর্ণের লোক ভয়েও তাহার দৃষ্টান্তানুসরণ করে। এই প্রকারে বর্ণ বিশেষের দ্বারা বর্ণ বিশেষ ধর্ম্মপথে পরিচালিত হয়।

এখন বোধ হয় বুঝা গেল, যে, হিন্দুর ভিতরে উচ্চ মধ্যম এবং নিম্ন

আহারান্তে রামপ্রসাদ সুধাপানে * ভোর হইয়া, সেই বাগানে মাদুরি পাতিয়া, তামাকু খাইতেন, বিশ্রাম করিতেন, আর আপন মনে শ্যামাগুণ গান করিতেন। বাগানের পার্শ্বেই একটি পুষ্করিণী; পর পারে আজুগোঁসায়ের আখড়া। বাবাজিও ছোট কলি হুঁকাটিতে গাঁজা সাজিয়া, পুষ্করিণীর পাড়ে ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেন; রাম প্রসাদের গান বুঝিতে পারিলে, কখন কখন বাবাজি তাহার উত্তর স্বরূপ আর একটি গান গাহিতেন। শাক্তে বৈষ্ণবে এইরূপ বাদ প্রতিবাদ রামপ্রসাদের জীবন বৃত্তান্তে প্রকাশিত হইয়াছে, আপনারা অনেকেই বোধ হয়, তাহা দেখিয়াছেন, অথবা সেই কাহিনী শুনিয়াছেন। কিন্তু বোধ হয়, আপনারা অনেকেই দিগম্বর ভট্টাচার্য্যের নাম পর্য্যন্ত ও শুনেন নাই। ভট্টাচার্য্যের কীর্ত্তি অকীর্ত্তির কথা আজি আপনাদিগকে উপহার দিব।

আজু গোঁসাই যেমন সাধক রামপ্রসাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, দিগম্বর ভট্টাচার্য্য সেইরূপ মহাত্মা রাম মোহন রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। রাজা রাম মোহন রায় অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, প্রতিভাশালী, দেশভক্তিপূর্ণ, তেজস্বী, মনস্বী, মহা পুরুষ; দিগম্বর ভট্টাচার্য্যের সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। এই মাত্র জানি, যে, মহাত্মা রামমোহন রায় কৃত কতকগুলি গানের উত্তরে তিনি কতকগুলি গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেই বাদ প্রতিবাদও বড় বিস্ময়কর।

আজু গোঁসায়ের সহিত যে রামপ্রসাদের সখ্য ছিল, এমন কথা কোথাও শুনি নাই। দিগম্বর ভট্টাচার্য্যের সাহি রাজা রাম মোহন রায়ের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। ভট্টাচার্য্যের নিবাস এই কলিকাতাতেই হইবে। যখন রামমোহন রায় কলিকাতায় বাস করিতেন, তখনই ভট্টাচার্য্য সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট থাকিতেন; এরূপ প্রবাদ, যে উভয়ে একত্র সুরাপান করিতেন। যাহাই হোক, দিগম্বরে রামমোহনে বিশেষ সখ্য ভাব ছিল; উভয়ে মধ্যে মধ্যে বিচার বিতর্ক হইত। সকলেই জানেন, মহাত্মা রামমোহন রায় নিরাকার, নির্গুণ, অদ্বৈত,—বাদী। তাঁহার মতে অনিত্য সংসার মিথ্যা, একমাত্র নিত্য নিরঞ্জনই সত্য। জগদীশ্বরের মহিমা চিন্তনই মহাত্মার মতে, তাঁহার বিশুদ্ধ উপাসনা। দিগম্বর ভট্টাচার্য্য সগুণ সাকার-বাদী, পৌত্তলিক, এবং তন্ত্রমতে আদ্যাশক্তির উপাসক।

* সুরাপন করি নে আমি, সুধা খাই রে কুতূহলে।
আমার মন মাতালে মেতেছে আজি, যত মদ-মাতালে মাতাল বলে॥
রামপ্রসাদের গান।

দিগম্বর ভট্টাচার্য্যের গানগুলি পর্য্যালোচনা করিলেই, তাঁহার রীতি নীতি উপাসনা-পদ্ধতি বুঝিতে পারা যায়। গানগুলি সমস্তই মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের রচিত প্রচলিত কয়েকটি গানের প্রত্যুত্তর মাত্র। সুর তাল অনেক সময়েই এক, অনেক গুলিতে কথায় কথায় মিল আছে, কেবল দুই দশটা শব্দ পরিবর্ত্তিত করা এবং দুই একটি কলি নূতন বাঁধা। কিরূপ গুণপনা পরের কয়েক পৃষ্ঠা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

রামমোহন রায়ের গান।

১

বসন্তবাহার—আড়াঠেকা।

মন তুমি সদা কর তাঁহার সাধনা।
নির্গুণ গুণাশ্রয় রহিত কল্পনা ॥
যে ব্যাপিল সর্ব্বত্র, তবু মন বুদ্ধিনেত্র
নাহি পায় কি বিচিত্র, কেমন জান না
জানিতে তায় পরিশ্রম,
করিছ সে বৃথা শ্রম,
সে সব বুদ্ধির ভ্রম, দুসাধ্য সূচনা
বিচিত্র বিশ্ব নির্ম্মাণ,
কার্য্য দেখে কর্ত্তা মান
আছে মাত্র এই জ্ঞান অতীত ভাবনা

---

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া ঠেকা।

তুমি কার কে তোমার
কারে বল রে আপন।
মহামায়া নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন।
রজ্জুতে হয় যেমন ভ্রমে অহি দরশন,
প্রপঞ্চ জগৎ মিথ্যা, সত্য নিরঞ্জন।
নানাপক্ষী এক বৃক্ষে,
নিশিতে বিহরে সুখে,
প্রভাত হইলে সবে যায় নানাস্থান
তেমতি জানিবে সব অমাত্য বন্ধু বান্ধব
সময়ে পলাবে তারা, কে করে বারণ।
কোথা কুসুম চন্দন, মণিময় আভরণ
কোথা বা রহিবে তব, প্রাণ প্রিয়জন।
ধন যৌবন মান, কোথা রবে অভিমান,
যখন করিবে গ্রাস নিষ্ঠুর শমন।

---

উত্তরে ভট্টাচার্য্যের গান।

১

বসন্ত বাহার, আড়াঠেকা।

কেন ক্ষেপা কর তবে তাঁহার সাধনা?
নির্গুণ যদি তিনি রহিত কল্পনা

* * *
* * *
* * *

"আছে মাত্র" এই জ্ঞান
তবে কেন গাও গান
চক্ষু মুদি কার ধ্যান, কিসের ভাবনা?

---

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া ঠেকা।

মা আমার, আমি তাঁর,
তাঁরে বলি রে আপন।
মহামায়া মায়ে আমি দেখি রে স্বপন।
রজ্জুতে হয় যখন, ভ্রমে অহি দরশন,
অহি মিথ্যা রজ্জু মিথ্যা বল কি তখন?
নিশিতে বিহরিসুখে, যায়পাখীদিকে দিকে
আবার ফিরিয়া আসে, আমারি মতন।
যাতায়াতে সমাচার, নিত্যসত্য এ সংসার
চিন্ময়ী চরণচিন্তা সংসার বন্ধন। *

---

* ভট্টাচার্য্যের ভাব যেন এইরূপ বোধ হয়, যে, চিন্ময়ী ও সংসার দুইই সত্য, আর সংসারী কর্ত্তৃক চিন্ময়ী চিন্তা, চিন্ময়ীর সহিত সংসারীর একমাত্র বন্ধন।

### রামমোহন রায়ের গান।

বেহাগ—আড়া ঠেকা।

মন একি ভ্রান্তি তোমার।
আবাহন বিসর্জ্জন কর তুমি কার।
যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে, ইহা গচ্ছ বল তাকে
তুমি কে বা আন কাকে, একি চমৎকার
অনন্ত জগ দাধারে, আসন প্রদান কা'রে
ইহ্য তিষ্ঠ বল তাঁরে, একি অবিচার,
একি দেখি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেদ্য সব
তাঁরে দিয়া কর স্তব, এবিশ্ব যাঁহার,

---

সিন্ধু ভৈরবি, আড়াঠেকা।

লোকে জিজ্ঞাসিলে বল,
আছি ভাল প্রাণে প্রাণে,
কোথায় কুশল তব,
আয়ুক্ষতি দিনে দিনে।
দারা সুত প্রভৃতি,
কেহ না হইবে সাথী,
জ্ঞান করি অবস্থিতি,
তোমার সহায় জীবনে,
যুক্তিবেদ মতে চল,
মিথ্যা মায়ায় কেন ভুল,
ইন্দ্রিয় আছে সবল,
ভজ সত্য নিরঞ্জনে

---

কেদার আড়াঠেকা।

অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা।
অনিত্য যে দেহ মন জেনে কি জান না
শীত গ্রীষ্ম আদি সবে,
বার তিথি মাস রবে,
কিন্তু তুমি কোথা যাবে,
একবার ভাবিলে না।
অতএব বলি শুন, ত্যজ রজঃ তমগুণ,
ভাবিলেই নিরঞ্জন এ বিপত্তি রবে না।

---

### উত্তরে ভট্টাচার্য্যের গান

বেহাগ—আড়া ঠেকা।

ভ্রান্তিতে শান্তি—আমার।
আবাহন বিসর্জ্জনে ক্ষতি কি বা কার।
সর্ব্বত্র পূরিত বায়, গ্রীষ্মে যবে প্রাণ যায়,
বলি বায়ু আয় আয় জীবন সঞ্চার।
জগমাতা জগময়ী, যখন কাতর হই,
বলি এসো ব্রহ্মময়ী, করগো নিস্তার।
জড় জীব জড় করি, যাহার সাধন করি
ধ্যানজ্ঞান জল ফল সকলিত তাঁর।

---

সিন্ধু ভৈরবী, আড়াঠেকা।

লোকে জিজ্ঞাসিলে বলি,
ভাল আছি খোলা প্রাণে।
ভাল মায়ের বেটা আমি,
ভাল না থাকিব কেনে?
দারা সুত প্রভৃতি
সকলে সাধনা সাথী
চক্রকরি অবস্থিতি
মত্ত থাকি সুধাপানে
তন্ত্রে মন্ত্রে ভর করি,
ভাবি সেই দিগম্বরী,
ইন্দ্রিয় গেল বা র'ল
কখন ত ভাবিনে।

---

কেদার আড়াঠেকা।

ওঁকারে মত্ত মন অপার বাসনা।
দেহ সত্য মন সত্য,
সত্য শ্যামা-সাধনা
শীত গ্রীষ্ম আদি ছয়, আসে যায় রয়, হয়,
পুত্রের সাধনা রয়, মায়ের করুণা,
অতএব শুন বলি,
ত্যজ মিথ্যা মিথ্যা বুলি।
সত্যময়ী তথ্য লও, যাবে ভাবনা॥

---

রামমোহন রায়ের গান।
ইমণ কল্যাণ—আড়াঠেকা।

একি ভুল মন। (তোমার)
দেখিবারে চাহ যারে
না দেখে নয়ন।
আকাশ বিশ্বেরে ঘেরে,
যে ব্যাপিল আকাশেরে,
আকাশের ন্যায় তাঁরে
মানা এ কেমন
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ যত,
যে চালায় অবিরত,
তাঁরে দেখাইতে কত করহ যতন।
পশু পক্ষী জলচরে,যে আহার দেয় নরে,
চাহ সেই পরাৎপরে
করাতে ভোজন।

———

ললিত—আড়াঠেকা।
কোথা হতে এলে কোথা
যাইবে কোথা রে।
নিদ্রাবশে দেখ যেমন বিবিধ স্বপন
প্রপঞ্চ জগতে তেমন
ভ্রমে সত্য দরশন।
অতএব দেখ বুঝে যিনি সত্য ভজ তাঁরে

———

বেহাগ—একতালা।
মন তোরে কে ভুলালে হায়!
কল্পনারে সত্যকরি জান একি দায়!!
প্রাণ দান দেহ যাকে,
যে তোমার বশে থাকে,
জগতের প্রাণ তাকে, কর অভিপ্রায়।
কখন ভূষণ দেহ, কখন আহার,
ক্ষণেক স্থাপহ ক্ষণে করহ সংহার,
প্রভু বলি মান যাঁরে,
সম্মুখে নাচাও তাঁরে,
এত ভুল এ সংসারে
কে দেখে কোথায়!

———

উত্তরে ভট্টাচার্য্যের গান।
প্রসাদী সুর—একতালা।

ভুল নয়, ভুল নয়, ঐ দেখ ওই!
আঁধারে করিছে আলো ঐযে আমার—
[ব্রহ্মময়ী।
পদতলে পড়ি মহেশ বিকলে,
লক্ষ লক্ষ কর কটির শিকলে,
চন্দ্র সূর্য্য বহ্নি নয়ন নিকলে
বদনে মা ভৈঃ মা ভৈঃ।
অট্ট অট্ট হাস, বিকট বিকাশ
ত্রাসিত আকাশ, সমরে জয়ী।
করাল বদনে সরল হাসিছে
মরাল গমনে মেদিনী কাঁদিছে,
তালে তালে তালে সুঠাম
নাচিছে তাথৈ, তাথৈ।

———

ললিত—আড়াঠেকা।
কোথা হতে এলাম আমি
যাইব কোথায় রে।
মা আমার, আমি মার,
ভাবনা কি তায় রে!
ভক্তিভরে দেখিতেছি জাগ্রতে খেয়াল
আমার মায়ের আমি স্নেহের ছাওয়াল
তাঁহার কোলেতে শুয়ে
ধরিয়াছি রাঙ্গা পায় রে।

———

ভৈরবী—মধ্যমান।
ভুবন ভুলালে মায়ায় ভুবনমোহিনী।
কল্পনারে সত্যকরি দেখা দিলা জননী
কল্পনায় অধিষ্ঠান, কল্পনায় দেই প্রাণ,
সত্য করি আত্মদান, এই মাত্র জানি।
কখন ভূষণ দেই কখন অশন,
কখন স্থাপন করি, কভু বিসর্জ্জন,
মাতৃরূপা দেখি চক্ষে,
নাচিছে বাপের বক্ষে
ভয়ে বলি সর্ব্বরক্ষে
কর সর্ব্বরূপিণী।

———

রামমোহন রায়ের গান।

ইমন ভূপালী—ঢিমা তেতালা।

ভুল না নিষাদ কাল
পাতিয়াছে কর্ম্ম জাল;
সাবধান রে আমার মানস বিহঙ্গ।
দেখ নানাবিধ ফল, ওযে কর্ম্মতরু ফল,
গরলময় কেবল, দেখিতে সুরঙ্গ।
ক্ষুধায় আকুল যদি হইয়াছ মন,
নিত্যসুখে জ্ঞানারণ্যে করহ গমন।
সুন্দর তরু নির্ভয়, অমৃতাক্ত ফলচয়,
পাইবে ভোগিতে কত আনন্দ বিহঙ্গ।

---

পূরবী—আড়াঠেকা।

গ্রাস করে কাল পরমায়ু প্রতিক্ষণে
তথাপি বিষয়ে মত্ত
সদা ব্যস্ত উপার্জ্জনে।
গত হয় আয়ু যত, স্নেহে কহ হলো এত
বর্ষগেলে বর্ষ বৃদ্ধি কহে বন্ধুগণে।
এসব কথার ছলে, কিম্বা ধন জন বলে,
তিলেক নিস্তার নাই কালের দর্শনে,
অতএব নিরন্তর চিন্ত সত্য পরাৎপর,
বিবেক বৈরাগ্য হলে কি ভয় মরণে,

---

রামকেলী—আড়াঠেকা।

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।
অন্যেবাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর
যার প্রতি যত মায়া,
কিবা পুত্র কিবা জায়া
তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর।
গৃহে 'হায় হায়' শব্দ
সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ,
দৃষ্টিহীন, নাড়ীক্ষীণ হিম কলেবর।
অতএব সাবধান,
ত্যজ দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর সত্যেতে নির্ভর।

উত্তরে ভট্টাচার্য্যের গান।

ইমণ ভূপালী—ঠেকা তেতালা।

দেখরে! বুদ্ধি নিষাদ
পাতিয়াছ জ্ঞান ফাঁদ,
সাবধান রে আমার মানস বিহঙ্গ।
দেখ নানাবিধফল, ওযে গরল কেবল,
তর্কে তর্কে ঢল ঢল, দেখিতে সুরঙ্গ।
ক্ষুধায় আকুল যদি হইয়াছে মন,
কর্ম্মরথে ভক্তিপথে করহ গমন,
মিলিবে মুক্তির ফল, মধু তাহে অবিরল
মত্ত হবে সুধাপানে দেখিবে যে রঙ্গ।

---

পূরবী—আড়াঠেকা।

তিলেতিলেপরমায়ু বাড়িতেছে প্রতিক্ষণে
ধীরে ধীরে ভক্তিনদী ধায় শ্যামা চরণে।
বৃদ্ধি পায় আয়ু যত, পুত্র হয় মাতৃরত,
কোলে টানে মা যে তত, আপন সন্তানে
পরের কথার ছলে,
পুত্র কি আর টলে, বলে,—
ভয় নাহি আর সেই কালের দর্শনে।
এক চিন্তা নিরন্তর মায়ে পোয়ে একঘর
ভেদ নাহি অতঃপর জীবনে মরণে।

---

পূরবী—আড়াঠেকা।

মনে কর শেষের সে দিন সুখকর।
আধনীরে গঙ্গাতীরে শঙ্কা হীন নর॥
কাটায়ে সংসার মায়া,
আশীর্ব্বাদি পুত্র জায়া
নিরমাল্য বিল্বপত্র মাথার উপর।
চিন্ময়ী ধরেছ বুকে,
কালী কালী নাম মুখে,
কালীনাম সবে ডাকে, করি উচ্চস্বর।
কালীনাম অবিচ্ছেদ,
স্বর্গে মর্ত্তে নাহি ভেদ,
ব্রহ্মরন্ধ্র করি ভেদ উঠে দিগম্বর।

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

### সিপাহি সমর।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে সিপাহীদিগের সহিত ইংরাজের মহা সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। সিপাহীগণ দিল্লী দখল করিয়াছে, ইংরাজকুল ভয়ে সশঙ্কিত। মান সম্ভ্রম ধন প্রাণ লইয়া সকলেই ব্যতিব্যস্ত।

যমুনা গোপিনীকে আপনাদের স্মরণ আছে কি? তাহার পিতা এখনও অমূল্যদের বাটিতে দুগ্ধ দেয়, সে নিজে আর আসে না। দুর্গাবতী তাহাকে আসিতে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেও আসে না, কচিৎ এক আধ বার আসে,তাও আবার দুধ দিতে নয়,—দেখা করিতে, তাহাও মধ্যাহ্নের সময়।—

যমুনা আজি প্রাতে আসিয়া সশঙ্কিতচিত্তে দুর্গাবতীকে বলিল "আপনারা আর সহরের মধ্যে থাকিবেন না!"

দুর্গা। কেন?

যমুনা। শুনিতে পাই ২।১ দিন মধ্যে এখানে লড়াই বাধবে।

দুর্গাবতী ভীতা হইলেন, অমূল্যকে তৎক্ষণাৎ ডাকাইয়া এ সংবাদ দিলেন। অমূল্য আর কাল বিলম্ব না করিয়া সহরের বাহিরে বাসার অনুসন্ধানে চলিলেন। যমুনা কুমারীও চলিয়া গেল।

অমূল্য বাসা স্থির করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে বৃটিশ সিংহের দুর্জ্জয় কামান গম্ভীর গর্জ্জন করিয়া উঠিল, চতুর্দ্দিকে মহা হুলস্থুল বাধিয়া গেল। ইংরাজের রণবাদ্য, কোলাহল, সিপাহীদিগের জয়োল্লাসে মিশ্রিত হইয়া এক ভীতিপ্রদ ভাব ধারণ করিল। সকলেই সশঙ্কিত চতুর্দ্দিকে ছুটা ছুটি হুড়া হুড়ি—অমূল্য মহা বিপদে পড়িলেন, কি করিয়া বাসায় যাইবেন, তাঁহাদিগের উপায়ইবা কি করিবেন, ভাবিয়া অস্থির হইলেন। সম্মুখে মহা সমর—যাইবার পথ নাই, অমূল্য অনেকক্ষণ—একটি বৃক্ষপার্শ্বে নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিছুক্ষণ পরেই ইংরাজ সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল। অসুরাবতার সিপাহিগণ দ্বিগুণ উৎসাহে দ্বিগুণ তেজে তাহাদের অনুধাবন করিল। তখন অমূল্য সেই রণভঙ্গ স্থল—মহা শ্মশানের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলেন। কত প্রাণশূন্য কায়া রুধির ধারায় প্লাবিত। তিনি বিষণ্ণ হৃদয়ে সেই সকল দেখিতে দেখিতে উর্দ্ধশ্বাসে চলিলেন। চলিতে চলিতে,—দেখিলেন তাহাদের মধ্যে দুই একটি তখনও জীবিত আছে, চক্ষু চাহিয়া দেখিতেছে, কাহারও চক্ষে বারি ধারা, কাহারও বা—চক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। অমূল্য যে এই মহা শ্মশান দিয়া একাকী চলিতেছেন, তাহা নহে। কত লোকে কত দিকে ছুটিতেছে। অমূল্য শুনিলেন,—সেই মহা শ্মশানের মহারব ভেদ করিয়া উচ্চে একটি কণ্ঠস্বর উঠিতেছে। জানিলেন এ সেই পরিচিত যুবার সুপরিচিত কণ্ঠস্বর। প্রথমে

অমূল্য বিস্মিত হইলেন; তাহার পর অনন্য মনস্ক হইয়া সেই গান শুনিতে শুনিতে চলিলেন। সেই কম্পিত কণ্ঠের স্বর, আজি যেন বড়ই মধুর, বড়ই মর্ম্মভেদী; চারিদিকের আর্ত্তনাদের অস্ফুটধ্বনি, ত্রস্তজনগণের পদশব্দ, দূরাগত কামানের গর্জ্জন. দূরাগত সিপাহী সৈন্যের জয় হুঙ্কার, সকল আচ্ছন্ন করিয়া পরিষ্কার তীব্র কণ্ঠস্বর উঠিতেছে; সুস্পষ্টে শুনা যাইতেছে, অদৃশ্য যুবা কবির সুরে গায়িতেছে।

চিতেন।

দৈব যোগে যদি প্রাণনাথ, হলো এপথে আগমন।
কও কথা, একবার কও কথা, তোলো ও বিধু বদন॥
পীরিত ভেঙেছে ভেঙেছে তায় লজ্জা কি?
এমনত প্রেম ভাঙাভাঙি অনেকের দেখি।
আমার কপালে নাই সুখ
বিধাতা হলো বিমুখ,
আমি সাগর ছেঁচে কিছু মাণিক পাবনা।

মহড়া।

দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ, বদন ঢেকে যেওনা।
তোমায় ভাল বাসি তাই, চোখের দেখা দেখতে চাই
কিছু থাক থাক বলে ধরে রাখবো না॥
তুমি যাতে ভাল থাক সেই ভালো,
গেল গেল বিচ্ছেদে প্রাণ আমারি গেল,
সদা বিরাগে কর ভর, আমিতো ভাবিনে পর,
তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ দিওনা॥ *

অমূল্য মহাশ্মশান মধ্যে এই অপূর্ব্ব গীত শ্রবণ করিয়া, ব্যাকুল, বিহ্বল-চিত্তে বিপথে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে একজন আহত ইংরাজ সৈন্য অমূল্যকে লক্ষ্য করিয়া বল্লম তুলিল। সে আঘাতে অমূল্যর জীবনের আশা থাকিত না,—কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে একটি যুবা সেই দ্রুতগামী বল্লমের মুখে আসিয়া পড়িল। বল্লম তাহার বক্ষে বিদ্ধ হইল। সেই মুমূর্ষ প্রায় ইংরাজ "হুর্ রে" করিয়া উঠিল। সে ধ্বনি অমূল্যের কর্ণে পশিল। তিনি দেখিলেন, সর্ব্বনাশ! সেই সুন্দর যুবা পুরুষের বক্ষে বল্লম বিদ্ধ হইয়াছে। অমূল্য তৎক্ষণাৎ তাহার সহায়তায় আসিলেন, বক্ষস্থিত বল্লম টানিয়া বাহির করি-লেন, ঘোরতর শোণিত প্রবাহ ছুটিতে লাগিল।

যুবক বলিল এস্থানে দাঁড়াইবেন না, এ বল্লম আপনারই প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিল।

অমূল্য। আমার প্রতি?

যুবক। হাঁ—চলুন, বলিতেছি।

---

* রাম বসুর গান।

অমূল্য। তুমি চলিতে পারিবে।

যুবক। আপনার স্কন্ধে ভর দিয়া যাইব।

যুবক তাহাই করিলেন। সেই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কতক দূরে একটি নির্জ্জন স্থানে গিয়া যুবক বলিলেন "আর আমার যাইবার সময় নাই; এখানে বসুন।"

অমূল্য যুবককে লইয়া বসিলেন।

যুবক বলিল,— "আপনার কোলে শুই।"

অমূল্য কোল পাতিয়া দিলেন।

যুবক অমূল্যের ক্রোড়ে শয়ন করিলে অমূল্য বলিলেন "তুমি এ দিকে কোথায় যাচ্ছিলে ?

যুবক। আপনার সঙ্গে।

অমূল্য। কই আমিত দেখ্‌তে পাই নাই।

যুবক। না দেখ্‌লে কি করে দেখাব।

অমূল্য। কেন যাচ্ছিলে ?

যুবক। গান শোনাতে। শুনিতে পান নাই ?

অমূল্য। একি গানের সময় ?

যুবক। গানের আবার সময় অসময় আছে না কি ?

অমূল্য। তোমার বুকে বল্লম লাগলো কি করে ?

যুবক। ইংরাজ আপনাকে লক্ষ্য করে বল্লম ছুঁড়লে তাই দেখে।—

অমূল্য। না হয় আমি মরতাম, আমার জন্যে তুমি মরিলে!

যুবক মৃদু হাসিয়া কহিল,—"একজন মানুষের প্রাণ রক্ষায় কি কোন ফল নেই ?"

অমূল্য যুবকের প্রতি একটি স্থির দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন, বলিলেন "আপনার প্রাণ বড় না, পরের প্রাণ—বড় ?"

যুবক ঈষৎ চঞ্চল নয়নে বলিলেন "আমি বড় না, তুমি বড় ?"

অমূল্য। তুমি হয় পাগল নয়, দেবতা !

যুবক এইবার মৃদু হাসি হাসিয়া কহিল,—"দেবতা নয় পাগল বটে। না হলে কি আমি সাগর ছেঁচে মাণিক তুলিতে যাই। বলিতে বলিতে যুবা কাঁদিয়া ফেলিল।

অল্পক্ষণ পরে যুবকের অধর প্রান্তে আবার যেন ঈষৎ হাসি ডুবিয়া ডুবিয়া দেখা দিল। যুবক বলিল,—"দেখুন আমার মাথার পাগড়িতে একটি কাগজ আছে, সে খানি আপনি লইবেন—আমি সে কাগজ খানি আপনাকে দিতে প্রতিশ্রুত ছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, অবসর পাইলেই ডাকে পাঠাইয়া দিব, কিন্তু আজিও ঘটিয়া উঠে নাই।

অমূল্য। কি কাগজ ?

যুবক। এখনি দেখিতে পাইবেন।

অমূল্য আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না। পাগড়ি হইতে যেমন পত্র বাহির করিতে যাইবেন, অমনি পাগড়ি খুলিয়া পড়িল, কুণ্ডলীকৃত কাল-ভুজঙ্গিনীর

মত বেণীবদ্ধ কেশরাশি তাঁহার কোলে ছড়াইয়া পড়িল। অমূল্য চকিত, বিস্মিত হইলেন, বলিলেন,—"তুমি স্ত্রীলোক!"

তখন মুমূর্ষুর বক্ষে কিএক তরঙ্গ হঠাৎ খেলাইয়া উঠিল। সে মৃদুস্বরে বলিল,—"আমি যমুনা"।

অমূল্য কাঁদিয়া ফেলিলেন। ধীরে ধীরে অন্যমনস্ক ভাবে মাথার বেণীগুলি কপাল হইতে সরাইয়া দিলেন। বলিলেন,—"যমুনা,তোমার অন্তিম কাল উপস্থিত, তুমি স্বর্গে চলিলে; আমায় ভাল বাসিতে বল, এখন আমি কি করিব?"

যমুনা মৃদু অথচ পরিষ্কার কণ্ঠে গাহিতে লাগিল,—

(চিতেন।)

নির্জ্জনে এমন, না পাব দরশন,
যায় নিশি যাক, জানুক গুরুজন,
তাহাতে নহি খেদিতো, শুন ওহে ব্রজনাথো,
ও'বংশীর গুণ কতো, বিশেষ শুনাও।

(মহড়া।)

শ্যাম, তিলেক দাঁড়াও, হেরি চিকণ কাল বরণে,
শ্যাম তিলেক দাঁড়াও,
সাধ মম বহু দিনের, আজ পেয়েছি অঙ্গনে,
চন্দ্রাননে হাসি হাসি বাঁশীটি বাজাও।

(অন্তরা।)

শ্যাম শুন শুন, যাও কেন রাখ হে বচন,
তোমার বাঁশীর গান আমি করিব শ্রবণ,

(পর চিতেন।)

কোন্ রন্ধ্রে পূরে ধ্বনি হে, কুলবতীর মন,
কুল সহিতে হে করিলে হরণ॥
কোন্ রন্ধ্রে পূরে ধ্বনি রাধায় কর উদাসিনী,
সাক্ষাতে বাজাও শুনি, আমার মাথা খাও॥ *
শ্যাম তিলেক দাঁড়াও—

গান থামিল;—যমুনা সতৃষ্ণ নয়নে, স্থির দৃষ্টিতে অমূল্যের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অমূল্য বিষণ্ণভাবে বলিলেন,—"কেন যমুনা আমিত কোথাও যাই নাই।' যমুনা তেমনি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া ধীরে ধীরে যেমন সন্ধ্যার সময় মল্লিকা ফুল ফুটে, তেমনই হাসি হাসিল। অমূল্যের স্কন্ধে ধীরে ধীরে দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিল, অস্তগামী সূর্য্যের ছবির মত সেই মুখপ্রভা ধীরে ধীরে মুখেই মিলাইয়া গেল। যমুনা তখনও তেমনই চাহিয়া আছে, কিন্তু সকলই ফুরাইয়াছে।

অমূল্য পত্রখানি বস্ত্রকক্ষে যত্নে রাখিয়া ধীরে ধীরে সেই কেশরাশি মণ্ডিত মস্তক দুর্ব্বাদলে স্থাপন করিলেন। চারিদিকে চাহিতে চাহিতে মৃতসৎকারের চেষ্টায় চলিলেন। তখনও ইংরাজের কামান দূরে গর্জ্জন করিতেছে।

* হরু ঠাকুরের গান।

# নবজীবন।

২য় ভাগ } ফাল্গুন ১২৯২। { ৮ম সংখ্যা।

## ঋগ্বেদের দেবগণ।

### চতুর্থ প্রস্তাব। অগ্নি বায়ু প্রভৃতি দেবগণ।

অগ্নি মনুষ্য সভ্যতার একটি প্রধান সাধন, মনুষ্য সুখের একটি প্রধান উপকরণ, সুতরাং আদিম আর্য্যজাতি সেই অগ্নির আরাধনা করিত। পরে যখন সেই জাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা ভিন্ন ভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিল, তখনও সেই পুরাতন দেবকে সেই পুরাতন নামেই আরাধনা করিতে লাগিল।

কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেন, যে গ্রীসদেশে অগ্নিকে যে যে নামে পূজা করা হইত সে সমস্ত নামই হিন্দুদিগের ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। অগ্নি সকল সময়েই যুবা, কেননা সকল সময়েই নূতন রূপে প্রজ্বলিত হয়েন, এবং এই হেতু ঋগ্বেদে অগ্নিকে সর্ব্বদাই "যবিষ্ঠ" বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। পণ্ডিতগণ মনে করেন গ্রীকদিগের বিশ্বকর্ম্মার Hephaistos নাম এই "যবিষ্ঠ" নামের রূপান্তর মাত্র। এই Hephaistos দেবকে রোমকগণ Vulcan বলিয়া ডাকিত, উপরি উক্ত পণ্ডিতদিগের মতে Vulcan শব্দ—উল্কা শব্দের প্রতিরূপ মাত্র। আবার দুইটি কাষ্ঠ ঘর্ষণ—বা মন্থন করিলে তাহা হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়, এইজন্য অগ্নিকে "প্রমন্থ" বলা যায়। পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন গ্রীকদিগের যে Prometheus দেব স্বর্গ হইতে মনুষ্যদিগের জন্য অগ্নি আনিয়াছিলেন, তাঁহার

নাম এই "প্রমন্থ" নামের রূপান্তর মাত্র। স্বর্গ হইতে অগ্নি আনিবার গল্প যেরূপ গ্রীকদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়, সেইরূপ হিন্দুদিগের ঋগ্বেদেও পাওয়া যায়। মাতরিশ্বা স্বর্গ হইতে ভৃগুবংশীয়দিগের জন্য অগ্নি আনিয়া দিয়াছিলেন; (১ মণ্ডল, ৬০ সূক্ত, ১ ঋক।) পুরাণে মাতরিশ্বা বায়ু; ঋগ্বেদে মাতরিশ্বা বায়ু নহে, মাতরিশ্বা অর্থে—অগ্নি। *

"অগ্নি" নামটিও ইউরোপে পাওয়া যায়। লাটিনগণ অগ্নিকে Ignis কহিত, শ্লাভগণ Ognis কহিত। প্রাচীন ইরাণীয়দিগের মধ্যে অগ্নির বড়ই সম্মান, তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা অহুরো মজ্দের পুত্র, এবং "অতর্" নামে উপাসিত হইতেন। ঋগ্বেদে অগ্নির "নরাশংস" ও "তনূনপাৎ" বলিয়া দুইটি বিশেষ নাম আছে, তাহার মধ্যে প্রথমটির প্রতিরূপ শব্দ "নৈর্য্যোসজ্ঘ" ইরাণীয়দিগের জেন্দ অবস্থায় পাওয়া যায়। যথা,—

"আমরা অহুরো মজ্দের পুত্র অতর্কে যজ্ঞ প্রদান করি। আমরা সকল অগ্নিকে যজ্ঞ প্রদান করি। রাজাদিগের নাভিতে যিনি বাস করেন সেই নৈর্য্যোসজ্ঘকে আমরা যজ্ঞ প্রদান করি।" জেন্দ অবস্থা।

দ্বিতীয় সিরোজা।

অগ্নি না হইলে হিন্দুদিগের যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহ হয় না, এই জন্য ঋগ্বেদে অগ্নিই দেবদিগের যজ্ঞ নির্ব্বাহক পুরোহিত বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, এবং প্রত্যেক মণ্ডলের প্রথম সূক্তগুলি অগ্নির স্তুতি। দেবদিগের যজ্ঞ কার্য্যে অগ্নিতেই হব্য নিক্ষেপ করা হইত, এই জন্য অগ্নিই দেবদিগের হব্যবাহক ও দূত। যজ্ঞ করিলেই ধন পাওয়া যায়, এইজন্য অগ্নিই ধনদাতা, তিনি দ্রবিণোদা। আমরা এখানে ঋগ্বেদ সংহিতার সর্ব্ব প্রথম অংশ টুকু, অর্থাৎ প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তটি উদ্ধৃত করিব।

"অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীপ্তিমান, অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক্ এবং প্রভূত রত্নধারী; আমি অগ্নির স্তুতি করি।

"অগ্নি পূর্ব্ব ঋষিদিগের স্তুতিভাজন ছিলেন, নূতন ঋষিদিগেরও স্তুতিভাজন; তিনি দেবগণকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুন।

"অগ্নি দ্বারা যজমান ধনলাভ করে, সে ধন দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও যশোযুক্ত হয়, এবং তদ্দ্বারা অনেক বীরপুরুষ নিযুক্ত করা যায়।

---

* "তং শুভ্রং অগ্নিং অবসে হবামহে বৈশ্বানরং মাতরিশ্বানং উক্থ্যং।"
৩ মণ্ডল, ২৬ সূক্ত, ২ ঋক্।

"হে অগ্নি! তুমি যে যজ্ঞ চারিদিকে বেষ্টন করিয়া থাক তাহা কেহ হিংসা করিতে পারে না, এবং সে যজ্ঞ দেবগণের নিকট গমন করে।

"অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী, সিদ্ধকর্ম্মা, সত্যপরায়ণ এবং প্রভূত ও বিবিধ কীর্ত্তিযুক্ত; সেই দেব দেবগণের সহিত যজ্ঞে আগমন করুন।

"হে অগ্নি তুমি হব্যদাতা যজমানের যে কল্যাণ সাধন কর, হে অঙ্গিরা! সে কল্যাণ প্রকৃত তোমারই।

"হে অগ্নি আমরা দিন দিন দিবস ও রাত্রিতে মনের সহিত নমস্কার সম্পাদন করত তোমারই সমীপে আসিতেছি।

"তুমি দীপ্যমান্, তুমি যজ্ঞের রক্ষক, যজ্ঞের দীপ্তিকারক, এবং যজ্ঞশালায় বর্দ্ধনশীল।

"পুত্রের নিকট পিতা যেরূপ অনায়াসে অধিগম্য, হে অগ্নি! তুমি আমাদিগের নিকট সেইরূপ হও; আমাদিগের কল্যাণের জন্য নিকটে বাস কর।" ১ মণ্ডল, ১ সূক্ত, ১ হইতে ৯ ঋক্।

পাঠক দেখিবেন, যে, ষষ্ঠ ঋকে অগ্নিকে অঙ্গিরা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। অগ্নিই অঙ্গিরা বংশীয়দিগের পূর্ব্বপুরুষ, অর্থাৎ প্রথম অঙ্গিরা ছিলেন, এরূপ কথা ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে দেখা যায়। আবার অঙ্গিরাগণ প্রথমে অগ্নিকে ধারণ করেন, পরে অন্যান্য লোকে অগ্নির উপাসনায় রত হয়, এরূপ কথাও অনেক স্থানে দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে মাতরিশ্বা স্বর্গ হইতে ভৃগুদিগের জন্য অগ্নিকে আনিয়া দিয়াছিলেন, এবং কোন কোন স্থানে দেখা যায় যে, মাতরিশ্বা মনুর জন্য অগ্নিকে আনিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপ অনেক বিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ভৃগু, মনু, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিবংশীয়গণ ভারতবর্ষের আর্য্যদিগের মধ্যে অগ্নির উপাসনা অনেকটা প্রচার করিয়াছিলেন।

আমরা অগ্নির আর একটি স্তুতি এখানে উদ্ধৃত করিব। সেটি দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রথম সূক্ত হইতে উদ্ধৃত, এবং তাহাতে অগ্নিকেই সর্ব্বদেবাত্মক বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে।

"হে অগ্নি! তুমি সাধুদিগের অভীষ্টবর্ষী, অতএব তুমিই ইন্দ্র, তুমি বিষ্ণু, তুমি বহুলোকের স্তুত্য, তুমি নমস্কার যোগ্য। হে ধনবান্ স্তুতির অধিপতি! তুমিই ব্রহ্মণস্পতি। তুমি বিবিধ পদার্থ সৃষ্টি কর ও বহু প্রকার বুদ্ধিতে অবস্থিতি কর।

"হে অগ্নি! তুমি ধৃতব্রত, অতএব তুমি রাজা বরুণ। তুমি শত্রুদিগের বিনাশক ও স্তুতিযোগ্য, অতএব তুমি মিত্র। তুমি সাধুদিগের পালক, অতএব তুমি অর্য্যমা, তোমার দান সর্ব্বব্যাপী। তুমি অংশ, হে দেব! তুমি আমাদিগের যজ্ঞে ফল দান কর।

"হে অগ্নি! তুমি ত্বষ্টা, তুমি পরিচর্য্যাকারীর বীর্য্যস্বরূপ, স্তুতিবাক্য সকল তোমারই, তোমার তেজঃ হিতকারী, তুমি আমাদিগের বন্ধু, তুমি শীঘ্র উৎসাহিত কর, তুমি আমাদিগকে উত্তম অশ্ববিশিষ্ট ধন প্রদান কর। তোমার ধন প্রভূত, তুমি মনুষ্যগণের বলস্বরূপ।

"হে অগ্নি! তুমি মহৎ আকাশের অসুর রুদ্র, তুমি মরুৎগণের বলস্বরূপ, তুমি অন্নের ঈশ্বর। তুমি সুখের আধার স্বরূপ, তুমি লোহিতবর্ণ বায়ুসদৃশ অশ্বে গমন কর। তুমি পূষা, তুমি আপনিই অনুগ্রহ করিয়া পরিচালক ব্যক্তিদিগকে রক্ষা কর।

"হে অগ্নি! তুমি অলঙ্কারকারী যজমানের পক্ষে দ্রবিনোদা, অর্থাৎ স্বর্ণ-দাতা। তুমি দ্যোতমান্ সবিতা, রত্নের আধার স্বরূপ। হে নৃপতি! তুমি ধনদাতা ভগ। যে যজমান যজ্ঞগৃহে তোমার পরিচর্য্যা করে, তুমি তাহাকে পালন কর।

"হে অগ্নি! লোকে নিজ নিজ গৃহে তোমাকে প্রাপ্ত হয় ও তোমাকে ভূষিত করে। তুমি মনুষ্যগণের পালক, দীপ্তিমান্ এবং আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহসম্পন্ন। তোমার সেনা অতি উত্তম, তুমি সমস্ত হব্যের ঈশ্বর, তুমি সহস্র, শত, ফল দান কর।

"হে অগ্নি! লোকে যজ্ঞদ্বারা তোমাকে তৃপ্ত করে, যেহেতু তুমি পিতা। তোমার সৌভ্রাত্র লাভের জন্য কর্ম্মদ্বারা তোমাকে তৃপ্ত করে, তুমি তাহাদিগের শরীর দীপ্ত করিয়া দাও। যে তোমার পরিচর্য্যা করে তুমি তাহার পুত্র হও। তুমি সখা, শুভকারী ও শত্রুনিবারক হইয়া পালন কর।

"হে অগ্নি! তুমি ঋভু, তুমি প্রত্যক্ষ স্তুতিযোগ্য, তুমি সর্ব্বত্র বিশ্রুত ধন ও অন্নের স্বামী। তুমি অতিশয় উজ্জ্বল, তুমি অন্ধকার ছেদনের জন্য ক্রমে ক্রমে কাষ্ঠাদি দাহ কর। তুমি বিশেষরূপে যজ্ঞ নির্ব্বাহ কর এবং তাহার ফল বিস্তার কর।

"হে দেব অগ্নি! তুমি হব্যদাতার পক্ষে অদিতি। তুমি হোত্রা ভারতী,

তুমি স্তুতিদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও। তুমি শত বৎসরের ইলা. তুমি দান সমর্থ। হে ধনপালক! তুমি বৃত্রহন্তা, তুমি সরস্বতী।

"হে অগ্নি! উত্তমরূপে পোষিত হইলে তুমিই উত্তম অন্ন। তোমাতে স্পৃহনীয় এবং উত্তমবর্ণ ঐশ্বর্য্য অবস্থিতি করে। তুমিই অন্নস্বরূপ, তুমিই তার কর, তুমিই বৃহৎ, তুমি বহুল ও সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ।

হে অগ্নি! আদিত্যগণ তোমাকে মুখ করিয়াছেন ; হে কবি! শুচি দেবগণ তোমাকে জিহ্বা করিয়াছেন। দানকালে সমবেত দেবগণ যজ্ঞে তোমার অপেক্ষা করেন, এবং তোমাতেই আহুতিরূপে প্রদত্ত হব্য ভক্ষণ করেন।" ২ মণ্ডল, ১ সূক্ত, ৩ হইতে ১৩ ঋক্।

বায়ুও আদিম আর্য্যদিগের আরাধ্য দেব ছিলেন, সুতরাং তাঁহার পুরাতন সাধারণ নাম লইয়া সেই আর্য্যজাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা জাতিগণ তাঁহার আরাধনা করিত। গ্রীক ও লাটিনদিগের Pan ও Favonius সংস্কৃত পবন শব্দের প্রতিরূপ, এবং ইরাণীয়দিগের জেন্দ অবস্থায় এই দেব "বায়ু" নামেই উপাসিত হইয়াছেন, এবং বায়ুর সাহায্যে থ্রেতেয়ন অহিকে বিনাশ করেন, এরূপ বিবরণ আছে, যথা—

"থ্রেতেয়ন বায়ুর নিকট একটি বর প্রার্থনা করিয়া বলিলেন হে ঊর্দ্ধ-বিচারী বায়ু! আমাকে এই বর দাও, যেন আমি তিন মুখ ও তিন মস্তক যুক্ত অহি দহককে পরাস্ত করিতে পারি। * *

"ঊর্দ্ধবিচারী বায়ু সৃষ্টিকর্ত্তা অহুরো মজ্দের প্রার্থনা অনুসারে তাঁহাকে সেই বর দিলেন"।

জেন্দ অবস্থা। রাম যাস্ত।

ঋগ্বেদ সংহিতায় বায়ুর বড় অধিক স্তুতি নাই, আমরা একটি উদ্ধৃত করিতেছি।

"হে রমণীয় বায়ু আইস, এই সোমরস সমূহ অভিষুত হইয়াছে। ইহা পান কর, আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ কর।

"হে বায়ু! যজ্ঞাভিজ্ঞ স্তোতাগণ সোমরস অভিষুত করিয়া তোমার উদ্দেশে স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করিয়া স্তব করিতেছে।

"হে বায়ু! তোমার সোমগুণ প্রকাশক বাক্য সোমপানার্থ হব্যদাতা যজমানের নিকট আসিতেছে, অনেকের নিকট আসিতেছে।

১ মণ্ডল, ২ সূক্ত, ১ হইতে ৩ ঋক্।

মন্দ মন্দ বায়ু অপেক্ষা ঝড়ের প্রবল বাত্যা সরল হৃদয় প্রাচীন হিন্দুদিগের অন্তঃকরণ অধিক পরিমাণে আলোড়িত করিয়াছিল, সুতরাং ঋগ্বেদ সংহিতায় বায়ু অপেক্ষা প্রবল মরুৎগণের অধিক স্তুতি দেখিতে পাই। দুই একটি আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।

"দ্যুলোক ও ভূলোকের কম্পনকারী হে নরগণ! তোমাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কে? তোমরা বৃক্ষাগ্রের ন্যায় চারিদিক পরিচালিত করিতেছ।

"হে মরুৎগণ! তোমাদিগের উগ্র ও ভীষণ গতির ভয়ে মনুষ্য গৃহে দৃঢ় স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছে, কেন না তোমাদের গতিতে বহু পর্ব্বযুক্ত গিরিও সঞ্চালিত হইতেছে।

"তাঁহাদিগের গতিতে পদার্থ সমূহ বিক্ষিপ্ত হইতেছে, পৃথিবীও বৃদ্ধ জীর্ণ নরপতির ন্যায় ভয়ে কম্পিত হইতেছে।

১ মণ্ডল, ৩৭ সূক্ত, ৬, ৭, ৮ ঋক্।

"প্রস্রুতস্তনবতী ধেনুর ন্যায় বিদ্যুৎ গর্জ্জন করিতেছে; গাভী যেরূপ বৎসের সেবা করে, বিদ্যুৎ সেইরূপ মরুৎগণের সেবা করিতেছে; মরুৎগণ বৃষ্টি দান করিতেছে।

"উদকধারী মেঘের দ্বারা মরুৎগণ দিবাকালেও অন্ধকার করিতেছেন, পৃথিবী জলসিক্ত করিতেছেন।

"মরুৎগণের গর্জ্জনে সমস্ত পৃথিবীর গৃহাদি কম্পিত হইতেছে, মনুষ্যগণ কম্পিত হইতেছে।

হে মরুৎগণ! তোমাদিগের দৃঢ় হস্তের সহিত বিচিত্র তটশালিনী নদী দিয়া অপ্রতিহত গতিতে গমন কর।

"তোমাদিগের রথের নেমি দৃঢ় হউক, অশ্বগণও দৃঢ় হউক, তোমাদিগের অঙ্গুলি বল্গা-ধারণে সুদীক্ষিত হউক।"

১ মণ্ডল, ৩৮ সূক্ত, ৮ হইতে ১২ ঋক্।

"মরুৎগণের স্বকীয়া পত্নী রোদসী আলুলায়িত কেশে ও অনুরক্ত মনে মরুৎগণকে সেবা করিতেছেন। সূর্য্য যেরূপ অশ্বিদ্বয়ের রথে আরোহণ করিয়াছিলেন, দীপ্তশরীরা রোদসী সেইরূপ চঞ্চল মরুৎদিগের রথে উঠিয়া শীঘ্র আগমন করিতেছেন।

"যজ্ঞ আরম্ভ হইলে তরুণ মরুৎগণ তরুণী রোদসীকে রথে স্থাপিত করিতেছেন। বলশালিনী রোদসী তাঁহাদিগের সহিত সঙ্গতা হইতেছেন।

যজমান মন্ত্র ও হব্য ও সোমাভিষব দান করিয়া মরুৎগণের পরিচর্য্যা করত স্তব করিতেছেন। ১ মণ্ডল, ১৬৭ সূক্ত, ৫ ও ৬ ঋক।

শেষের দুই ঋকে রোদসী মরুৎদিগের স্ত্রী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। রোদসী অর্থে এখানে বিদ্যুৎ, কবি সুন্দর কল্পনা পরবশ হইয়া বিদ্যুৎকে প্রবল ঝড়ের স্ত্রী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আবার অন্যান্য স্থানে রোদসী রুদ্রের স্ত্রী, মরুৎগণের মাতা। "রোদসী রুদ্রস্য পত্নী মরুতাং মাতা"। [সায়ণ, ৫ মণ্ডলের ৫৬ সূক্তের ৮ ঋকের ব্যাখ্যা।] ঋগ্বেদের অনেক স্থানে এইরূপ উদাহারণ পাওয়া যায়, এবং ইহাতে কিছুই বিচিত্রতা নাই। পুরাণের দেবদিগের ন্যায় ঋগ্বেদের দেবদিগের ততটা ব্যক্তিগত পার্থক্য নাই, দেবদিগের পিতা, পুত্র মাতা, ভার্য্যা, দুহিতা ও বংশাবলির বিবরণ ততটা স্থিরীকৃত হয় নাই। সরল স্বভাব উপাসক প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমোহিত হইয়া সেই সৌন্দর্য্যের স্তুতি করিতেছেন, ভক্তি ও কল্পনায় দ্রবীভূত হইয়া আহ্বান করিতেছেন, হৃদয় যে নাম বলিয়া দিতেছে, সেই নাম দিয়া আহ্বান করিতেছেন। ঋগ্বেদের উপাসনার প্রাচীনত্ব ও সরলত্ব ইহা দ্বারাই বিশেষ রূপে প্রতীয়মান হইতেছে।*

ঋগ্বেদের অন্যান্য স্থানে পৃশ্নিই মরুৎদিগের মাতা এবং রুদ্র মরুৎদিগের পিতা। পৃশ্নি অর্থে সায়ণ পৃথিবী করিয়াছেন, কিন্তু যাস্ক আকাশ করিয়াছেন। যাস্কের অর্থ সঙ্গত বোধ হয়, আকাশই ঝড়ের মাতৃস্থানীয়া। রোথ ও লাংলোয়া পৃশ্নি অর্থে মেঘ বিবেচনা করিয়াছেন। মরুৎদিগের পিতা রুদ্র সম্বন্ধে আমরা ইহার পরের প্রস্তাবে লিখিব।

---

* "The mythology of the Veda is to comparative mythology what Sanscrit has been to comparative grammar. ** The whole nature of these so-called gods is still transparent; their first conception in many cases clearly perceptible. There are as yet no genealogies, no settled marriages between gods and goddesses. The father is sometimes the son, the brother is the husband, and she who in one hymn is the mother, is in another the wife. As the conceptions of the poet varied, so varied the nature of these gods. No-where is the wide distance which separates the ancient poems of India from the most ancient literature of Greece so clearly felt than when we compare the growing myths of the Veda with the full grown and decayed myths on which the poetry of Homer is founded. The Veda is the real Theogony of the Aryan races" Max Muller's Comparative Mythology. *Selected Essays, Vol 1. ( 1881 ) p. 381.*

মরুৎগণের বাহন পৃষতী। সে পৃষতী কি? ঐতিহাসিকগণ বলেন, শ্বেত বিন্দুচিহ্নিত মৃগই পৃষতী এবং উহাই মরুৎগণের বাহন। নৈরুক্তগণ বলেন নানা বর্ণ মেঘমালাই পৃষতী। মেঘকে ঝড়ের বাহন বলিয়া বর্ণনা করা অসম্ভব নহে।

আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে দেবদিগের সাধারণ নাম মরুৎ হইয়া গিয়াছে, এবং দেবপতি ইন্দ্রকে "মরুত্তাং পতি" বলিয়া সম্বোধন করা হয়। তাহার উৎপত্তি ঋগ্বেদেই স্পষ্ট দেখা যায়। বৃষ্টিদাতা ইন্দ্র ঝড়ের সহায়তায় বৃষ্টি দান করেন; সুতরাং ঋগ্বেদে একটি কল্পনা আছে যে, ইন্দ্র যখন মেঘরূপ অহিকে হনন করিয়া বৃষ্টি দান করেন, তখন মরুৎগণ, অর্থাৎ ঝড়, তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছিল। অতএব বৃষ্টিদাতা ইন্দ্রকে মরুৎদিগের পতি বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে, এবং অনেক স্থলে ইন্দ্র ও মরুৎগণের একত্র স্তুতি আছে। কিন্তু বোধ হয় এইরূপ একত্র স্তুতি হওয়াতে কোন কোন ঋষি সম্প্রদায়ের পূর্ব্বকালে আপত্তি ছিল; তাঁহারা ইন্দ্রকে অতিশয় বড় মনে করিতেন, এবং মরুৎদিগকে তাঁহার উপযুক্ত সহায় বলিয়া মনে করিতেন না। প্রথম মণ্ডলের ১৬৯ সূক্তে এই ভাব কিছু কিছু লক্ষিত হয়। সেই সূক্তে ইন্দ্র ও মরুৎগণের কথোপকথন আছে, ইন্দ্র একাকীই অহিকে বিনাশ করিয়াছেন, একাকীই উপাসনার পাত্র এইরূপ প্রকাশ করিতেছেন। মরুৎগণ ইন্দ্রের অনেক স্তুতি করিয়া অবশেষে তাঁহার সহিত সঙ্গত হইলেন।

ত্বষ্টা দেবগণের অস্ত্রাদি নির্ম্মাতা, পুরাণের বিশ্বকর্ম্মা। তিনি ইন্দ্রের বজ্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন ও ব্রহ্মণস্পতির পরশু তীক্ষ্ণ করিয়াছিলেন। তিনি গর্ভস্থ সন্তানের রূপ বিধান করেন, সমস্ত জীবের রূপ ব্যক্ত করেন, এবং আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত পদার্থের রূপ বিধান করিয়াছেন, এরূপ বর্ণনা আছে। ত্বষ্টার সৃষ্ট পান পাত্র ঋভুগণ চারিগুণ করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,—তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এবং ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যুর বিবাহ সম্বন্ধে যে আখ্যান আছে তাহাও পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

ইন্দ্র ত্বষ্টাকে পরাজয় করিয়া তাঁহার গৃহে সোমপান করিয়াছিলেন এরূপ বিবরণ আছে। (৩।৪৮।৪ এবং ৪।১৮।৩।) এবং ইন্দ্র ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের তিন মস্তক ছিন্ন করিয়াছিলেন এরূপও আখ্যান আছে। (১০।৮।৯।) এ আখ্যানের উৎপত্তি ও অর্থ বুঝিতে পারি নাই।

ঋগ্বেদে পর্জ্জন্য শব্দ কখন মেঘ অর্থে, এবং কখনও মেঘরূপ বৃষ্টিদাতা দেব অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ১।৩৮।৯ ঋকে আছে যে মরুৎগণ উদক-ধারী পর্জ্জন্য দ্বারা দিবাকালেও অন্ধকার করিয়াছেন। এখানে পর্জ্জন্য অর্থে কেবল মেঘ মাত্র, মেঘরূপ দেব নহে। আবার ৫ মণ্ডলের ৮৩ সূক্তে এবং ৭ মণ্ডলের ১০১ ও ১০২ সূক্তে পর্জ্জন্যকে বৃষ্টিদাতা ও বজ্রধারী দেব বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে। ডাক্তার বূলর ঋগ্বেদের পর্জ্জন্য ও লিথুনীয়দিগের বজ্রদেব পর্কুনকে একই দেব বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন।

সোমরস প্রাচীন আর্য্যদিগের যজ্ঞের একটি প্রধান সাধন, সুতরাং সোমকে প্রাচীন আর্য্যগণ দেব বলিয়া উপাসনা করিত, এবং জেন্দ অবস্থায় হওমার অনেক স্তুতি দৃষ্ট হয়, যথা,—

"আমরা কাঞ্চনবর্ণ ও সুদীর্ঘ হওমাকে যজ্ঞদান করি; আমরা হর্ষদাতা হওমাকে যজ্ঞদান করি; তিনি জগৎকে বৃদ্ধি করিতেছেন। আমরা হওমাকে যজ্ঞদান করি, তিনি মৃত্যুকে দূরে রাখিয়াছেন"। জেন্দ অবস্থা। দ্বিতীয় সিরোজা।

"যে মনুষ্য হওমা পান করিবে সে যুদ্ধে শত্রুদিগকে জয় করিবে"। জেন্দ অবস্থা। বহরাম যাস্ত।

ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে আমরা দেখিতে পাই যে সবিতা আপন দুহিতা সূর্য্যাকে সোম রাজার সহিত বিবাহ দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। আবার ৯।১১৩।৩ ঋকে আছে, যে, সূর্য্যের দুহিতা পর্জ্জন্য কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত সোমকে আনয়ন করেন। ইহার প্রকৃত অর্থ কি ঠিক বুঝিতে পারি নাই। ৯।১।৬ ঋকে আছে। সূর্য্যের দুহিতা পবিশ্রুত সোমকে বিশুদ্ধ করেন। সূর্য্য কিরণে সোমরস মাদকতা প্রাপ্ত হয়, এই কি সূর্য্যার সোমের সহিত বিবাহের উপাখ্যানের প্রকৃত অর্থ?

এক্ষণে আমরা যম সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। পুরাণের যম কে, তাহা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু ঋগ্বেদে প্রথমে কাহাকে "যম" বলিত? বিবস্বানের দ্বারা ত্বষ্ট্-কন্যা সরণ্যুর গর্ভে যম ও তাঁহার ভগিনী যমীর জন্ম হয়, তাহা আমরা অশ্বিদ্বয়ের বিবরণে পূর্ব্বে লিখিয়াছি। বিবস্বান্ অর্থে আকাশ, সরণ্যু অর্থে উষা। আকাশ উষাকে আলিঙ্গন করিলেন, তাঁহাদের পুত্র যম কে? মক্ষমূলর উত্তর করেন দিবস বা সূর্য্যই যম। আখ্যানে আছে, যে, সরণ্যু যমকে রাখিয়া অন্তর্হিত হইলেন;—তাহার

অর্থ উষা অদৃশ্য হইল, দিবস হইয়াছে। আবার আখ্যানে আছে যে বিবস্বান্ দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিলেন;—তাহার অর্থ সায়ংকালের সন্ধ্যা আকাশকে আলিঙ্গন করিল।

এই মত যদি ঠিক হয় তাহা হইলে দিবস বা সূর্য্য এবং রাত্রিকেই প্রথম ঋষিগণ যম ও যমী নাম দিয়াছিলেন। এই মতটি গ্রহণ করিবার পক্ষে আমরা তিনটি প্রধান কারণ দেখিতে পাইতেছি।

(১) যম—বিবস্বান ও সরণ্যু, অর্থাৎ আকাশ ও উষার সন্তান বলিয়া ঋগ্বেদেই বর্ণিত হইয়াছেন। আকাশ ও উষার সন্তান দিবস বা সূর্য্য হওয়াই সম্ভব।

(২) যম শব্দের অর্থই যমক সন্তান। দিবস ও রাত্রিকে যমক সন্তান বলিয়া বর্ণনা করা সম্ভব।

(৩) পুরাণেও যমকে সূর্য্য না বলুক সূর্য্যের সন্তান বলে।

দিবস বা সূর্য্যরূপ যম পুরাণের মৃত্যুরাজ হইলেন কিরূপে? তাহাও অনুমান করা কঠিন নহে। প্রাচীন ঋষিগণ যেরূপ পূর্ব্বদিককে উৎপত্তি স্থল মনে করিতেন, পশ্চিম দিককে সেইরূপ জীবনের অবসান বলিয়া মনে করিতেন। সূর্য্য বা দিবস পূর্ব্বদিকে উদয় হইয়া পশ্চিম দিকে অন্তর্হিত হয়েন, অর্থাৎ জীবনের ভ্রমণ শেষ করিয়া পরলোকের পথ দেখান। এইরূপে যম পরলোকের রাজা, এই অনুভব উদয় হইল। যম পাপাত্মাদিগের শাস্তি দেন, এ কথার উল্লেখ ঋগ্বেদের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না; এ সমস্ত গল্প পৌরাণিক কালে ক্রমে কল্পিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল।

ইরাণীয়দিগের ধর্ম্ম পুস্তক জেন্দ অবস্তায় যমকে "যিম" বলে। বেদে যেরূপ যমের পিতা বিবস্বান্, জেন্দ অবস্তায় যিমের পিতা বিবন্‌হৎ। বেদে যেরূপ পুণ্যাত্মা লোক যমের নিকট স্থান প্রাপ্ত হইয়া সুখে বাস করে, জেন্দ অবস্তায়ও সেইরূপ পুণ্যাত্মা লোক ও উৎকৃষ্ট পশু পক্ষী যিমের সৃষ্ট উৎকৃষ্ট জগতে বাস করিতে পায়। পৌরাণিক যমপুরী ঠিক ইহার বিপরীত,—পাপীদিগের নরক।

পরে ইরাণে এই গল্প আরও বাড়িতে লাগিল, এবং সেই গল্প অবলম্বন করিয়া পারসীক কবি ফের্দৌসী তাঁহার রচিত শাহনামায় যিমকে যমশিদ্ নামে এক জন পরাক্রান্ত সম্রাট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সেই যমশিদ্ যে ঋগ্বেদের যম তাহা অদ্বিতীয় ফরাসী পণ্ডিত বর্ণফ (Burnouf)

প্রথমে আবিষ্কার করেন। তিনিই প্রথমে দেখাইয়া দেন, যে, ফেহ্সীর ঐতিহাসিক যমশিদ্, ফেরুদিন্ ও গশাস্প আর কেহ নহে, জেন্দ অবস্থার যিম, থ্রেতেয়ন, এবং কেরেশাস্প, এবং জেন্দ অবস্থার এই তিন জন আদিম মনুষ্য আর কেহ নহে, ঋগ্বেদের যম, ত্রিত ও কৃশাশ্ব।

১০ মণ্ডলের ১০ সূক্তে যম ও তাঁহার ভগিনী যমীর একটি কথোপকথন আছে। যমী তাঁহার ভ্রাতাকে স্বামী রূপে বরণ করিতে বার বার লালসা প্রকাশ করিতেছেন, এবং যম সে প্রস্তাব পাপজনক বলিয়া তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া ভগিনীকে অন্য স্বামী লাভের আশীর্ব্বাদ দিলেন। ১০ মণ্ডলের ১৪ সূক্তে যমের সম্বন্ধে পরলোকের কথা আছে, আমরা তাহা হইতে এক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। ব্রাহ্মণদিগের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় এই ঋক্ গুলি উচ্চারণ করিতে হয়।

"যে পথ দিয়া আমাদিগের পূর্ব্বে পিতাগণ গিয়াছেন, সেই পুরাতন পথ দিয়া গমন কর, স্বধায় হৃষ্ট উভয় যম ও দেব বরুণ রাজাদ্বয়কে দেখিবে।

"পিতৃদিগের সহিত সঙ্গত হও; যমের সহিত সঙ্গত হও, পরম স্বর্গে যজ্ঞ ফল লাভ কর। দোষ ত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রবেশ কর, দ্যোতমান শরীর ধারণ কর।

"এস্থান হইতে প্রস্থান কর; শীঘ্র প্রস্থান কর, পিতৃগণ তাঁহার জন্য এই লোক প্রস্তুত করিয়াছেন। যম তাঁহাকে দিবস, এবং জল ও আলোক দ্বারা ব্যক্ত একটি আবাস দিয়াছেন।

১০ মণ্ডল, ১৪ সূক্ত, ৭, ৮, ৯ ঋক্।

---

# বিধবা বিবাহ।

এই প্রস্তাবে আমরা বিধবা বিবাহের পক্ষাপক্ষ বিচার করিব; বাধক সাধক উভয় বিধ প্রমাণ আহরণ করিব; অনন্তর তাহার পদ্ধতি বা প্রাচীন প্রণালী কিরূপ ছিল, তাহা বর্ণন করিব।

প্রথমত বিধবা বিবাহের বিপক্ষে বাধক প্রমাণ ও অশাস্ত্রীয়তা বোধক তর্ক যথাযথ রূপে বর্ণিত হইবে; তৎপরে উক্ত বিবাহের সপক্ষে সাধক প্রমাণও শাস্ত্রীয়তা দ্যোতক যুক্তি বর্ণিত হইবে। বিচার দ্বারা পক্ষাপক্ষ ভঙ্গ করিয়া, এক বাক্যতা বা সামঞ্জস্য প্রণালী উন্নয়ন করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন ও মতামত প্রকাশ করা আমাদের অভিপ্রেত নহে; বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান পাঠক বর্ণিত পক্ষ দ্বয় উত্তম রূপে অধ্যয়ন করিয়া স্বস্ব বুদ্ধিবলে সিদ্ধান্ত করিয়া লইবেন।

বিপক্ষে—বাধক প্রমাণ ও যুক্তি এইরূপে উন্নীত করা যাইতে পারে। যথা;

যদিও কোন কোন স্মৃতিবাক্যে ও পুরাণ কথায় বিধবার পুনর্ব্বিবাহের যৎকিঞ্চিৎ সম্পর্ক থাকা অনুভূত হয় বটে,পরন্তু সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে সে সকল আচরণ যোগ্য বা গ্রহণ যোগ্য নহে। বোধ হইবে, যে, বিধবার পুনর্বিবাহ ধর্ম্ম নহে, কোনও কালে উহা সদাচার বলিয়া গৃহীত হয় নাই।

সেই জন্যই প্রধান ঋষি ঐ কার্য্য করণ পক্ষে প্রতিকূল ছিলেন এবং উহার অশাস্ত্রীয়তা ও কদাচারতা দেখাইয়া বচন নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি মনু, যাঁহা অপেক্ষা মান্য, গণ্য আর কেহ নাই, তিনিও বিধবা বিবাহ অবৈদিক, অশাস্ত্রীয় ও সাধু বিগর্হিত বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন। যথা;

"নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ।
ন বিবাহ বিধাবুক্তং বিধবা বেদনং পুনঃ।"

এই মনুবাক্যের ব্যাখ্যায় জানা যায় যে, তাঁহার সময়ে যে কিছু বিবাহ বিধি প্রচারিত ছিল এবং যৎগুলি বিবাহ বোধক বেদ-মন্ত্র বিদ্যমান ছিল, তাহার একটিতেও বিধবা বিবাহ হওয়ার কথা নাই। তাৎপর্য্য এই যে, যখন কোনও শাখায় ও কোনও মন্ত্রে বিধবার বিবাহ হওয়ার কথা নাই, তখন উহা অসদাচার, অশাস্ত্রীয়, ও আর্য্য ব্যবহারের বহির্ভূত।

বিবাহ-বোধক বেদ মন্ত্র গুলি দেখুন, দেখিতে পাইবেন তাহার কোনটিও বিধবা-বিবাহে সঙ্গত হইবে না এবং তাহার প্রত্যেকটির লক্ষ্য কন্যা-বিবাহের দিকে। যথা;

"অর্য্যমণং নু দেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত।
স ইমাং দেবো অর্য্যমা প্রেতো মুঞ্চাতু নামুতঃ।"

এই একটি মন্ত্র। এই মন্ত্রের দ্বারা বধূ ও বর অগ্নিতে লাজা হোম করিয়া থাকে। ইহার অর্থ এই যে, এই কন্যা এক্ষণে অর্য্যমা নামক অগ্নির পূজা বা

ধার্গ করিতেছেন। অগ্নিদেব এই কন্যাকে এ লোক হইতে পরিত্যাগ করুন, পরলোক হইতে পরিত্যক্ত করিবেন না।

বিবাহের সময়ে যে সকল মন্ত্র পড়া হয়, তাহার একটি এই; পরন্তু এটি কন্যা বিবাহের কথাই ব্যক্ত করে; বিধবা বিবাহের কথা বলে না।

"সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্ব্বো বিবিদ উত্তরঃ।
তৃতীয়ো অগ্নিষ্টো পতি স্তুরীয়স্তে মনুষ্যজঃ।"

ইহাও একটি বৈবাহিক মন্ত্র। এই মন্ত্রটি বর কর্তৃক বধূ উদ্দেশে পঠিত হয়। ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ;—

প্রথমত চন্দ্র তোমাকে লাভ করিয়াছিলেন, পরে গন্ধর্ব্ব, তৎপরে অগ্নি তোমার পতি, এক্ষণে মনুষ্যজাত আমিই তোমার পতি।

বিবেচনা করিয়া দেখুন, এমন্ত্রটিও বিধবা বিবাহের বিরোধী।

"সোমো দদদ্গন্ধর্ব্বায় গন্ধর্ব্বো দদদগ্নয়ে।
রয়িঞ্চ পুত্রাংশ্চাদাদগ্নির্মহ্য মথো ইমান্।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যার দ্বারা নিশ্চিত হয় যে, বর সেই কন্যাকে অগ্নির নিকট হইতে লাভ করিলেন, এবং বর সেই অগ্নির পর চতুর্থ পতি। অপিচ, অগ্নি যে বরকে কন্যা দান করিল, যে বরের সহিত বিবাহ সংযোগ করিয়া দিল, সে বর মরিলে অন্য বর আর তাঁহাকে বিবাহ কালে "অগ্নির্মহ্য মথো ইমান্" অগ্নি আমাকে এই কন্যা প্রদান করিলেন, বলিতে পারে না। অতএব, বিধবা গ্রহণে মন্ত্র ও মন্ত্রার্থ অসঙ্গত থাকায় বিধবা-বিবাহ বিবাহ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না; ধর্ম্মোপযোগী হইতে পারে না, তবে কামভোগ চরিতার্থের উপযোগী সংযোগ মাত্র হইতে পারে।

বিবাহ বিষয়ক মন্ত্রের একটিও বিধবা বিবাহে খাটে না, অর্থাৎ সঙ্গত হয় না, সুতরাং বিধবাদের পাণিগ্রহণ অমন্ত্রক ও কামাচার পূর্ব্বক করিতে হয়। কাজে কাজেই তাদৃশী স্ত্রী ধর্ম্মপত্নী মধ্যে গণ্যা নহে; তাদৃশ আচারও ধর্ম্ম আচার নহে। বোধ হয়, তখনকার ভীল, কোল, ও সন্তাল প্রভৃতি অনার্য্য জাতিরা ঐরূপ কামাচার করিত, ধর্ম মর্ম্ম বুঝিত না বলিয়াই করিত। প্যাছে, সেই কদাচার ও কুপ্রবৃত্তি আর্য্য সমাজে প্রবেশ করে, ব্যবস্থাপক মনু সেই আশঙ্কায় বলিয়াছিলেন;

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ কন্যাস্বেব প্রতিষ্ঠিতাঃ।
নাহ কন্যাসু ক্বচিন্নৃনাং লুপ্ত ধর্ম্মক্রিয়াহি তাঃ॥" [মনু, ৮ অধ্যায়।

বিবাহ বোধক মন্ত্র সকল কন্যাতেই প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ কন্যা বিবাহেই সমবেত আছে। যাহার কন্যাত্ব নষ্ট হইয়াছে বিবাহ-ঘটক কর্ম্ম সকল তাহাদের নাই, ইহা নিশ্চিত জানিবে।

এই মনু বচনের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, যে, মনু বিধবা বিবাহকে শাস্ত্রীয় ও সদাচার যুক্ত বলেন নাই। মনু আরও বলিয়াছেন, যে, বিবাহ কর্ম্মের শেষাঙ্গ সপ্তপদী গমন সমাপ্ত হইলেই কন্যার কন্যাত্ব নাশ হয়, হইয়া ভার্য্যাত্ব জন্মে। যথা,—

"পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণম্।
তেষাং নিষ্ঠাতু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে॥"

পাণিগ্রাহক মন্ত্র সকল ভার্য্যাত্ব জন্মায়; পরন্তু সপ্তপদী গমনে তাহার সমাপ্তি হয়, ইহা বিদ্বান্‌গণ জানেন।

মনুর এই কথায় ব্যক্ত হইতেছে, যে, যতক্ষণ না সপ্তপদী গমন সমাপ্ত হয়, ততক্ষণ কন্যাত্ব থাকে, এবং তন্মধ্যে বরের অন্যথাগতি হইলে, কন্যাত্ব থাকা বিধায় কদাচিৎ তাহার পুনর্ব্বিবাহ হইলেও অসদাচার ও অধর্ম্ম হয় না। সপ্তপদী গমনের পর অর্থাৎ বিবাহ সংস্কার সমাপ্ত হইলে, পুনর্ব্বিবাহ অবশ্যই অশাস্ত্রীয় ও অধর্ম্ম, ইহা মনুর অভিপ্রায়। পরাশর ঋষিও এইরূপ বলিয়াছেন। যথা;—

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু কন্যানাং * পতিরন্যো বিধীয়তে॥"

সপ্তপদী গমনের পূর্ব্বে, অর্থাৎ কন্যাত্ব থাকার অবস্থায়, বর যদি দেশান্তর গমন করে, বহুকালেও যদি ফিরিয়া না আইসে ও অস্তিত্ব সংবাদ অজ্ঞাত থাকে, তাহা হইলে তাহা এক বিপদ। এরূপ বিপদ হইলে, অথবা মরণরূপ বিপদ হইলে কিংবা বরের ক্লীবত্ব প্রকাশ হইলে, পাতিত্য ও সন্ন্যাস ঘটনা হইলে, সে কন্যা অন্য পতির আশ্রয় করিতে পারে। †

বিধবা বিবাহের সপক্ষগণও এই বচন দেখিয়া বিধবা বিবাহ ঋষিসম্মত, এইরূপ বলিয়া থাকেন পরন্তু তাঁহারা "কন্যানাং" স্থানে "নারীনাং"

* কোন কোন প্রাচীন পুস্তকে "কন্যানাং" পাঠের পরিবর্ত্তে "নারীনাং" পাঠ থাকায় যে গোলযোগ ঘটিয়াছে, তাহা পরে ব্যক্ত হইবে।

† এখন যেমন বিবাহ রাত্রেই সপ্তপদী গমন সম্পন্ন হইয়া থাকে, পূর্ব্বে সেরূপ হইত না চতুর্থ দিবসে হইত; সুতরাং মধ্যবর্ত্তী তিন দিনে সকল ঘটনাই হইতে পারে, অসম্ভব কিছুই নাই।

পাঠ জানেন। ভাষ্যকার মাধবাচার্য্য "নারীনাং" পাঠ দেখিয়া এক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, পরন্তু নন্দ পণ্ডিত যখন টীকা করেন, তখন তিনি নিজ আদর্শ পুস্তকে "কন্যানাং" পাঠ দেখিয়াছিলেন। বচনের পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিলে "কন্যানাং" পাঠই ঋষি প্রোক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়, "নারীনাং" পাঠ লেখক প্রমাদ বলিয়া অবধারিত হয়। "কন্যানাং" পাঠ ঋষিপ্রোক্ত হইলে উপভুক্তা বিধবার বিবাহ অনাযত্ত হইয়া পড়ে, ইহা ব্যাক্তি মাত্রেরই বুদ্ধিগম্য। বিশেষত পতি মরিলেই যদি পুনঃ পতি গ্রহণ করা ঐ বচনের অভিপ্রায় হয়, তবে বচনস্থ পতির নিরুদ্দেশ, প্রব্রজ্যা, মৈথুনাক্ষমতা, কুষ্ঠাদি রোগ ও অভক্ষ্য ভক্ষনাদি স্থলেও অন্য পতি গ্রহণ করা শাস্ত্র সম্মত ও ঋষির অভিপ্রেত বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু কৈ? এ পর্য্যন্ত কোন সাধু ব্যাক্তি উক্ত বিধ বিপদ দেখিয়া বিধবাদিগকে পুনর্ব্বিবাহিতা করেন নাই। নারীর পতি মারল, অমনি পরাশরের আজ্ঞায় তাহাকে অন্য পতি দেওয়া হইল, এরূপ হইলে, ক্লীব-পতিকা নারীও বলিতে পারে, "আমার পতি ক্লীব * আমাকেও অন্য একটি সক্ষম পতি দাও।" নিরুদ্দিষ্ট-পতিকা ও ব্যাধিগ্রস্ত-পতিকা রমণীও বলিবে, যে, "আমাদিগেরও পরাশরের মতে পুনর্ব্বিবাহ দাও।" উহাদের প্রত্যেকের অনুরোধ রক্ষা করিতে গেলে সংসার পাপস্রোতে ভাসিয়া যাইবে, সন্দেহ নাই। অতএব পরাশরের এমন অসদভিপ্রায় হইতে পারে না, ইহা নিশ্চিত কথা।

এ পর্য্যন্ত নিষেধবাদীর মত বলা হইল, এক্ষণে বৈধবাদীর অভিপ্রায় বর্ণন করা যাউক।

যাঁহারা বলেন, বিধবা বিবাহ শাস্ত্রীয়, অশাস্ত্রীয় নহে, তাঁহারা প্রথমত একটি শ্রুতি প্রমাণ উদ্ধার করিয়া থাকেন। যথা;

"তস্মাদেকস্য বহ্বো জায়া ভবন্তি নৈকস্যৈ বহবঃ সহ পতয়ঃ।"

[ শ্রুতি।

সেই কারণে এক পুরুষের বহু পত্নী হইয়া থাকে, কিন্তু এক নারীর এক কালে বহু পতি হয় না।

---

* ক্লীব অনেক প্রকার। অক্ষম ও অল্পক্ষম উভয়কেই ক্লীব বলা যায়। অনেক অক্লীব পুরুষও বিশেষ বিশেষ নারীর মতে ও জ্ঞানে ক্লীব বলিয়া বিবেচিত হয়। এমত স্থলে উক্ত ব্যবস্থা প্রচলিত হইলে জগতে কি ভয়ঙ্কর উৎপাত উপস্থিত হইতে পারে, ভাবিলে হৃদয়-শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়।

শ্রুতি বলিতেছেন, "এক নারীর বহু সহপতি নিষিদ্ধ" অর্থাৎ এক সময়ে বহুপতি গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। শ্রুতির ঐ কথায় অবশ্যই বুঝা যাইতে পারে, যে, সময় ভেদে বহুপতি গ্রহণ অনিষিদ্ধ অর্থাৎ একটির মরণের পর অন্য একপতি গ্রহণ করা নিষিদ্ধ নহে। এতদ্ভিন্ন দ্রৌপদী বিবাহ কালে যখন এক সময়ে পঞ্চপতি গ্রহণ করার প্রস্তাব হইয়াছিল, যুধিষ্ঠির তখন বলিয়াছিলেন,

"সূক্ষ্মো ধর্ম্মো মহারাজ! নাস্য বিদ্যোগতিং বয়ম্।"

হে মহারাজ! ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ; তাহার গতি আমরা জানিতে পারি না।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এক স্ত্রীর এক কালে বহুপতি হইলে তাহাতে ধর্ম্ম থাকিবে কি না, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। অতএব, যুধিষ্ঠির যখন এক সময়ে বহু পতিত্বের ধর্ম্ম্যতা বিষয়ে সংশয় করিয়াছিলেন, অবশ্যই তখন তাহা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অসংশয়িত হইতে পারে।

পরাশর সংহিতার ভাষ্য লেখক মাধবাচার্য্য আদিত্য পুরাণের একটি বচন উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন * যে, বিবাহিতা নারীর পুনর্ব্বিবাহ কলিকালে নিষিদ্ধ বটে; পরন্তু উহা কলির পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হইত কিন্তু আমরা দেখিতেছি, কলিকালেও বিধবা বিবাহ হইয়াছে এবং তাহাতে কোন নিন্দা হয় নাই।

যুধিষ্ঠির কলির প্রথমে জন্ম গ্রহণ করেন, তাহার ভ্রাতা অর্জ্জুন বিধবা নাগকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তদগর্ভে ইরাবান্ নামে পুত্র হইয়াছিল, সে পুত্র অনিন্দিত হয়, এবং অর্জ্জুন ও তৎকার্য্যে নিন্দনীয় হন নাই। যথা—

"অর্জ্জুনস্য সুতঃ শ্রীমান্ ইরাবান্ নাম বীর্য্যবান্।
স্নুষায়াং নাগরাজস্য জাতঃ পার্থেন ধীমতা॥
ঐরাবতেন সা দত্তা অনপত্যা মহাত্মনা।
পত্যৌহতে সুপর্ণেন কৃপণা দীন-চেতনা॥
ভার্য্যার্থং তাঞ্চ জগ্রাহ পার্থঃ কাম বশানুগাম্।
এব মেষঃ সমুৎপন্নঃ পরক্ষেত্রেঽর্জ্জুনাত্মজ॥
স নাগ লোকে সংবৃদ্ধো মাত্রাচ পরিরক্ষিত॥
পিতৃব্যেন পরিত্যক্তঃ পার্থদ্বেষাদ্দেশাৎ দুরাত্মনা।
রূপবান্ বলসম্পন্নো গুণবান্ সত্য বিক্রমঃ॥

* উঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহো জ্যেষ্ঠাংশং গোবধস্তথা।
কলৌ পঞ্চ ন কুর্ব্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমণ্ডলুম্॥'

ইন্দ্র লোকং জগামাশু শ্রুত্বা তত্রার্জ্জুনংগতম্।
সোঽভিগম্য মহাবাহুঃ পিতরং সত্য বিক্রমঃ॥

ইত্যাদি ভীষ্মপর্ব্ব দেখ।

মহাভারতের এই আখ্যান দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে, কলিকালেও বিধবা-বিবাহ হইত; হইলে তাহাতে নিন্দা হইত না। কলিকালেও বিধবাগণ ধর্ম্ম পত্নী হইতে পারিত; তাহাদের গর্ভজাত সন্তানগণ ঔরসপুত্র বলিয়া মান্য গণ্য হইত, পৌনর্ভব বলিয়া নিন্দিত হইত না। ইহারও প্রমাণ উক্ত আখ্যানের শেষ ভাগে প্রব্যক্ত আছে। যথা ;—

বিমোহিত মিরাবন্তং ন্যহ নং রাক্ষসোঽসিনা।
অজানান্ অর্জ্জুনশ্চাপি নিহতং পুত্র মৌরসম্॥
জঘান সময়ে শক্রূন্ বাজ্ঞস্তান্ ভীষ্ম রক্ষিণঃ॥

এই দেখুন, মহাভারতেও বিধবা নাগ কন্যার গর্ভজাত পুত্রকে ঔরস পুত্র বলা হইয়াছে। অতএব, কলিকালেও বিধবা বিবাহ হইয়াছে, বিধবারাও ধর্ম্ম পত্নী হইয়াছে, তাহাদের গর্ভজাত সন্তানেরা ঔরস পুত্র বলিয়া সম্বোধিত ও সম্মানিত হইয়াছে। হইয়াছে বলিয়াই কলিকালের ধর্ম্মোপদেষ্টা পরাশর মুনিও বলিয়াছেন,

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
পঞ্চ স্বাপৎ সু নারীনাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

পতি নিরুদ্দেশ হইলে, মৃত হইলে, সন্ন্যাসী হইলে, ক্লীব হইলে, পতিত হইলে, নারীদিগের অন্য পতি গ্রহণ করিবার বিধি আছে। *

শ্রী রামদাস সেন।

* নিষেধ-বাদীরা এই সকল কথার অনেক প্রকার খণ্ডন করিয়া থাকেন এবং নষ্টে মৃতে বচনটিকে বাগদত্তাচার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ইহার অন্যতর ব্যাখ্যাতা নন্দ পণ্ডিত বিদ্বন্মনোহরা নাম্নী টীকায় "নারীনাং" পাঠের পরিবর্ত্তে "কন্যানাং" পাঠ ধরিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তদ্ব্যাখ্যানে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, যে, সপ্তপদী গমনের পূর্ব্বে অর্থাৎ কন্যাত্ব নাশের পূর্ব্বে উক্ত পাঁচ প্রকার বিপদ হইলে অন্য পতি গ্রহণ করা তাহাদের পক্ষে বিহিত। সে কথা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে।

# ব্রিটিশ ও বঙ্গীয় চিত্রাবলী।

২। গুইনিবিয়ার (Guinevere) ও শৈবলিনী।

এই চরিত্র দুইটির সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য আমরা ইহাদিগের জীবনের কয়েকটি প্রধান ঘটনা ভাগ করিয়া লইলাম। (ক) প্রসক্তি (খ) পাপ (গ) অনুতাপ (ঘ) প্রায়শ্চিত্ত ও শাস্তি (ঙ) পরিণাম। এই চরিত্র দুইটি সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার আছে, প্রথমে আমরা এই বিভাগানুসারে তাহা বলিব; পরিশেষে মোটের উপর দুই একটি কথা থাকিবে।

(ক) প্রসক্তি—

গুইনিবিয়ার ও শৈবলিনীর প্রসক্তি সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে, ল্যান্সেলট ও প্রতাপকে অবলম্বন করিয়াই তাহা বলিতে হইবে। যাঁহারা আমাদিগের আলোচ্য গ্রন্থদ্বয় পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট ইহার কারণ বলা অনাবশ্যক. কিন্তু একটি কথা এখানে বলিতে হইতেছে—আমরা এই প্রসক্তি অধ্যায়ে তাঁহাদিগের প্রসক্তিই দেখাইব, ন্যায় অন্যায়ের কথা বড় একটা পাড়ব না। সেই জন্য পূর্ব্ব হইতেই আমরা "প্রসক্তি" ও "পাপ" দুইটিকে পৃথক করিয়া লইয়াছি।

শৈবলিনীর প্রসক্তির আরম্ভ চন্দ্রশেখরের উপক্রমণিকায়। মূল আখ্যায়িকার প্রারম্ভেই বঙ্কিম বাবু শৈবলিনী ও প্রতাপকে আমাদিগের চক্ষের সম্মুখে একত্র করিয়া ধরিয়াছেন। "শৈবলিনী তখন ৭।৮ বৎসরের বালিকা—প্রতাপ কিশোর বয়স্ক।"

বালক বালিকারা যেরূপ খেলিয়া থাকে, শৈবলিনী ও প্রতাপ ঠিক সেইরূপই খেলা করিত, আর বালক বালিকার এরূপ ঘনিষ্ঠতায় যে ফল ফলিয়া থাকে, এখানেও তাহাই ফলিল। গ্রন্থকার লিখিলেন "এইরূপে ভালবাসা জন্মিল। প্রণয় বলিতে হয় বল, না বলিতে হয়, না বল। ১৬ বৎসরের নায়ক—আট বৎসরের নায়িকা। বালকের ন্যায় কেহ ভাল বাসিতে জানে না।" শৈবলিনীর বয়স যতই বাড়িতে লাগিল, এ ভালবাসা ততই পরিবর্দ্ধিত হইতে চলিল। শেষে শৈবলিনী বুঝিল যে "প্রতাপ ভিন্ন পৃথিবীতে সুখ নাই।"

বঙ্কিম বাবু এইরূপ করিয়া ধীরে ধীরে দুই এক কথায় প্রতাপের সহিত শৈবলিনীর ভালবাসার উৎপত্তি দেখাইলেন, তাহার কারণ বলিলেন এবং

তৎসম্বন্ধে আরও দুই এক কথা বলিলেন। গুইনিবিয়ারের চিত্রে এরূপ কিছু আমরা দেখিতে পাই না। ব্রিটিশ কবি এইরূপ করিবার কোন আবশ্যকতা মনে করিলেন না। গুইনিবিয়ারের এই প্রসক্তির উৎপত্তি স্থান-সময় বা কারণ আমরা প্রথমে বড় একটা দেখিতে পাই নাই। গুইনিবিয়ার যখন পাপের অনুতাপ করিতে আরম্ভ করিল, তখনই কবি আমাদিগকে সেই কথাটি কৌশল করিয়া বলিয়াছেন।

"And ev'n in saying this,  
Her memory from old habit of the min  
Went slipping back upon the golden days  
In which She saw him first, when Lancelot came,  
Reputed the best knight and goodliest men,  
Ambassador, to lead her to his lord  
Arthur, and led her forth, and far ahead  
Of his and her retinue moving, they  
Rapt it sweet talk or lively, all on love  
And sport and tilts and pleasure &c.  
&c. &c. &c.  
But when the Queen immersed in sneh a trance,  
And moving thro' the past unconciously,  
Came to the point where first she saw the King  
Ride toward her from the city, sigh'd to find  
Her journey done, glanced at him, thought him cold,  
High, self-contained, and passionless, not like him,  
'Not like my Lancelct'—&c. &c.

এই স্থলেই আমরা প্রণয় বৃত্তান্তটি জানিলাম। ইহার কারণ আমরা গুইনিবিয়ারের স্ব-মুখে শুনিয়াছি। গুইনিবিয়ার এক স্থলে এইরূপ বলিয়াছে,—

"Arthur. my lord, Arthur, the faultless king,  
The passionless perfection, my good lord—  
But who can gaze upon the sun in heaven ?  
He never spoke word of reproach to me,  
He never had a glimpse of mine untruth,  
He cares not for me : only here to-day  
There gleam'd a vague suspecion in his eyes :  
Some meddling rogue has tamper'd with him—else  
Rapt in this fancy of his Table Round,  
And swearing men to vows impossible,  
To make them like himself : but, friend, to me  
He is all fault who hath no fault at all :  
For who loves me must have a touch of earth ;  
The love seen makes the colour : &c.———"

এই উক্তিটি পড়িয়া অন্যে কি ভাবিয়া থাকেন, জানিনা, কিন্তু আমরা ইহাতে গুইনিবিয়ারের কিছু নীচত্ব দেখিতে পাই। গুইনিবিয়ারকে লঘুচেতসী করিতে ব্রিটিশ কবির ইচ্ছা ছিল কিনা জানি না, কারণ অন্য কোথায়ও এইরূপ দেখিতে পাই না,কিন্তু আমাদিগের কবি যে কখনও শৈবলিনীকে এইরূপ করিতে চাহেন নাই, নিরাপত্তিতে একথা বলা যাইতে পারে; সুতরাং আমরা তাঁহার শৈবলিনীর আসক্তির কারণ প্রবলরূপে দেখিতে পাই।

শৈবলিনী ও গুইনিবিয়ার উভয়েরই প্রসক্তির প্রগাঢ়তা দেখান কবিদ্বয়ের লক্ষ্য ছিল। ইহার উদ্দেশ্য আমরা পরে বলিব। অবস্থার পার্থক্যবশত এই প্রসক্তি দেখাইবার সুযোগও পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। কোন একটি জিনিসের বল পরীক্ষা করিতে হইলে যেরূপে তাহার বিরুদ্ধে অন্য একটি বল প্রয়োগ আবশ্যক হয়; প্রণয় বল পরীক্ষা করিতেও প্রায় সেইরূপ আবশ্যক। প্রণয় প্রতিরোধী কতকগুলি অবস্থার সংঘর্ষণে আমরা এই বল স্ফুটতর দেখিতে পাই। গুইনিবিয়ারের জীবনে এরূপটি ঘটিয়া উঠে নাই। তাহার প্রেম পরিতৃপ্ত—বিঘ্নশূন্য; সুতরাং এস্থলে তাহা দেখাইতে হইলে অন্য উপায় অবলম্বন আবশ্যক। এখানে মুখে কিছু না বলিয়া কার্য্যের উপরে নির্ভর করা যায় না। তাই টেনিসন ইহা কতক লিখন ভঙ্গি দ্বারা কতক উহাদিগের স্ব-মুখ বহির্গত উক্তি দ্বারা দেখাইয়াছেন।

প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে আমরা এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। কেবল একটি কথা বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিব। গুইনিবিয়ার যখন স্বীয় পাপকার্য্য জন্য অনুতপ্তা, যখন তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত,তখনও আমরা দেখিয়াছি ল্যান্‌সেলট্ তাহার অন্তর হইতে উঠিয়া যায় নাই। অনুতাপ করিতে করিতেও সেই ভূত কথা মনে পড়িল—সেই প্রথম সাক্ষাৎ, সেই প্রণয় সম্ভাষণ, সেই সুখের জীবন, একে একে সব মনে পড়িল। এই স্থলটি আমরা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি।

এ ত গেল অনুতাপের আরম্ভে। শেষেও আমরা ইহা দেখিতে পাই। আর্থর চলিয়া গেলে গুইনিবিয়ার যে অনুতাপসূচক, হৃদয়ভেদী কথাগুলি বলিয়াছিলেন,—তাহাতেও আমরা দেখিতে পাই, তাহার অন্তর সম্যক্‌রূপে ল্যানসেলট্-চিন্তা বিমুক্ত হইতে পারে নাই।

"Tbe shadow of another claves to me,
And makes me one pollution."

ইহা দ্বারা কবি গুইনিবিয়ারের প্রসক্তির প্রগাঢ়ত্ব ও স্থায়িত্ব দেখাইয়া লইয়াছেন।

বঙ্কিম বাবুর এ সম্বন্ধে অনেকটা সুযোগ ছিল। তাঁহার শৈবলিনী ও প্রতাপের মিলন পথে অনেকটা বাধা ছিল। স্বয়ং প্রতাপই তাহার একটি প্রকাণ্ড বিঘ্ন। তাই শৈবলিনীর প্রণয় এত খুলিয়াছে। বিবাহ হইবে না, অবস্থা প্রতিকূল, তাহাতেই তাহাদিগের একদিন ডুবিয়া মরিতে সাধ হইয়াছিল। কিন্তু তখনও শৈবলিনীর প্রণয় পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই, তাই প্রতাপের ন্যায় সে ডুবিতে পারিল না। কিন্তু পূর্ণতা নাই লাভ করুক, অনেকটা বিকাশ হইয়াছিল, ইহা দেখান হইয়াছে। ক্রমে শৈবলিনীর বিবাহ হইল, শৈবলিনী সংসারী হইল কিন্তু তাহার মনে সুখ নাই, শান্তি নাই। সেই প্রতাপ আসিয়া তাহার অন্তরটি যুড়িয়া বসিল। শৈবলিনীর প্রণয়ে মোহ জন্মিল। এইখানে আমরা এ প্রণয়ের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাইলাম। যখন আমরা শৈবলিনীকে ভীমা পুষ্করিণী মধ্যে অত ব্যাপিকা, অত সাহসিনী দেখিতে পাইলাম, তখন আমরা বুঝিতে পারিলাম, যে, শৈবলিনী এখন সে মোহে উন্মত্তা—শৈবলিনীর হৃদয় এখন অশান্তিতে পূর্ণ। যখন আমরা শৈবলিনীকে নির্ব্বিবাদে লরেন্স ফষ্টরের সহিত গমন করিতে দেখিলাম, সুন্দরীর সহিত তাহার কথোপকথন শুনিলাম, তখন আমরা বুঝিতে পারিলাম, শৈবলিনী কেন এত উচ্ছৃঙ্খলা হইয়া পড়িয়াছে। যাহার মনে সুখ শান্তি নাই, তাহার আবার ভবিষ্যৎদৃষ্টি কিসের? তাহার আবার সমাজ-ভয় কিসের? শৈবলিনী একস্থলে বলিয়াছে "পৃথিবীতে আমার ভয় নাই। মৃত্যুর অপেক্ষা বিপদ নাই। যে স্বয়ং অহরহ মৃত্যুর কামনা করে, তাহার কিসের ভয়?" লজ্জা, ভয়, অভিমান যাহাই বল, সবই জীবনের জন্য। যাহার জীবনভার দুর্ব্বিসহ, তাহার ইহাতে ভয় কি? অনেকে শৈবলিনীর চরিত্রে অস্বাভাবিকতা দেখিয়া দোষারোপ করিয়া থাকেন। বঙ্কিম বাবুর প্রতি সমধিক শ্রদ্ধা জন্যই হউক, বা যুক্তিসঙ্গত অন্য কারণেই হউক, আমরা ইহাতে এত দোষ দেখি না। শৈবলিনীর চরিত্র যে ঠিক বাঙ্গালির মেয়ের মত হয় নাই, এ কথা সম্পূর্ণ আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। তবে একটি কথা আছে। শৈবলিনীই বল, আর চন্দ্রশেখরই বল, ঠিক মানুষ গড়া কবির অভিপ্রায় নহে, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই মানবচিত্র কয়েকটি অবলম্বন করিয়া ভারতরাজ্যের কতকগুলি চিত্র বিকাশিত করাই

তাঁহার উদ্দেশ্য। কবি ঐরূপ করিয়া শৈবলিনীকে উচ্ছৃঙ্খলা করিয়া শৈবলিনীর মোহ বা উন্মত্ততা, তাহার যন্ত্রণারাশি, যেরূপ স্ফুটতর করিতে পারিয়াছেন, এরূপ আর কিসে হইত? হৃদয়ে যখন একটি ভাব সমধিক প্রবল হইয়া উঠে, তখন আমরা অন্য সব বিস্মৃত হইয়া কেবল তন্ময় হইয়া পড়ি। তাই আমরা শৈবলিনীকে প্রতাপ মিলনেচ্ছাব বশবর্ত্তী হইয়া স্ত্রীজাতি-সুলভ ভাবগুলি পরিত্যাগ করিতে দেখিয়াছি। এটি ইংরাজি শিক্ষার কুফল বলিয়া কাহাকেও দুঃখিত হইতে হইবে না; অন্য সকল ঠিক থাকিলে, বঙ্কিম বাবুর জন্য সে ভয়টি না করিলেও চলিতে পারে। কথা প্রসঙ্গে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। শৈবলিনীর প্রসক্তির প্রগাঢ়তা দেখাইবার জন্য বঙ্কিম বাবু অনেক করিয়াছেন। তিনি কতক কার্য্য দ্বারা দেখাইয়াছেন, কতক তাহাদিগের কথোপকথন দ্বারা বুঝাইয়াছেন, নিজে বড় একটা বেশি বলেন নাই। শেষ উপায়টি দুইয়েরই প্রায় এক। এ প্রসক্তির গাঢ়ত্ব ও স্থায়ীত্ব দেখাইতে বঙ্কিম বাবুও পরিবর্ত্তিতা শৈবলিনীর মুখ হইতে দুই একটি কথা বাহির করাইয়াছেন। তাই আমরা শেষেও শৈবলিনীকে বলিতে শুনিয়াছি,—

"তুমি (প্রতাপ) থাকিতে আমার সুখ নাই;—যতদিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে, আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিও না। স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার; কত দিন বশে থাকিবে জানি না। এ জন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না।" এখানে যদিও শৈবলিনী ঠিক ইহা বলেন নাই, যে, The shadow of another cleaves to me, তবু ইহাতে এমনই কিছু আছে, যদ্দারা শৈবলিনীর প্রণয়ের প্রগাঢ়ত্ব বেশ খুলিয়াছে। সাধনা-বলে গতি ফিরিয়াছে বটে, কিন্তু শৈবলিনী এত সাধনা করিয়াও এরূপ স্থির হইতে পারে নাই, যে, কোন দিনও সে প্রসক্তি তাহাকে বিচলিত করিতে পারিবে না।

এইরূপে আমরা দেখিলাম যে, শৈবলিনী ও গুইনিবিয়ার উভয়েরই প্রসক্তি প্রগাঢ়, স্থায়ী ও অপরিমেয়। এখন আমরা অন্য কথা বলিব।

(খ) পাপ—

আমরা এখন গুইনিবিয়ার ও শৈবলিনীর পাপের কথা কিছু বলিতে চাহি। উভয় দেশের কবিই এই চরিত্র দুইটিতে এক একটি পাপের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এই পাপের প্রকৃতি ও পরিণাম দেখাইতেই শৈবলিনী

ও গুইনিবিয়ার সৃষ্ট হইয়াছে, এবং ইহা দেখাইতেই "চন্দ্রশেখর" ও "Guinevere" রচিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। আমরা পূর্ব্বে এক স্থলে বলিয়াছি, যে, যাহার ধর্ম্ম ভাব যত উন্নত হইবে, ততই তাহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি বাড়িবে। অন্যে যাহা পাপ বিবেচনা করে না, তাহা তাহার নিকট পাপ বিবেচিত হইবে। ব্রিটিশ কবি টেনিসন সম্যক্ পতিতা গুইনিবিয়ারের চরিত্রে যতটা পাপ কল্পনা করিয়াছেন, আমাদিগের সতীভূমি আর্যদেশের কবি বঙ্কিমচন্দ্র গুইনিবিয়ার হইতে অনেক উচ্চে স্থিতা শৈবলিনীর চরিত্রে তিনি তত পাপ দেখিতে পাইয়াছেন। এখানেও আবার আমরা সেই জড়ভাব ও আধ্যাত্মিক ভাবের পার্থক্য দেখিতে পাই। কথাটি আমরা পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিব।

একই পাপের চিত্র অঙ্কন দুইযেরই উদ্দেশ্য, এবং সেই পাপ যত সূক্ষ্ম করিতে পারা যায়, তজ্জন্য দুই কবিই চেষ্টা করিয়াছেন। পাপ সূক্ষ্ম করা কথাটায় বুঝি কিছু গোল রহিয়া গেল। পাপ সূক্ষ্ম করার অর্থ পাপের কতকগুলি কারণ (extenuating circumstance) দেখান ও পাপের কঠোরতা হ্রাস করা। এইরূপ কারণ আমরা উভয়ের চরিত্রেই দেখিতে পাই। তবে তাহা ঠিক একরূপ নহে। আমরা ক্রমে তাহা দেখাইতেছি।

প্রথমে গুইনিবিয়ারের কথা বলিয়া লই। গুইনিবিয়ার ব্রিটন দেশস্থ কামিনী হইলেও, তাহার বিবাহটি ঠিক তদ্দেশীয় প্রণালীতে হয় নাই। একেবারে যে হয় নাই, তাহা বলিতে পারি না; কারণ প্রাপ্তবয়স্কা গুইনিবিয়ারকে অতি সহজবোধ্য ভাষায় ধর্ম্মমন্দিরে বসিয়া বলিতে শুনিয়াছি,—

'King and my lord, I love thee to the death!

কিন্তু এ বিবাহে গুইনিবিয়ারের পূর্ব্ব সম্মতি গ্রহণ করা হয় নাই। তখনকার বিবাহ কার্য্য এইরূপে হইত বলিয়াই হউক, কিম্বা অন্য কোন কারণেই হউক, আমরা গুইনিবিয়ারকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর্থরকে বিবাহ করিতে দেখিলাম। বলা বাহুল্য, যে, এই বিবাহের পূর্ব্বেই ল্যান্সেলেটের প্রতি তাঁহার অনুরাগ সঞ্জাত হইয়াছিল। ইহা একটি গুরুতর ঘটনা। এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি extenuating circumstacnes আছে; তন্মধ্যে তাহার প্রসক্তির প্রগাঢ়ত্বও একটি। গুইনিবিয়ারের ল্যান্সেলটাসক্তি এত প্রবল করিয়া কবি আমাদিগকে দেখাইয়াছেন, যে, এ পাপ সাধারণ কুপথগামিনী কামিনীদিগের ন্যায় যৌবনচাঞ্চল্যজনিত কিছু নহে, মাত্র

পশুভাব ইহাতে নিহিত নাই, ইহা পাপ হইলেও সাধারণ পাপ হইতে অপেক্ষাকৃত নির্দ্দোষ। গুইনিবিয়ারের বিবাহ যদি আর্থরের সহিত না হইয়া ল্যান্‌সেলটের সহিত হইত, তবে আমরা গুইনিবিয়ারকে একজন অসামান্যা সতী বলিতে পারিতাম। ইহাও কম কথা নহে। এ ছাড়া গুইনিবিয়ারের পাপ সূক্ষ্ম করিতে কবি আরও একটি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। গুই-নিবিয়ারের একটি বই পাপ নাই। এই পাপে পাপী হওয়া ভিন্ন গুইনি-বিয়ার সাধু চরিত্রা। আর্থরের প্রতি তাহার অনুরাগ ছিল না সত্য, কিন্তু আর্থরের মহত্ত্ব তাহার নিকট আদরণীয়। আর্থরের প্রতি তাহার ভক্তি (Regard) অচলা। আর্থরের উন্নত চরিত্রে তাহার কোন সন্দেহ নাই। আর্থর সম্বন্ধে গুইনবিয়ারের প্রত্যেক উক্তিই আমাদিগের এই কথার প্রমাণ।

এখন শৈবলিনীর কথা বলা যাউক। যে সকল Extenuating circumstances আমরা গুইনিবিয়ারের পক্ষে দেখাইয়াছি, শৈবলিনীর পক্ষে তৎসমস্তই আছে। শৈবলিনীর বিবাহও অধিক বয়সে, তাহার মনের সম্মতি না লইয়াই হইয়াছিল। শৈবলিনীরও প্রতাপাসক্তি ঐ রূপই প্রবলা ছিল, এবং শৈবলিনীর তাহার স্বামীর প্রতি বড় ভক্তি ( Regard ) এবং তাঁহার মহত্ত্বে বিশ্বাস ছিল। এ সকলই ছিল এবং ইহা ছাড়াও অনেকগুলি ছিল। প্রতাপের প্রতি শৈবলিনীর প্রসক্তিতে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল—বাল্যাবধি একত্র সহবাস, একত্র ক্রীড়া ইত্যাদি। শৈবলিনী প্রথমে জানিত, যে, প্রতাপের সঙ্গেই তাহার বিবাহ হইবে, সুতরাং প্রতাপকে ভালবাসিতে প্রথমে তাহার কোন পাপ বোধ হয় নাই।*

এখন উভয়ের পাপের প্রকৃতি দেখিতে হইবে। শৈবলিনীর পাপ তাহার মনেই সীমাবদ্ধ—শৈবলিনী মনে মনেই অসতী; কিন্তু গুইনিবিয়ারের পাপ সেরূপ নাই। গুইনিবিয়ার সম্যক্ পতিতা ভ্রষ্টা। সকল কথা জড়া-

---

* গুইনিবিয়ার সম্বন্ধেও এইরূপ একটি কথার আভাস পাওয়া যায়। Murlin একস্থলে Vivienকে বলিয়াছে।

"Sir Lancelot went ambassador, at first,
To fetch her, and she watch'd him from the walls.
A rumour runs, she took him for the king,
So first her fancy on him.' কিন্তু একথা অন্য কোথায় স্পষ্ট দেখিতে না পাইয়া, আমরা গুইনিবিয়ার সম্বন্ধে তাহা বলি নাই।

ইয়া ; ইহা বলা যায়, যে, শৈবলিনীর এখন পাপ এত সূক্ষ্ম, যে, অন্য দেশে ইহা পাপ বলিয়া বিবেচিত না হইতে পারে। গুইনিবিয়ারের পাপ মোটা রকমের। সকল জড়াইয়া তাহার পাপও কিছু হ্রাস করা যায় বটে, কিন্তু তবু তাহা শৈবলিনীর পাপ হইতে অনেক ভারি, অথচ টেনিসনের নিকট গুইনিবিয়ার যেরূপ পাপিষ্ঠা, বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট শৈবলিনী তদ্রূপই পাপিষ্ঠা। এ নৈতিক তত্ত্ব লইয়া অধিক কথা বলিবার স্থান এ নহে। আমরা সংক্ষেপে এতৎ সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবুর কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিয়া এই অধ্যায় সমাপ্ত করিব।

শৈবলিনী এক স্থলে বলিতেছিল,—"অনর্থক কলঙ্ক কিনিলাম, জাতি হারাইলাম, পরকাল নষ্ট করিলাম।" আমাদিগের কবি তখন বলিলেনঃ—

"পাপিষ্ঠা শৈবলিনী এ কথা মনে করিল না, যে, পাপের অনর্থকতা আর সার্থকতা কি? বরং অনর্থকতাই ভাল। কিন্তু একদিন সে এ কথা বুঝিবে; একদিন প্রায়শ্চিত্তের জন্য সে অস্থি পর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইবে। সে আশা না থাকিলে, আমরা এ পাপ চিত্রের অবতারণা করিতাম না।"

(গ) অনুতাপ ;—

সকল বিষয়েরই প্রায় একটা সময় স্থর আছে। অনুতাপেরও তাহাই। যাহারা পাপকার্য্য অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগের সকলেরই যে সকল সময়ে অনুতাপ হইবে এরূপ ভরসা করা যায় না। প্রায়ই আমরা দেখিতে পাই, যে, পাপকার্য্যে যখন আকাঙ্ক্ষা সম্যক্ পরিতৃপ্ত হয়, বা যখন সেই পাপকার্য্য অভীষ্ট ফলোৎপাদক হয় না, অথবা যখন তাহার অনুষ্ঠানে বিশেষ কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তখনই পাপীর হৃদয়ে পাপানুষ্ঠানজনিত কষ্ট অনুভব হইয়া থাকে। গুইনিবিয়ার ও শৈবলিনী উভয়ের পক্ষেই ঠিক এই কথাটি সঙ্গত হইতে পারে। গুইনিবিয়ারের পাপানুষ্ঠান অধিক দিন হইতেই চলিতেছিল, কিন্তু তাহাকে পূর্ব্বে কখন বিশেষ একটা অনুতাপ করিতে দেখি নাই। যে পর্য্যন্ত গুইনিবিয়ারের কলঙ্কের কথা প্রকাশিত হয় নাই, সে পর্য্যন্ত আমরা তাহাকে অব্যথিতচিত্তে অসঙ্কুচিত ভাবে পাপস্রোতে গা ঢালিয়া দিতে দেখিয়াছি। পাপের সহবাসে থাকিয়া কখনও তাহাকে কষ্ট পাইতে দেখি নাই। কিন্তু যখন তাহাদিগের সেই পঙ্কিল প্রণয়-ব্যাপার ধূর্ত্ত মড্রেডের (Modred) দৃষ্টিগোচর হইল, তখন

আর গুইনিবিয়ারকে পূর্ব্বের ন্যায় স্থির ও অসঙ্কুচিতচিত্ত দেখিতে পাইলাম না।

Hence forward rarely could she front in hall,
Or elsewhere, Modred's narrow foxy face,
Heart-hiding smile, and gray persistent eye:
Hence forward too, the Powers that tend the soul,
To help it from the death that cannot die,
And save it even in extremes, began
To vex and plague her. Many a time for hours,
Beside the placid breathings of the King,
In the dead night, grim faces came and went,
Before her, or a vague spiritual fear—
Like to some doubtful noise of creaking doors,
Heard by the watcher in a haunted house,
That keeps the rust of murder on the walls—
Held her awake: or if she slept, she dream'd
An awful dream, for then she seem'd to stand
On some vast plain before a setting sun
And from the sun there swiftly made at her
A ghastly something, and its shadow flew,
Before it, till it touch'd her, and she turn'd—
When lo! her own, that broadening from her feet,
And blackening, swallow'd all the land, and in it,
Far cities burnt, and with a cry she woke.
And all this trouble did not pass but grew;
Till ev'n the clear face of the guileless King,
And trustful courtesies of household life,
Became her bane:—

গুইনিবিয়ারের পাপের শাস্তি আরম্ভ হইল—গুইনিবিয়ারের অন্তরে অন্তরে অনুতাপের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। পাপপথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে তাহার ইচ্ছা জন্মিল। কিন্তু প্রলোভনের বস্তু ঐরূপ নিকটে রাখিয়া তাহার আকর্ষণ অবহেলা করিতে তাহার সাধ্য ছিল না। কোন বিষয়ে আসক্তি জন্মিলে তাহা পরিত্যাগ করা সহজ কথা নহে। তাই গুইনিবিয়ার ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে ল্যান্সেলট্‌কে বলিলেন;—

"O Lancelot, get thee hence to thine own land,
For if thou tarry we shall meet again,

And if we meet again, some evil chance,
Will make the smouldering scandal break and blaze,
Before the people, and our lord the King,

কিন্তু এইরূপ অবস্থায় যাহা ঘটিয়া থাকে তাহাই হইল ;—

— Lancelot ever promised, but remain'd,
And still they met and met.

কিন্তু গুইনিবিয়ারের চিত্তে যে আগুন জ্বলিয়াছে, অত সহজে তাহা নির্ব্বাপিত হইবে কেন ?

" ———Again she said,
" O Lancelot, if thou love me get thee hence."

পরিশেষে বিদায়ের দিন অবধারিত হইল। আবার মড্রেড আসিয়া বিঘ্নস্বরূপ দাঁড়াইল। তখন গুইনিবিয়ার ল্যান্সেল্টকে বলিলেন,

" ———The end is come
And I am shamed for ever"

ল্যান্সেলট গুইনিবিয়ারকে লইয়া দেশে যাইতে চাহিলেন, কিন্তু গুইনিবিয়ার এখন আর তাহাতে সম্মতি দিতে পারিল না। এখন তাহার মনে অনুতাপানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, ধর্ম্মের ঈষৎ আলোকে তাহার পাপের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাই সে প্রাণপ্রতিমা ল্যান্সেলটের অমন প্রেমপূর্ণ কথায়ও সম্মতি দিতে পারিল না। গুইনিবিয়ার যখন সস্নেহে ল্যান্সেল্টকে সম্বোধন করিয়া বলিল,

"———Lancelot, will thou hold me so ?
Nay, friend, for we have taken our farewells.
Would God that thou couldst hide me from myself,
Mine be the shame, for I was wife, and thou
Unwedded : yet rise now, and let us fly,
For I will draw me into sanctuary,
And bide my doom,

গুইনিবিয়ারের এই কথাটিতে যেমন একদিকে ল্যান্সেলটের প্রতি তাহার প্রীতি খুলিয়াছে, অন্যদিকে তাহার অনুতপ্ত হৃদয় খানিও তেমন প্রকাশিত হইয়াছে। গুইনিবিয়ার ল্যান্সেলটের নিকট জন্মের তরে বিদায় গ্রহণ করিয়া Almesburyর ধর্ম্ম মন্দিরে গমন করিল। পাপের সংস্পর্শ অনেকটা ছাড়িয়া আসিল। গুইনিবিয়ারের অন্তঃকরণে বড়ই যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল।

And in herself she moan'd—too late—too late.

গুইনিবিয়ারের পাপবোধ ও তজ্জনিত অনুতাপ এইরূপে জন্মিল।

শৈবলিনীর চরিত্র বিশ্লেষণ করিলেও আমরা ঠিক ইহাই দেখিতে পাইব। শৈবলিনীর হৃদয়খানি প্রতাপে ভরা—প্রতাপের জন্য তাহার আকাঙ্ক্ষা দুর্নিবার্য্য। প্রতাপ-প্রাপ্তিপথে সে কোন বিঘ্নকেই বিঘ্ন জ্ঞান করে নাই;—প্রতাপকে পাইবার জন্য সে স্ত্রীজনোচিত লজ্জা, ভয়, প্রভৃতি সকলি পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছে। এ পথে এ পর্য্যন্ত কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে নাই। কিন্তু শতসহস্র বিঘ্ন পায়ে ঠেলিয়াও সে যখন প্রতাপের নিকট শুনিল যে তাহার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইবার নহে। যখন এইরূপ একটি অনতিক্রমণীয়া বাধা আসিয়া তাহার সম্মুখে পড়িল, তখন আর তাহার পূর্ব্বের আত্ম বিস্মৃতি রহিল না। ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া অনুতাপের আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

"শৈবলিনী আপনার কপালে করাঘাত করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। বেদগ্রামের সেই গৃহ মনে পড়িল। যেখানে প্রাচীর পার্শ্বে শৈবলিনী স্বহস্তে করবীর বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল,—সেই করবীর সর্ব্বোচ্চ শাখা প্রাচীর অতিক্রম করিয়া রক্তপুষ্প ধারণ করিয়া নীলাকাশকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া দুলিত, কখন তাহাতে ভ্রমর বা ক্ষুদ্র পক্ষী আসিয়া বসিত, তাহা মনে পড়িল। শৈবলিনী কাঁদিতে লাগিল। একমুহূর্ত্তও বাঁচিয়া থাকিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। আত্মহত্যার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। শৈবলিনী ভাবিল "মরি ত বেদগ্রামে গিয়া মরিব। সুন্দরীকে বলিব, যে, আমার জাতি নাই, কুল নাই, কিন্তু এক পাপে আমি পাপিষ্ঠা নহি। তার পর মরিব।—আর তিনি—যিনি আমার স্বামী—তাঁহাকে কি বলিয়া মরিব? কথা ত মনে করিতে পারি না। মনে করিলে বোধ হয়, আমাকে শত সহস্র বৃশ্চিকে দংশন করে—শিরায় শিরায় আগুন জ্বলে। আমি তাঁহার যোগ্যা নহি, বলিয়া আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তাতে কি তাঁর কোন ক্লেশ হইয়াছে? তিনি কি দুঃখ করিয়াছেন? না—আমি তাঁহার কেহ নহি। পুঁথিই তাঁহার সব। তিনি আমার জন্য দুঃখ করিবেন না। একবার নিতান্ত সাধ হয়, সেই কথাটি কেহ আসিয়া বলে—তিনি কেমন আছেন, কি করিতেছেন তাঁহাকে আমি কখন ভালবাসি নাই, কখন ভাল বাসিতে পারিব না—তথাপি তাঁহার মনে যদি কোন ক্লেশ দিয়া

থাকি, তবে আমার পাপের ভরা আরও ভারি হইল। আর একটি কথা তাঁহাকে বলিতে সাধ করে,—কিন্তু কষ্টর মরিয়া গিয়াছে, সে কথার আর সাক্ষী কে! আমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে?" শৈবলিনীর অনুতাপের প্রথম অধ্যায় এইরূপে আরম্ভ হইল। আশাপথে বিঘ্ন ঘটিল বলিয়া শৈবলিনীর এই বোধ টুকু হইল। কিন্তু এখনও শৈবলিনীকে আমরা গুইনিবিয়ারের ন্যায় মিলনেচ্ছা অনুতপ্তা দেখিতে পাই না এখনও প্রতাপের সহিত তাহার সম্যক্ দূরীভূত হয় নাই। তাই যখন আমরা দেখিলাম গঙ্গাবক্ষে এ ক্ষীণ আশাটিও তাহাকে বিদূরিত করিতে হইল, তখন আমরা শৈবলিনীকে আত্মবোধ সম্পন্না দেখিতে পাইলাম। তখন হইতে শৈবলিনী মনকে দমন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল—তখন হইতে পাপেচ্ছা তাহাকে ছাড়িয়া চলিল। যে ভয়ে গুইনিবিয়ার ল্যান্সেলটের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল; ঠিক সেই কারণেই শৈবলিনী প্রতাপের নিকট হইতে পলায়ন করিল। "যে ভাবে দহ্যমান অরণ্য হইতে অরণ্য চর জীব পলায়ন করে, শৈবলিনী সেই ভয়ে প্রতাপের সংসর্গ হইতে পলায়ন করিয়াছিল। প্রাণ-ভয়ে শৈবলিনী, সুখ সৌন্দর্য্য প্রণয়াদি পরিপূর্ণ সংসার হইতে পলাইল। সুখ সৌন্দর্য্য প্রণয়, প্রতাপ, এ সকলে শৈবলিনীর আর অধিকার নাই—আশা নাই—আকাঙ্ক্ষা পরিহার্য্য নিকটে থাকিলে, কে আকাঙ্ক্ষা পরিহার করিতে পরে? মরুভূমে থাকিলে কোন্ তৃষিত পথিক, সুশীতল স্বচ্ছ সুবাসিত বারি দেখিয়া পান না করিয়া থাকিতে পারে?"

এক্ষণে আমরা বলিতে পারি, যে, পাপবোধ দুজনের প্রায় একই কারণে উৎপত্তি হইল এবং তাহার প্রকৃতিও প্রায় একইরূপ।

(খ) শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্ত।

শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্তের কার্য্য প্রায়ই এক—তবে আপনা হইতে বা দৈব হইতে আগত কষ্টকে আমরা শাস্তি বলি, ও স্বেচ্ছা পূর্ব্বক গৃহীত কষ্টকে আমরা প্রায়শ্চিত্ত বলি। গুইনিবিয়ারের এ দুইটি বেগ পৃথক্‌ভাবে বিভক্ত করা যায়, কিন্তু শৈবলিনীর চরিত্রে ইহা সমভাবে জড়িত। আর্থরের সহিত শেষ সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত গুইনিবিয়ারকে যে সকল কষ্ট পাইতে হইয়াছিল; আমরা তাহাই তাহার শাস্তি মনে করি। কিরূপে অতি সাধারণ কথা শুনিয়াও তাহার পাপমান (guilty conscience) পীড়িত হইত, তাহার Almsbury মন্দিরে তাহার কথা ও কার্য্যতেই সুস্পষ্ট রহিয়াছে। প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে

এস্থলে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম না। প্রায়শ্চিত্তকে এক প্রকার চিকিৎসা বলা যাইতে পারে। গুইনিবিয়ার ও শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত এক প্রকার তাহাদিগের বিকৃত মনোভাবের চিকিৎসা বলা যায়। এই চিকিৎসাটি কিন্তু একরকমে হয় নাই। এখানেও ঠিক সেই ডাক্তারি ও কবিরাজি মত দেখিতে পাই। গুইনিবিয়ারের চিকিৎসায় অতি শীঘ্র ফল দর্শিল। সে চিকিৎসা আর কিছুই নহে, পুণ্যের সংস্পর্শ। শৈবলিনীর পক্ষে কিন্তু এরূপ চিকিৎসা কার্য্যকরী হইবার নহে, তাহার রোগ অপেক্ষাকৃত কিছু জটিল প্রকৃতি; রগুইনিবিয়ারের আকাঙ্ক্ষা অনেকটা পরিতৃপ্তা, কাজেই তাহার চিকিৎসা অতি সহজেই হইল, পুণ্যের সংস্পর্শ মাত্রেই তাহার বিকৃতভাব দূর হইল—অপবিত্রাকাঙ্ক্ষা নিবারিত হইল। কিন্তু শৈবলিনীর আকাঙ্ক্ষা অপরিতৃপ্ত, সুতরাং তাহার মনোভাব অধিকতর বিকৃত ভাবাপন্না। আমাদের বঙ্গীয় কবির চিকিৎসা প্রকরণ দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি—শত সহস্রবার প্রাণ খুলিয়া তাঁহাকে ভক্তি উপহার দিয়াছি। চন্দ্র শেখরের "প্রায়শ্চিত্ত" খণ্ড একটি অপূর্ব্ব জিনিস। দুই এক কথায় তাহা কি বুঝাইব? তাহা বুঝানও দুষ্কর। গ্রন্থকার একস্থলে লিখিয়াছেন, "যে, বলিয়াছিল এইরূপে স্বামিধ্যান কর, সে অনন্ত মানব হৃদয় সমুদ্রের কাণ্ডারী—সবজানে আমারাও বলি যাঁহার মস্তিষ্ক হইতে ইহা বাহির হইয়াছে, তিনি মনোবিজ্ঞানে সম্যক্ অভিজ্ঞ, একজন উচ্চশ্রেণীর কবি। আধ্যাত্মিক উন্নতি যে দেশে একদিন চরম সীমায় উঠিয়াছিল, সেই আর্য্য দেশেই এইরূপ কল্পনা সম্ভবে। ইহার অধিক আর কি বলিব?

(ঙ) পরিণামঃ—

প্রায়শ্চিত্তে উভয়েরই ঠিক এক ফলই ফলিল। উভয়ের মনেই স্বামীর মহত্ব দৃঢ় অঙ্কিত হইল, উভয়েই স্বামীকে ভাল বাসিতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে উভয়েই এক সিদ্ধান্তে উপনীত। যখন আর্থর তাঁহার ঔদার্য্য ময়ী বাক্যাবলী পরিসমাপ্ত করিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হইলেন, গুইনিবিয়ারের রোগ সারিল। সে উদারতা, সে গভীর স্নেহভাব দেখিয়া গুইনিবিয়ারের মনো বিকৃতি লোপ পাইল। পুণ্যের সংস্পর্শে পাপ ভস্ম হইয়া গেল।

একদিন আমরা শৈবলিনীকে বলিতে শুনিয়াছি, "কে তুমি? প্রতাপ?

না, কোন দেবতা ছলনা করিতে আসিয়াছ? "আবার, "তুমি কি ফিরিয়াছ? কেন তুমি, তোমার এই অতুল্য দেবমূর্ত্তি লইয়া আবার আমায় দেখা দিয়াছিলে? আমার স্ফুটনোন্মুখ যৌবন কালে ও রূপের জ্যোতিঃ কেন আমার সম্মুখে জ্বালিয়াছিলে তুমি কি জান না; তোমারই রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অ হইয়াছিল।—"সেই শৈবলিনীকেই আবার আমরা আর একদিন অন্যরূপ দেখিতে পাই। অবসন্ন মনে একাগ্রচিত্তে স্বামীর ধ্যান করিতে করিতে শৈবলিনীর চিত্ত বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া উঠিল।

"বিকৃতি? না দিব্য চক্ষু? শৈবলিনী দেখিল—অন্তরের ভিতর অন্তর হইতে দিব্য চক্ষু চাহিয়া, শৈবলিনী দেখিল, এ—কিরূপ! এই শাল তরু নিন্দিত, সুভুজ বিশিষ্ট, সুন্দর গঠন, সুকুমারে বলময়, এ দেহ যে রূপের শিখর। এই যে ললাট—প্রশস্ত, চন্দন চর্চ্চিত, চিন্তারেখা বিশিষ্ট—এ যে সরস্বতীর শয্যা, ইন্দ্রের রণভূমি, মদনের সুখকুঞ্জ, লক্ষ্মীর সিংহাসন! ইহার কাছে প্রতাপ? ছি! ছি! সমুদ্রের কাছে গঙ্গা। এই যে নয়ন জ্বলিতেছে, হাসিতেছে, ফিরিতেছে, ভাসিতেছে—আঁখি বিস্ফারিত, তীব্রজ্যোতিঃ স্থির, স্নেহময়, করুণাময়, সং রঙ্গপ্রিয়, সর্ব্বত্র তত্ত্ব জিজ্ঞাসু—ইহার কাছে কি প্রতাপের চক্ষু? কেন আমি ভুলিলাম—কেন মজিলাম—কেন মরিলাম! এই যে সুন্দর সুকুমার বলিষ্ঠ দেহ—নব পত্র শোভিত শাল তরু—মাধবীজড়িত দেবদারু, কুসুম পরিব্যাপ্ত পর্ব্বত; অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য অর্দ্ধেক শক্তি—আধ চন্দ্র আধ ভানু—আধ গৌরী আধ শঙ্কর—আধ রাধা আধ শ্যাম—আধ আশা আধ ভয়—আধ জ্যোতিঃ আধ ছায়া—আধ বহ্নি আধ ধূম—কিসের প্রতাপ? কেন না দেখিলাম—কেন মজিলাম—কেন মরিলাম। সেই যে ভাষা—পরিষ্কৃত পরিস্ফুট, হাস্যপ্রদীপ্ত, ব্যঙ্গ রঞ্জিত, স্নেহ পরিপ্লুত, মৃদু, মধুর, পরিশুদ্ধ—কিসের প্রতাপ? কেন মজিলাম—কেন মরিলাম—কেন কুল হারাইলাম? সেই যে হাসি—ঐ পুষ্পপত্রস্থিত মল্লিকা রাশিতুল্য, মেঘ মণ্ডলে বিদ্যুত্তুল্য, দুর্ব্বৎসরে দুর্গোৎসব তুল্য, আমার সুখস্বপ্নতুল্য—কেন দেখিলাম না, কেন মজিলাম, কেন মরিলাম, কেন বুঝিলাম না? সেই যে ভালবাসা সমুদ্রতুল্য—অপার, অপরিমেয়, অতলস্পর্শ, আপনার বলে আপনি চঞ্চল—প্রশান্ত ভাবে স্থির গম্ভীর, মাধুর্য্যময়—চাঞ্চল্যে কূলপ্লাবী, তরঙ্গভঙ্গ ভীষণ, অগম্য, অজ্ঞেয়

ভয়ঙ্কর—কেন বুঝিলাম না, কেন হৃদয়ে তুলিলাম না—কেন আপনা খাইয়া প্রাণ দিলাম না। কে আমি? তাঁহার কি যোগ্যা—বালিকা, অজ্ঞান,—অনক্ষর, অসৎ, তাঁহার মহিমাজ্ঞানে অশক্ত, তাঁহার কাছে আমি কে? সমুদ্রে শম্বূক, কুসুমে কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক, চরণে রেণু কণা—তাঁর কাছে আমি কে? জীবনে কুস্বপ্ন, হৃদয়ে বিস্মৃতি, সুখে বিঘ্ন, আশায় অবিশ্বাস—তাঁর কাছে আমি কে? সরোবরে কর্দ্দম, মৃণালে কণ্টক, পবনে ধূলি, অনলে পতঙ্গ। আমি মজিলাম,—মরিলাম না কেন?''

শৈবলিনী ও গুইনিবিয়ার উভয়েরই প্রায়শ্চিত্তের এক ফল ফলিল। ইহারা পূর্ব্বে ইহাদিগের স্বামীতে যাহা অভাব ছিল বলিয়া বোধ করিত, ঠিক তাহাই এখন আবার সমধিক প্রবল দেখিতে পাইল।

পরিণাম সম্বন্ধে আর এক কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। শৈবলিনীর মনের পাপ মনের প্রায়শ্চিত্তেই শুধরাইয়া গেল, আর গুইনিবিয়ারের পাপ কার্য্যত, সুতরাং তাহার প্রায়শ্চিত্ত ঠিক এক রূপ হইল না। তাই চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে গ্রহণ করিলেন—গুইনিবিয়াব ইহকালে, পুনর্গৃহীতা হইতে পারিল না। এখানে আমরা টেনিসনের আধ্যাত্মিক ভাবেব কিছু উৎকর্ষ পূর্ব্বের তুলনায় দেখিতে পাই। গুইনিবিয়ার পরকালে পুনর্ম্মিলনের আশা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে রহিল।

এখন আমরা মোটের উপর গোটাকতক কথা বলিতে চাহি। টেনিসন ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েই এক লক্ষ্য করিয়া চরিত্র দুইটি সৃজন করিয়াছেন, তাই আমরা দুই চরিত্র প্রায় একরূপ দেখিতে পাই। উভয়েরই যেন এ সম্বন্ধে নীতিও এক। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের পথ রোধ কর—ইন্দ্রিয় বিলুপ্ত কর—মনের শক্তি অপহৃত কর—মন কি করিবে? সেই এক পথে যাইবে—তাহাতে স্থির হইবে—তাহাতে মজিবে।'' এই কারণেই, যে শৈবলিনীকে আমরা এক দিন বলিতে শুনিয়াছি "তাঁহাকে (চন্দ্রশেখরকে) আমি কখন ভাল বাসি নাই—কখন ভাল বাসিতে পারিবনা—''সেই শৈবলিনীকে আবার গ্রন্থকার চন্দ্রশেখরকে ভাল বাসাইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তিনি মুক্তকণ্ঠে লিখিয়াছেন "শৈবলিনীর চিত্তে চির প্রবাহি নদী ফিরিল, পাহাড় ভাঙ্গিল, সমুদ্র শোষিল, বায়ু তাড়িত হইল। শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলিয়া চন্দ্রশেখরকে ভাল বাসিল।'' আর্য্যকবি দেখাইয়া গেলেন যে, ভালবাসা সাধনাব ফলে সর্ব্বত্রই বিস্তারিত হইতে পারে।

মনের উপর এ সম্বন্ধে আমাদিগের প্রভূত প্রভুত্ব আছে। আর ইহা তিনি দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়াই শৈবলিনীকে পাপিষ্ঠা বলিতে পারিয়াছেন। শৈবলিনী কেন আগে এ সাধনা করে নাই—এই তাঁহার পাপ। টেনিসন যদিও খুব স্পষ্টরূপে এ সত্য বাহির করেন নাই, কিন্তু সত্যটি তাঁহার চিত্রে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। আমাদিগের বোধ হয় যে, যাহারা বর্ত্তমান শতাব্দীর বাহিরের কার্য্য প্রণালীর নিন্দা করিয়া, বহিঃস্থ সমাজের দোষ দিয়া, এই সকল পাপ কার্য্য ব্যাখ্যা করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে তিনি শিখাইয়াছেন, যে, ইহা বাহিরের তত দোষ নয়, যত দোষ অন্তরের—সমাজের তত দোষ নয়, যত দোষ ব্যক্তি বিশেষের। তোমরা সমাজের নিন্দা করিয়া, হিন্দু বিবাহ প্রণালীর নিন্দা করিয়া, শৈবলিনীকে সমর্থন করিতে পারিবে না, কারণ গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন, যে, শৈবলিনীর আধ্যাত্মিক ঔৎকর্ষ থাকিলে সকল গোলই মিটিতে পারিত।

গুইনিবিয়ার ও শৈবলিনীর উভয়ের চরিত্রই যে পরস্পর সদৃশ তাহার কারণ এই যে, উভয়েরই চরিত্রেই চরিত্র-নির্ম্মাতাদ্বয়ের লক্ষ্য এক—এ সম্বন্ধে উভয় দেশেরই আদর্শও প্রায় এক। আদর্শ পুরুষ চরিত্র লইয়া যেরূপ দুই দেশে মতভেদ আছে, আদর্শ স্ত্রী চরিত্র লইয়া তত মতভেদ নাই। আবার এই সাদৃশ্যই আমরা উভয়েরই সমুচিত প্রশংসা মনে করি—এবং ইহাই আমরা তাঁহাদিগের কাব্যস্থিত সত্যের যথেষ্ট প্রমাণ বলিয়া মনে করি। আবার সাদৃশ্যের যেরূপ কারণ দেখা যায়, যে টুকু পার্থক্য রহিয়াছে, তাহারও কারণ সেইরূপ পরিষ্কার। আমরা টেনিসনের এই চিত্রগুলি মধ্যে স্ফুটতা বড় অধিক দেখিতে পাই। মহত্বই হউক, বা, ক্ষুদ্রত্বই হউক, তাহা তাঁহার চরিত্রগুলিতে সর্ব্বদাই উজ্জ্বল ভাবে পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহার আর্থর, তাঁহার গুইনিবিয়ারকে দেখিলেই তাহাদিগের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত পরিলক্ষিত হয়—কিন্তু বঙ্কিম বাবুর চিত্রগুলি সেরূপ নহে। প্রথম দৃষ্টিতে তাহার বাহিরের রঙগুলিই খুলিবে; ভিতরের কিছুই দেখিতে পাইবে না। তাঁহার চন্দ্রশেখরের মহত্ব আর্থরের মহত্বের ন্যায় পরিস্ফুট নহে, তাঁহার শৈবলিনীর চরিত্র গুইনিবিয়ারের চরিত্রাপেক্ষা অনেক জটিল। টেনিসনের চিত্র সহজবোধ্য, পরিষ্কার; আর বঙ্কিম বাবুর চিত্র বুঝিতে কিছু চিন্তা আবশ্যক, গভীরতাই যেন তাহার সৌন্দর্য্য।

# কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন।

যে প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোকের অমৃতনিস্যন্দি ভক্তি-রসামৃত-সিঞ্চিত শক্তি-বিষয়ক সঙ্গীত নিচয় বঙ্গের প্রতি নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, ধনীর বিচিত্র অট্টালিকা হইতে দরিদ্রের সামান্য পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত প্রত্যেক হিন্দু গৃহে অনুদিন প্রতিধ্বনিত হইতেছে;—যাঁহার ভাবপূর্ণ হৃদয় স্পর্শি গীত প্রভাবে ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক, সাধু অসাধু, সকল শ্রেণীর লোকের শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে, ভক্তির অনির্ব্বচনীয় ভুবন ভুলান ভাব সঞ্চারিত করিতেছে; সেই সাধুরঞ্জন স্বর্গীয় মহাত্মা কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে কয়েকটি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিবার জন্যই অদ্য আমরা তন্নামশীর্ষক এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবটি লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। রামপ্রসাদ সেনের সঙ্গীতাবলী সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিতেও অনেকেই প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সাধনার বিষয় এ পর্য্যন্ত কেহই নিরপেক্ষভাবে সাম্প্রদায়িকতা-বিহীন হইয়া সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন নাই, বরং কোন কোন জীবনাখ্যায়ক তাঁহাকে তিনি যাহা ছিলেন না, তাহাই প্রতিপন্ন করিতে বিস্তর চেষ্টা করিয়াছেন। যতদূর সাধ্য সেই উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ করিবার জন্যই আমাদের অদ্যকার প্রবন্ধের অবতারণা। রামপ্রসাদ তদীয় জীবন্ত কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ যে সংগীতপুঞ্জ রাখিয়া গিয়াছেন, সেই সঙ্গীতপুঞ্জ অবলম্বন করিয়া, আমরা আজ সহৃদয় পাঠকবর্গের অবগতির জন্য পক্ষপাত বিহীন হইয়া প্রসাদের সাধনা, সাধন-প্রণালী এবং ধর্ম্মমতের প্রকৃত তত্ত্ব এই প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। আমাদের এই বিবৃতি এবং আলোচনার লক্ষ্য কবি রামপ্রসাদ নহেন, সাধক রামপ্রসাদ। মুক্তি, সাকার ও নিরাকার উপাসনা, পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্ম, অবতারবাদ এবং তীর্থপর্য্যটন প্রভৃতি সম্বন্ধে রামপ্রসাদের কি মত ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করাই আমাদের অদ্যকার প্রবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য।

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে নানা প্রকার মুক্তির উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য এবং নির্ব্বাণ এই চতুর্ব্বিধ মুক্তির কথাই

বিশেষ প্রচলিত। রামপ্রসাদ এই চতুর্ব্বিধ মুক্তির কোনটি মানিতেন কি না, এবং মানিলে কোন্‌টি অথবা কোন্ কোন্‌টিকে মানিতেন, আমরা সর্ব্বাগ্রে তাহারই আলোচনা করিব। তাঁহার একটি সঙ্গীতে,—

"প্রসাদ বলে চাষে বাসে, মিছে মন অভিলাষী।
আমার মনের বাসনা তোমার ও রাঙা চরণে মিশি॥"

এবং অপর একটিতে

"মৃত্যুঞ্জয়ের উপযুক্ত সেবায় হবে আশু মুক্ত।
ওরে সকলি সম্ভবে তাঁতে, পরমাত্মায় মিশাইবে।"

এই দুইটি কথা দেখিতে পাই। ইহা দ্বারা এই অনুমিত হইতে পারে, যে তিনি সাযুজ্য অথবা নির্ব্বাণ এই দুই প্রকার মুক্তির একতর অথবা উভয়ই মানিতেন। কিন্তু আবার তাঁহার অন্য এক সঙ্গীতে দেখিতে পাই "নির্ব্বাণে কি আছে ফল," এবং আর এক স্থলে "সাকারে সাযুজ্য হবে, নির্ব্বাণে কি ফল বল না ?" ইহা দ্বারা বুঝা যায় তিনি নির্ব্বাণ মুক্তি মানিতেন না; কিন্তু সাযুজ্য মানিতেন কিনা স্পষ্ট বুঝা গেল না। পুনশ্চ, একস্থানে বলিয়াছেন "ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি"। ইহা দ্বারা আমরা এই বুঝি, যে, তিনি সালোক্য অথবা সামীপ্য মুক্তিই মানিতেন ও অন্তরের সহিত আকাঙ্ক্ষা করিতেন, এবং তিনি দ্বৈতবাদী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর প্রাক্কালীন সংগীত চতুষ্টয়ের অন্যতরে বলিয়াছেন "যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হ'য়ে সে মিশায় জলে।" এতদ্দ্বারা এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, যে, তিনি বাস্তবিকই নির্ব্বাণ মুক্তি মানিতেন। তবে এই প্রকার মতবৈষম্য দেখা যায় কেন ?—এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। বৈষম্যের কারণ আছে। এই মত-বৈষম্য প্রসাদের সাধনার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা (Stage) প্রতিভাত হইয়াছে। পূর্ব্বে নির্ব্বাণ মুক্তিতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে নাই, অথবা তিনি তাহা চাহিতেন না। কিন্তু অন্তিম কালে—মৃত্যুর প্রাক্কালে—সেই বিশ্বাসই তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়; সুতরাং উদ্ধৃত উক্তিগুলির মধ্যে বস্তুগত্যা কোন বিরোধ ভাব নাই।

রামপ্রসাদ একমাত্র ভক্তিকেই মুক্তির স্থির উপায় বলিয়াছেন। বস্তুত ভক্তিই সাধনার প্রকৃত জীবনীশক্তি। "জ্ঞান মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ বটে,"(১)

(১) "বোধোহি কো ? যস্তু বিমুক্তি হেতুঃ"—মণিরত্ন মালা (শঙ্করাচার্য্য।)
—জ্ঞান কি ? যাহা বিমুক্তির কারণ।

কিন্তু ভক্তি না থাকিলে জ্ঞান, নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এবং হৃদয়কে তত মধুময় করিতে পারে না। আর যদি কাহারও জ্ঞান জন্মিয়া না থাকে, তাহার প্রকৃত ভক্তি হইলেই তৎসংযোগে জ্ঞান স্বয়ংই উৎপাদিত হইয়া থাকে।(১) এই জন্যই হিন্দুশাস্ত্রকারকগণ জ্ঞানের উপর ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন।(২) তাঁহারা শিক্ষাভিমানী পাশ্চাত্য দার্শনিকদের ন্যায় শুধু বুদ্ধিবৃত্তিকে (intellect) সর্ব্বেসর্ব্বা মনে করিতেন না। বস্তুত একমাত্র ভক্তিতেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।(৩) 'ব্রহ্মসিদ্ধির নিমিত্ত ভক্তিযোগের ন্যায় শুভদায়ক পন্থা আর দ্বিতীয় নাই।' তাই প্রসাদ বলিয়াছেন ;—

"সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন তার দাসী"।

"ওমা শক্তিরূপা ভক্তি দিয়া মুক্তি জলে টেনে ফেল"।

"পাবে মুক্তি, বাঁধ দিয়া ভক্তিদড়া"—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

রাম প্রসাদের ভক্তি কিরূপ গাঢ় ছিল, এবং মুক্তি সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ অচল ও অটল বিশ্বাস ছিল, তাহা নিম্নোদ্ধৃত দুই পংক্তিতেই বেশ বুঝা যাইবে।—

"আমি ভক্তির জোরে কিনতে পারি ব্রহ্মময়ীর জমিদারি।"

"কত মহাপাপী তরে গেল, রাম প্রসাদ কি চোর ?"

রাম প্রসাদ পূর্ব্বজন্ম কি পরজন্ম মানিতেন কি না, ইহাই আমাদের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়। 'জন্মজন্মান্তরেতে মা, কত দুঃখ আমায় দিলে," এবং "জন্মজন্মান্তরের যত বকেয়াবাকী জের টেনেছে," ইত্যাদি দ্বারা স্পষ্টই দেখা যায়, যে, তিনি পূর্ব্বজন্ম, অথবা বহুজন্ম মানিতেন। পর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত সংগীতেও তাঁহার পরজন্ম এবং বহুজন্ম মানার প্রমাণ পাওয়া যায়।—

---

(১) "বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহেতুকম্॥" ভা, ১, ২, ৭।

(২) "——পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি——।" ভা, ৬, ৩, ২২।

(৩) "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাং।" ভা, ১১, ১৪, ২১
"পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ! ভক্ত্যালভ্যস্ত্বনন্যয়া।" গীতা ১৩।১৩।
"ধর্ম্মার্থকামৈঃ কিং তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।
——যস্য ভক্তিঃ স্থিরা ত্বয়ি॥" বিষ্ণুপুরাণম্, ১, ২০, ২৭।

"ইহজন্ম, পরজন্ম, বহুজন্ম পরে।
রাম প্রসাদ বলে আর জন্ম হবে না জঠরে॥" (১)

আমাদেরও বিশ্বাস রামপ্রসাদ পূর্ব্বজন্ম, পরজন্ম, বহুজন্মও স্বীকার করিতেন। কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি ছত্র পাঠ করিলে দেখা যায় যে তাঁহার নিজসম্বন্ধে পরজন্ম বিশ্বাস তুলিয়া দিয়াছিল।—

"রাম প্রসাদে এই ভণে, বদ্ধ হবে মায়ের জ্বরে।
তবু রব মার চরণে, আরত ভবে জন্মিব না॥"
"গিয়েছি না ফেরে আছি, আর কি পাবে ভবে॥"
"ভবে আর জন্ম হবে না।
হবে না জননীর জঠরে॥—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

মৃত্যুর পূর্ব্বে রামপ্রসাদ দ্বিজ অর্থাৎ দ্বিজাত্মা হয়েন। (২) তিনি হয়ত চরমকালে সেই জ্যোতির্ম্ময় অতীন্দ্রিয় রাজ্যের দিব্যালোকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, যে, এই দুঃখসঙ্কুল, পাপপরিপূর্ণ, মায়ামোহময় সংসারে আর তাঁহাকে পুনর্ব্বার জন্মপরিগ্রহ করিতে হইবে না। কিন্তু মনুষ্যমাত্রেরই পুনর্জ্জন্ম হইবে না, এ কথা তিনি কোথায়ও বলিয়া যান নাই। তাঁহার নিজের পুনর্জ্জন্ম হইবে না বলিয়া কোন মনুষ্যের পুনর্জ্জন্ম তিনি মানেন না, এমন বুঝায় না, বরং তিনি যে পুনর্জ্জন্ম মানিতেন, তাহাই আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি।

প্রসাদ অবতার মানিতেন না। তাহারও প্রমাণ তাঁহার নিজের সঙ্গীতেই পাওয়া যায়।—

"তুই কি জানিবি সে যন্ত্রণা, জন্মিলি না মরিলি না।

---

(১) 'প্রসাদ-প্রসঙ্গ-কার জোরজবর দস্তি (forced construction) করিয়া রামপ্রসাদ পরজন্ম মানিতেন না, এইটি প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই পংক্তিদ্বয়ের স্বীয় মতপোষক একটা ভিন্ন অর্থ খাড়া করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন প্রথম পংক্তির পর "বলে" এইরূপ একটি ক্রিয়া উহ্য আছে। আমরা এইরূপ কূট অন্বয়ের কোন আবশ্যকতা দেখি না। সঙ্গীতটি যেরূপ আছে তাহাতেই বেশ অর্থ হয়।

(২) "য এতদক্ষরং বিদিত্বা অস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।
বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩, ৮, ১০।

"ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন সত্যেন চ দমেন চ।
ব্রহ্মণঃ পদমাপ্নোতি যৎপরং দ্বিজসত্তমঃ। বনপর্ব্বণি, ২০১, ১৩৮১।

পুনশ্চ—verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God—*John III. 3.*

এখন দেখা যাউক তিনি তীর্থ এবং তীর্থ পর্য্যটন সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন।" এই সম্বন্ধে তাঁহার সংগীতে যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রায় সমস্তই নিয়ে উদ্ধৃত হইল।—

(ক) "আর কাজ কি আমার কাশী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী॥"

(খ) "কালীর পদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি।"

(গ) "নানা তীর্থ পর্য্যটনে, শ্রম মাত্র পথ হেঁটে॥
"পাবে ঘরে বসে চারিফল, বুঝনা রে দুখ্-চেটে।"

(ঘ) "কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী।
কালীর চরণে কৈবল্য রাশি॥
সার্দ্ধত্রিশ কোটি তীর্থ, মায়ের ও চরণ বাসী।
যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান, কাজ কি হয়ে কাশীবাসী॥
হৃৎকমলে ভাব বসে, চতুর্ভুজা মুক্তকেশী।
প্রসাদ বলে এই ঘরে বসি, পাবে কাশী দিবা নিশী॥"

(ঙ) "এ ভব সংসারে আসি, না করিলাম গয়া কাশী।" ইত্যাদি বলিয়া দুঃখ প্রকাশ।

(চ) "কাজ কি তীর্থ গঙ্গাকাশী, যার হৃদে জাগে এলোকেশী"—

(ছ) "কেন গঙ্গাবাসী হ'ব।
ঘরে বসে মায়ের নাম গাইব॥
আপন রাজ্য ছেড়ে কেন, পরের রাজ্যে বাস করিব।
কালীর চরণতলে কত শত গয়া গঙ্গা দেখ্‌তে পাব॥"

(জ) "আমি ঐহিক সুখে মত্ত হয়ে, যেতে নারিলাম বারাণসী"। ইত্যাদি বলিয়া খেদ।

(ঝ) "যেন অন্তিম কালে, দুর্গা বলে, প্রাণ ত্যজি জাহ্নবীর তটে।"

(ঞ) "কাশী মোক্ষধাম।"

(ট) "কাজ কি আমার কাশী?
যাঁর কৃত কাশী, তত্ত্বমসি বিগলিতকেশী॥
যেই জগদম্বার কুণ্ডল পড়ে ছিল খসি।
সেই হ'তে মণিকর্ণি বলে তারে ঘোষি॥

অসি বরুণার মধ্যে তীর্থ বারাণসী।
মায়ের করুণা বরুণা ধারা, অসিধারা অসি॥
কাশীতে মরিলে শিব দেন তত্ত্বমসি।
ওরে তত্ত্বমসির উপরে সেই মহেশ মহিষী॥
রামপ্রসাদ বলে কাশী যাওয়া ভাল ত না বাসি।
ঐযে গলাতে বেঁধেছে আমার কালী নামের ফাঁসি॥"

(ঠ) "প্রসাদ বলে কি ফল হবে হই যদি গে কাশীবাসী।"

(ড) "তবু অন্তকালে আমায় টেনে ফেলো গঙ্গাজলে॥"

(ঢ) "মন চলরে বারাণসী।"

(ণ) "আমি কবে কাশী বাসী হব॥
সেই আনন্দ কাননে গিয়ে নিরানন্দ নিবারিব॥
গঙ্গাজল বিল্বদলে, বিশ্বেশ্বর নাথে পূজিব।
ঐ বারাণসীর জলে স্থলে মোলে পরে মোক্ষ পাব॥"

(ত) "তীর্থে গমন, মিথ্যা ভ্রমণ; মন উচাটন করো না রে।
ও মন ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস, শীতল হবে অন্তঃপুরে॥"

(থ) "তবু মন ধায় কাশী রব কেমনে।"

(দ) 'কিবা কাজ অভিমুক্ত পুরী (১) গমনে।"

(ধ) "আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে পদে গঙ্গা গয়া কাশী।" ইত্যাদি।

(ক), (খ), (গ), (ঘ), (চ), (ছ), (ট), (ঠ), (দ) এবং (ধ) দ্বারা দেখা যায় যে তিনি কাশী এবং অন্যান্য তীর্থে যাওয়া অনাবশ্যক মনে করিতেন, এবং ভাল বাসিতেন না। (ত) "তীর্থে গমন মিথ্যা ভ্রমণ," পথ হাঁটার শ্রম মাত্রই লাভ, অন্য কোন লাভ নাই। যাঁর ঘরে রাশি রাশি তীর্থ আছে, তাঁহার আর তীর্থে প্রয়োজন কি? কিন্তু আবার (ঙ) ও (জ) দ্বারা দেখা যাইতেছে, তিনি কাশী না যাইতে পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং (ঝ) ও (ড) দ্বারা তাঁহার মৃত দেহ গঙ্গাজলে পরিত্যক্ত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন; (ঞ) ও (থ) দ্বারা তিনি কাশীকে মোক্ষ ধাম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, এবং তাঁহার মন যে কাশীর দিকে ধায় তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। আর (ঢ) এবং (ণ) দ্বারা কাশী যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন

(১) কাশী।

"বারাণসীর জলে স্থলে মোলে পরে মোক্ষ পাব" এবং ত্রিবেণীর ঘাটে বসিলে অন্তর শীতল হইবে।

এখন দেখা যাইতেছে রামপ্রসাদ নিজেই তীর্থ পর্য্যটন সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল মত কি একে অন্যের বিরোধী? আমাদের বিবেচনায় তাহাদের মধ্যে বাস্তবিক কোন বিরোধ ভাব নাই। ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন মতে তাঁহার সাধনার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রতিফলিত হইতেছে; অথবা প্রকৃত সিদ্ধ হিন্দুভক্ত ও বিশ্বাসীর পক্ষে তীর্থ পর্য্যটন করা না করা উভয়ই সমান, কিন্তু করিলে লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই। প্রসাদ বাস্তবিক তীর্থের মাহাত্ম্য বিশ্বাস করিতেন, ইহা তাঁহার মৃত্যুর প্রাক্কালীন কার্য্য দ্বারাই উপলব্ধি হয়। যিনি মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া কালী পূজা করত স্বেচ্ছা পূর্ব্বক সংজ্ঞানে অর্দ্ধ নাভি গঙ্গা জলে নামিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন, তিনি যে তীর্থের মাহাত্ম্য স্বীকার করিতেন না এ কথা কে বলিবে?

গুরুদত্ত মন্ত্রের প্রতি আমরণ প্রসাদের আন্তরিক বিশেষ ভক্তি ও আস্থা দেখা যায় (১)। তিনি গুরুদত্ত মন্ত্রকে "মহাসুধা" এবং "রত্নজোড়া" বলিয়া বর্ণন করিয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত কতিপয় পংক্তি তাহার প্রমাণ :—

"গুরুদত্ত তত্ত্বকর।"

"গুরুদত্ত রত্নজোড়া বাঁধ রে যতনে কসে।"

"মুখে গুরুদত্ত মন্ত্রকর।"

"গুরুদত্ত মহাসুধা"—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এখন দেখা যাক্ ব্রহ্ম নিরূপণ সম্বন্ধে প্রসাদ কি বলিয়াছেন, "প্রসাদ বলে ব্রহ্মনিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি" (২)। অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বতঃপ্রকাশিত। যখন সূর্য্য উঠে, তখন যদি কেহ বলে "কই কোথায় সূর্য্য উঠে, আমায় দেখাইয়া দেও দেখি," তখন যেমন তাহাকে সূর্য্যোদয় দেখাইবার জন্য প্রদীপ জালিবার আবশ্যক করিবে না, ঠিক সেইরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য দর্শন কি বিজ্ঞানের প্রদীপ জালিবার আবশ্যক করে না। তাই প্রসাদ বলিয়াছেন "ষড় দর্শনে দর্শন পেলে না, আগম নিগম তন্ত্রসারে"। ঈশ্বরকে দেখিতে হইলে দর্শনের আলো দ্বারা দেখিতে পাইবে না, মনোরূপ প্রদীপ দ্বারা দেখিতে হইবে।

(১) ইহা কি প্রসাদের হিন্দুত্বের একটি বলবৎ প্রমাণ নয়?

(২) কেমন সুন্দর উক্তি!

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং"। কঠোপনিষদ, ২য়, ১৫ শ্লোঃ

"মনসাতু প্রদীপেন মহানাত্মা প্রকাশতে"। শান্তি পর্ব্ব নিঃ ২৯, ১৫ শ্লোঃ

তথাচ যজুর্ব্বেদে

"———মনসৈবাপ্তব্যম্'—

প্রপাঃ ৩৪, অধ্যায় ৭, প্রাঃ ২৬২৭ শ্লো।

"সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে"—প্রসাদ।

'প্রসাদ প্রসঙ্গ'কার(১) এবং সাধকসঙ্গীতে(২)রাম প্রসাদের জীবনী লেখক "শুনেছি শ্রীনাথের বাণী" "পাগল বাটার কথায় মজে" ইত্যাদি দ্বারা প্রসাদ প্রত্যাদেশ পাইতেন এই কথা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমাদের বোধ হয় এইটি তাঁহাদের ভুল হইয়াছে। রাম প্রসাদ শক্তির উপাসক ছিলেন। তিনি কালীর নিকট হইতে প্রত্যাদেশ পাইতেন এইরূপ প্রমাণ করিতে পারিলে সঙ্গত এবং পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষিত হইত বটে, কিন্তু কালীভক্ত প্রসাদ শিবের নিকট হইতে প্রত্যাদেশ পাইতেন, এই কথাটা আমাদের নিকট বড় যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। শিববাক্য অর্থে তন্ত্রকে বুঝায়; সুতরাং উক্ত পদদ্বয় দ্বারা প্রসাদের প্রত্যাদেশ প্রাপ্তি না বুঝিয়া তাঁহার তন্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসই বুঝিতে হইবে।

প্রকৃত সাধকের ন্যায় প্রসাদের সামান্য ধনে এবং ঐহিক সুখে স্পৃহা ছিল না।(৩)

"কাজ কি মা সামান্য ধনে।"

"চাকি কেবল ফাঁকি মাত্র।"

"মন করো না সুখের (৪) আশা যদি অভয় পদে লবে বাসা।"—ইত্যাদি।

তিনি দুঃখে ভয় করিতেন না।(৫) দুঃখ আসলে তিনি দুঃখিত না হইয়া বরং সুখী হইতেন। (৬) তিনি 'সুখই দুঃখ দুঃখই সুখ" মনে করিতেন। তিনি

(১) প্রসাদ প্রসঙ্গ, ৩৫ ও ৩০ পৃষ্ঠা।

(২) সাধক সঙ্গীত, ৪১ ও ৪২ পৃষ্ঠা।

(৩) মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাম প্রসাদকে স্বীয় সভাসদ করিবার জন্য প্রস্তাব করেন। প্রসাদের এই প্রস্তাবে অসম্মতি তাঁহার ঐহিক সুখ নিস্পৃহার অন্যতর প্রমাণ।

(৪) Not bliss. but pleasure.

(৫) "আমি কি দুঃখেরে ডরাই"।

(৬) "দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই।"

সম্মানে হৃষ্ট হইতেন না; (১) অবমাননাতেও সন্তপ্ত হইতেন না। ইহাকেই প্রকৃত জ্ঞানী, ইহাকেই প্রকৃত সাধু বলা যায়। এইরূপ সমাহিত ব্যক্তিই মুনি বলিয়া উক্ত হয়।

ন হৃষ্যত্যাত্মসম্মানে নাবমানেন তপ্যতে।

গাঙ্গো হ্রদ ইবাক্ষোভো যঃ স পণ্ডিত উচ্যতে॥"

উদ্যোগ পর্ব্বনি ৩৩ ২৯৬।

"উদয়াস্তে মনস্তোহি ন হৃষ্যতি ন শোচতে।

সুখমাপতিতং সেবেৎ দুঃখমাপতিতং বহেৎ॥" বনপর্ব্বনি ২৫৮ ১৫৩৮৯।

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ গীতা ২ ৫৬।

সাধুসঙ্গের যে কতদূর উপকারিতা (২) তাহা রাম প্রসাদ বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন।

"আমি সাধুসঙ্গে নানারঙ্গে দূর করিব মনের ব্যথা।"

রামপ্রসাদ পাপপুণ্য মানিতেন না। নিম্নলিখিত সংগীতে বোধ করি তাহার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

"ওরে শূন্যেতে পাপপুণ্য গণ্য মান্য করে সব খেয়ালে"

এই উদ্ধৃত বাক্যটি দ্বারা ইহাও বুঝা যায়, যে, তিনি অদ্বৈতবাদী ছিলেন। "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" এ যদি ঠিক হয়, তবে পাপপুণ্য না থাকারই কথা বটে!

তিনি বেদ দর্শন প্রভৃতিকে অভ্রান্ত মনে করিতেন না—

"বেদে দিলে চক্ষে ধূলা ষড় দর্শনের সেই অন্ধগুলা।"

---

(১) প্রসাদ কৌলিক প্রথানুসারে সাধনায় মনোনিবেশের জন্য সুরাপান করিতেন। একদিন কুমারহট্ট-নিবাসী বলরাম তর্কভূষণের টোলের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন; তর্কভূষণ তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন,—মাতাল ব্যাটা যাইতেছে। প্রসাদ ইহাতে ক্রুদ্ধ না হইয়া নিম্নোক্ত সংগীত দ্বারা পণ্ডিতকে যথোচিত প্রবোধ দিলেন,—

"মন ভুল না কথার ছলে।

লোকে বলে বলুক মাতাল বলে॥

সুরাপান করিনেরে সুধা খাইবে কুতূহলে!

আমার মনমাতালে মেতেছে আজ, মদমাতালে মাতাল বলে।" ইত্যাদি।

(২) ধর্ম্মাস্যযোনিঃ সাধুসমাগমঃ। বনপর্ব্বনি, ১, ২৫।

শ্রীমান শঙ্করাচার্য্য তাঁহার মণিরত্নমালা নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

কি মত্র হেয়ং? কনকঞ্চ কান্তা।

মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে কোন্ কোন্ বস্তু হেয়? ধন ও স্ত্রী।

"দ্বারং কি মাহ নরকস্য?—নারী"।

নরকের দ্বার কি?—নারী। (১)

নারী সাধনার অন্তরায় বলিয়া প্রসাদেরও বোধ হইয়াছিল, তাই বলিয়াছেনঃ—

"রমণী বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী।"

আগে ইচ্ছা সুখে পান কর, বিষের জ্বালায় ছটফটি।"

প্রসাদ অদ্বৈতবাদী ছিলেন কি, দ্বৈতবাদী ছিলেন, এই বিষয় লইয়াও মতভেদ দৃষ্ট হয়। আমরা দেখাইয়াছি—'চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি" এই কথা দ্বারা প্রসাদের দ্বৈতবাদই প্রতিপন্ন হয়, কারণ তাহাতে স্বতন্ত্র জীবাত্মার স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু আবার দেখাইয়াছি, যে তিনি পাপ পুণ্য মানিতেন না, সুতরাং তিনি অদ্বৈতবাদী, (২) কারণ পাপপুণ্য না মানার মধ্যে 'তত্ত্বমসি" ভাব নিহিত আছে। বস্তুত দ্বৈত এবং অদ্বৈত এই দুইয়ের মিশ্রিত ভাবটিই যথার্থ তত্ত্ব। ভগবান্ শিব এই রূপ বলিয়াছেন (৩)। দক্ষ প্রজাপতিও এই রূপই বলিয়াছেনঃ—

"দ্বৈতঞ্চৈব তথাদ্বৈতং দ্বৈতাদ্বৈতং তথৈবচ।

ন দ্বৈতং নাপিচাদ্বৈত মিত্যেতৎ পারমার্থিকম্॥"—

অর্থাৎ 'দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, ইহাদের মধ্যে শুদ্ধ দ্বৈত, কি শুদ্ধ অদ্বৈত এরূপ নহে, দ্বৈতাদ্বৈতই পারমার্থিক"। ফলত সাধকের যে পর্য্যন্ত এই দ্বৈতাদ্বৈত মিশ্রিত ভাবটির সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি না হয়, সে পর্য্যন্ত তাঁহার প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে নাই।

---

(১) স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের নৈকট্য চিত্তচাঞ্চল্য এবং আসক্তি জন্মে সুতরাং অনেক সময় ইঁহারা একে অন্যের সাধনার বিশেষ অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়।

(২) "মা বিরাজে ঘরে ঘরে।

জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে।

রাম প্রসাদ বলে বল্‌ব কি আর, বুঝে লওগে ঠারে ঠোরে॥"

—এই সংগীত দ্বারাও প্রসাদের অদ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন হয়।

(৩) "—তত্ত্বং...দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্জ্জিতম্"      কুলার্ণবতন্ত্রম্, ১, ১, ১১০।

রামপ্রসাদ মৃত্যুকে কণামাত্র ভয় করিতেন না (১)। বাস্তবিক তাঁহার মৃত্যুনির্ভীতি দেখিলে যুগপৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। তিনি সর্ব্বদাই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলেন। (২) —"কালমেব প্রতীক্ষেত নিদেশং ভৃতকো যথা" —(৩) প্রকৃত সাধক এবং বিশ্বাসী ব্যতীত এইরূপ মৃত্যু-নির্ভীতি আর কাহারও সম্ভব না।

এখন দেখা যাউক প্রসাদ যে দেবতার সাধনা করিতেন, সেই দেবতা সাকার কি নিরাকার, সীমাবদ্ধ কি অসীম। প্রসাদ চতুর্ভুজা কালীমূর্ত্তির পূজা করিতেন। ইহা দ্বারা দেখা যায় তিনি সাকার উপাসক অর্থাৎ পৌত্তলিক ছিলেন। কিন্তু কেমন পৌত্তলিক? তিনি কি তাঁহার কালীকে সেই মৃৎ প্রতিমাতেই আবদ্ধ মনে করিতেন? প্রসাদ স্বয়ং এই প্রশ্নের কেমন বিশদ উত্তর দিয়াছেন, দেখুনঃ—

"কালী কৃষ্ণ শিব রাম সকল আমার এলোকেশী।"

"আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে।"

"ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি।"

"তারা আমার নিরাকারা।"

"তুমি ক্ষিতি তুমি জল।"

"পুরুষ প্রকৃতি রূপিণী।"

"হংস (৪) রূপে সর্ব্বভূতে বিহরিণী।"

"অজ্ঞানেতে অন্ধজীব ভেদ ভাবে শিবা শিব।" (৫)

"উভয়ে অভেদ পরমাত্মা স্বরূপিণী।"

"আমার আত্মারামের আত্মকালী; তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন" ইত্যাদি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

(১) 'চেননা আমারে শমন, চিনলে পরে হবে সোজা। আমি শ্যামা মার দরবারে থাকি, অভয় পদের বইবে বোঝা"॥ "প্রসাদ বলে কালের ভটা (দূত), মুখ সামলায়ে বলিস্ বেটা। কালীর নামের জোরে বেঁধে তোরে, সাজা দিলে রাখবে কেটা॥" ইত্যাদি

(২) "শ্রীরাম প্রসাদ বলে দোর জাক ডেকে দিয়েছি। মুখে কালী কালী বলে, যাত্রা করে বসে আছি॥" ইত্যাদি।

(৩) শান্তি পর্ব্বনি, ২৪৫; ৮৯২৯।

(৪) সোহং।

(৫) "শিবশক্ত্যোরভেদত্বং ভিন্নত্বং প্রতিপাদ্যতে।
যথা দুগ্ধেষু ধাবল্যং দাহিকা পাবকস্য চ॥"

যে শক্তিতে বিশ্ব চরাচর অনুপ্রাণিত, প্রসাদ সেই শক্তির সেবক। প্রসাদের শক্তি মৃৎ মূর্তিতে আবদ্ধ নহেন। মৃৎপ্রতিমা তাঁহার উপাস্য নহে। তাঁহার উপাস্য জগদ্ধাত্রী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবতা। সেই দেবতার সীমা নাই; তিনি নিরাকারা, সর্ব্বব্যাপিনী। কিন্তু তবুও দেখা যাইতেছে প্রসাদ মনুষ্য-নির্ম্মিত মৃৎমূর্ত্তি চিহ্ন ঈশ্বরারাধনায় ব্যবহার করিতেন। ইহাতে আমরা তাঁহাকে হিন্দু না বলিয়া আর কি বলিব? তিনি ব্রহ্মবাদী ছিলেন, কিন্তু তা বলিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিতে পারি না, কারণ তাঁহার মধ্যে ষোল আনা হিন্দুত্ব ছিল। তিনি নিরাকার সাকার অভেদ জ্ঞান করিতেন। (১) তিনি "বনের পুষ্প বেলের পাতা", "রক্ত চন্দন রক্ত জবা" দিয়া মায়ের পূজা করিতেন। তিনি তারা নামের কবচ মালা গলায় ধারণ করিতেন। (২) তিনি "গঙ্গাজলে বিল্বদলে বিশ্বেশ্বরনাথের" পূজা করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাকে হিন্দু বলিব না ত আর কি বলিব? যিনি হৃদয়ের নিরানন্দ নিবারণের জন্য তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন; যিনি তান্ত্রিক প্রথানুসারে মদ্যপান করিতেন, এবং সোঁড়া মন্ত্র ন্যাস করিতেন (৩), শিববাক্যের প্রতি যাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল; সন্ধ্যা আহ্নিকে যাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল; জানিয়া শুনিয়া যিনি গঙ্গাজলে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন; তাঁহাকে হিন্দু সাধক না বলিবে কে?

---

(১) "নিরাকার সাকার, ককার সবাকার ভিটা"—ইত্যাদি।

(২) যমের প্রতি—"যে যাবি স জড় করে, তার একটা ভাবনা কি রে। হবে তারা নামের কবচ মালা, বৃথা আমি গলায় রাখি রে॥"—ইত্যাদি।

(৩) "কাল করেছে হৃদয়ে বাস, বাড়ছে যেন শালের কোঁড়া। তবে সেই কালের সর্ব্ব বিনাশ, ন্যাস ধর রে মন্ত্র সোঁড়া॥"—ইত্যাদি।

# উদ্ভট কথা।

## প্রথম শাখা।

তোমরা যে যা বলিতে চাও, বল, আমি কিন্তু আমার মনের কথা আর পেটে পুরিয়া রাখিতে পারিতেছি না। আমার একটা আসল কথা আমি চাপিয়া রাখিয়াছি বলিয়া তোমরা অনেক সময় আমার অনেক কথা বুঝিতে পার না; কি জানি কি মনে কর; আমি বুঝিতে পারি, যে আমি আমার মূলকথা বলি নাই বলিয়াই তোমরা গোলে পড়িয়াছ; কত দিন বলি বলি করিয়াছি, বলিতে পারি নাই এখন কিন্তু আর না বলিলে চলে না।

হয়ত তোমায় আমায় এ বিষয়ে মত ভেদ নাই; অথচ আমি বলিলেই তুমি বিস্মিত হইবে। এটা যে কেন হইবে, তাহাও আমি বুঝিতেছি। বোধ হয়, আমি আমার মনের ভিতর যত খানা-তল্লাসি করিয়াছি, তুমি তত কর নাই। প্রয়োজন হয় নাই, অথবা তোমার সেরূপ প্রবৃত্তিই বা নাই।

মনের খানাতল্লাসি করিতে আমার কতকটা প্রবৃত্তি আছে, একটু আমোদও বোধ হয় এবং প্রয়োজনও হয়। বিজ্ঞ বিবেচক লোকের সঙ্গে কোন মতের অনৈক্য হইলে, আমি অনেক সময় ভাবি, যে হয়ত উঁহার সহিত কোন মূল বিষয়ে আমার মত মিল নাই, তাই এরূপ ঘটিয়াছে। ক্রমে দেখিতেছি, একটি মূল বিষয়ে অনেকের সহিতই আমার মত-মিল নাই। আপন মনের অনেক খানা-তল্লাসির পর এ কথা বুঝিতে পারিয়াছি। আমি অনুরোধ করিতেছি, আপনারা আমার এই খানাতল্লাসির রিপোর্ট পড়িয়া ইহা একেবারে অগ্রাহ্য করিবেন না; আপনাদের মনের গূঢ় হইতে গূঢ়তম ভাগে মধ্যে মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দীপ জ্বালিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন; ছমাস ছমাস বৎসরাবধি এইরূপ করিবেন; তাহার পর আর একবার এই রিপোর্ট খানি পড়িবেন—তখন নিতান্ত অসার বোধ হয়, ইহা দূরে নিক্ষেপ করিবেন।

কথাটি এই—আমি অন্তরে অন্তরে ইতিহাসে এবং উপন্যাসে কোন ভেদ মানি না। চোখে দেখা একটি বিষয়, আর মনগড়া আর একটি বিষয়ে জন্মগত ভেদ আছে, তাহা জানি ও মানি। কিন্তু মনুষ্যের উপর বা সমাজের উপর তাহাদের ফলাফল বিবেচনা করিলে, ইতিহাসে এবং উপন্যাসে

কিছুই ভেদ দেখিতে পাই না। মানিও না সেই জন্য। Real—Ideal; History—Poetry; Fact—Fiction; Perception—Imagination; Walking—Dreaming; Physical—Metaphysical;—ইহার এক এক যোড়া মধ্যে পরস্পর কোন ভেদ দেখি না,—বুঝি না—মানি না।

কথাটা আর একটু বিস্তৃত করিয়া বলি। রামচন্দ্র নামে একজন রক্ত-মাংসের মনুষ্য হস্ত পদাদি লইয়া এই পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য বিচরণ করিয়াছিলেন কি না, এই কথা ভাবিয়া, এই কথার বিচার করিয়া, তোমার আমার মত সামান্য জীবের কোন ফল আছে কি? ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বা ডাক্তার রামদাস সেনের এ বিষয়ে বিচার করায় কোন ফল আছে কি না—সে কথা এখন আমি তুলিতেছি না,—আমি কেবল জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমার আমার, পক্ষে সংসার ধর্ম্মে শিক্ষার জন্য, বা আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির জন্য, পুত্র কলত্রকে শিখাইবার জন্য, ঐ কথার বিচার করিয়া কোন ফল আছে কি? আমি বলি কোন ফলই নাই। ইতিহাসই হোক, আর কবির উপন্যাসই হোক, রামচরিত যে দিক্ দিয়া দেখিবে; সেই দিকই তোমাকে আকর্ষণ করিবে। তাহার সৌন্দর্য্যে তুমি অভিভূত হইবে; আর সেই সৌন্দর্য্য ক্রমেই তোমাকে সুন্দর করিবে। তুমি এ কথা বলিতে পার, যে, কোন একটি দৃষ্টান্তে বিশ্বাস না হইলে, সে দৃষ্টান্তে কোন শুভ ফল হয় না। ঠিক কথা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বিশ্বাস কি ইতিহাসের খাস দখলি ভূমি? কাব্যে কি তুমি আমি কেহই বিশ্বাস করি না? আমি দেখাইতেছি, আমরা কাব্যে বিলক্ষণ বিশ্বাস করি।

কথাটা উলটাইয়া বলিলে বোধ হয়, আরও সহজ হইবে। যে সকল উপন্যাসে তুমি আমি সকলেই বিশ্বাস করিতে পারি, তাহাই কাব্য; আর যে সকল বিশ্বাস করিতে পারি না, সেগুলি গল্প হইলেও কাব্য নহে। মনে করুন, কোন একজন নব্য গ্রন্থকার লিখিলেন, যে রামচন্দ্র সীতা বিসর্জ্জন করার পর কৌশল্যার কাঁদাকাটি সহ্য করিতে না পারিয়া, সূর্য্যবংশ রক্ষার্থ একটি বালিকার পাণিগ্রহণ করিলেন! এরূপ শুনিলেই তুমি আমি সকলেই বলিব, যে এটি বড় অসংলগ্ন কথা। অসংলগ্ন-অর্থ—যাহা লাগে না, বা খাপে না। কাহার সঙ্গে লাগে না? কাহার সঙ্গে খাপে না? না,—রামচরিতে আমাদের যে টুকু বিশ্বভূমি আছে, তাহার সহিত লাগে না, এবং খাটে না।

আসল কথা, খাপিল, কি না খাপিল, ইহা লইয়াই বিশ্বাস ও অবিশ্বাস হয়; সুতরাং বিশ্বাস—কাব্য বা ইতিহাস কাহারও এক চেটে নহে। ইতিহাসে ও বেখাপ কথা থাকিলে আমাদের বিশ্বাস হয় না, কাব্যেও বে-খাপ কথা থাকিলে আমাদের শ্রদ্ধা হয় না।

বিশ্বাসের কথা হইতেই সত্য মিথ্যার কথাটা উঠিতে পারে। অনেকে মনে করেন, যে ইতিহাসের অবলম্বন সত্য এবং কাব্যের অবলম্বন মিথ্যা, সুতরাং ইতিহাসে এবং কাব্যে নিত্য প্রভেদ আছে। এ কথা আমি মানি না। আমি বলি, কাব্য এবং ইতিহাসে উভয়েতেই সত্য মিথ্যা জড়িত হইয়া থাকে। মিথ্যা, কিন্তু কাব্য বা ইতিহাস কাহারও অঙ্গীভূত পদার্থ নহে। সত্যই উভয়ের অবলম্বন, আশ্রয়, সমবায়, এবং পরিমাণ। ইতিহাস বা কাব্যে যে মিথ্যা থাকে, তাহা পরগাছা বা বাঁদরা ডাল। সে গুলা ছাটিয়া ফেলিতে পারিলেই বৃক্ষের শ্রীবৃদ্ধি হয়। কাব্যে যে সকল মিথ্যা থাকে, তাহা কাব্যাংশ নহে, সে গুলা গাঁজাখুরি; আর ইতিহাসে যে মিথ্যা থাকে, তাহা ইতিহাসের অংশ নহে, বখরলর জোবানবন্দ।

প্রকৃত ইতিহাসও সত্য, আর প্রকৃত কাব্য মিথ্যা—এইটি ঘোর মিথ্যা কথা। এক দিক দিয়া দেখিলে আমাদের ভূয়োদর্শনের সঙ্গে যে গুলি খাপে, সেই গুলিই সত্য। অন্যদিক দিয়া দেখিলে, যাহার বিপরীতটা মনে খাপাইতে পারিনা, তাহাই সত্য।* তাই যদি হয়, তবে কাব্য মিথ্যা হইবে কেন? আমাদের ভূয়োদর্শনের সহিত যদি হামলেট চরিত্রের খাপ থাকে, তবেই তাহা সত্য নতুবা তাহা মিথ্যা। হামলেটের মত পুরুষ তুমি কিম্বা আমি কোথাও দেখিতে পাইনা বলিয়া হামলেট কখন মিথ্যা হইতে পারে না। তাহা হইলে নেপোলিয়নও মিথ্যা। কেন না নেপোলিয়নের মত পুরুষ তুমি আমিও কোথায়ও দেখি নাই। যদি বল কেন নেপোলিয়নকে ইতিহাসে দেখিয়াছি। তাহা হইলে আমিও বলিব, কেন হামলেটকেত কাব্যে দেখিয়াছি। তোমার ইতিহাসে দেখাই কি দেখা, আর আমার কাব্যে দেখা কি কিছুই নহে?

যদি ফল দেখিয়া সত্য মিথ্যা বুঝিতে হয় তাহা হইলে অনেক সময়, কাব্যই সত্য, আর ইতিহাস মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান ইতিহাসের বর্ত্তমান

---

* ১৯ সংখ্যা নবজীবনের ৪২৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত, মিলের এবং স্পেন্সরের কৃত, সত্যের লক্ষণ দেখ। আমাদের শাস্ত্রকার বা দার্শনিকগণের মতের সহিত ঐ লক্ষণের কোন বিভেদ নাই।

জীবন্ত মূর্ত্তি—দেখ—ঐ আমাদের বিলাস বাবু। বেলা এগারটা বাজিয়াছে, সকাল বেলা হইতে এখন পর্য্যন্ত বিলাস বাবু করিয়াছেন কি? না নিত্য কর্ম্ম সমাধণন্তে দশ ছিলিম তমাকু দগ্ধ করিয়াছেন। ঐ আলস্য-জীবন বিলাস বাবু সত্য? আর হ্যামলেট্ যে মিথ্যা, একথা বলিতে আমরা সম্মত নহি।

কাহারও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গোচর না হইলে, কোন পদার্থই সত্য নহে, উন্নতমনা মানবের পক্ষে এরূপ ধারণা বড়ই বিড়ম্বনা। স্থূল-ইন্দ্রিয়-সম্বল কোন অসভ্য জাতি ও কথা বলিলে বুঝিতে পারি; কিন্তু তোমার আমার মত কোন হিন্দুতে ও কথা বলিলে, আর বুঝিতে পারি না। কেননা, তুমি আমি আজি কালি মানসিক ভাব লইয়াই বাঁচিয়া আছি। পূর্ব্বতন কতকগুলি কাব্য এবং মহাকাব্যই আমাদের প্রধান সম্পত্তি, এবং এখনও যাহা কিছু নাড়া চাড়া করি, সে সকলই কাব্য। কাব্যই যদি মিথ্যা হয়, তবে আমাদের এ ভার ভূত জীবনে আর প্রয়োজন কি? চর্ম্ম চক্ষে দেখিলে, আমাদের কি আছে? আমাদের কিছুই নাই। একে আমরা অঙ্গে পৃষ্ঠে ললাটে নাগপাশ বন্ধনে বদ্ধ, তাহার উপর সেই নিরুপায় অবস্থায় আমরা পর পদের ভীষণ তাড়নে অবলুণ্ঠিত, সুতরাং চর্ম্ম চক্ষে দেখিলে আমাদের জীবন আশঙ্কায় পূর্ণ হয়, আশা স্থান পায় না। কিন্তু ভাব চক্ষুতে দেখিলে, আমরা আমাদের আর এক রূপ অবস্থা বুঝিতে পারি। আমরা দেখিতে পাই ধর্ম্ম রূপ অক্ষয় বট নানা শাখা প্রশাখায় প্রসারিত হইয়া, প্রাচীন কালের মত এখনও ভারতে শীতল চ্ছায়া প্রদান করিতেছে; এখনও পূর্ব্বের মত মহা ঝঞ্ঝাবাত হইতে আশ্রিত ভারতবাসীকে রক্ষা করিতেছে। এখনও তেমনই ভাবে সুমন্দ পবন সেই অক্ষয় বটের শাখা বিতান মধ্যে ঝর ঝর করিয়া বহিতেছে ও তাহার তল দেশের শ্যামল শস্প শয্যা তেমনই করিয়া পরিস্কৃত করিতেছে। এখনও প্রভাতের পাখীরা তেমনই করিয়া কূজন করিতে থাকে; মধ্যাহ্নে গাভী বৎস সকল তেমনই করিয়া ধীরে ধীরে তল দেশে চরিতে থাকে। ভারতের মহা ধর্ম্মরূপ অক্ষয় বট বৃক্ষের লক্ষ শাখা, কোটি প্রশাখা, অসংখ্য পত্রপুঞ্জ সমগ্র ভারত এখনও আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ধরণী পৃষ্ঠস্থিত কোন একটি বা দুইটি বল্মীক-দষ্ট মূল দেখিলে, একটু আশঙ্কা হয় বটে, কিন্তু একবার চারি দিকে চাহিয়া দেখ, কত লক্ষ লক্ষ বিলম্বিত জটা নূতন মূল রূপে

নিত্য পরিবর্দ্ধিত হইয়া, বৃক্ষের অবলম্বনের স্বরূপ হইতেছে। একবার স্বর্গাভি-মুখে উপরে চাহিয়া দেখ কেমন জীবন্ত বৃক্ষ, প্রশান্ত মূর্ত্তি। পত্র পুষ্পের কেমন শ্যামল সুন্দর বর্ণ—ফলের কি প্রাণ-গঞ্জন রঞ্জন। মহাকাল রাক্ষসকে সৌম্য হাস্যে উপহাস করিয়া, জরা রাক্ষসীকে পাদ মূলে আশ্রয় দিয়া—চির-যৌবন, অক্ষয় বটরূপী মহাধর্ম্ম ভারতে যুগ যুগ ব্যাপিয়া বিরাজমান। আমরা চিরদিনই এই মহা বৃক্ষের আশ্রিত। এই আশ্রয় গুণেই আমরা দুর্জ্জয় বজ্র কোটিতে নষ্ট হই নাই, ঝঞ্ঝার উপর ঝঞ্ঝাতে আমাদিগকে আবাসচ্যুত করিতে পারে নাই। আর আজি একটু খর পশ্চিমে বাতাসে দুইটি শাখা ঈষৎ দুলিতেছে বলিয়া, কতকগুলি শুষ্ক পত্র ঝরিয়া গেল দেখিয়া—আমরা কি আশঙ্কিত হইব? এবং মহদাশ্রয় ত্যাগ করিব? না; কথনই না। না, আমাদের কোন আশঙ্কা নাই।

## মন্বন্তর।

আর্য্যশাস্ত্র, ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপারকে একটি সাম্রাজ্যের ন্যায় প্রতিপাদন করেন। পরাৎপর ব্রহ্মা সেই সাম্রাজ্যের একমাত্র অধিপতি। পার্থিব রাজা ভূমি, জল, অনল, অনিল, আকাশ, দেহ, দেহী প্রভৃতি সৃষ্টি করিতে পারেন না কিন্তু সেই সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মা সর্ব্ব পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টি প্রকাশ পূর্ব্বক তিনি তাহাকে পালন করেন। পশ্চাৎ যখন প্রয়োজন হয়, তখন তিনি তাহাকে উপসংহৃত করিয়া থাকেন। পার্থিব সম্রাট যেমন রাজবিধি স্থাপন পূর্ব্বক রাজ্য পালন ও শাসন করেন, পরমেশ্বর ও সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষা-ত্মক স্বীয় অনাদি প্রাকৃতিক বিধি অনুসারে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় প্রভৃতি বার বার সম্পাদন করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিধি সনাতন এবং অপরিবর্ত্ত-নীয়। সৃষ্টি, পালন, শাসন, মৃত্যু স্বর্গ বিভাগ, প্রলয় প্রভৃতি যাহা কিছু সংঘটিত হয় সে সমস্ত ঐ সনাতন বিধি অনুযায়ী।

পার্থিব সম্রাটের রাজ্য শাসন সম্বন্ধীয় যে সমস্ত শক্তি আছে, তাহা তিনি স্বয়ং অথবা একাকী কার্য্যে পরিণত করিতে অপারগ। সে জন্য

তিনি উপযুক্ত পাত্রদিগের হস্তে এক এক ক্ষমতা অর্পণ করেন। তাহাতে রাজকীয় শক্তি প্রভাবে সামান্য ব্যক্তি সকল ভিন্ন ভিন্ন রাজপুরুষরূপে উপলক্ষিত হন। শক্তির ইতর বিশেষতা তাঁহাদের মধ্যে অধঃ ও উর্দ্ধ পদবী সকল সৃষ্টি করে। কেহ বা সমগ্ররাজ্যে সার্ব্বভৌমিক রাজপ্রতিনিধি পদ প্রাপ্ত হয়েন; কেহ সেনাপতি, কেহ শান্তিরক্ষক, কেহ দণ্ডনায়ক, কেহ ধর্ম্মাধিকরণী, কেহ করসংগ্রাহক এবং কেহ বা কোষাধ্যক্ষ হইয়া তাদৃশ রাজ-প্রতিনিধির অধীনে কার্য্য করিয়া থাকেন। ফলত রাজশক্তিই তাঁহাদিগের এবম্বিধ অধ্যক্ষতা সমূহের মূলীভূত কারণ। ব্যক্তিগুলি উপযুক্ত আধার মাত্র রাজশক্তি সমূহ তথা আধেয় স্বরূপ। আধারগুলিকে স্বতন্ত্র রাখিয়া আধেয়স্বরূপ শক্তি পদার্থকে স্মরণ করিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে, যে, শক্তিই রাজ প্রতিনিধি, এবং শক্তিই সমস্ত প্রকার রাজপদবী স্বরূপিণী।

সেইরূপ পরমেশ্বর এই জগৎরাজ্যের মহারাজা। তাঁহার শক্তি অনাদি অনন্ত; বিক্রম অপার। জ্ঞান ক্রিয়া এবং বলক্রিয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ। তাঁহার শক্তিক্রিয়া অনির্ব্বচনীয়। তদ্দ্বারা তিনি অনন্ত প্রকার প্রাণী সম্বলিত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়াছেন। পার্থিব রাজা যেমন স্বয়ং অক্ষম হইয়া রাজশক্তি সকল অন্যকে প্রদান করেন, পরমেশ্বর সেরূপ অক্ষম নহেন। তাঁহার দৃষ্টি, তাঁহার হস্ত পদ সর্ব্বত্র বিদ্যমান; সুতরাং তিনি সর্ব্বত্র স্বয়ংই শক্তিধর ও শক্তির নির্ব্বাহক। তাঁহার শক্তিক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া দিবার নিমিত্ত তাঁহাকে পাত্র নির্ব্বাচন করিতে হয় না। তাঁহার ইচ্ছামাত্রে সেই শক্তি দ্বারা কোটি কোটি আধার সৃষ্ট হইয়া থাকে। এস্থলে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে ঐ শক্তিই তাঁহার ইচ্ছাতে আধার রূপে পরিণত হয়। ঐ শক্তিই দ্রব্যধাতুবিশিষ্ট। তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় দ্রব্যধাতু নাই। তাঁহার শক্তিই পদার্থের উপাদান কারণ এবং অন্তিম পরিণাম। ঈশ্বরীয় বিধি বলে শক্তি, ক্রমে পদার্থরূপ ধারণ করে, আবার রূপের বিনাশে শক্তিময়ীই থাকে। পদার্থ সমূহ তাঁহার শক্তিরই আবির্ভাব। জগতে যত দৃশ্য বস্তু আছে সে সমস্ত স্বস্ব অদৃশ্য বা গুণ স্বরূপিণী ঈশ্বরীয় শক্তির পরিণাম মাত্র। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই, যে নিরাকারা ব্রহ্মশক্তিই, এই সাকারা ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপিণী। সেই শক্তি স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। তাহা ব্রহ্মেরই শক্তি। তাহারই নামান্তর প্রকৃতি। শাস্ত্রে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, "শক্তি আর শক্তিমানে

অভেদ।" সুতরাং শক্তিবিভাগে পরমেশ্বরই ব্রহ্মাণ্ডরূপী এবং জ্ঞান বিভাগে তিনিই তথা উপাদেয় বা আছেন। অথবা পক্ষান্তরে ইহাও বলে; যে, তিনিই শক্তির মূলাধার। আকাশ যেমন পদার্থ মাত্রের আধার, অথচ নবস্থই ঘটে, আধার স্বরূপ; পরমেশ্বর সেইরূপ সর্ব্বশক্তির মূলাধার অথচ শক্তির আবির্ভাবরূপী পদার্থমাত্রে আধেয় স্বরূপ। সেই প্রাকৃতিক আবির্ভাবের তারতম্যানুসারে তাঁহার আধেয়ত্ব ভিন্ন ভিন্ন পদবী দ্বারা উপলক্ষিত হইয়া থাকে।

পদার্থ সমূহের বাহ্য অবয়বগুলি সংবৃত রাখিয়া যদি তাহার শক্তির দিকে দৃষ্টি করা যায়, তবে স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হইবে, যে, সমস্ত পদার্থ একমাত্র শক্তির আবির্ভাব; পরমেশ্বর সেই শক্তির পরিচালক। শক্তিরূপ মহাযন্ত্রের তিনি নির্ব্বাহক, বিধাতা এবং যন্ত্রীস্বরূপ। একদিকে সূর্য্য, চন্দ্র তারাগণ, তাঁহার শক্তির আবির্ভাব; অন্যদিকে তিনি স্বয়ং বিধাতা স্বরূপে তাহাদিগের নিয়ন্তা। একদিকে মানবের মনঃ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার শক্তির আবির্ভাব, অন্য দিকে তিনিই আবার তৎসমূহের নিয়ামক। তিনি স্বীয় শক্তির সহিত ব্রহ্মাণ্ড রাজ্যের সর্ব্ববিভাগের অধিনায়ক। সেই শক্তির প্রকার ভেদ ও তারতম্যানুসারে তাঁহার নায়কত্ব ও বিভুত্বের নানা সংজ্ঞা হইয়া থাকে। শক্তির নানাত্ব অনুসারে তাঁহার নানাত্ব উপলক্ষিত হয় মাত্র। নতুবা তিনি নানা নহেন। তিনি একই। যদ্রূপ রাজা একই, তাঁহার শক্তির নানাত্ববশত নানা রাজপুরুষ সৃষ্ট হয়, তদ্রূপ পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্। জগতে যেখানে যত শক্তি আছে সমস্তই তাঁহার শক্তি। তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত শক্তি অচলা। তাঁহার ইচ্ছাতেই তাহা সচলা হইয়া থাকে। কিন্তু এ কথা ক্ষণমাত্রও বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে, যে, তিনিই শক্তিমান্। তথাপি, শিষ্যগণকে বুঝাইবার অনুরোধে শাস্ত্র, সেই পরমেশ্বরকে কখনও শক্তিরূপে দর্শন করেন, কখনও বা জ্ঞানরূপে দর্শন করেন। শাস্ত্র, শক্তিকে স্ত্রীরূপিণী, ক্ষেত্র ও উপাধি স্বরূপিণী বলেন, এবং জ্ঞানভাগকে পুরুষ স্বরূপ, ক্ষেত্রজ্ঞ ও উপাধেয় স্বরূপ কহেন।

এইরূপে জগতের যে লোকে যে কোন অবস্থায় তাঁহার শক্তি যে কোন রূপে আবির্ভূত হয়, তিনি তথা সেই ভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া তাহার কার্য্য বিধান করিয়া থাকেন। ইহাই তাঁহার রাজ্যবিধি। তিনি সহস্র মস্তক, সহস্রনেত্র, সহস্র হস্ত-পদ বিশিষ্টের ন্যায় হইয়া ব্রহ্মাণ্ড রাজ্যকে শাসন

ও পালন করিতেছেন। তিনি কাহারও সাহায্যাপেক্ষী নহেন। তিনি আপনিই রাজা, আপনিই রাজপ্রতিনিধি, আপনিই দণ্ডমারক এবং আপনিই ধর্ম্মাধিকারী। তিনি আপনিই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মূল কারণরূপে "ব্রহ্ম"; শক্তিরূপিণী রাজলক্ষ্মীর স্বামীরূপে "পরমেশ্বর"; পঞ্চভূতের আদ্যন্তন সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্ররূপ সাংধাতুগণের এবং মনোবুদ্ধিপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়রূপী সূক্ষ্মদেহসমূহের বিধাতা, ও পালয়িতারূপে "হিরণ্যগর্ভ।" তিনি এই নানাবিধ প্রজাবিশিষ্ট প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান স্থূল জগতের নিয়ন্তারূপে "ব্রহ্মা," "বিধাতা" অথবা "প্রজাপতি।" তিনি তথা সমস্ত প্রজার পিতা, পাতা, শাসনকর্ত্তা। তিনি জ্ঞানস্বরূপে পরমপুরুষ এবং সচেতন জগতের "ব্রহ্মরূপ" পরম ধাতু। তিনি শক্তিরূপে সকলের জননী ও "ক্ষেত্ররূপ" আধারস্থান। তিনি শক্তিরূপে "ক্ষেত্র," ব্রহ্মরূপে "ক্ষেত্রজ্ঞ।"

এই সকল তত্ত্ব কথার অনুরোধে শাস্ত্র তাঁহাকে ব্রহ্মা ও রাজ্যের ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন বিভাগ বিশেষে নানাপ্রকার শাসন ও পালন কর্ত্তৃত্বপদে সৃষ্টি করিয়াছেন। ঊর্দ্ধতনভাগে তিনি পালনে বিষ্ণু, সৃজনে ব্রহ্মা, সংহারে রুদ্র। অধস্তন ভাগে তিনি সৃজনে প্রজাপতি, পালনে ও শাসনে ইন্দ্র ও মনু এবং সংহারে মৃত্যু বা যমরাজ। নিবৃত্তিধর্ম্মে তিনিই সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমাররূপী পরম আদর্শ এবং প্রবৃত্তিধর্ম্মে তিনিই মরীচি অত্রি প্রভৃতি প্রজাপতি। মরীচ্যাদি ব্রহ্মর্ষিগণ তাঁহার পুরুষ ও ব্রহ্মরূপ ধাতুর আবির্ভাব; এজন্য তাঁহারা ব্রাহ্মণ প্রজাপতি-শব্দে উক্ত হন এবং মনুগণ তাঁহার শক্তি ও ক্ষেত্ররূপ ধাতুর অংশ; এজন্য তাঁহারা ক্ষত্রিয় প্রজাপতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। জগতের পালন ও শাসনকর্ত্তৃত্বের প্রকারভেদে সেই একই পরমেশ্বরেতে এই সকল নানা পদবী বা উপাধি কল্পিত হইয়া থাকে। পুরাণশাস্ত্রের এই সমস্ত রহস্য বেদার্থে পরিপূর্ণ।

সর্ব্বপ্রাণির ভোগশক্তি ও ভোগ্যবিষয়সংযুক্ত যে সত্ত্ব রজঃ তমোগুণময় প্রবৃত্তিধর্ম্ম বা প্রকৃতি, তৎসম্বন্ধে পরব্রহ্মের সমষ্টি নিয়ন্তৃত্ব বা কর্ত্তৃত্ব-অংশটি ব্রহ্মানামে অভিহিত হয়। নৈমিত্তিক সৃষ্টি ও প্রলয় তাঁহারই অধিকারভুক্ত। সর্ব্বপ্রাণীগত প্রাগুক্ত গুণত্রয়ই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়রূপ পরিবর্ত্তনের হেতু। ব্রহ্মা তাহার সমষ্টি-ভাবের বিধাতা ও অধিষ্ঠাতা। তিনি সেই সমষ্টি প্রকৃতি, ধর্ম্ম, বা ধাতুর ঘন-বীজপুরুষ। এই নিমিত্তে জীবেতে সমষ্টিভাবে দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, রিপু, ও ভোগবাসনা সম্বন্ধে যত

বিধি বর্ত্তমান আছে সে সমস্তই ব্রহ্মার অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্বরূপ বলিয়া উক্ত হয়। অথবা লক্ষণাপ্রয়োগে ব্রহ্মাঙ্গসম্ভূতরূপেও বর্ণিত হয়। ব্রহ্মাঙ্গসম্ভূত বলিলেই তৎসমস্তকে ব্রহ্মার পুত্র বলিতে হয়। সামান্যত 'মানস' ও 'দেহ' ভেদে ব্রহ্মাঙ্গ দ্বিবিধ। 'মানস', উক্তমাঙ্গস্থানীয় এবং মুখ প্রভৃতি দশ ইন্দ্রিয়, তাহার প্রত্যঙ্গস্বরূপ। সেই সার্ব্বভৌমিক দশ ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট মহা মানস-বীজ হইতে জীব সমষ্টির প্রবৃত্তিরাজ্যের নিয়ামক দশবিধ ধর্ম্মধাতু উৎপন্ন হইয়াছে, অথবা ইহাই বল যে, সেই ব্রহ্মমানস, বিভাগক্রমে মানবীয় দশবিধ ব্রহ্মধাতু-স্বরূপ। সেই দশবিধ ইন্দ্রিয় ক্ষেত্র' স্বরূপ 'ব্রহ্মমানস' হইতে যে দশবিধ প্রবৃত্ত ধর্ম্মের উৎকৃষ্ট ধাতু উৎপন্ন হইয়াছে তৎসমূহই ব্রাহ্মণ-প্রজাপতি শব্দে উক্ত হয়। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ এবং নারদ এই দশজন ব্রাহ্মণ-প্রজাপতি, ব্রহ্মার সেই মানসপুত্র। মনই ব্রহ্মধাতু এইজন্য ইহারা ব্রাহ্মণ। এই মনের উৎকর্ষ সাধন যাঁহাদের ব্রত তাঁহারাও ব্রাহ্মণ। পূর্ব্বকালে ঐ দশ প্রকারের মধ্যে যে ধাতুর বিশেষতা যে ব্রাহ্মণে দৃষ্ট হইয়াছে, তিনিই মরীচ্যাদি কোন ধাতুর নামে নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্যক্তিপুরঃসরে এবং গোত্রপুরঃসরে ব্রাহ্মণকুলে ঐ সমস্ত নামের বিস্তর ঋষি ছিলেন। মূল-ধাতুটি মানস ছিল, তাহার বিশেষ বিশেষ বিভাগ হইতে অনেক ঋষি ও গোত্রের নাম-করণ হইয়াছে। ফলে মন্বন্তর-ভেদে ব্রাহ্মণ প্রজা-পতিদিগের নামও সংখ্যার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

ব্রহ্মার দ্বিতীয়াঙ্গ দেহ। সেই দেহ, সর্ব্বাভৌমিক সমষ্টি-ক্ষত্রধাতুস্বরূপ। বল, বীর্য্য, রাজ্যশাসন, প্রজাপালনাদি তাহার অন্তর্গত। সেই ধাতুটিও তাঁহার পুত্র তুল্য। তাঁহারই নাম মনু। মনু, ক্ষত্রধাতুস্বরূপ ব্রহ্ম-দেহ হইতে উৎপন্ন বিধায় জাতিতে ব্রাহ্মণ নহেন, কিন্তু ক্ষত্রিয়। যাঁহাদের প্রতি মানস রাজ্যের ভার তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। যাঁহারা দেহ-রাজ্য বা বাহ্য প্রজা-পালনাদিতে ব্রতী, তাঁহারা কখনও ব্রাহ্মণ নহেন; সুতরাং সেই প্রথম মনু, বা পর পর মন্বন্তরে যত মনু হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ক্ষত্রিয় ধাতু স্বরূপ। যুগযুগান্তে যে সকল মহামহা ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠে তাদৃশ ক্ষত্রধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহারাও অনেকে মনু বা ক্ষত্রিয় প্রজাপতি নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ব্রহ্মার মানসস্বরূপ সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মণ্য-ধাতু ও তাঁহার দেহস্বরূপ সমষ্টি ক্ষত্রধাতু—এই উভয় ধাতু মূল, আর্য্যশাস্ত্রে স্থাপিত করা আছে। সেই উভয়-ধাতু হইতে প্রত্যেক মন্বন্তরে ধর্ম্মরাজ্য ও সাংসারিক রাজ্য বিন্যস্ত

হয়। ক্ষত্রিয়ধাতু হইতে বাহ্যরাজ্যের শাসনকর্ত্তা এক একজন মনু এবং ব্রহ্মধাতু হইতে ব্রাহ্মণ প্রজাপতিগণ পরিকল্পিত হন। সেই সকল কল্পিত নাম হইতে ব্যক্তিবাচক প্রজাপতিগণ স্ব স্ব গুণানুসারে নাম প্রাপ্ত হন। প্রত্যেক মন্বন্তরে যিনি মনু হন তিনিই রাজা।

মানবীয় সহস্র চতুর্যুগে বিভক্ত ব্রহ্মদিনমানস্বরূপ প্রত্যেক কল্পে চৌদ্দ জন করিয়া মনু, ক্রমে পালন ও শাসনকর্ত্তা হন। এই বর্ত্তমান শ্বেত-বরাহ কল্পের আদিতে স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকার ছিল। তিনি ক্ষত্র-ধর্ম্মের মূর্ত্তিস্বরূপ ছিলেন। সেই ক্ষত্রধাতুতে মানব বংশ প্রোথিত আছে। প্রগুক্ত ব্রহ্মধাতু সমূহ উক্ত ক্ষত্র ধাতুর সহিত উপগত হইয়া জগতে দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদির বিধান করিতেছে। স্বায়ম্ভুব মনুই ব্রহ্মার আত্মজ ক্ষত্রধাতুরূপ আদি প্রজাপতি। প্রজাপ্রসবকারিণী ক্ষেত্ররূপিণী সমগ্রশক্তি তাঁহার স্ত্রীরূপা। সেই স্ত্রীরূপিণী বিচিত্র শক্তির নাম শতরূপা। স্বায়ম্ভুব মনুর ঔরসে শতরূপার গর্ব্ভে দুই পুত্র ও তিন কন্যা জন্মে। সেগুলি প্রায়ই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংসার-ধর্ম্মরূপ ধাতু। পুত্র দুইটির নাম উত্তানপাদ ও প্রিয়ব্রত। উত্তানপাদের দুই স্ত্রী। প্রেয় রূপিণী সুরুচি এবং শ্রেয়ঃ-রূপিণী সুনীতি। সুরুচি সম্পূর্ণ সংসার-রুচি। সুনীতিও মোক্ষজনিকা নহে, কিন্তু কর্ম্মফলভূত উর্দ্ধস্বর্গপ্রদায়িকা। কল্পজীবীগণের উপজীব্য ধ্রুব বা 'ধ্রুবলোক' সেই সুনীতিরূপ তপস্যার পুত্রস্বরূপ। শতরূপার তিন কন্যার নাম আকুতি, দেবহূতি ও প্রসূতি। আকুতি রুচির ক্ষেত্রস্বরূপ। অতএব রুচিনামক ব্রাহ্মণ প্রজাপতির সহ তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহা হইতে সংসারের হিতকর যজ্ঞ নামে পুত্র ও দক্ষিণা নামে কন্যা জন্মে। এই যজ্ঞই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের ইন্দ্র ছিলেন। তাঁহা হইতে যথাকালে পর্জন্য বর্ষিত হইত এবং প্রজাগণ সন্তোষানুভব করিত। যজ্ঞ ও দক্ষিণার পরস্পর পরিণয়সূত্রে দ্বাদশ সংখ্যক দেবতা জন্মেন। তাঁহারা যজ্ঞ সম্পাদ্য মানসিক তোষস্বরূপ। এই হেতু তাঁহাদের সাধারণ নাম তুষিত দেবতা। দেবহূতি নামক কন্যাটি যাগযজ্ঞের ফলভূত ভোগ্য ও ভোগায়তনস্বরূপ লোকমণ্ডলের জননী। ব্রাহ্মণ প্রজাপতি কর্দ্দম ঋষির সহ তাঁহার পরিণয় হয়। কর্দ্দম * শব্দে লোকমণ্ডলের উপাদান মৃত্তিকা-ধাতু। তাহা ব্রহ্মার

* "কর্দ্দম' শব্দ স্মাজ ও। কম্যবীর হইতে ফলরাশ্যস্বরূপ লোক-মণ্ডল সকল উৎপন্ন হয়।

ছায়াস্বরূপ। কর্দ্দম ও দেবহূতির যোগে ফলভোগের পদার্থ ও স্থান সকল উৎপন্ন হয়। কলা, বসু (কিরণ), পূর্ণিমা, দেবকুল্যা (স্বর্গগঙ্গা), সোম, শ্রদ্ধা, শান্তি, অমাবস্যা, বৃহস্পতি, অগস্ত্য, গতি, ক্রিয়া, অরুন্ধতি, খ্যাতি নিয়তি, লক্ষ্মী; প্রভৃতি তাঁহার বংশ। মরীচ্যাদি দশজন ব্রাহ্মণ ঋষি তাঁহার জামাতা। কিন্তু এই সমস্ত কর্ম্মময় প্রবৃত্তিধর্ম্ম ও তাহার ফলভূত স্বর্গাদি অনিত্য বিধায়, সাংখ্য জ্ঞানদ্বারা তাহাতে বৈরাগ্য জন্মাইবার নিমিত্তে দেবহূতির গর্ব্ভে সর্ব্বকর্ম্মভস্মকর জ্ঞানাগ্নিস্বরূপ কপিল * উৎপন্ন হন। তিনি স্বীয় কর্ম্মময়ী মাতাকে বৈরাগ্যে অভিষিক্ত করেন। যেখানে কর্ম্ম সেইখানে জ্ঞানাগ্নি আচ্ছাদিত। যেখানে রোগ সেইখানে ঔষধ। এটি ভারত শাস্ত্রের অসামান্য মর্য্যাদা অথচ স্বভাবেরও নিয়ম। নিম্নস্থ আখ্যায়িকার এই নিয়মের পরাকাষ্ঠা দৃষ্ট হয়।

প্রসূতি শতরূপার তৃতীয়া কন্যা। সায়ম্ভুব মন্বন্তরে প্রজাপতি দক্ষ, ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ প্রজাপতির সহিত প্রসূতির বিবাহ হয়। 'দক্ষ,' সন্তান-সন্ততির জনন-ক্ষমতা স্বরূপ। প্রসূতি, সেই ক্ষমতার স্ত্রীলিঙ্গ-বাচিকা। সুতরাং উভয়ের বিবাহ স্বাভাবিক। তাঁহাদের ১৬ টি কন্যা হয়। সেই ১৬টি কন্যা চারিভাগে বিভক্ত। ১৩ টী সংসার-ধর্ম্ম-ভাগে; তাহাদের;—নাম শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, তিতিক্ষা, হ্রী, মূর্ত্তি। সেই সকল কন্যার প্রত্যেকের এক একটি পুত্র; ক্রম-যথা—সত্য, প্রসাদ, অভয়, শম, হর্ষ, গর্ব্ব, যোগ, দর্প অর্থ, স্মৃতি, ক্ষেম, বিনয়, এবং নরনারায়ণ। প্রত্যেক পুত্র তাহার মাতার সহিত একধর্ম্মী। কেবল স্ত্রীলিঙ্গ শব্দদ্বারা মাতাকে ও পুংলিঙ্গ শব্দদ্বারা পুত্রকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এই মাত্র প্রভেদ। দক্ষ ও প্রসূতির এই ত্রয়োদশ কন্যা সকলেই সংসারধর্ম্মপ্রযোজিকা; সুতরাং ধর্ম্মের সহিত তাঁহাদের বিবাহ হইয়াছিল। সংক্ষেপ এই, যে, ধর্ম্ম, তাঁহার ঐ ত্রয়োদশ পত্নী ও ত্রয়োদশ পুত্র—সমস্তই একজাতীয় তত্ত্ব।

দক্ষ ও প্রসূতির অবশিষ্ট তিন কন্যার নাম স্বাহা, স্বধা, ও সতী। স্বাহা অগ্নিধর্ম্মিণী। উত্তরমার্গে, দেবলোকে, দেবযানে, দেবযাজী পুরুষকে তেজোময় রশ্মিযোগে বহন করা তাঁহার কার্য্য; সুতরাং দেবযানরূপ আতিবাহিকী বা অগ্ন্যভিমানী দেবতার সহিত তাঁহার পরিণয় হয়। তাহাতে

* 'কপিল" শব্দে ভস্মকর অগ্নি। ভস্ম অথবা পিঙ্গলবর্ণ।

পাবক, পবমান ও শুচিনামে তিনটি পুত্র ভোক্তা পুত্র জন্মে। সেই তিনজন হইতে অগ্নিস্বভাব পঁয়তাল্লিশটি পুত্র জন্মে। পিতামহ, পিতা ও পুত্রগণকে লইয়া সমস্ত পরিবারের সংখ্যা উনপঞ্চাশ। এই উনপঞ্চাশ দেবতা অমুদয়ই মলোকসাধক অগ্নিতত্ত্ব। এ সমস্ত লৌকিক নহে। (ভাগবত—৪।১।৪৮)

স্বধানামক দক্ষকন্যাটির ধাতু পিতৃতুষ্টিকর ও শ্রাদ্ধাদির ফলবৰ্দ্ধক। তাঁহার ধাতু অনুসারে অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদ, সোমপ, ও আজ্যপ নামক সাগ্নি ও নিরগ্নি মিলিত পিতৃগণের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

১৩৮। জীবের সংসারবাসনা, দেবলোকে গমনের আশা, পিতৃলোক-সম্ভোগের ইচ্ছা—এ সমস্তই অনিত্য এবং বারবার জন্মমৃত্যুসাধক। সংসার, দেব ও পিতৃ ভোগসাধিনী ত্রিবিধা বাসনা জীবের সহজাতা, সুতরাং আত্মজা কন্যাস্বরূপিণী। সমষ্টি দৃষ্টিতে তাঁহারা দক্ষ ও প্রসূতির আত্মজা। দক্ষ ও প্রসূতির কন্যা হওয়াতেই তাঁহারা মনুষ্যমাত্রের কন্যারূপে সিদ্ধ হইতেছেন। কিন্তু ঐ ত্রিবিধ ভোগসাধিনী কন্যাই মনুষ্যের মোক্ষবিরোধিনী ও বন্ধনা-স্বরূপিণী। এই নিমিত্তে তাহার উপশমবীজরূপিণী একটি মোক্ষদায়িকা প্রকৃতি মনুষ্যমাত্রের হৃদয়ে আছে। সমষ্টিভাবে সেইটি দক্ষের সতীনাম্নী চতুর্থী কন্যা। বৈরাগ্য, ব্রহ্মবিদ্যা, কালভয়নিবারণ-ক্ষমতা সেই কন্যাটির ধাতু। এই নিমিত্ত বৈরাগ্যের একমাত্র নিকেতন, সাক্ষাৎ যোগমূর্ত্তিস্বরূপ গুণাতীত, সুখকল্যাণের আকর, মঙ্গলস্বরূপ সংসারতারক শঙ্কর তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। যখনই মনুষ্য সংসারধর্ম্মে, দেবস্বর্গকামনায়, পিতৃসুখ-সম্ভোগে—ইত্যাদি অসার যজ্ঞাড়ম্বরে—অত্যন্ত আসক্তচিত্ত হইয়া উঠেন, তখন করুণাময় পরমেশ্বরের নিয়মে মানবের হৃদয়-কবাট ভেদ করত ঐ সতী কন্যাটি বিনা আহ্বানে তাঁহার যজ্ঞপ্রাঙ্গণে আগমনপূর্ব্বক তাদৃশ যজ্ঞরূপ সমস্ত কর্ম্মকে স্বীয় পতি জগৎপতি সদাশিবকে অর্পণ করিতে উপদেশ দেন। সংসারী মানব সেই সদুপদেশ শ্রবণ না করাতে তাঁহার সমস্ত যজ্ঞ পণ্ড হইয়া যায়। এইরূপে সংসারাসক্ত মানব-সমষ্টির বীজমূর্ত্তি দক্ষ প্রজাপতির "বৃহস্পতি সব" নামক মহাযজ্ঞ নষ্ট হইয়াছিল। দক্ষ, বৈরাগ্য-ধর্ম্মরূপী সদাশিবকে অপমান করায় সতী, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অজামুণ্ড হইয়াছিল। "অজা" শব্দে ব্রহ্মজ্ঞানের বিরোধী জন্মবিহীনা অনাদি মায়া, অবিদ্যা অথবা প্রকৃতি। অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মজ্ঞানবিহীন কেবল-মাত্র অবিদ্যা বিরচিত মস্তক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মপূজায় অভিলাষই

ব্রহ্মনীর অজারূপ বলিস্বরূপ। দক্ষ সেই ব্রহ্মপূজা করেন নাই, বরং অবিদ্যা ও বেদের অর্থবাদ লইয়া উন্মত্ত ছিলেন; এই হেতু তাঁহার মুণ্ডটি লক্ষণা-প্রয়োগে অজামুণ্ড বলিয়া কথিত হইয়াছে।

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে—স্বায়ম্ভুব মনু রাজা; শতরূপা মনুপত্নী; প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ মনুপুত্র; আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি মনুকন্যা; যজ্ঞ ইন্দ্র, তুষিতগণ (অথবা যামাদিগণ) দেবতা; এবং মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ষি ছিলেন। (মতান্তরে দশ ঋষি) তাঁহারা তখন জগতের পালনকর্তা ও নিত্য সৃষ্টির কারণ ছিলেন। প্রবৃত্তিধর্ম্মই জগতের সৃষ্টি-স্থিতির কারণ। প্রত্যেক জীবের ব্রহ্মধাতু ক্ষত্রিয়ধাতুরূপিণী প্রবৃত্তি হইতে এই জগতে জীবগণ, যে, নিত্য নিত্য জন্মগ্রহণ করিতেছে ও প্রতিপালিত হইতেছে তাহারই নাম নিত্য সৃষ্টি। তাহা ব্রহ্মারই নিয়মিত দৈবিক প্রবৃত্তির অধীন। ক্ষত্রিয়ধাতুরূপ মনু এবং ব্রহ্মধাতুরূপ মরীচি দক্ষ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ প্রজাপতিগণ, নিত্য সৃষ্টির অবান্তরকর্ত্তা ও বিধাতামাত্র।

এই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর ব্যতীত আর ত্রয়োদশটি মন্বন্তর আছে। তাহার প্রত্যেক মন্বন্তরে মনু, মনুপুত্র, মনুকন্যা, ইন্দ্র, দেবতা, ও সপ্তর্ষিগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অভিধানে উৎপন্ন হন। মন্বন্তর ভেদ জন্য তাদৃশ নামাদির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। মনুগণ, এক এক জন ক্ষুদ্র ব্রহ্মা বিশেষ। এই বর্ত্তমান শ্বেত-বরাহ কল্পে ১০০০ চতুর্যুগ আছে। চতুর্দ্দশ মনুর মধ্যে প্রত্যেকে তাহার ৭১ মহাযুগ ভোগ করেন। তাঁহাদের ৬ জনের অধিকারকাল ক্রমে গত হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের নাম স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত এবং চাক্ষুষ। এক্ষণে সপ্তম মনুর অধিকার। ইঁহার নাম বৈবস্বত। ইঁহারই বংশ এখন প্রবাহিত হইতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মনুবংশ সকল লোপ হইয়া গিয়াছে। এই সময়ে পুরন্দর ইন্দ্রপদে, এবং কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ সপ্তর্ষিপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মনুর স্ত্রীর নাম শ্রদ্ধা, এবং ইঁনি শ্রাদ্ধদেব শব্দে উক্ত হন। ইঁহার পর আরও সাত জন মনু হইবেন। তাঁহাদের অধিকারকাল গত হইয়া গেলে ব্রহ্মার রাত্রী হইবে। তখন একটি নৈমিত্তিক প্রলয় উপস্থিত হইবে।

নৈমিত্তিক সৃষ্টি ও প্রলয় যেমন ব্রহ্মার অধিকারভূত; নিত্য সৃষ্টি ও নিত্য প্রলয় সেইরূপ মন্বন্তরের অন্তর্ভূত। এই অন্তর্ভাব অবান্তর মাত্র। কেননা ব্রহ্মাই, সকল ঘটনার অধিপতি এবং মনু প্রভৃতি প্রজাপতিগণ

কেহই স্বতন্ত্র নহেন; কিন্তু ব্রহ্মার সাময়িক ভাব, তত্ত্ব বা অবস্থাবিশেষ। জীবগণের ভোগশক্তি, ভোগ্য পদার্থের ভোগদানের শক্তি, মানসিক ধর্ম্মের ভাব প্রভৃতি ধাতু ও তত্ত্বকে অধিকার পূর্ব্বক মহা যুগ যুগান্তে যেরূপ অবস্থা ও ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে; তাহা ঋষিগণ যোগবলে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ সূত্রে জ্ঞাত হইয়া ভারতের উপকারার্থ শাস্ত্রবদ্ধ করিয়াছেন। সে সমস্ত মন্বন্তরাদির কালসংখ্যা এবং বিভাগ হেতু সামান্য বুদ্ধিতে স্ফুরিত হইতে পারে না।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ এই তিন শক্তি সর্ব্বদা সর্ব্বশরীরে অবস্থান করাতে নিরন্তর সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়রূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে। সত্ত্ব ও রজোগুণপ্রভাবে স্থিতি ও উৎপত্তি, তমোগুণপ্রভাবে বিনাশ। অতএব উপরি উক্ত নিত্য সৃষ্টির বিপর্য্যয়রূপ নিত্য প্রলয়ও উক্ত হইয়াছে। সার্ব্বভৌমিক-সৎপ্রবৃত্তি-সমূহ যেমন সৃষ্টির হেতু, সার্ব্বভৌমিক-তমোগুণ সেইরূপ নিত্যপ্রলয়ের কারণ। সেই সার্ব্বভৌমিক-তমোগুণটি সমষ্টিজীব-বিধাতা স্বরূপ ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ বলিয়া উক্ত হইয়াছে; সুতরাং সমষ্টি অধর্ম্ম তাঁহার পৃষ্ঠদেশস্বরূপ অথবা পৃষ্ঠ হইতে উৎপন্ন। হিংসা, অনৃত, ভয়, নরক, মায়া, বেদনা, মৃত্যু, শোক, কলি এই সকল সেই অধর্ম্মের বংশ। ইহারাই জগতের 'নিত্যপ্রলয়ের' হেতু। এই জগতে জীবগণ যে নিত্য নিত্য জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া পশ্চাৎ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে তাহাই 'নিত্য প্রলয়' শব্দের বাচ্য।

এইরূপ নিত্যপ্রলয়সমূহ মনুগণকর্ত্তৃক অবান্তর-রাজশাসনের অন্তর্গত। তদ্ভিন্ন মনু-পরিবর্ত্তনকালে জগতে বিস্তর পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। তখন ঋষি, দেবতা, ইন্দ্র প্রভৃতি সমুদয় পরিবর্ত্তিত হওয়াতে জগতের প্রবৃত্তিধর্ম্মে ও ভোগরাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়া থাকে।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।
জামালপুর।

# কর্ম্মফল।

কেবা আমি কার তরে, এসেছি কোথায় ?
কিছুই জানিনা আমি কে বলে আমায় ?
কেহত আমার নাই কার কাছে যাই,
চারিদিক্ ধূ ধূ করে যেদিকে তাকাই,
আপন যে জন, তারে চিনিতে না পারি
কে যবে আপন হ'ল, তাই ভেবে মরি
চারিদিকে লাগে ধাঁধা,
একদিকে ও দিকে বাঁধা,

বাঁচিনে বাঁচিনে আর গেলাম গেলাম
কোথায় এলেম আমি বিঘোরে মলাম!
অনন্ত কালের আঁকা—
উপরে আকাশ ফাঁকা—
চলেছে চলেছে শুধু নাহি তার সীমা;
কে জানে অনন্ত তাঁর, অনন্ত মহিমা?
যতই চাহিয়া দেখি,
ভাবেতে ডুবিতে থাকি,
নেত্রে উথলিয়া উঠে প্রেমের নিঝর;
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি সভয় অন্তর!

২

পড়ে থাকি জ্ঞান শূন্য নেশায় বিভোর,
উহ! কি গভীর ভাব অনন্তের ঘোর!
মাহাত্ম্য তোমার কেবা,
আমারে বুঝায়ে দেবা,
কোথা গেলে পাই তব নিগূঢ় সন্ধান
কহহ আকাশ মোরে উত্তর প্রদান?

৩

সর্ব্বগুণাধার তুমি, শব্দগুণালয়,
ওঙ্কারেতে বিমোহিত, ব্রহ্মরূপময়;
সহজ সে শুদ্ধ সুরে,
একবার ডাক মোরে,—
ছুটে যাক আমিঘোর এ গোলক ধাঁধা
এ ভাবেতে কত কাল থাকিব রে বাঁধা?
"আমি কার, কে আমার"?
বল শুনি একবার,
হে আকাশ, তুমি বাপ, তোমার দোহাই?
যথার্থ ভিক্ষুক আমি কপটতা নাই!!
বিপুল ব্রহ্মাণ্ড এ যে,
কোথায় পাব রে খুঁজে,
কেমনে করিব ভেদ এ লক্ষ্য বিষম!
বিনা সে অনন্ত দেব আগমে নিগম।

৪

তুমি কি আকাশ মোরে এ তত্ত্ব বুঝাবে?
তুমিত উন্মত্ত সদা অনন্তের ভাবে!
অনন্ত এ বিশ্ব মাঝে,
কোথা আমি কার কাজে,
আমি কেরে, আমি বলে ঘুরিয়া বেড়াই,
শুনিয়া তোমার কাছে সন্দেহ মিটাই,
কবে, সে কোথায় ওরে,
কোন্, সূত্রে, ভব-ঘোরে
পড়েছি জড়ায়ে, বল সে অনন্ত কথা,
তুমি বিনা কে কহিবে এ গূঢ় বারতা!

৫

তুমি হে অনন্তময় সকলি ত জান,
মনে করে দেখ দেখি, জান ত সন্ধান।
অতীতের অন্ধকারে—
কে বল ডুবিতে পারে?
যত যাই তত পাই অনন্ত গভীর—
প্রকৃতির মায়া তায় বিকট কুম্ভীর!
একেত অনন্ত কায়া,
অনন্ত সে মহামায়া,
প্রকৃতি, বড়ই তুমি নিষ্ঠুরা প্রকৃতি!
মাগো! এ কেমন ভাব সন্তানের প্রতি
কোথা সে কারণ পিতা,
বলে দাও সেই কথা,
ছুটে গিয়ে একবার ধ'রিগে চরণে?
'বাবা' ব'লে একবার ডাকিগে বদনে।
ছেড়ে দাও একবার,
খুলে দাও কারাগার,
আবার আসিব ফিরে, মা, তোমার কাছে
ভয় নাই আর যদি নাহি ফিরি পাছে।
এমনি মায়ের মায়া,
চমকি উঠিল, ছায়া
ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবাতে, নিশ্বাস-পবন
তরঙ্গে মথিল সিন্ধু, আলোড়িল বন॥

৬

অনন্ত বিস্তৃত কায়, তুমি ত আকাশ,
তোমার নয়ন আগে সব সুপ্রকাশ;
সমভাবে আছ একা,
প্রেমেতে হৃদয় মাখা,
ধ'রেছ জঠর মাঝে, এ বিশ্ব ভাণ্ডার,
কে করে ধারণা তার, অনন্ত বিস্তার?
কত সূর্য্য কত তারা,
ধূমকেতু দিশে হারা,
কত অগণিত চাঁদ, (কত) গ্রহ, উপগ্রহ,
ঘুরিতেছে ভয়ঙ্কর অতি দুর্ব্বিসহ—

৭

কত ঘাত প্রতিঘাতে, ব্যথিত শরীর,
তবুও অটল ভাব, মূরতি গম্ভীর,
জঠরেতে মহাভ্রূণ,
বাড়িতেছে অনুক্ষণ,
নাহিক প্রসব বেগ, নাহিক যন্ত্রণা!
উহ কি! ধারণা শক্তি জানেনা বেদনা!
সেই প্রেমময় হাস
অথচ গম্ভীর ভাস
নির্ম্মল শীতল যেন পূর্ণিমার দিশি
ভয়ঙ্করা মহাঘোরা অমাবস্যা নিশি।
আকাশ, প্রকৃতি-তত্ত্ব জান ত সকলি,
প্রকৃতির ইতিহাস দেও দেখি বলি।
কি আছে আমার কথা,
বল সে গূঢ় বারতা,
দেখিব এতই আমি, কি পাপ করেছি
এত দুঃখ মনস্তাপ কেন সহিতেছি॥
কার ইচ্ছা অনুসারে,
বল, কে সৃজিল মোরে?
আমি কোথা বল আগে, আমি সাধিলাম,
কার প্রেমে মজে বল, ভব দেখিলাম?

৮

পাপ, পুণ্যে ভেদাভেদ কবে সে হইল?
কে আমারে কোন্ কালে সে কথা বলিল?
যার প্রতি আছে ভার,
সেই কথা বলিবার,

সেকি মোরে কানে কানে বলেছে সে কথা;
দেখ দেখি ভাল ক'রে সে গূঢ় বারতা?
লোকে যদি বলিয়া থাকে;
দোষী করে কে আমাকে?
শুনেছি এ ভব-রাজ্যে অবিচার নাই,
কেন তবে বিনা দোষে এত দুঃখ পাই?

১০

জগৎ প্রসূতি ওগো, প্রকৃতি জননি,
শোন্ মা অভয় দিয়ে সন্তান-কাহিনী;
জরায়ু ছিঁড়িয়ে যবে,
ভ্রূণগণ বাহিরিবে,
আর যেন গর্ভ-ভার কোরো না গ্রহণ!
সন্তানে এমন ক্লেশ না পায় কখন।
পুরুষে হোয়ো মা লয়,
সৃষ্টি যেন লোপ হয়,
মিছে কেন সৃষ্টি করে হাসাও কাঁদাও?
আদরের জীবে মা গো জীয়ায়ে পোড়াও,

১১

প্রকৃতি গো, তুমি নাকি আদ্যাশক্তি হও
তবে মা এ অভাগারে মুক্ত করি লও।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া আর,
কত কাল আমি-ভার,
বহিতে হইবে মাগো, আর যে পারিনে।
একবার দয়া কর প্রকৃতি সন্তানে!
ভুবনমোহিনী তুমি,
তোমার কুহকে ভ্রমি,
তোমার মূরতি মাগো, ভুলিতে কি পারি
যাই আসি, আসি যাই, ভব ঘুরে মরি!

১২

প্রভাতের নবরাগ, গোধূলির হাসি,
মরিলেও প্রাণে যেন বেড়ায় গো ভাসি।
টেনে আনে জোর করে,
কেমনে এড়াই তারে?
তুমি হলে মহাশক্তি, আমি ক্ষীণ প্রাণী,
ডাকিলে কেমনে থাকি, বল গো জননি?

১৩

আগেও ত এসেছি মা তোমার এখানে;
কাঁদি নাই নিজ দুঃখে কখন জীবনে।
হাসিতাম তোর সনে,
কাঁদিতাম দুই জনে;
বেড়াতাম কত সুখে পড়ে মা, কি মনে
গাহিতাম তোর গান, বদরিকাশ্রমে?
আজি মা তেমন নয়!
সব নিরানন্দময়!
তোমার হাসিতে আর; মন যে হাসে না!
তোমার ক্রন্দনে মাগো, মন যে কাঁদে না
আপনিই কাঁদি আমি,
জাহ্নবী পুলিনে ভ্রমি,
মিথ্যা প্রবঞ্চনা মাঝে, কলির শাসনে,
পূর্ব্ব কথা ভেবে কাঁদি স্বপনে স্বপনে!
হায় মা, সে সিন্ধুকূলে
আপনে আপনি ভুলে,
গেয়েছি যখন মাগো, সাম-বেদ গান,
প্রকৃতির হাসি ছিল জুড়াইয়া প্রাণ!
আজি মা তেমন নয়!
সব নিরানন্দময়!

তোমার হাসিতে আর, মন যে হাসে না
তোমার ক্রন্দনে মাগো, মন যে কাঁদে না
কেন মা এমন হ'লো,
জননী গো বলো বলো,—
কি ঘোরে পড়িয়ে মাগো, মোক্ষ হইল না,
সব পণ্ড,—গিয়ে মাগো, নূতন সূচনা ?

১৪

কর্ম্ম ফল সে কি মাগো ! অদৃষ্টই বা কি?
একবার বল মাগো ! পায়ে ধরে থাকি,
কে করিল কর্ম্ম সৃষ্টি ?
কেন এ গরল বৃষ্টি।
জীব-বীজ আগে কিংবা কর্ম্ম-বীজ বল?
তুমিই এ বীজ মন্ত্র জান মা, কেবল।
কর্ম্ম কভু অগ্রে নয়,
জীব ছাড়া নাহি রয়,
সে জীবের তলে কোথা, উদ্ভব কারণ,
তবে কি মা জীব সৃষ্টি, বিধি বিড়ম্বন ?
জীব যদি অগ্রে হবে,
কেন সুখ, দুঃখ রবে ?
তা হ'লে ব্রহ্মাণ্ড যে মা, হ'ত একাকার
এক বুদ্ধি চালাইত কর্ম্ম সবাকার ;
সত্ত্ব, রজঃ তমঃ, গুণ,
তিন ভেঙে এক গুণ,
হ'ত গো জননী তোর, সাম্য অবয়ব,
অবতার কপিলের হ'ত অসম্ভব।
সে যে মা হবার নয়,
বেদ কোথা মিথ্যা হয় ?
তুমি মা ত্রিগুণাত্মিকা, ত্রিগুণদায়িনী,
কর্ম্মভেদে গুণভেদ, কর গো জননী।

তবে মা বলি আমার,
চরণে ধরি তোমার,
ভেঙে দাও এ সমস্যা মোর হিয়া লাগে,
কর্ম্মফল আগে কি মা জীব সৃষ্টি আগে ?

১৫

এ ও নয়, অ-ও নয়, কেমনে বুঝিব
না বুঝিলে, আমি মোর কেমনে ভাঙিব
কেন আমি, হ'য়ে আমি,
আসিয়াছি মর্ত্ত্য ভূমি ?
কেন আমি হইলাম ? কে মোরে করিল
কেন যে করিল মোরে, গোড়া কোথা পাইল
গোড়া নাই, আগা নাই,
মাথার দেখিতে পাই,
এ বড় মজার কথা, তবে কেমনেতে,
ধূমো হি দৃশ্যতে যত্র, অনলস্তত্র বিদ্যতে?
এ যে বড় হল দায়,
মাঝে পড়ে প্রাণ যায়,
প্রকৃতি গো, এ গাছের মূল কোথা বল
আমি—বৃক্ষে, আর কত খাই বিষ ফল।
নেবে যাই গাছ হ'তে
মূল ধরে পাতালেতে,
শেষ নাগ যেখানেতে, কারণ বারিতে
যোগাযোগ করিতেছে মণির প্রভাতে।
সুধা হ্রদ যার মূলে,
সে গাছেতে বিষ ফলে ?
প্রকৃতি গো, পায়ে ধরি বল সে কাহিনী
কর্ম্মঘুণ কোথা হ'তে আসিল জননি ?

১৬

সকলেই পূর্ব্বাপর কর্ম্মফল বলে,
কেন বলে জানি না, মা, কার আজ্ঞা বলে;

বেদ বলে, সাংখ্যবলে,
বেদান্ত, দর্শন বলে,
গীতা ভাগবত, আর শাস্ত্র সমুদয়,
এক বাক্যে বলে মাগো, কর্ম্মফল জয়,
তবে মা, আমি কি বলি ?
দাও মন্ত্র কাণে ঢালি,
দেখাও সন্তানে মাগো জ্ঞান-চক্ষু দিয়ে,
কেমন জীবের কর্ম্ম, প্রকৃতি আলয়ে ;
কর্ম্ম, জীব, পরস্পরে
বাঁধা কি অনন্ত ডোরে,
কার পর কেবা মাগো, কিংবা এক যোগে?
না, না,—মাগো, নমস্কার
বেদ বাক্যে বার বার,
গীতা, ভাগবত, আর বেদান্ত বচনে;
মহা যোগী কপিলের অমূল্য চরণে;
আমিও মা, গাই তবে,
কর্ম্মবীজ আদি ভবে,
গাও তবে দেব, নর, করিয়া ভকতি।
"নমস্তং কর্ম্মভ্যো বিধিরপিন যে ভ্যঃ-
প্রপবতি ॥"

---

# নবজীবন।

২য় ভাগ } চৈত্র ১২৯২। { ৯ম সংখ্যা।

## আর্য্যধর্ম্মের ভাবীরূপ।

### দ্বিতীয় অধ্যায়।

ধর্ম্ম নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়
আচার অনিত্য ও পরিবর্ত্তনীয়।

ধর্ম্ম কাহাকে বলে, ভগবান্ মনু তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

"ধৃতিঃক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ
ধীর্ব্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥"

মনু সংহিতা ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৯২ শ্লোক।

ধৃতি ক্ষমা, দম, অচৌর্য্য, মনঃশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সংযম, ধীঃ, আত্মজ্ঞান, সত্যানুরাগ, এবং অক্রোধ এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ।

'ধীঃ' শব্দের প্রকৃত অর্থ বুদ্ধিবৃত্তি, কুল্লুকভট্ট বলেন, এস্থলে ইহার অর্থ 'শাস্ত্রাদি তত্ত্বজ্ঞান।' মনু কোন্ অর্থে এই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। যাহার বুদ্ধি অল্প এবং শাস্ত্রজ্ঞান নাই বলিলেই হয়, তাহারও যদি কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকে, সেও ধার্ম্মিক হইতে পারে; অতএব প্রচলিত ব্যাখ্যা অবলম্বন করিলে, 'ধীঃ' ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষণ নহে বলিতে হইবে। (১)।

---

(১) কুল্লুকভট্ট আরও বলেন, 'ধৃতি' অর্থে 'সন্তোষ।' বোধ হয় মনুর অভিপ্রায় এই যে, যে ব্যক্তি আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া পরশ্রীকাতর না

'ধীঃ' অনির্দ্দিষ্ট লক্ষণ বলিয়া ত্যাগ করিয়া, মানবধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত অন্যান্য নয়টি লক্ষণ যে ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষণ, ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অবশ্য স্বীকার করিবেন। ধর্ম্ম নিত্য এবং সার্ব্বভৌমিক; তাহা দেশ কালও অবস্থাভেদে পরিবর্ত্তনীয় নহে। আচার অনিত্য; তাহা দেশকালও অবস্থা ভেদে পরিবর্ত্তনীয়। অমাৎসর্য্য, ক্ষমা, দয়া, অচৌর্য্য, সত্যানুরাগ, অক্রোধ ও ইন্দ্রিয় সংযম সত্যযুগে ধর্ম্ম ছিল, এখনও ধর্ম্ম। মনু এক স্থলে বলিয়াছেন. বটে, যে সত্যযুগের ধর্ম্ম অন্য, ত্রেতার ধর্ম্ম অন্য, দ্বাপরের ধর্ম্ম অন্য এবং কলির ধর্ম্ম অন্য (মনু সংহিতা ১অ ৫৮)। এই বচনের প্রকৃত অর্থ এই যে, কালভেদে ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসন ভিন্ন হইবে; কিন্তু ধৃতি আদি ধর্ম্মের লক্ষণের ব্যত্যয় হইবে না। অস্তেয় বা অচৌর্য্য সকল যুগেই ধর্ম্ম; এবং তদ্বিপরীত চৌর্য্য সকল যুগেই অধর্ম্ম। কিন্তু এই অধর্ম্মের দণ্ডবিধান মনু এক প্রকার করিয়াছেন, যাজ্ঞবল্ক্য অন্য প্রকার, মুসলমান ইমামগণ অন্য প্রকার, এবং ইংরেজি ব্যবস্থাপকগণ অন্য প্রকার করিয়াছেন। দণ্ডের পার্থক্যবশতঃ উক্ত পাপের গুরুত্ব বা লঘুত্ব হয় নাই।

মহাপ্রভু চৈতন্য বলিয়াছেন,

"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসুচ।
প্রেমো মৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥"

ঈশ্বরে প্রেম, তদধীনে মৈত্রী মূঢ়ে কৃপা এবং বিদ্বেষীর প্রতি যিনি উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যম বৈষ্ণব। এই বচনে মধ্যম বৈষ্ণব কেন, পরম ধার্ম্মিকের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কারণ যাঁহার মানবের প্রতি মৈত্রী আছে, তিনি অবশ্যই সত্যবাদী, দয়াবান্, অহিংসক ও সংযতেন্দ্রিয় হইবেন। (১) মনু

---

হয়, সে ধৃতি অর্থাৎ অমৎসরতা গুণযুক্ত। 'দেহশোধনং শৌচং' কুল্লুককৃত এই ব্যাখ্যার শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। চূড়ামণি মহাশয় যথার্থ ই বলিয়াছেন. "মনঃশুদ্ধিই যখন সকল শাস্ত্রের একমত উদ্দেশ্য, তখন তাহা পরিত্যাগ করিয়া কেবল দেহ ধৌত করাকে শৌচ বলা যুক্তি বিরুদ্ধ বোধ হইল"—ধর্ম্ম ব্যাখ্যা ১ম খণ্ড ১০ পৃষ্ঠা।

(১) কোন কোন বৌদ্ধগ্রন্থে 'মৈত্রী' ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এক জন ব্যবহারাজীব ঈশাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ধর্ম্মের সার কি?"। তদুত্তরে ঈশা বলিয়া ছিলেন, 'ঈশ্বরে প্রেম ও মানবে মৈত্রী" মেথি ২২ অং ৩৬—৪০ সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে ধর্ম্মজিজ্ঞাসু মহাত্মারা নিত্য ও সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রায় এক প্রকার মীমাংসাই করিয়া গিয়াছেন।

চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মারা নিত্য ধর্ম্মের যে সমস্ত লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহার প্রতি জনসাধারণের আস্থা এখনও আছে, এবং উত্তরকালেও থাকিবে; কিন্তু অনিত্য আচার পরিবর্ত্তিত হইবে। আমাদের কোন কোন পুরাণও স্মৃতিতে নিত্য ধর্ম্ম বিশেষ অনিত্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এবং কোন কোন আচারও নিত্য ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইয়াছে। ইহার কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

(১) সতীত্ব নিত্য ধর্ম্ম। ইহা মানব ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মের পঞ্চম ও ষষ্ঠ লক্ষণের (শৌচ এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহের) অন্তর্গত; কিন্তু মহাভারতে কুন্তির প্রতি পাণ্ডুর উক্তি পাঠ করিয়া অনেক হিন্দুরই এই সংস্কার জন্মিয়াছে, যে, সতীত্ব নিত্য ধর্ম্ম নহে; উদ্দালক মুনির পুত্র শ্বেতকেতু স্ত্রীলোকদিগের স্বেচ্ছা-বিহার রহিত করিয়া, সতীত্বধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন। (১)

ধর্ম্ম ঈশ্বরের ন্যায় অনাদি ও অনন্ত; কোন মনুষ্যের সাধ্য নাই, যে, সে নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি করে, অথবা পুরাতন ধর্ম্ম বিনষ্ট করে। মহাভারতের আদিপর্ব্বে কথিত আছে, যে, একদা একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া শ্বেতকেতুর মাতার হাত ধরিয়া, তাঁহার সহিত বিহার করার মানসে তাঁহাকে একান্তে লইয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া, শ্বেতকেতু ক্রুদ্ধ হইলেন। শ্বেতকেতুর পিতা উদ্দালক শ্বেতকেতুকে বলিলেন, "বৎস, রাগ করিও না, এ সনাতন ধর্ম্ম।" শ্বেতকেতু তৎকালে ক্রোধ সম্বরণ করিলেন; কিন্তু তৎপরে এই নিয়ম স্থাপন করিলেন, "অতঃপর যে নারী পতিকে অতিক্রম করিবে, সে ভ্রূণ হত্যার সমান পাপে পতিত হইবে, এবং যে পুরুষ সাধুশীলা পতিব্রতা পত্নীকে অতিক্রম করিবে, তাহারও ঐরূপ পাপ হইবে।" শ্বেতকেতুকে উদ্দালক নারীগণের সচ্ছন্দ বিহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "এষধর্ম্মঃ সনাতনঃ"। যদি উদ্দালকের এই উক্তি সত্য হয়, তাহা হইলে এক্ষণেও স্ত্রীলোকদিগের সচ্ছন্দ বিহারে কিছুমাত্র দোষ নাই, এবং সতীত্ব কৃত্রিম ধর্ম্ম, কারণ সনাতন ধর্ম্ম রহিত করে এমন কাহার সাধ্য নাই। বস্তুতঃ অতি পুরাকালে স্ত্রী পুরুষ

---

(১) অনাবৃতা কিলপুরা আসনস্ত্রিয় বরাননে।
কামাচার বিহারিণ্য স্বতন্ত্রশ্চারুহাসিনি॥
* * * * * *
ঋষিপুত্রোহচ তৎধর্ম্মং শ্বেতকেতুর্নচক্ষমে।
চকার চৈব মর্য্যাদামিমাং স্ত্রীপুংসয়োর্ভুবি॥

মহাভারত, আদিপর্ব্ব।

সকলেই গবাদির ন্যায় সচ্ছন্দ-বিহার করিত (১)। ইহাতে সমাজের অনিষ্ট হওয়ায় সতীত্ব রক্ষার জন্য নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু ঐ নিয়ম দ্বারা সতীত্ব নামে নূতন ধর্ম্ম সৃষ্ট হয় নাই। উদ্দালকের সময়ে স্ত্রীলোকদের মধ্যে অসতীত্ব বা সচ্ছন্দ-বিহার প্রাদুর্ভূত ছিল বলিয়া, অসতীত্বকে সনাতন ধর্ম্ম বলা উদ্দালকের ভ্রম। মনুর সময়ে কোন পুরুষ পুত্রোৎপাদনে অপারগ হইলে আপন স্ত্রীকে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন জন্য অপর পুরুষের নিকট নিয়োগ করিতে পারিত বটে; তথাপি এই প্রথা দ্বারা সাধারণ বিধির ব্যত্যয় হয় নাই বলিলেই হয়। মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে সতীত্ব নিত্য ধর্ম্ম বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। সাবিত্রীর উপাখ্যান পাঠ করিয়া বোধ হয়, বেদব্যাস ও সতীত্বকে নিত্যধর্ম্ম বলিয়া মানিতেন; তথাপি আদিপর্ব্বে পাণ্ডুর উক্তি পড়িয়া পাঠকের ভ্রম জন্মাইতে পারে।

শ্বেতকেতুর নিয়ম অতি উৎকৃষ্ট নিয়ম। তাহা সম্যক্ প্রতিপালিত হইলে, হিন্দুসমাজ হইতে অধিবেদন প্রথা তিরোহিত প্রায় হইত; পত্নী বন্ধ্যা, চিররোগিনী, ব্যভিচারিণী বা মৃতা না হইলে, কেহই দ্বিতীয়া পত্নী-গ্রহণ করিতেন না।

ব্যচরস্ত্যাঃ পতিংনার্য্যা অদ্য প্রভৃতি পাতকম্।
ভ্রূণ হত্যাসমং ঘোরং ভবিষ্যত্যসুখাবহম্॥
ভার্য্যাং তথা ব্যুচ্চরতঃ কৌমার ব্রহ্মচারিণীম্।
পতিব্রতামেতদেব ভবিতা পাতকংভুবি॥

হিন্দুসমাজে শ্বেতকেতুর এই ব্যবস্থা কেবল স্ত্রীলোকদের পক্ষেই প্রবল রহিয়াছে; বরং নিয়ম পূর্ব্বাপেক্ষা কঠিনতর হইয়াছে। শ্বেতকেতুর এই বচন বিধবা বিবাহ নিষেধক নহে; কারণ প্রথম শ্লোকার্দ্ধে 'পতি' শব্দে 'জীবিত পতি' বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয় শ্লোকে 'ভার্য্যা' শব্দে 'জীবিতা ভার্য্যা' বুঝিতে হইবে; ভার্য্যার মৃত্যু হইলেও ভার্য্যান্তর গ্রহণ করিতে পারিবে না; অথবা পতির মৃত্যু হইলে, অন্য পতিগ্রহণ করিতে পারিবে না, শ্বেতকেতুর এমন অভিপ্রায় নহে। শ্বেতকেতু স্ত্রী ও পুরুষের পাপের কিছুমাত্র পার্থক্য করেন নাই। পতিকে অতিক্রম করায় যে পাপ, ব্রহ্মচারিণী এবং পতিব্রতা স্ত্রীকে অতিক্রম করায়ও সেই পাপ।

(১) Sir John Lubbock on Communal Marriage (Origin of Civilisation, Chapter 3) & M. Lellan's Primitive Marriage.

ব্যভিচার সকলের পক্ষেই দূষণীয়; তথাপি এই পাপের লঘুত্ব ও গুরুত্ব আছে। মনে কর মদ্যপায়ী স্বামী স্ত্রীকে নানা প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা এবং অন্ন বস্ত্রের কষ্ট দিয়া, অবশেষে বাটীর বাহির করিয়া দিল; এমন অবস্থায় নিরাশ্রয়া স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে, তাহার পাপের মার্জ্জনা আছে। আবার মনে কর স্বামীর প্রাণাধিকা পত্নী কামের বশবর্ত্তিনী হইয়া ভ্রষ্টা হইল; তাহার পাপ গুরুতর। পত্নীহীন পুরুষ বেশ্যাগমন করিলে, তাহার পাপ লঘু; যে পুরুষ পরস্ত্রীর সতীত্ব নাশ করে, তাহার পাপ গুরু। ব্যভিচার দোষের গুরুত্ব ও লঘুত্ব না বুঝিয়া ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের রচয়িতা মহাভ্রমে পড়িয়াছেন। তাঁহার মতে কুলটাগমনে পাপ লঘু, আর মহাবেশ্যাগমনে পাপ গুরু। বৃষলী, পুংশ্চলী, বেশ্যা ও যুম্পীগমনে পাপ নাতি গুরু, নাতি লঘু। (১) এক্ষণে বিবেচনা করা উচিত যে সতীর সতীত্ব নাশ না করিয়া কুলটাগমন হইতে পারে না; বৃষলী, পুংশ্চলী বা বেশ্যাগমনে অন্য যেমন পাপ হউক না কেন, সতীর সতীত্ব নাশ জনিত মহাপাতক হয় না। ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণকার কোন্ যুক্তি অবলম্বন করিয়া কুলটাগমন মহা বেশ্যাগমন অপেক্ষা একশত গুণ লঘুতর পাপ বিবেচনা করেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

(২) বৃহন্নারদীয়মতে কলিযুগে সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ (২)। অন্যান্য যুগে যে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ ছিল না, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১১৬ সূক্তে লিখিত আছে, যে, তুগ্র রাজর্ষির পুত্র ভুজ্যু দ্বীপবাসী শত্রুদিগের বিনাশ জন্য সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন; সমুদ্রে নৌকাভগ্ন হওয়ায় অশ্বিনীকুমারদ্বয় ভুজ্যুকে রক্ষা করিয়াছিলেন। মানব

---

(১) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড। পতিকে অতিক্রম করিয়া যে স্ত্রী এক পুরুষগামিনী হয়, সে কুলটা, যে দুই পুরুষগামিনী হয়, সে বৃষলী, যে তিন পুরুষগামিনী হয়, সে পুংশ্চলী, যে চারি পুরুষগামিনী হয়, সে বেশ্যা, যে পাঁচ ছয় বা সাত পুরুষগামিনী হয়, সে যুম্পী, ও যে আট বা তদধিক পুরুষগামিনী হয়, সে মহাবেশ্যা। উক্ত পুরাণমতে কুলটাগামী এক শতাব্দী, অবটোদ নরকে বাস করে। ধৃষ্টাগামীর পাপভোগ তাহার চতুর্গুণ, পুংশ্চলীগামীর ষট্‌গুণ, বেশ্যাগামীর অষ্টগুণ, যুম্পীগামীর দশগুণ, এবং মহাবেশ্যাগামীর একশত গুণ।

(২) সমুদ্রযাত্রা স্বীকার কমণ্ডলু বিধারণম্।
দ্বিজানাম্ সবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা॥
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্মধুপর্কে পশোর্বধ।
মাংসাদনং তথাশ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা॥

ধর্ম্মশাস্ত্রে সমুদ্রযাত্রার নিষেধ নাই; তবে তৃতীয়াধ্যায়ে লিখিত আছে যে পিতৃশ্রাদ্ধে জটিল ও মুণ্ডব্রহ্মচারীকে, বহু যাজনশীল যাজককে, বেতনগ্রাহী অধ্যাপককে, সমুদ্রযায়ী প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করিবে না। রামায়ণে যবদ্বীপের উল্লেখ আছে।

"যত্নবন্তো যবদ্বীপং সপ্তরাজ্যোপশোভিতং।
সুবর্ণরূপ্যকং দ্বীপং সুবর্ণ করমণ্ডিতং॥"

ইতি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৪০ সর্গ।

যদি পূর্ব্ব পূর্ব্বযুগে সমুদ্রযাত্রা অধর্ম্ম ছিল না, এক্ষণেও হইতে পারে না; কারণ ধর্ম্মাধর্ম্ম নিত্য পদার্থ। মনু যে ধর্ম্মের দশ লক্ষণ বলিয়াছেন, সমুদ্র যাত্রা দ্বারা ইহার কোন্ লক্ষণের ব্যত্যয় হয়? যদি না হয়, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে বৃহন্নারদীয়ের রচয়িতা কৃত্রিম অধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া স্বজাতির পায়ে শৃঙ্খল বাঁধিয়াছেন। যদি এখন সমুদ্রযাত্রায় পাপ হয়, পরে এক স্মার্ত্ত নিয়ম করিতে পারিবেন যে পদ্মা ও মেঘনা নদীর উপর যাত্রায় পাপ আছে, অথবা লাল বাঁধপুকুরে, সাগর দীঘিতে বা কৃষ্ণসায়রে যাত্রায় পাপ আছে।

যদি বল মনুষ্যের শক্তির হ্রাসহেতু যে কার্য্যে পূর্ব্বে দোষ ছিল না; তাহা এক্ষণে দূষণীয় হইয়াছে, তদুত্তরে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, "শক্তি হ্রাসের প্রমাণ কি?" মনুষ্য কোন কালে কেবল শারীরিক বলে সিংহ ব্যাঘ্রাদির সমকক্ষ ছিল না। তাহার দৈহিক বল সর্ব্বকালেই সামান্য। বুদ্ধি বলে ও অস্ত্র বলে মনুষ্য পৃথিবীতে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। ভুজ্যু যখন সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন, তখন বরং তাঁহার কার্য্য দোষাবহ ছিল; কারণ তৎকালের তরী এক্ষণকার পোতাপেক্ষা সর্ব্বাংশে নিকৃষ্ট ছিল; তখন কেহ কোম্পাসের ব্যবহার জানিত না; কেবল সূর্য্য ও তারা দেখিয়া সমুদ্রে নৌকা বাহিত। এক্ষণে বাষ্পীয় যন্ত্রদ্বারা মনুষ্যের শক্তির বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়াছে; কোম্পাসদ্বারা দিক্ নিরূপণ অতি সহজ ব্যাপার হইয়াছে;

---

দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়া পুনর্দ্দানং পরস্য চ।
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ॥
মহাপ্রস্থান গমনং গোমেধঞ্চ তথা মখম্।
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাহুর্মনিষিণঃ॥

ইতি উদ্বাহতত্ত্বধৃত বৃহন্নারদীয়।

জ্যোতিষের এখন সূক্ষ্ম গণনা হইয়াছে। এবং ভূগোলে এমন ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে, যে পোতবাহন এক্ষণে পূর্ব্ববৎ দুরূহ ব্যাপার নহে। নাবিক বিদ্যাজনিত শক্তির বৃদ্ধি হেতু সমুদ্র যাত্রা পূর্ব্বাপেক্ষা এত সহজ ব্যাপার হইয়াছে, যে পূর্ব্বকালের তিন মাসের পথ এক্ষণে তিন দিনে যাওয়া যায়। আগে যাঁহারা যবদ্বীপে যাত্রা করিতেন, তাঁহারা প্রাণের আশা ছাড়িয়া যাত্রা করিতেন; এক্ষণে আবাল বৃদ্ধ বনিতা তথায় সচ্ছন্দে যাইতে পারে। অতএব পূর্ব্বকালে সমুদ্রযাত্রা নিষেধের বরং কারণ ছিল; এক্ষণে সে কারণ আদৌ নাই।

বৃহন্নারদীয়ের রচয়িতা সমুদ্রযাত্রা, কমণ্ডলু ধারণ, প্রভৃতি আচারকে "ইমান্ ধর্ম্মান্" বলিয়া উক্ত করায় ভ্রমজালে পতিত হইয়াছেন। ধর্ম্মের দশ লক্ষণের কোন লক্ষণই ঐ সমস্ত আচারে নাই। যদি সমুদ্র যাত্রা ধর্ম্ম ছিল বলা যায়, তাহা কি কারণে অধর্ম্ম হইল, কেহই বলিতে পারেন না। হিন্দু সমাজের এক্ষণে এমন শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে যে যাঁহারা সমাজপতি বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহারা বুঝিতে পারেন না, যে ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম নিত্য পদার্থ; কোন ঋষির সাধ্য নাই যে ইহার অন্যথা করে। তাঁহাদের নিকট মানবধর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত দশ লক্ষণ যুক্ত সনাতন ধর্ম্মাপেক্ষা অনিত্য আচারের অধিক আদর। এমন কখনও শুনি নাই যে অমুক মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া, কূট লেখন প্রস্তুত করিয়া, বিধবা বা অনাথের সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া সমাজ চ্যুত হইয়াছে; কিন্তু ইহা সর্ব্বদাই শুনিতে পাই যে অমুক সমুদ্রযাত্রা করিয়া ইংলণ্ডে বিদ্যা শিখিতে গিয়াছিলেন, তিনি সমাজচ্যুত হইয়াছেন। তিনি সত্যবাদী দয়াবান্ ও জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন; মানবধর্ম্ম তাহাতে থাকিতে পারে; তথাপি তাঁহার অপরাধের মার্জনা নাই।

হিন্দু সমাজ তাঁহার বিরুদ্ধে খড়্গ হস্ত। যে পুরুষ আধুনিক আচার না মানিয়া, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের পূর্ব্ব পুরুষদিগের আচার অবলম্বন করে, সে এক্ষণে নিত্যধর্ম্ম পালন করিয়াও বিধর্ম্মী ও অহিন্দু হয়; আর যে পুরুষে নিত্য ধর্ম্মের কোন লক্ষণই নাই, সেও অনিত্য আধুনিক আচারে আস্থা দেখাইয়া হিন্দু বলিয়া গণ্য হয়। হিন্দু সমাজ ইহার প্রতিকার করুন, নতুবা মহা বিভ্রাট ঘটিবে।

শ্রীতারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

# ঋগ্বেদের দেবগণ।

## পঞ্চম প্রস্তাব।

**সরস্বতী প্রভৃতি দেবীগণ। ব্রহ্মণস্পতি, বিষ্ণু ও রুদ্র। বিশ্বকর্ম্মা ও প্রজাপতি।**

ঋগ্বেদে যে সকল দেবীর স্তুতি আছে, তাঁহাদিগের মধ্যে সরস্বতী ভিন্ন কেহই ভারতবর্ষে এক্ষণে উপাসিতা হয়েন না; অদিতি বা উষার উপাসনা এক্ষণে প্রচলিত নাই। আবার এক্ষণে যে সকল দেবীর উপাসনা ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে, তাঁহাদিগের মধ্যে সরস্বতী ভিন্ন কেহই ঋগ্বেদের উপাস্যা দেবী নহেন, শক্তি, কালী দুর্গা, উমা জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী প্রভৃতি আধুনিক দেবীগণ ঋগ্বেদের উপাস্যা দেবী নহেন, তাঁহাদিগের নাম পর্য্যন্ত ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না, তাঁহাদিগের উপাসনা ঋগ্বেদ রচনার অনেক পর কল্পিত হইয়াছে। প্রচীনা দেবীদিগের মধ্যে কেবল মাত্র সরস্বতীর পূজাই অদ্যাবধি প্রচলিত আছে, ভারতবর্ষে যেন যুগ যুগান্তর পর্য্যন্ত বিদ্যার আদর থাকে।

ঋগ্বেদে সরস্বতী নদী দেবীও বটেন, বাক্‌দেবীও বটেন। সরঃ শব্দ অর্থে জল, সরস্বতী অর্থে জলবতী; ভারতবর্ষে যে সরস্বতী নামক নদী আছে তাহাই প্রথমে পবিত্র নদী বলিয়া উপসিত হইত। বোধ হয় সেই নদী তীরে ঋষিগণ যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন, বোধ হয় সেই নদী তীরে ঋগ্বেদের পবিত্র মন্ত্র ও স্তুতি উচ্চারিত হইত, সুতরাং সরস্বতী নদী অচিরে সেই মন্ত্র ও স্তুতির দেবী অর্থাৎ বাগ্দেবী হইয়া গেলেন। নিম্ন স্তোত্রে সরস্বতীর উভয় প্রকৃতিই বর্ণিত হইয়াছে।

"পবিত্রা, অন্ন যুক্তযজ্ঞ বিশিষ্টা ও যজ্ঞ ফলদায়িনী সরস্বতী আমাদিগের অন্নবিশিষ্ট যজ্ঞ কামনা করুন।

"সূনৃত বাক্যের উৎপাদয়িত্রী, সুমতি লোকদিগের শিক্ষয়িত্রী, দেবী সরস্বতী আমাদিগের যজ্ঞ গ্রহণ করুন।

"সরস্বতী প্রবাহিতা হইয়া প্রভূত জল সৃজন করিয়াছেন, এবং জ্ঞান উদ্দীপন করিয়াছেন।

১ মণ্ডল, ৩ সূক্ত, ১০, ১১, ১২ ঋক্।

৭ মণ্ডলের ৯৬ সূক্তে সরস্বতীকে সরস্বৎ নামক এক দেবের পত্নী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু ঋষি স্পষ্টই "সরস্বতী" স্ত্রীলিঙ্গ শব্দকে পুংলিঙ্গ করিয়া একটি দেব কল্পনা করিয়াছেন মাত্র, নচেৎ সরস্বৎ নামে ঋগ্বেদে পৃথক কোন দেব নাই। সরস্বতী যে নদী তাহা ঋষিগণ স্পষ্টই জানিতেন, তাঁহাদের সমস্ত স্তুতিতেই সেই সরস্বতী নদী রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

পুরাণে ইলা মনুর কন্যা, ঋগ্বেদে ইলা একজন উপাস্যা দেবী, কিন্তু মনুর কন্যা নহেন। ঋগ্বেদে ইলার আদি অর্থ কি ঠিক করা দুষ্কর। সায়ণ অনেক স্থানে ইলা অর্থে পৃথিবী বা ভূমি, এবং অনেক স্থানে ইলা অর্থে পৃথিবীস্থ বাক্ করিয়া গিয়াছেন। ফরাসী পণ্ডিত বর্ণুফ (Burnouf) ইলার এই দুই অর্থ করিয়া গিয়াছেন বাক্য ও ভূমি। ১ মণ্ডলের ৩১ সূক্তের ১১ ঋকে আছে যে দেবগণ ইলাকে মনুর ধর্ম্মোপদেষ্ট্রী করিয়াছেন।

বর্ণুফ বলেন মনু অর্থে মনুষ্য, ইলা অর্থে বাক্য, দেবগণ বাক্য দ্বারাই মনুষ্যের জ্ঞানের সঞ্চার করিয়াছেন।

ইলার সঙ্গে ঋগ্বেদের অনেক স্থলে মহী বা ভারতী এবং সরস্বতীকে আহ্বান করা হইয়াছে। সায়ণ ইলা অর্থে পৃথিবীস্থ বাক করিয়া সরস্বতী অর্থে অন্তরীক্ষস্থ বাক্ এবং মহী বা ভারতী অর্থে স্বর্গস্থ বাক্ করিয়া গিয়াছেন। আবার ভারতী অর্থে ভরত নামক আদিত্যের পত্নী বলিয়া কোন কোন স্থানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ১।২২।১০ ঋকের টীকা দেখ। ঐ ঋকে হোত্রা ও বরুত্রী ধিষণারও উল্লেখ আছে; সায়ণ হোত্রা অর্থে অগ্নি পত্নী এবং ধিষণা অর্থে বাগ্দেবী করিয়া গিয়াছেন।

Muir বিবেচনা করেন যে ইলা, ভারতী, মহী, হোত্রা, বরুত্রী, ধিষণা এ সকল গুলিই যজ্ঞের বিশেষ বিশেষ অংশ বাচক শব্দ, ক্রমে দেবী বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

পৃথিবী দ্যুর পত্নী এবং দেব গণের মাতা তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রুদ্রের পত্নী রোদসীর বিষয়ও পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইন্দ্রের স্ত্রী ইন্দ্রাণী, বরুণের স্ত্রী বরুণানী, অগ্নির স্ত্রী অগ্নায়ী এই সকল দেবের স্থানে স্থানে উল্লেখ আছে মাত্র, কোন ও পৃথক স্তুতি নাই। পুংলিঙ্গ দেব বাচক শব্দ গুলিকে স্ত্রীলিঙ্গ করিয়া ঋষিগণ দেবীর কল্পনা করিয়াছেন মাত্র—, পুরাণে সে

কল্পনা সম্পূর্ণতা লাভ করিল। পুরাণের ইন্দ্রানী কেবল নাম মাত্র নহেন, রূপ লাবণ্য বিশিষ্টা নানা গুণোপেতা স্বর্গের মহিষী, এবং অনন্ত পৌরাণিক উপাখ্যানের আধার ভূতা।

ঋগ্বেদের দেব দেবীর কথা প্রায় সাঙ্গ হইল, কেবল তিন জনের কথা বলিতে বাকি আছে; পুরাণে যাঁহারা সৃষ্টি কর্ত্তা, পালন কর্ত্তা ও ধ্বংস কর্ত্তা, ঋগ্বেদে তাঁহাদের কি পরিচয় পাওয়া যায়?

ঋগ্বেদে ব্রহ্মা বলিয়া দেবতা নাই; ব্রহ্ম অর্থে প্রার্থনা, ঋগ্বেদে ব্রহ্মা অর্থে প্রার্থনা কারী এক জন পুরোহিত বিশেষ। ব্রহ্মণস্পতি অথবা বৃহস্পতি নামে ঋগ্বেদে এক জন দেব আছেন, তিনি প্রার্থনার পতি। ঋগ্বেদের অনেক স্থানে তিনি অগ্নির রূপান্তর মাত্র।

"ব্রহ্মণস্পতি নিঃসন্দেহই পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করেন, সেই মন্ত্রে ইন্দ্র বরুণ মিত্র ও অর্য্যমা দেবগণ অবস্থিতি করেন।

"হে দেবগণ! সে মন্ত্র সুখের উৎপত্তি হেতু এবং হিংসা দোষ রহিত, আমরা যজ্ঞে সেই মন্ত্র উচ্চারণ করি। হে নেতৃগণ! যদি তোমরা মন্ত্র কামনা কর, তাহা হইলে কমনীয় মন্ত্র সকল তোমাদিগের নিকট উপনীত হইবে।

"যিনি দেবগণ কে কামনা করেন, তাঁহার নিকট ব্রহ্মণস্পতি ভিন্ন কে আইসে? যিনি যজ্ঞের জন্য কুশ ছিন্ন করেন তাঁহার নিকট ব্রহ্মণস্পতি ভিন্ন কে আইসে? হব্যদাতা যজমান ঋত্বিকদিগের সহিত যজ্ঞ স্থানে গমন করিয়াছেন, বহু ধনোপেত গৃহে গমন করিয়াছেন"।

১ মণ্ডল, ৪০ সূক্ত, ৫।৬।৭ ঋক্।

এই ঋক্ গুলিতে এবং এই রূপ ঋগ্বেদের অন্যান্য অনেক ঋক গুলিতে স্পষ্টই দেখা যায়, যে ব্রহ্মণস্পতি ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রার্থনার পতি। এই ব্রহ্মণস্পতি-কেই ঋগ্বেদে কোন কোন স্থানে "ব্রহ্মা" বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে;— ৪। ৫০ সূক্তের ৮ ও ৯ ঋক্ দেখ।

ঋগ্বেদে বিষ্ণুর ও নাম পাওয়া যায়, এবং তিনি তিন পদবিক্ষেপ দ্বারা জগৎ পরিক্রম করিয়াছিলেন,—এ কথা ও পাওয়া যায়।

"বিষ্ণু সপ্ত ধামের সহিত যে ভূপ্রদেশ হইতে পরিক্রম করিয়াছিলেন, সেই প্রদেশ হইতে দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন।

"বিষ্ণু এই জগৎ পরিক্রম করিয়াছিলেন, তিন প্রকার পদবিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার ধূলিযুক্ত পদে জগৎ আবৃত হইয়াছিল।

"বিষ্ণু রক্ষক, তাঁহাকে কেহ আঘাত করিতে পারে না, তিনি ধর্ম্ম, সমুদয় ধারণ করিয়া তিন পদ পরিক্রম করিয়াছিলেন।

"বিষ্ণুর যে কর্ম্মবলে যজমান ব্রত সমুদয় অনুষ্ঠান করেন, সেই কর্ম্ম সকল অবলোকন কর, বিষ্ণু ইন্দ্রের উপযুক্ত সখা।

"আকাশে সর্ব্বতো বিচারী চক্ষু যেরূপ দৃষ্টি করে, বিদ্বানেরা বিষ্ণুর পরম পদ সেইরূপ সর্ব্বদা দৃষ্টি করে।

"স্তুতিবাদক ও সদা জাগরুক মেধাবী লোকেরা সেই বিষ্ণুর পরম পদ প্রদীপ্ত করেন।"

১ মণ্ডল, ২২ সূক্ত, ১৬ হইতে ২১ ঋক্।

বিষ্ণু তিন প্রকার পদ বিক্রম করিয়াছিলেন তাহার অর্থ কি? ঋগ্বেদের বিষ্ণু কে?

শাকপুণিঃ ও ঔর্ণবাভ নামক ঋগ্বেদের দুই জন পুরাতন ব্যাখ্যাকার ছিলেন, তাঁহাদিগের মত যাস্ক নিরুক্ততে উদ্ধৃত করিয়াছেন। দুর্গাচার্য্য কৃত নিরুক্ত ব্যাখ্যা হইতে প্রতীয়মান হয়, যে বিষ্ণু আদিত্য অর্থাৎ সূর্য্য। শাকপুণির মতে সেই বিষ্ণু পৃথিবীতে অগ্নিরূপে, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎরূপে এবং স্বর্গে সূর্য্যরূপে বর্ত্তমান আছেন,—এই তাঁহার তিন পদবিক্ষেপ। ঔর্ণবাভের মতে সেই সূর্য্যরূপ বিষ্ণু সমারোহণের সময় উদয় গিরিতে, দ্বিপ্রহরের সময় মধ্য আকাশে এবং অস্ত যাইবার সময় অস্ত গিরিতে পদ বিক্ষেপ করেন, এই তাঁহার তিন পদবিক্ষেপ।

এই সূর্য্যরূপ বিষ্ণুর জগতে পদবিক্ষেপ স্বরূপ একটি বৈদিক উপমা হইতে ক্রমে নানা উপাখ্যান রচিত হইতে লাগিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে যে দেব ও অসুরদিগের মধ্যে এই জগৎ বিভাগ কালে ইন্দ্র বলিলেন, বিষ্ণু যতটুকু তিন পদে বিক্রম করিতে পারেন, ততটুকু দেবগণের, অবশিষ্ট অসুরদিগের। অসুরগণ সম্মত হইল, এবং বিষ্ণু তিন পদ বিক্রমে জগৎ ও বেদ ও বাক্য ব্যাপ্ত করিলেন। শতপথ ব্রাহ্মণে অসুরগণ বলিতেছে বামনরূপ বিষ্ণু শয়ন করিলে যতটুকু স্থান ব্যাপ্ত হয় ততটুকু দেবগণের, দেবগণ সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সমস্ত জগৎ পাইলেন। আবার ঐ ব্রাহ্মণে বিষ্ণুর সকল দেবের মধ্যে প্রাধান্য লাভের এবং তৎপর তাঁহার মস্তক ছিন্ন হওয়ার কথা আছে, এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যকেও পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণেও এই কথা পাওয়া যায়। তাহার পর বিষ্ণুর বামন অবতার ও বলি রাজার দমন সম্বন্ধে

পৌরাণিক উপাখ্যান আমরা সকলেই জানি। সূর্য্যের আকাশ ভ্রমণ সম্বন্ধে একটি বৈদিক উপমা হইতে কত উপাখ্যান সৃষ্ট হইয়াছে।

ঋগ্বেদে রুদ্রের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তিনিও পৌরাণিক রুদ্র নহেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঋগ্বেদের রুদ্র মরুৎগণের অর্থাৎ ঝড়ের পিতা, অথচ রুদ্র অগ্নির রূপ বিশেষ তাহাও বেদে দেখিতে পাওয়া যায় *। আর রুদ ধাতু অর্থে ক্রন্দন করা বা শব্দ করা, রুদ্র ঝড়ের পিতা, শব্দকারী, অগ্নিরূপী দেব। এখন আমরা রুদ্রের বৈদিক অর্থ বুঝিলাম, রুদ্রের আদি অর্থ বজ্র।

এক্ষণে একটি বিষম প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে। ঋগ্বেদে ব্রহ্ম অর্থে প্রার্থনা, ব্রহ্মা অর্থে একজন পুরোহিত, ব্রহ্মণস্পতি অর্থে প্রার্থনার দেব, অগ্নির রূপ বিশেষ, তাঁহাকেও কখন কখন ব্রহ্মা নাম দেওয়া হইয়াছে। বিষ্ণু অর্থে সূর্য্য তিনি একজন সামান্য দেব, ইন্দ্রের সখা বলিলে তাঁহার স্তুতি করা হইল। রুদ্র অর্থে ঝড়ের উৎপাদক অগ্নিরূপী বজ্র। প্রার্থনা দেব বাচক ও সূর্য্য বাচক ও বজ্র বাচক তিনটি শব্দ লইয়া পুরাণের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারীর মহৎ অনুভব কি রূপে উদয় হইল? পুরাণের ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মহৎ অনুভব অর্থাৎ এক জগদীশ্বরের সৃষ্টি স্থিতি ও ধ্বংস কার্য্যের অনুভব কোথা হইতে উঠিল?

বিশেষ অনুশীলন করিয়া দেখিলে এ প্রশ্নের উত্তর স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। আমরা পূর্ব্বে বার বার বলিয়াছি যে বেদ রচনার সময় সরল চিত্ত উপাসকগণ প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর বা বিস্ময় কর বা ভয়ঙ্কর দেখিতেন তাহাই উপাসনা করিতেন। আকাশের অনন্ত বিস্তৃতি কে বরুণ বলিয়া, বৃষ্টিকারী আকাশকে ইন্দ্র বলিয়া, কমনীয় উষা বা জলন্ত সূর্য্য, দীপ্তিমান্ অগ্নি বা কমনীয় বায়ুকে ভক্তিভাবে স্তুতি করিতেন। প্রকৃতির যাহা কিছু দেখিয়া সেই সরল চিত্ত পূর্ব্ব পুরুষ গণের হৃদয় আলোড়িত হইত, প্রকৃতির যে সকল কার্য্য দ্বারা তাঁহারা কৃষি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ও পশ্বাদি পালন করিয়া জীবন ধারণ করিতেন, ভক্তি ভাবে নত হৃদয়ে সেই সকল সৌন্দর্য্য, সেই সকল কার্য্যের স্তুতি করিতেন।

কিন্তু কাল ক্রমে তাঁহাদিগের আলোচনা শক্তির বৃদ্ধি হইল, জ্ঞানের উন্নতি হইল। তখন তাঁহারা আলোচনা করিয়া দেখিলেন প্রকৃতির সমস্ত

* "অগ্নিরপি রুদ্র উচ্যতে"। যাস্ক। "রুদ্রায় ক্রূরায় অগ্নয়ে"। সায়ণ।

সৌন্দর্য্য ও সমস্ত কার্য্য একই নিয়ম দ্বারা আবদ্ধ ও পরিচালিত! সূর্য্য আমাদিগকে পালন করিতেছেন, বায়ু আমাদিগকে পালন করিতেছেন, অগ্নি ও জল আমাদিগকে পালন করিতেছেন, কিন্তু সূর্য্য ও বায়ু, অগ্নি ও নদী একই নিয়ম শ্রেণী দ্বারা আবদ্ধ ও পরিচালিত, অতএব সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি ও জলের একজন পরিচালক, একজন নিয়ন্তা আছেন। ঋগ্বেদের ঋষিগণ তাঁহাকে বিশ্বকর্ম্মা বা প্রজাপতি বলিয়া ডাকিলেন, উপনিষদের প্রণেতা গণ তাঁহাকে আত্মন্ বা ব্রহ্মণ্ বলিয়া ডাকিলেন।

তাহার পর পৌরাণিক কালে সেই এক ঈশ্বরের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কার্য্য দেখিয়া তাঁহাকে তিনটি নাম দেওয়া হইল। কি নাম দেওয়া হইবে? বেদে সৃষ্টি কর্ত্তার ঠিক নাম পাইলেন না। "আরাধ্য" দেবের নাম নাই, অথবা তাঁহার নাম "আরাধনার দেব" বা "ব্রহ্মা"। পালন কার্য্য দ্বারা যিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন তাঁহার কি নাম দিবেন? ঋগ্বেদের বিষ্ণু সমস্ত জগৎ পরিক্রম করিয়াছেন, তাঁহার পদধূলিতে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত আছে, অতএব পালন কারী জগদীশ্বরের নাম "বিষ্ণু"। আর বজ্ররূপীসংহারকর্ত্তা ঋগ্বেদের "রুদ্রের" নামটিই পরমেশ্বরের সংহার কার্য্যের উপযুক্ত নাম হইল। এইরূপে পুরাণের ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রের অনুভব উদয় হইল। ঋগ্বেদের সময়, এবং ঋগ্বেদের বহুকাল পরে টীকাকার শাকপূণি, ঔর্ণবাভ ও যাস্কের সময় ঈশ্বরবাচী ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নাম ভারতবর্ষে বিদিত ছিল না। বলা বাহুল্য যে শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র, গণপতি ও কার্ত্তিকেয় প্রভৃতি পুরাণের অসংখ্য দেব ঋগ্বেদের অপরিচিত।

আমরা লিখিয়াছি যে ঋগ্বেদের ঋষিগণ প্রকৃতির অনন্ত কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া অবশেষে সেই কার্য্যের একজন নিয়ন্তাকে অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। ঋগ্বেদ হইতে সে বিষয়ে দুই একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া আমরা এ প্রস্তাব শেষ করিব।

"কোন্ স্থানে, কি অবলম্বনে, কোথা হইতে বিশ্বকর্ম্মা পৃথিবী সৃজনকালে নিজ ক্ষমতায় স্বর্গ বিকাশিত করিলেন?

"যাঁহার চক্ষু সকল স্থানে, যাঁহার মুখ সকল স্থানে, যাঁহার বাহু সকল স্থানে, যাঁহার পদ সকল স্থানে, সেই এক দেব স্বর্গও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া তাঁহার বাহু ও পদ দ্বারা পরিচালিত করেন।"

১০ মণ্ডল, ৮১ ঋক্ ২, ৩ ঋক্।

"স্বর্গ হইতেও বহির্ভূত, পৃথিবী হইতেও বহির্ভূত, দেব ও অসুর হইতেও বহির্ভূত কি এক গর্ভ জল সমূহ ধারণ করিয়াছিল, যাহাতে সকল দেবগণকে দেখা গিয়াছিল ?

"সমস্ত দেবগণ যে গর্ভে দৃষ্ট হইয়াছিলেন, জল সমূহ সে গর্ভ ধারণ করিয়াছিল। যাহাতে বিশ্বভুবন স্থাপিত ছিল, তাহা সেই জন্মশূন্যের নাভিদেশে অর্পিত ছিল।

"যিনি এই সকল সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাকে কথনও জানিতে পারিবে না, তোমাদের মধ্যে ও তাঁহার মধ্যে অন্তর আছে। স্তোত্র রচয়িতাগণ নীহারে আবৃত হইয়া বৃথা কথা জল্পন করিয়া এই জীবনেই তুষ্ট হইয়া বিচরণ করিতেছে।" ১০ মণ্ডল, ৮২ সূক্ত, ৫, ৬, ৭ ঋক্।

"হিরণ্য গর্ভ জন্মগ্রহণ করিয়া একাকী ভূতমাত্রের অধিপতি হইলেন, তিনি পৃথিবী ও স্বর্গ ধারণ করিলেন। আমরা কোন্ দেবকে হব্য দ্বারা অর্চ্চনা করিব ?

"যিনি আত্মা দিয়াছেন, যিনি বল দিয়াছেন, যাঁহার আজ্ঞা সকল দেবগণ পালন করেন, যাঁহার ছায়া অমরত্ব, যাঁহার ছায়া মৃত্যু। আমরা কোন্ দেবকে হব্য দ্বারা অর্চ্চনা করিব ?

"যিনি মহত্ত্ব দ্বারা জাগ্রত ও সুপ্ত জগতের রাজা হইয়াছেন, যিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদের অধিপতি। আমরা কোন দেবকে হব্য দ্বারা অর্চ্চনা করিব ?

"যাঁহার মহত্ত্ব দ্বারা এই হিমবান্ পর্ব্বত রহিয়াছে, নদীর সহিত সমুদ্র আছে, এই প্রদেশ সকল যাঁহার বাহু, আমরা কোন্ দেবকে হব্য দ্বারা অর্চ্চনা করিব ?

"যাঁহার প্রভাবে স্বর্গ উগ্র এবং পৃথিবী স্থির, যাঁহার দ্বারা আকাশ যাঁহার দ্বারা স্বর্গ স্তম্ভিত হইয়াছে, যিনি অন্তরীক্ষে জগৎ পরিমাণ করিয়াছেন, আমরা কোন্ দেবকে হব্য দ্বারা অর্চ্চনা করিব ?

'হে প্রজাপতি! তুমি ভিন্ন কেহ বিশ্ব ভূতজাতকে চারিদিকে বেষ্টন করে না। আমরা যে কামনায় যজ্ঞ করিতেছি তাহা যেন সিদ্ধ হয়, আমরা যেন অর্থলাভ করি।" ১০ মণ্ডল, ১২১ সূক্ত, ১ হইতে ৫ এবং ১০ ঋক্।

এক্ষণে আমরা ঋগ্বেদের ধর্ম্মকে কি ধর্ম্ম বলিব ? কূটতর্কে প্রবেশ করিবার আমাদিগের ইচ্ছা নাই, কোন বিশেষ মতামত সমর্থন করিবার আমাদিগের রুচি নাই, বৈজ্ঞানিক আলোচনায় আমাদিগের আবশ্যক নাই।

যেটি স্পষ্টত দেখিতেছি নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে তাহাই বলিব। ঋগ্বেদের ধর্ম্ম প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও কার্য্য সম্বন্ধীয় কল্পিত দেবগণের-স্তুতিতে আরম্ভ হইয়াছে, প্রকৃতির সমস্ত কার্য্যের এক নিয়ন্তা, ঈশ্বরের আরাধনায় শেষ হইয়াছে। From Nature up to Nature's God.

আর একটি কথা মাত্র আমাদিগের বলিবার আছে। ঋগ্বেদে যাহা পাইলাম অন্য কোনও জাতির কোনও গ্রন্থে তাহা পাওয়া যায় না। অন্য ধর্ম্মশাস্ত্রে কেবল প্রকৃতির কার্য্য কলাপ সম্বন্ধীয় কল্পিত দেবগণের স্তুতি আছে, অথবা সেই কার্য্যের এক নিয়ন্তার স্তুতি আছে। কার্য্য কলাপের অনুশীলন হইতে কিরূপে মনুষ্য চিন্তা সেই কার্য্যের এক নিয়ন্তা পর্য্যন্ত আরোহণ করে, প্রকৃতির আলোচনা হইতে মনুষ্য ক্রমে, বহুকালে, বহুপরিশ্রমে, কিরূপে প্রকৃতির ঈশ্বরকে চিনিতে পারে, তাহা জগতের ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহের মধ্যে কেবল ঋগ্বেদ সংহিতায় দৃষ্ট হয়।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

---

# ব্রিটিশ ও বঙ্গীয় চিত্রাবলী।

## ৩। ল্যান্সেলট (Lancelot) ও প্রতাপ।

যাঁহারা আমাদিগের আলোচ্য গ্রন্থ দুইখানি একটু অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জ্ঞাত আছেন যে ল্যান্সেলট্ ও প্রতাপ গ্রন্থদ্বয়ের সর্ব্বপ্রধান নায়ক না হইলেও, দুইটি প্রধান নায়ক বটে। "Idylls of the King" এ ল্যান্সেলট্ শ্রেষ্ঠত্বে মাত্র আর্থরেরই দ্বিতীয়, আর আমাদিগের "চন্দ্রশেখরে" প্রতাপ ও চন্দ্রশেখর, এ দুয়ের মধ্যে কাহাকে উচ্চস্থান দিতে হইবে, এ সম্বন্ধে মতের একতা নাই; ফলত গ্রন্থখানির নাম "চন্দ্রশেখর" না হইলে, অনেকেরই চিত্তে এ সম্বন্ধে সংশয়

থাকিত। এই দ্বিতীয় চরিত্র দুইটি প্রধান চরিত্রদ্বয়ের অনুবর্ত্তী থাকিয়া গ্রন্থদ্বয়ের সম্যক শোভা সম্পাদন করিয়াছে। আমরা এইবারে এই চরিত্র দুইটি যথাসাধ্য বিশ্লেষণ করিয়া প্রস্তাবটি উপসংহার করিব।

আর্থরের সহিত ল্যান্সেলটের যেরূপ সম্বন্ধ, চন্দ্রশেখরের সহিত প্রতাপেরও প্রায় সেইরূপ সম্বন্ধ। ল্যান্সেলট আর্থর সৃষ্ট 'বীর সম্প্রদায়' মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর—আর্থরের সমধিক স্নেহের পাত্র। আর্থরের নিকট ল্যান্সেলট তাঁহার মহতী কল্পনা সৃষ্ট আদর্শ পুরুষ চরিত্র—জীবন ব্যাপারে তাহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। প্রতাপের সহিত চন্দ্রশেখরের সম্বন্ধও প্রায় এইরূপ। চন্দ্রশেখর প্রতাপের জীবন রক্ষক—একদিন তিনি প্রতাপকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। প্রতাপের সম্পদ সমস্তই চন্দ্রশেখরের প্রসাদাৎ। প্রতাপ নিজমুখে একদিন বলিয়াছেন, 'তাঁহার সর্ব্বস্ব চন্দ্রশেখর হইতে।' ল্যান্সেলট্ ও প্রতাপ উভয়েই তাঁহাদিগের প্রভু ও উপকারকের নিকট কৃতজ্ঞ-চিত্ত। এ কথাটি অনেকের নিকট বিসদৃশ বোধ হইবে। যে ল্যান্সেলট্ আর্থরের সুখের পথে কণ্টকস্বরূপ, তাঁহার প্রিয়তমা বনিতার প্রিয়তম উপপতি, তাহাকে কৃতজ্ঞ-চিত্ত বলা যায় কিরূপে? কথাটি গুরুতর সন্দেহ নাই। আমরা সম্প্রতি পাঠকবর্গকে এই কথাটি কিছুকালের জন্য ভুলিয়া যাইতে অনুরোধ করি। আমরা অন্য সময়ে সে কথাটি পাড়িব। যদি মাত্র এই কথাটি ভুলিয়া যাওয়া যায়, তবে ল্যান্সেলট সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিলাম, তৎসম্বন্ধে কাহারও বোধ হয় আপত্তি থাকিতে পারে না। আর্থর একদিন কাহাকে গোপনে বীর সম্প্রদায় ভুক্ত করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন।

'Make thee my knight in secrect? yea, but he,
Our noblest brother, and our truest man,
And one with me in all, he needs must know."

এরূপ ল্যান্সেলটের গুণযুক্ত বিশেষণ প্রয়োগ আর্থরের মুখে প্রায়ই শুনা যায়। আমরা যদৃচ্ছাক্রমে উপরের কথাটি তুলিয়া দিয়াছি। গ্রন্থের অনেক স্থলে ল্যান্সেলটের এরূপ প্রশংসা রহিয়াছে। যদি ল্যান্সেলট্ প্রকৃত পক্ষেই নিগুর্ণ বা সম্যক্ অকৃতজ্ঞ হইবে, তাহা হইলে এরূপ কথা আমরা গ্রন্থের সর্ব্বত্র, বিশেষত পুরুষপ্রধান আর্থরের নিকট শুনিতে পাইতাম না। এই প্রশংসা কেবল আর্থরের গুণজ্ঞাপক নহে—ল্যান্সেলটেরও গুণশীল-

তাঁর পরিচারক। ইহাতেই আমরা দেখিতে পাই, ল্যান্‌সেলট সর্ব্বত্র আর্থরের নিকট প্রিয়কার্য্য করিয়া প্রিয়তম হইয়া উঠিয়াছিলেন। ল্যান্‌সেলট অকৃতজ্ঞ হইলে এরূপ হইতে পারিত না। এতদ্ভিন্ন ল্যান্‌সেলেটের মুখেও আমরা আর্থরের প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাব্যঞ্জক অনেক কথা শুনিয়াছি। ল্যান্‌সেলট কেবল একটি অপরাধে—একটি অতি গুরুতর অপরাধে, আর্থরের নিকট অপরাধী; নতুবা সর্ব্বদাই তাঁহাকে আর্থরের নিকট কৃতজ্ঞ দেখিতে পাওয়া যায়। বিপক্ষভাবে দাঁড়াইয়াও ল্যান্‌সেলট্ আর্থরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন নাই। আর্থর তাঁহার নিকট পূজনীয় দেবতাস্বরূপ।

চন্দ্রশেখরের নিকট প্রতাপ কিরূপ কৃতজ্ঞ, তাহা দুই এক কথায় বলিতে পারা যায় না। তবে, সংক্ষেপে এই বলা যাইতে পারে, যে, আমরা প্রতাপকে যখনই দেখিয়াছি, তখনই প্রায় তাঁহাকে চন্দ্রশেখরের হিতকামনায় কার্য্য তৎপর দেখিয়াছি। তাঁহার কার্য্য সমস্তই প্রায় চন্দ্রশেখরের জন্য। প্রতাপ রূপসীকে বিবাহ করিয়াছিলেন চন্দ্রশেখরের জন্য; লরেন্স ফষ্টরকে শাস্তি প্রদান করিয়া শৈবলিনীকে উদ্ধার করিয়াছেন, চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর জন্য; ইংরেজ কর্তৃক বন্দী হইলেন, চন্দ্রশেখরের জন্য; সমর ক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন চন্দ্রশেখরের জন্য;—আর একটি কথা যদি তোমরা বলিতে দেও, তাহা হইলে বলি,—প্রতাপ জীবনত্যাগ অপেক্ষাও যে দুর্দ্দমনীয় শৈবলিনীর আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ তাহাও করিয়া ছিলেন, অনেকটা চন্দ্রশেখরের জন্য। এ কথা টিতে বোধ হয় প্রতাপের মহত্ত্ব বিন্দু মাত্রও স্খলিত হয় না; চন্দ্রশেখরের জন্য শৈবলিনীর অকাঙ্ক্ষা ত্যাগে তাঁহার যথেষ্ট মহত্ত্ব ও যথেষ্ট ইন্দ্রিয় বিজয়ের পরিচয় রহিয়াছে। কঠোর নীতিতত্ত্বজ্ঞগণ এ কথা শুনিয়া আমাকে কি বলিবেন, জানি না। কিন্তু আমাদিগের নিকট এই কথাটিতেই যেন প্রতাপ চরিত্রের অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য নিহিত আছে, ইহার জন্যই প্রতাপ-চরিত্র আমাদিগের মনোরঞ্জন করিতে এত সমর্থ হইয়াছে। যাহা হউক, এ কথা বলিবার অন্য সময় রহিয়াছে। এখন আমরা প্রতাপের সহিত চন্দ্রশেখরের সম্বন্ধ ও ল্যান্‌সেলটের সহিত আর্থরের সম্বন্ধের সাদৃশ্য দেখাইয়া ক্ষান্ত হইলাম।

রূপের মাহাত্ম্য কি, কিসের জন্য জানি না, আর্থর ও চন্দ্রশেখর যেরূপ গুইনিবিয়ার ও শৈবলিনীকে ভালবাসিতেন, ল্যান্‌সেলট্ ও প্রতাপও ঠিক সেই রূপই তাঁহাদিগকে ভাল বাসিতেন। আর্থর ও ল্যান্‌সেলটের প্রণয়

তুলনা করিয়া তবু একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, কিন্তু চন্দ্রশেখর ও প্রতাপের ভালবাসা সম্বন্ধে এরূপ কিছুই সম্ভব নহে। ল্যান্সেলটের আসক্তি পাপে পরিণত হওয়ায় দুই এক স্থলে তাহার দূষণীয় ভাব দেখিতে পাই, এবং বলিতে পারি যে, ল্যান্সেলট অপেক্ষা আর্থরের ভাল-বাসা পবিত্রতর সুতরাং সমধিক প্রগাঢ়; কিন্তু কাহার সাধ্য বলিতে পারে যে, প্রতাপ শৈবলিনীকে অধিকতর ভালবাসিতেন, না, চন্দ্রশেখর অধিকতর ভালবাসিতেন? উভয়ের প্রণয়ই, প্রশান্ত, প্রগাঢ়, "সমুদ্র তুল্য—অপার, অপরিমেয়, অতলস্পর্শ, আপনার বলে আপনি চঞ্চল—প্রশান্ত ভাবে স্থির, গম্ভীর, মাধুর্য্য ময়—চাঞ্চল্যে কুলপ্লাবী; তরঙ্গ-বঙ্গ-ভীষণ, অগম্য, অজেয়, ভয়ঙ্কর"। উভয়ের প্রণয়েই ইন্দ্রিয় চাপল্য নাই—যদিও তাহার কারণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সেই জলনিমজ্জন কাল হইতে মৃত্যু দিবস, অথবা মৃত্যু-ক্ষণ পর্য্যন্ত প্রতাপের প্রণয় রাশি হৃদয় মধ্যে যে কি ভাবে অবস্থিতি করিতে-ছিল, তাহা কবি ভিন্ন অন্যে বাক্য দ্বারা বুঝাইতে পারে না। আমরা বুঝিতে পারি, কিন্তু বুঝাইতে পারি না। আমাদিগের কবিবর এক স্থলে প্রতাপ দ্বারা তাহা বুঝাইয়াছেন। প্রতাপের তদানীন্তন অবস্থা, প্রতা-পের তাৎকালিক ভাব, আর তাঁহার সেই ভাষার আবেশ—একত্রিত হইয়াও, হৃদয় মধ্যে কেবল সেই প্রেম চ্ছবির রেখা পাত করিয়া দেয়, কিন্তু হৃদয় সেই চিত্রের সমস্ত রঙ্‌ ফলাইয়া লইতে অসমর্থ। সে চিত্র সম্পূর্ণ করিতে অন্য কাহারও অধিকার নাই। কেবল পাঠকগণের স্মৃতিপথে প্রতাপের ভাষাই আসে। 'কি বুঝিবে, তুমি সন্ন্যাসী! এ জগতে মনুষ্য কে আছে যে, আমার এ ভালবাসা বুঝিবে! কে বুঝিবে, আজি এই ষোড়শ বৎসর আমি শৈবলিনীকে কত ভাল বাসিয়াছি। পাপ চিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি—আমার ভালবাসার নাম,—জীবন-বিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা।" এই ভাষার আর ভাষান্তর হয় না।

প্রতাপ জিতেন্দ্রিয়। মৃত্যু কালে রমানন্দস্বামী তাঁহাকে যাহা বলিয়া-ছিলেন, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। সেই পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর দেশব্যাপিনী চন্দ্রকর-বিধৌত-সলিলরাশির উপরে পুণ্যমনা, প্রশস্ত হৃদয়, পবিত্র প্রেমপূর্ণ প্রতাপের সেই কথা মনে পড়িলে, কাহার না বিস্ময় জন্মে? সে কি সাধারণ ত্যাগ? যখন শৈবলিনী বলিল "এ সংসারে আমার মত দুঃখী কে আছে, প্রতাপ?" তখন সত্যই প্রতাপ

বলিয়াছিলেন " আমি "। যিনি মানবচরিত্র অবগত নহেন তিনি অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, ইতর লোকের ন্যায় এইরূপ শপথে লাভ কি ছিল? আমরা এ কথার উত্তর আপনারা কিছুই না দিয়া, একবার স্থির-চিত্তে পাঠকবর্গকে ভাবিতে বলিব; তাহা হইলে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে কি সুন্দর চিত্র—কি আশ্চর্য্য কাব্য কৌশল। একেবারে স্বর্গের ছবি দেখিতে চাও. অন্যত্র গমন কর, নবেলে তাহা থাকিবে না। যাহা সম্পূর্ণ অমানুষিক, তাহা নবেলে, ভাল নবেলে পাইবে না। তাই আমরা চন্দ্র-শেখরকে শৈবলিনীর জন্য পাগলের মত দেখিতে পাই, তাই আমরা ভাগি-রথীবক্ষে প্রতাপ—শৈবলিনীর এইরূপ শপথের কথা শুনিতে পাই। চন্দ্র-শেখর ও প্রতাপ আদর্শ মনুষ্য।

ল্যান্‌সেলট্ ও গুইনিবিয়ারকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। কিন্তু ল্যান্-সেলট্ ইন্দ্রিয় জয়ী না হইয়া ইন্দ্রিয়-জিত। এইখানে আমরা আবার চরিত্র পার্থক্যে চরিত্রস্রষ্টৃগণের আধ্যাত্মিক ভাবের পার্থক্য দেখিতে পাই। ইহার একটি গুহ্য কারণ আমরা একস্থানে প্রকাশিত দেখিতে পাইয়াছি। গুইনিবিয়ার একস্থলে ল্যান্‌সেলট্‌কে বলিতেছে—

" Mine be the shame, for I was wife, and thou unwedded:—

এ কথাটির প্রতিধ্বনি যেন টেনিসনের হৃদয়ে শুনা যায়। এই জন্যই বোধ হয়, টেনিসন ল্যান্‌সেলটকে চিরকুমার রাখিয়াছিলেন। কিন্তু একটি কথা ন্যায়ানুরোধে বলা আবশ্যক। টেনিসনের মনে যাহাই থাকুক, তাঁহার ল্যান্‌সেলটে আমরা এ পাপের গুরুত্ব বোধ দেখিতে পাই। শৈবলিনীর ন্যায় ল্যান্‌সেলট্ ও একদিন ইহার জন্য অনুতাপ করিবেন।

ল্যান্‌সেলেটের প্রণয় পঙ্কিল, সুতরাং তন্মধ্যে দুই এক স্থলে পবিত্র প্রণয়ের শত্রু—সন্দেহ আদি কতকগুলি জিনিস—দেখিতে পাওয়া যায়। ল্যান্‌সেলট্ একদিন গুইনিবিয়ারকে অন্যরকম দেখিয়া বলিতেছেন,

"Are ye so wise? ye were not once so wise,
My Queen, that summer, when ye loved me first.

*　*　*　*　*

How then is there none?
Has Arthur spoken aught? or would yourself,
Now weary of my service and devoir,
Henceforth be truer to your faultless lord?"

গুইনিবিয়ারকেও আমরা সময়ে সময়ে এইরূপ সন্দিগ্ধমনা (Jealous) দেখিয়াছি। ইহার কারণ পরিষ্কার—তাহাদিগের প্রণয় পবিত্র নহে।

প্রসঙ্গ ক্রমে আর একটি কথা আসিয়া পড়িয়াছে। প্রতাপ ও ল্যান্‌সেলটের প্রণয়ের সাদৃশ্য দেখাইতে গিয়া, সে কথাটি ভুলিয়া যাওয়া যায় না। সেটি প্রতাপের বিবাহ ও ল্যান্‌সেলটের চিরকৌমার্য্যব্রত। ইলেইন (Elaine) ল্যান্‌সেলটকে কিরূপ ভাল বাসিয়াছিল, তাহা "Idylls of the King"এর পাঠকবর্গের নিকট অবিদিত নাই। কিন্তু ল্যান্‌সেলট তাহাকে ভাল বাসিতে পারেন নাই। ল্যানসেলট বাস্তবিকই চিরদিনই গুইনিবিয়ারের নিকট "Love loyal। কিন্তু প্রতাপের বিবাহের তবে তাৎপর্য্য কি? এ প্রশ্নটি বোধ হয়, অত্যন্ত কঠিন—সকলে ইহার একরূপ উত্তর দিবেন, এরূপ ভরসা নাই। আমাদিগের মতে ৩টি উদ্দেশ্যে কবি প্রতাপের এই বিবাহটি ঘটাইয়াছেন। (১) প্রতাপের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহাতে তিনি বিবাহ না করিলে এত সহজে—আর সহজেই বা কি করিয়া বলি?—শৈবলিনী উপভোগের আকাঙ্ক্ষা দমন বা ত্যাগ করিতে পারিতেন না। এ কথাটি ইহাতেই সুস্পষ্ট হওয়া উচিত। (২) প্রতাপ সর্ব্বদাই চন্দ্রশেখরের আজ্ঞাবহ। 'চন্দ্রশেখর প্রতাপের চরিত্রে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। সুন্দরীর ভগিনী রূপসী বয়ঃস্থা হইলে তাহার সঙ্গে প্রতাপের বিবাহ ঘটাইলেন।' ইহাতে যেন গ্রন্থকারের আভাস রহিয়াছে যে, প্রতাপ চন্দ্রশেখরের ইচ্ছাক্রমেই বিবাহ করিয়াছিলেন। (৩) প্রতাপ ভাবিয়াছিলেন, বিবাহ করিলে হয়ত শৈবলিনীকে ভুলিতে পারিবেন, এবং ভুলাই তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য কার্য্য। আরও মনে করিয়াছিলেন যে এতদ্দ্বারা শৈবলিনীর মনে প্রতাপ পাইবার আশা একেবারে উৎপাটিত হইবে, কিম্বা তৎপ্রতি তাঁহার আসক্তি কমিয়াছে ভাবিয়া শৈবলিনীর প্রতাপাসক্তি একেবারে বিলুপ্ত হইবে। চন্দ্রশেখরের হিতের জন্য, যাহাতে এরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহা তাঁহার করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই সব চিন্তা একত্রিত হইয়া বোধ হয়, প্রতাপকে বিবাহ করিতে পরামর্শ দেয়।

কিন্তু কারণ যাহাই থাকুক, তাহা প্রতাপের পক্ষে; রূপসীর পক্ষে ত এ সব কিছুই ছিল না! তবে প্রতাপ রূপসীকে কিরূপে অক্ষুব্ধচিত্তে বিবাহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? সাম্যবাদী কঠোর নীতিতত্ত্বজ্ঞগণ এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন। ইহার উত্তরে আবার

অনেকেই বলিতে পারেন, "তাহাতে দোষ কি? প্রতাপ শৈবলিনীকে ভালবাসিত বলিয়া যে রূপসীকে ভালবাসিত না, তাহা তুমি কিরূপে বুঝিলে? প্রতাপ সাহেবের চিত্র নহে, বাঙ্গালীর চিত্র। প্রতাপের জন্ম সেই দেশে, যেখানে দুষ্মন্তও শকুন্তলা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই কল্পনা হইতে, যেখানে কুন্দ ও সূর্য্যমুখী, ভ্রমর ও রোহিণী, নন্দাওরমা একই ব্যক্তির প্রণয়পাত্রী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।" আমরা পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন কারীকে অন্যকোন উত্তর না দিয়া একটি গল্প বলিব। গল্পটির সারাংশ কোন ইংরাজী পুস্তক হইতে গৃহীত। কোনও এক ব্যক্তি পরোপকারের জন্য আত্মহত্যা করিয়াছেন। একদিকে আত্মহত্যা মহাপাপ, অন্যদিকে পরোপকার মহাব্রত এই দুইটির কোন্‌টি সমধিক প্রবল হইবে জানিতে না পারিয়া, ধর্ম্মরাজ পাপের খাতায় তাঁহার এই কার্য্যটি উঠাইলেন। কিন্তু যাই তাহা লেখা হইল, অমনি এক ফোঁটা চক্ষের জল পড়িয়া সমস্তই মুছিয়া গেল। বোধ হয় এ গল্পটি শুনিয়া প্রশ্নকারীগণ নিরুত্তর থাকিতে পারেন। যদি বাস্তবিকই প্রতাপ বিবাহ করিয়া কোন দূষণীয় কাজ করিয়া থাকেন, তবে তাহার কারণগুলি ভাবিয়া দেখিলে, সে দোষের ভাগ মুছিয়া যায় না কি?

পাপ করিলে তজ্জন্য অনুতাপ ও সৎকার্য্যের চরমফলে আত্মপ্রসাদ ভোগ করা প্রকৃতির একটি অপরিহার্য্য নিয়ম। গ্রন্থকারদ্বয় অতি সুন্দর-রূপেই আমাদিগকে ইহা দেখাইতে পারিয়াছেন।

একদিন নদীতটে বসিয়া ইলেইনের মৃত-দেহ-বাহিনী ক্ষুদ্র তরণীখানি দেখিয়া ল্যান্‌সেলট আপনা আপনি কি বলিতেছেন শুন,—

— 'Ah simple heart and sweet,  
Ye loved me, damsel, surely with a love  
Far tenderer than my Queen's. Pray for thy soul?  
Ay, that will I. Farewell too--now at last—  
Farewell, fair lily.

* * * * * * *

For what am I? what profits my name  
Of greatest knight? I fought for it, and have it:  
Pleasure to have it, none; to lose it, pain;  
Now grown a part of me: but what use in it?

To make men worse by making my sin known?
Or sin seem less, the sinner seeming great?
Alas for Arthur's greatest knight, a man
Not after Arthur's heart! I needs must break
These bonds that so defame me: not without
She wills it: would I, if she will'd it? nay,
Who knows? but if I would not, then may God,
I pray him, send a sudden Angel down
To seize me by the hair and bear me far,
And fling me deep in that forgotten mire,
Among the tumbled fragments of the hills."

অনুতাপের সঙ্গে সঙ্গে আবার এটিও দেখিতে পাই যে, ল্যান্‌সেলট্ এখন ইলেইনের প্রণয় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্বাদু বলিয়া অনুভব করিতেছেন। ফলত তাঁহার অনুতাপের আরম্ভই এইরূপ চিন্তা হইতে। পুণ্যের সংস্পর্শে এখানে পাপবোধ ও তজ্জনিত অনুতাপ আরম্ভ হইল।

অন্যত্র ল্যান্‌সেলট্ আর্থরকে বলিতেছেন

"O King, my friend, if friend of thine I be,
Happier are those that welter in their sin,
Swine in the mud, that cannot see for slime,
Slime of the ditch: but in me lived a sin
So strange, of such a kind, that all of pure,
Noble, and knightly in me twined and clung
Round that one sin, until the wholesome flower
And poisonous grew together, each to each
Not to be pluck'd asunder;

কথাগুলি জ্বলন্ত ভাষায় ল্যান্‌সেলটের চরিত্রটি সম্যক্ বুঝাইয়া দিতেছে।

পক্ষান্তরে প্রতাপের আত্মপ্রসাদও বড় সুন্দর। তাঁহার সেই অন্তিম সময়ের উক্তিটিতে যেন এই ভাবটি প্রণয়ের সঙ্গে সঙ্গে উছলিয়া পড়িতেছে।

আমরা এইখানে বর্ত্তমান প্রস্তাবটির উপসংহার করিলাম। যাঁহারা ল্যান্‌সেলট্ ও প্রতাপকে প্রথমে সম্পূর্ণ বিসদৃশ মনে করিয়াছিলেন, তাঁহারা বোধ

হয়, এক্ষণে ততটা বৈসাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন না। নবেল নাটকে এরূপ কতকগুলি চিত্র থাকে, যাহা কেবল প্রধান চিত্রগুলির বিকাশ জন্যই কল্পিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে “Idylls of the King”এ, আর্থরের ও গুইনিবিয়ারের চরিত্র স্ফুটন জন্যই ল্যান্সেলটের সৃষ্টি হইয়াছিল; এবং “চন্দ্রশেখরে” চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর চরিত্র বিকাশ জন্যই প্রতাপ কল্পিত হইয়াছিল। ইহাদিগকে আনুসঙ্গিক চরিত্র (Secondary characters) বলা যায়। ল্যান্সেলট যে জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল, তদ্ভিন্ন বড় বেশি কিছু করিতে পারে নাই; কিন্তু প্রতাপ প্রথমে আনুসঙ্গিক রূপে (Secondary character) কল্পিত হইলেও, বিষয়ান্তরে প্রধান চরিত্রের স্থান লাভ করিয়াছে। প্রথমে, উভয় কবিরই ধারণা (Conception) একই রূপ ছিল। কিন্তু গুইনিবিয়ার ও শৈবলিনী চিত্রে জাতিগত পার্থক্য ফলিত হওয়াতে, প্রতাপ ও ল্যান্সেলটেও বিভিন্ন হাত পড়িয়াছে। ল্যান্সেলট্ ও প্রতাপের বৈসাদৃশ্য কেবলমাত্র গুইনিবিয়ার ও শৈবলিনীর পার্থক্য জনিত। সুতরাং এস্থানেও আমরা বলিতে পারি যে, উভয়েরই ধারণা একই প্রকার, কিন্তু স্থান ও আচার ভেদে তাহা বিভিন্ন প্রকার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।

---

# শাক্যসিংহের জন্ম ও বাল্যজীবন।

শাক্য সিংহ পৌষ মাসের পুষ্যা নক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা তিথিতে লুম্বিনীবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; ইহা আমরা বৌদ্ধদিগের ললিত বিস্তর ও মহাবস্তু অবদান নামক গ্রন্থদ্বয় হইতে জানিতে পারি।*

লুম্বিনীবন রাজা শুদ্ধোদনের উদ্যান, (বাগান বাটী,) ইহা কপিল বস্তু নগরে প্রান্ত সীমায় অবস্থিত ছিল। রাজ্ঞী মায়াদেবী গর্ভের দশম মাস

---

* “অথ খলু মায়াদেবী লুম্বিনীবন মনুপ্রবিশ্য” ইত্যাদি ললিতবিস্তরের ৭ম অধ্যায় দেখ এবং মহাবস্তু অবদানের দীপঙ্কর বস্তু দেখ।

আরম্ভে আপন ইচ্ছায় এই উদ্যানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, এবং এই স্থানেই ভগবান্ শাক্য সিংহকে প্রসব করেন। ললিতবিস্তরগ্রন্থে লিখিত আছে,

"পরিপূর্ণানাং দশানাং মাসানা মত্যয়েন মাতুর্দক্ষিণ পার্শ্বা ন্নিষ্ক্রামতিস্য। স্মৃতঃ সম্প্রজানন্ অনুপলিপ্তো গর্ভমলৈর্যথা নান্যঃ কশ্চিদুচ্যতে অন্যেষাং গর্ভ মল ইতি।"

সেই বুদ্ধদেব পূর্ণ দশ মাসে জঠর বাস সমাপ্ত করিয়া জননীর দক্ষিণ কুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন; অন্য বালকে যেমন গর্ভমলে অনুলিপ্ত হইয়া প্রসূত হয়; ইনি সেরূপ গর্ভমলায় লিপ্ত হন নাই। অন্য বালক যেমন অজ্ঞান অবস্থা লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, ইনি সেরূপ অজ্ঞানাবস্থা লইয়া প্রসূত হন নাই। জন্মকালেও ইহার স্মৃতি ও প্রজ্ঞা বিদ্যমান ছিল। তাই ইনি লোক গতি স্মরণ করিতে করিতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন আরও অনেক অলৌকিক বর্ণন আছে, সে সকল কথা এক্ষণে তৃপ্তিকর নহে। ইন্দ্র ও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ আসিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, অপ্সরা ও দেবীগণ আসিয়া তাঁহার ধাত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন, নাগগণ আসিয়া তাঁহার স্নান কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। জাত মাত্রেই তিনি দিব্য চক্ষুদ্বারা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান লোক চরিত বিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। কুশল মূল জানিয়াছিলেন, ভূমিষ্ঠ হইয়াই তিনি পূর্ব্বদিকে সপ্তপদ, দক্ষিণ দিকে সপ্তপদ, পশ্চিমদিকে সপ্তপদ ও উত্তরদিকে সপ্তপদ পরিচালন করিয়াছিলেন * এবং আনন্দকে অনেক ধর্ম্মরহস্য লোক রহস্য ও জ্ঞানরহস্য উপদেশ করিয়াছিলেন; ইত্যাদি ইত্যাদি। †

---

* পূর্ব্বদিকে পদসঞ্চালনের উদ্দেশ্য, আমি প্রাণীমাত্রের কুশল মূল ধর্ম্মের পূর্ব্বগামী (শ্রেষ্ঠ পথদর্শক)। দক্ষিণদিকে পদবিন্যাসের দ্বারা তিনি জানাইয়াছিলেন. আমিই দেব মনুষ্যের দক্ষিণীয় অর্থাৎ প্রিয়। পশ্চিমদিকে পদক্ষেপ করিয়া জানাইয়াছিলেন, আমিই মনুষ্যের পশ্চিম জাতির, অর্থাৎ জরামরণ দুঃখের অন্তকর্ত্তা. এবং উত্তরদিকে পদক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমি জীবের জীব, সত্ত্বের শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ, ইত্যাদি।

† লিখিত আছে, যে, যে দিন বুদ্ধদেব পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, সেই দিনেই নাকি মধ্যগয়া প্রদেশে একটি আশ্চর্য্য অশ্বত্থবৃক্ষ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, যথাকালে সেই অশ্বত্থবৃক্ষই "বোধিদ্রুম" নামে খ্যাত হইয়াছে।

লুম্বিনীবনে কথিত প্রকারে আশ্চর্য্য শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে রাজা শুদ্ধোদনের নিকট সংবাদ গেল। তৎশ্রবণে রাজা শুদ্ধোদন যারপর নাই হৃষ্ট তুষ্ট হইলেন। দানক্রিয়া সমারব্ধ হইল, লোক সকল হৃষ্ট তুষ্ট ও প্রফুল্ল হইয়া বিবিধ আনন্দ চেষ্টায় নিমগ্ন হইল; কুমারের পরিচর্য্যার্থ ও রক্ষণাবেক্ষণার্থ শত শত দাস দাসী ও রক্ষিপুরুষ সেই লুম্বিনীবনে প্রেরিত হইল। রাজা শুদ্ধোদন এখন আনন্দ মগ্ন-চিত্তে ভাবিতেছেন,—

"কিমহংকুমারস্য নাম ধেয়ং করিষ্যামি ?"

কুমারের কি নাম রাখিব ?

কিয়ৎক্ষণ পরেই তাঁহার মনে হইল যে,—

অস্য হি জাতমাত্রেণ মম সর্ব্বার্থ সমৃদ্ধাঃ সংসিদ্ধাঃ।
অতোঽহমস্য "সর্ব্বার্থসিদ্ধ" ইতি নাম কুর্য্যাম্॥"

যে ক্ষণে আমার এই কুমার জন্মিয়াছে, আমি দেখিতেছি, সেই ক্ষণেই আমার সকল অর্থ সকল কামনা, সকল অভীষ্ট সুসিদ্ধ হইয়াছে। অতএব কুমারের "সর্ব্বার্থসিদ্ধ" এই নাম রাখিব।

অনন্তর রাজা শুদ্ধোদন মহা সমারোহের সহিত কুমারের নামকরণ নির্ব্বাহ করিলেন, "সর্ব্বার্থসিদ্ধ" এই নাম রাখা হইল; আজ হইতে শাক্য-গণ কুমারকে "সর্ব্বার্থসিদ্ধ" নামে ডাকিয়া আনন্দ করিতে লাগিল।

বুদ্ধদেবের জন্মগ্রহণের সাত দিবস পরে তাঁহার জননীর মৃত্যু হয়। ঐ সাতদিন নগরে ও বনে কোথাও অসুংসব ছিল না। মায়া দেবীর মৃত্যু সম্বন্ধে বৌদ্ধগণের মধ্যে এইরূপ তর্ক বিতর্ক আছে। যথা—

"সপ্তরাত্র জাতস্য বোধিসত্ত্বস্য মাতা মায়াদেবী কালমকরোৎ। সা কাল গতা ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবেষূপপন্নাস্যাৎ। খলু পুনর্ভিক্ষবো যুষ্মাকমেবং বোধি সত্ত্বাপরাধেন মায়াদেবী কাল গতেতিন খল্বেবং দ্রষ্টব্যম্। তৎকস্মাদ্ধেতোঃ ? এতৎ পরমং হিতস্যায়ুঃ প্রমাণমভূৎ। অতীতানামপি বোধিসত্ত্বানাং সপ্ত রাত্র জাতানাং জনয়িত্র্যঃ কালন কুর্ব্বন্। তৎকস্মা-দ্ধেতো ? বিবৃদ্ধস্য হি বোধিসত্ত্বস্য পরিপূর্ণেন্দ্রি-য়স্যাতি নিষ্ক্রামতো মাতুহৃদয় মস্ফুটৎ।"

বোধিসত্বের জন্ম দিবস হইতে সপ্তম দিবসে তাঁহার মাতা মায়াদেবী কালগতা হইয়াছিলেন। সেই কালগতা মায়াদেবী পুদ্গল দেহ পরিত্যাগ করিয়া দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন। হে ভিক্ষুগণ! তোমরা মনে করিতে পার যে, বোধিসত্বের অপরাধে তাঁহার জননী মায়াদেবীর মৃত্যু হইয়াছিল, (প্রসবের দোষেই মৃত্যু হইয়াছিল), এরূপ মনে করিও না; কেন না মায়াদেবীর ঐরূপ আয়ুঃ প্রমাণ অবধারিত ছিল। কেবল মায়াদেবী নহে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বুদ্ধের জননীরাও প্রসবের পর সপ্তম দিবসে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গগামিনী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মৃত্যুর উপলক্ষ এই যে, বোধিসত্বগণ পূর্ণ-ইন্দ্রিয় না হইয়া, পূর্ণজ্ঞান না হইয়া, ভূমিষ্ঠ হন না। তাঁহারা পূর্ণেন্দ্রিয় ও পূর্ণাবয়ব হইয়া নির্গত হন, তাই তাঁহাদের জননীদিগের হৃদয় স্ফুটিত হয়; তৎকারণে তাঁহারা কালগতা হন।

শাক্যসিংহের জন্মের পর সপ্তম দিবসে তাঁহার জননী মায়াদেবী পরলোকগামিনী হইলে, কাযেই তাঁহার আর লুম্বিনী উদ্যানে থাকা হইল না; সেই দিবসেই তাঁহাকে রাজভবনে আনয়ন করিবার উদ্যোগ হইতে লাগিল। পঞ্চ সহস্র সজ্জিত পুরুষ পূর্ণকুম্ভ লইয়া অগ্রগামী হইবে, তৎপশ্চাৎ পঞ্চ সহস্র পুরকন্যা ময়ূরপুচ্ছের ব্যজন করিয়া যাইবে, তৎপরে তালবৃন্তধারিণী কন্যাগণ যাইবে, তৎসঙ্গে অন্যান্য কন্যাগণ গন্ধোদক পূর্ণ ভৃঙ্গার হস্তে অবস্থান করিবে, রাজপথ জলসিক্ত করা হইবে, পঞ্চ সহস্র বালিকা পতাকা ধারণ করিবে, পঞ্চ সহস্র কন্যা বিচিত্র প্রলম্বন মালায় বিভূষিতা হইয়া সঙ্গে যাইবে; পঞ্চশত ব্রাহ্মণ ঘণ্টাবাদ্য করিতে করিতে সঙ্গে যাইবেন; বিংশতি সহস্র হস্তী, বিংশতি সহস্র অশ্ব, অশীতি সহস্র রথ, তদ্ভিন্ন চত্বারিংশ সহস্র পদাতি সৈন্য সজ্জীভূত হইয়া কুমারের অনুগমন করিবে *। নগরবাসীরা সকলেই স্ব স্ব গৃহের দ্বারদেশ ও অন্তর্গৃহ সজ্জিত ও শোভিত করিতে লাগিল, তাহাদের সকলেরই ইচ্ছা যে, কুমারকে তাহারা এক একদিন নিজ নিজ গৃহে রাখিবে।

অভিযান সজ্জা সমাপ্ত হইল; রাজপুরুষগণ কুমারকে লইয়া লুম্বিনী বন পরিত্যাগ করিলেন। নগরবাসীগণের অনুরোধে, প্রার্থনায়, কুমারকে

* ললিত বিস্তরের এই বর্ণনা সত্য হইলে কপিলবস্তু নগরকে মহানগর বলায় দোষ হইবে না এবং ইহার দ্বারা তৎকালের শ্রীসমৃদ্ধির ও সভ্যতার পরিমাণ হইবে।

একে একবার, এক এক ভবনে লইয়া যাইতে ক্রমে চারি মাস অতীত হইল।

চারি মাস পরে কুমার রাজভবন প্রাপ্ত হইলেন। শাক্য বৃদ্ধগণ কুমারের রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যা জননী স্থানীয়া রমণীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পরে স্থির হইল, কুমারের মাতৃস্বসা (মাসী) মহা প্রজাপতী; তিনিই কুমারের রক্ষণ যোগ্যা মাতৃস্বরূপা হইতে পারেন। মহা প্রজাপতী তৎবার্ত্তা শ্রবণে হৃষ্টা তুষ্টা হইলেন এবং কুমারের মাতৃস্থানীয়া হইয়া প্রতিপালন ভার গ্রহণ করিলেন। রাজা শুদ্ধোদন কুমারের পরিচর্য্যার্থ ৩২জন ধাত্রী নিযুক্ত করিলেন। ৮আট জন অঙ্গ ধাত্রী, ৮জন ক্ষীর ধাত্রী, ৮জন মল ধাত্রী ও ৮জন ক্রীড়া ধাত্রী। * ভগবান শাক্যসিংহ রাজা শুদ্ধোদনের গৃহে উক্ত রূপে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। শাক্যগণও কুমারের ভবিষ্যৎ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের পার্শ্ব প্রদেশে "অসিত" নামে এক জীর্ণতম মহর্ষি বাস করিতেন। নরদত্ত নামে তাঁহার এক ভাগিনেয় ছিল। নরদত্ত বালক; এবং বেদাধ্যায়ী মানবক। ভগবান্ শাক্যসিংহ যখন কপিলবস্তু নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, নরদত্ত তখন মাতুল অসিত মুনির নিকট বেদাধ্যয়ন করিতে ছিলেন। ঐ সময়ে হিমালয় প্রদেশে অনেক প্রকার অদ্ভুত দৃশ্য আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের উভয়কে বিমোহিত করিল। দেবগণ আকাশপথে আনন্দে 'বুদ্ধ" শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক এদিক ওদিক গতায়াত করিতেছিলেন, অসিত মুনি তাহা দেখিতে পাইলেন। মুনিবর দেবগণের সেই আনন্দ ব্যাপারের কারণ জানিবার জন্য ধ্যানস্থ হইলেন। ধ্যানবলে তাঁহার দিব্য চক্ষু উন্মেষিত হইল, তদ্দ্বারা তিনি জম্বুদ্বীপের সমুদায় ঘটনা জানিতে পারিলেন এবং দেবগণের আনন্দের কারণও জ্ঞাত হইলেন। ধ্যানভঙ্গের পর তিনি নরদত্তকে ডাকিলেন

---

* অঙ্গধাত্রী—যাহারা অঙ্গ সংস্কার করে, বেশ ভূষা পরায় এবং স্বাস্থ্যসংরক্ষণ করে।

ক্ষীরধাত্রী—যাহারা কেবল শিশুকে স্তন্য পান করায়।

মলধাত্রী—যাহারা শিশুর মলমূত্রাদি পরিষ্কার করে।

ক্রীড়াধাত্রী—যাহারা শিশুকে হৃষ্ট রাখে, খেলা করায় ও উৎসঙ্গে লইয়া শিশুর ইচ্ছানুসারিনী হয়।

এবং বলিলেন, নরদত্ত, এই মহা জম্বুদ্বীপে এক মহারত্ন জন্মিয়াছে। কপিলবস্তু নগরে শুদ্ধোদন রাজার গৃহে এক অদ্ভুত বালক জন্মিয়াছে। এই বালক সর্ব্বলোকপূজ্য এবং দ্বাত্রিংশৎ মহালক্ষণে লক্ষিত। ইনি গৃহে থাকিলে চক্রবর্ত্তী রাজা হইবেন, ত্যাগী হইলে সম্যক্ বুদ্ধ হইবেন। অতএব চল, আমরাও সেই অনুপম বালককে নয়নগোচর করিয়া জীবনের সার্থক্য সাধন করিব।

অনন্তর অসিত ঋষি ভাগিনেয় (নরদত্তের) সহিত রাজহংসের ন্যায় আকাশ মার্গ অবলম্বন করিয়া কপিলবস্তু মহানগরে আসিলেন। নগর-প্রান্তে লোকের সমাগম দেখিয়া যোগবল উপসংহার পূর্ব্বক সাধারণ মানবের ন্যায় পদব্রজে রাজদ্বারে গিয়া উপনীত হইলেন। দ্বারপালকে বলিলেন "দ্বারপতে, রাজাকে গিয়া বল, দ্বারে একজন ঋষি উপস্থিত। তিনি আপনার সন্দর্শন ইচ্ছা করেন।'

দৌবারিক রাজসমীপে গমন পূর্ব্বক, তদ্‌বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, রাজা হৃষ্ট তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ঋষিকে আনয়ন কর এবং তাঁহার জন্য আসনাদি আহরণ কর।"

অনন্তর দ্বারবান্ ঋষিকে লইয়া রাজসমীপে গমন করিল। রাজা যথোচিত অভ্যর্থনা সহকারে ঋষিকে আমন্ত্রণ করিলেন, ঋষিও সানন্দচিত্তে আশীর্ব্বাদ উচ্চারণ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহর্ষে! আমার মনে হয় না যে, আপনি আর কখন আমাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। এক্ষনে বলুন, কি উদ্দেশে আমার নিকট আপনার আগমন। "ঋষি বলিলেন, তোমার একটি পুত্র হইয়াছে, তাহাকেই দেখিবার ইচ্ছায় আসিয়াছি।"

রাজা বলিলেন "কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করুন, কুমার নিদ্রিত আছে, উঠিলেই আপনাকে দেখাইব।" ঋষি বলিলেন "রাজন! মহাপুরুষেরা দীর্ঘকাল নিদ্রিত থাকেন না, জাগ্রত থাকাই তাঁহাদের স্বভাব। আপনি অন্তঃপুরে যান, দেখিবেন কুমার উঠিয়াছেন।"

অনন্তর রাজা শুদ্ধোদন পুর প্রবেশ পূর্ব্বক কুমারকে ক্রোড়ে করিয়া ঋষি সন্নিধানে আনয়ন করিলেন। ঋষি সেই দ্বাত্রিংশল্লক্ষণান্বিত বালককে দেখিয়া মনে মনে কি অনুধ্যান করিলেন; অনন্তর সসম্ভ্রমে 'অদ্ভুত বালক, অদ্ভুত বালক" এইরূপ বলিয়া উঠিলেন। সেই বৃদ্ধতম ঋষি তখন অসঙ্কোচ

চিত্তে সেই বালককে প্রদক্ষিণ, নমস্কার ও স্তুতি বন্দনাদি করিয়া আসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন, আর অবিরল অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ঋষির সেই নীরব রোদন দেখিয়া রাজা শুদ্ধোদন কিছু ভীত হইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহর্ষে, রোদন কেন? দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন কেন? বালকের কি কোন অমঙ্গল দেখিলেন?

ঋষি বলিলেন, "মহারাজ! আমি বালকের জন্য কাঁদিতেছি না; বালকের কোন অমঙ্গলও দেখি নাই। আমি আমার নিজের জন্যই কাঁদিতেছি। মহারাজ! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, জরাজীর্ণ হইয়াছি, আর অধিককাল বাঁচিব না। তোমার এই বালক বুদ্ধ হইবেন। বুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মচক্র প্রবৃত্ত করিবেন। যে ধর্ম্ম কোন শ্রমণ, কোন ব্রাহ্মণ, কোন দেব, কোন দেবপুত্র, কেহই প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন নাই, সেই অনুত্তম ধর্ম্ম ইনি সর্ব্ব লোকের হিতের জন্য, সর্ব্ব লোকের সুখের জন্য, সর্ব্ব লোকের কল্যাণের জন্য প্রচারিত করিবেন। মূলে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, শেষেও কল্যাণ, শুদ্ধ, নির্ম্মল ও ব্রহ্মচর্য্য সংযুক্ত অনুত্তম ধর্ম্ম প্রচারিত করিবেন। ইঁহার ধর্ম্ম শুনিয়া জাতিধর্ম্মা প্রাণী সকল মুক্ত হইবে। ইনিই লোকদিগকে জরা ব্যাধি মরণ শোক পরিবেদন দুঃখ দৌর্ম্মনস্য ও অপায় হইতে রক্ষা করিবেন। রাগদ্বেষ মোহাদি সন্তপ্ত জীব নিবহকে স্বধর্ম্ম জল বর্ষণের দ্বারা সুখী করিবেন। মহারাজ, উড়ুম্বর পুষ্প যেমন কদাচিৎ কখন এক আধটা উৎপন্ন হয়, ইহ লোকে বুদ্ধ পুরুষও তেমনি কল্প কল্পান্তকাল অতীত হইতে হইতে কদাচিৎ কখন একবার উৎপন্ন হন, বহুকাল পরে সেই বুদ্ধ পুরুষ তোমার কুমাররূপে উৎপন্ন হইয়াছেন, অবশ্য ইনি বুদ্ধ হইবেন। অবশ্যই নষ্ট প্রাণী নিবেসকেই সংসারসমুদ্র হইতে উদ্ধার করিবেন। নির্ব্বাণে স্থাপিত করিবেন। আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি, তৎকারণে আমরা আর সেই বুদ্ধরত্ন দেখিতে পাইব না। সেই জন্যই আমি রোদন করিতেছি, সেই জন্যই আমি শ্বাস ত্যাগ করিতেছি। আমি ইঁহার আরাধনা করিতে পাইব না, এই ভাবিয়াই আমি রোরুদ্যমান, তজ্জন্যই আমার অশ্রু বিসর্জ্জন। মহারাজ! আমাদের মন্ত্রশাস্ত্রে ও বেদশাস্ত্রে আমরা যাহা দেখিতেছি, তাহাতে ইনি নিশ্চিত বুদ্ধ হইবেন, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন, গৃহে থাকিবেন না। মহারাজ! দেখুন, আপনার এই কুমারে

দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণ সুস্পষ্টরূপে বিরাজিত আছে।* অতএব হে শুদ্ধোদন! তোমার এই কুমার সম্যক সম্বুদ্ধ হইবেন; গৃহবাসী হইবেন না; নিশ্চিত ইনি প্রব্রজ্যা তেজ ধারণ করিবেন।

রাজা শুদ্ধোদন অসিত ঋষির নিকট কুমারের স্বরূপ বর্ণন শ্রবণ করিয়া তুষ্ট হইলেন, প্রীত হইলেন। তাঁহার মনের আবরণ বিদূরিত হইল, জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইল, তিনি আসন হইতে উত্থিত হইয়া বোধিসত্ত্বের চরণে প্রণিপতিত হইলেন এবং একটি গাথার দ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করিলেন।

"বন্দিত ত্বং সুরৈঃ সেন্দ্রৈ ঋষিভিশ্চাপি পূজিতঃ।
বৈদ্যোসর্ব্বস্য লোকস্য বন্দেহহমপিত্বাং বিভো॥"†

পরে রাজা শুদ্ধোদন হিমালয়বাসী অসিত ঋষিকে ও তাঁহার ভাগিনেয় নরদত্তকে আহার দানাদির দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া দিলেন এবং অসিত মুনিও ভাগিনেয়ের সহিত সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

অসিত মুনিও নরদত্ত যোগ শক্তির উদ্ভাবন পূর্ব্বক অন্যের অলক্ষ্যে আকাশ পথে শীঘ্রই হিমাচল পার্শ্বস্থ আশ্রমে গিয়া উপনীত হইলেন। অসিত মুনি ভাগিনেয়কে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "নরদত্ত! আমি তোমায় এক হিতকথা বলি, শ্রবণ কর। যে দিন তুমি শুনিবে, ইহলোকে বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই দিনেই তাঁহার শাসন অবলম্বন করিবে, শিষ্য হইবে। তাহা হইলেই তোমার হিত হইবে, সুখ হইবে, দীর্ঘজীবনের সাফল্য হইবে।"

বৌদ্ধাচার্য্যেরা বুদ্ধের বাল্যলীলা সম্বন্ধে এইরূপ অনেক অলৌকিক কথা বলিয়া গিয়াছেন। ললিতবিস্তর নামক বৌদ্ধগ্রন্থের অষ্টমাধ্যায়ে বুদ্ধের বাল্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে এমন সকল ঘটনার উল্লেখ আছে, যাহা পাঠ করিলে অনুবাদ করিতে আদৌ ইচ্ছা হয় না। এস্থলে তাহার নিদর্শনের স্বরূপ একটি মাত্র বিষয়ের অনুবাদ করিলাম।

অসিত ঋষি গমন করিলে, কিছু দিন পরে, শাক্যগণ সমবেত হইয়া রাজাকে গিয়া বলিল, মহারাজ! কুমারকে দেবকুলে উপনীত করিবার

---

* বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ ও অশীতি প্রকার অনুব্যঞ্জক আমরা পৃথক প্রস্তাবে বলিব।

† শিষ্যগণ গুরুকে কিরূপে বড় করে তাহা এই সকল বর্ণনা দেখিয়া বুঝিয়া লওয়া যায়।

সময় আগত হইয়াছে, শুভদিন স্থির করিয়া কুমারকে দেবদর্শন করান।* রাজা বৃদ্ধ অমাত্যগণের উপদেশ ক্রমে মহা উৎসবের সহিত কুমার দেবস্থানে লইয়া গেলেন; মন্দিরস্থ দেব প্রতিমা সকল বালকরূপী বোধিসত্ত্বকে দেখিবামাত্র আপন আপন স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বালকের চরণে আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিল। এই অদ্ভুত ব্যাপারে শাক্যগণ সকলেই বিস্মিত হইল, আনন্দিত হইল, অন্তরীক্ষে দিব্য পুষ্পবর্ষন ও দিব্য বাদ্য প্রভৃতি হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

শ্রীরাম দাস সেন।

---

# দয়া।

গুরু। ভক্তি ও প্রীতির পর দয়া। আর্ত্তের প্রতি যে বিশেষ প্রীতি-ভাব, তাহাই দয়া। প্রীতি যেমন ভক্তির অন্তর্গত, দয়া তেমনি প্রীতির অন্তর্গত। যে আপনাকে সর্ব্বভূতে, এবং সর্ব্বভূতকে আপনাতে দেখে, সে সর্ব্বভূতে দয়াময়; অতএব ভক্তির অনুশীলনেই যেমন প্রীতির অনুশীলন, তেমনই প্রীতির অনুশীলনেই দয়ার অনুশীলন। ভক্তি, প্রীতি, দয়া, হিন্দুধর্ম্মে এক সূত্রে গ্রথিত—পৃথক করা যায় না। হিন্দুধর্ম্মের মত সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ধর্ম্ম আর দেখা যায় না।

শিষ্য। তথাপি দয়ার পৃথক অনুশীলন হিন্দুধর্ম্মে অনুজ্ঞাত হইয়াছে।

গুরু। ভূরি ভূরি, পুনঃপুনঃ। হিন্দুধর্ম্মে দয়ার অনুশীলন যত পুনঃ-পুনঃ অনুজ্ঞাত হইয়াছে, এমন কিছুই নহে। যাহার দয়া নাই, সে হিন্দুই নহে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের এই সকল উপদেশে দয়া কথাটা তত ব্যবহৃত

---

* মাস বিশেষে শিশুকে দেবদর্শন করান এখনও পর্য্যন্ত অনেকের কুল প্রথা থাকিতে দেখা যায়।

হয় নাই, যত দান শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। দয়ার অনুশীলন দানে। কিন্তু দান কথাটা লইয়া একটা গোলযোগ ঘটিয়াছে। দান বলিলে সচরাচর আমরা অন্নদান, বস্ত্রদান, ধনদান, ইত্যাদিই বুঝি। কিন্তু দানের এরূপ অর্থ অতি সঙ্কীর্ণ। দানের প্রকৃত অর্থ ত্যাগ। ত্যাগ ও দান পরস্পর প্রতিশব্দ। দয়ার অনুশীলনার্থ ত্যাগ শব্দও অনেক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ত্যাগ অর্থে কেবল ধনত্যাগ বুঝা উচিত নহে। সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ—আত্মত্যাগ পর্য্যন্ত, বুঝিতে হইবে। অতএব যখন দান ধর্ম্ম আদিষ্ট হইয়াছে, তখন আত্মত্যাগ পর্য্যন্ত ইহাতে আদিষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে। এইরূপ দানই যথার্থ দয়ার অনুশীলনমার্গ। নহিলে তোমার অনেক টাকা আছে, তাহার অত্যল্পাংশ তুমি কোন দরিদ্রকে দিলে, ইহাতে তাহাকে দয়া করা হইল না। কেননা, যেমন জলাশয় হইতে এক গণ্ডূষ জল তুলিয়া লইলে জলাশয়ের কোন প্রকার সঙ্কোচ হয় না, তেমনি এইরূপ দানে তোমারও কোন প্রকার কষ্ট হইল না, কোন প্রকার আত্মোৎসর্গ হইল না। এরূপ দান যে না করে, সে ঘোরতর নরাধম বটে, কিন্তু যে করে সে একটা বাহাদুর নয়। ইহাতে দয়া বৃত্তির প্রকৃত অনুশীলন নাই। আপনাকে কষ্ট দিয়া পরের উপকার করিবে, তাহাই দান।

শিষ্য। যদি আপনিই কষ্ট পাইলাম, তবে বৃত্তির অনুশীলনে সুখ হইল কৈ? অথচ আপনি বলিয়াছেন সুখের উপায় ধর্ম্ম।

গুরু। যে বৃত্তিকে অনুশীলিত করে, তাহার সেই কষ্টই পরম পবিত্র সুখে পরিণত হয়। শ্রেষ্ঠ বৃত্তি গুলি—ভক্তি, প্রীতি, দয়া, ইহাদের একটি লক্ষণ এই, ইহাদের অনুশীলনজনিত দুঃখ সুখে পরিণত হয়। এই বৃত্তিগুলি সকল দুঃখকেই সুখে পরিণত করে। সুখের উপায় ধর্ম্মই বটে, আর সেই যে কষ্ট, সেও যতদিন আত্মপর ভেদ জ্ঞান থাকে, তত দিনই লোক তাহাকে কষ্ট নাম দেয়। ফলতঃ পরের জন্য যে আত্মত্যাগ, তাহা ঈশ্বরানুমোদিত, এজন্য নিষ্কাম হইয়া, তাহার অনুষ্ঠান করিবে। নিষ্কাম কর্ম্মেই সকল বৃত্তির সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হয়।

শিষ্য। নিষ্কাম কর্ম্মির আবার সুখ কি! সুখ ত কাম্য।

গুরু। নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানই পূর্ণ সুখ। তাহার অপেক্ষা উচ্চ সুখের স্থান মনুষ্য-হৃদয়ে নাই। এক্ষণে দান ধর্ম্ম যে ভাবে সাধারণ হিন্দু শাস্ত্রকারদিগের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে, তৎ সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার

আছে। হিন্দু ধর্ম্মের সাধারণ শাস্ত্রকারেরা (সকলে নহে) বলেন, দান করিলে পুণ্য হয়, এজন্য দান করিবে। এখানে "পুণ্য" স্বর্গাদি কাম্য বস্তু লাভের উপায়। দান করিলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়। এইজন্য দান করিবে, ইহাই সাধারণ হিন্দু শাস্ত্রকারের ব্যবস্থা। এরূপ দানকে ধর্ম্ম বলিতে পারি না। স্বর্গ লাভার্থ ধনদান করার অর্থ মূল্য দিয়া স্বর্গে একটু জমি খরিদ করা, স্বর্গের জন্য টাকা দাদন দিয়া রাখা মাত্র। ইহা ধর্ম্ম নহে, বিনিময় বা বাণিজ্য। এরূপ দানকে ধর্ম্ম বলা ধর্ম্মের অবমাননা।

দান করিতে হইবে, কিন্তু নিষ্কাম হইয়া দান করিবে। দয়াবৃত্তির অনুশীলন জন্য দান করিবে; দয়াবৃত্তিতে, প্রীতিবৃত্তিরই অনুশীলন, এবং প্রীতি ভক্তিরই অনুশীলন, অতএব ভক্তি, প্রীতি, দয়ার অনুশীলন জন্য দান করিবে। বৃত্তির অনুশীলন ও স্ফূর্ত্তিতে ধর্ম্ম, অতএব ধর্ম্মার্থেই দান করিবে, পুণ্যার্থ বা স্বর্গার্থ নহে। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন, অতএব সর্ব্বভূতে দান করিবে; যাহা ঈশ্বরের তাহা ঈশ্বরকে দেয়, ঈশ্বরে সর্ব্বপ্রদানই মনুষ্যত্বের চরম। সর্ব্বভূতে এবং তোমাতে অভেদ, অতএব তোমার সর্ব্বস্বে সর্ব্ব লোকের অধিকার; যাহা সর্ব্বলোকের তাহা সর্ব্ব লোককে দিবে। সর্ব্ব লোকের জন্য আত্মত্যাগ, আত্মবিসর্জ্জন করিবে। ইহাই যথার্থ হিন্দু ধর্ম্মের অনুমোদিত, গীতোক্ত ধর্ম্মের অনুমোদিত দান। ইহাই যথার্থ দান ধর্ম্ম। নহিলে তোমার অনেক আছে, তুমি ভিক্ষুককে কিছু দিলে, তাহা দান নহে। বিস্ময়ের বিষয়, যে এমন অনেক লোক আছে যে তাহাও দেয় না।

শিষ্য। সকলকেই কি দান করিতে হইবে? দানের কি পাত্রাপাত্র নাই? আকাশের সূর্য্য সর্ব্বত্র করবর্ষণ করেন বটে, কিন্তু অনেক প্রদেশ তাহাতে দগ্ধ হইয়া যায়। আকাশের মেঘ সর্ব্বত্র জলবর্ষণ করেন বটে, কিন্তু তাহাতে অনেক স্থান হাজিয়া ভাসিয়া যায়। বিচারশূন্য দানে কি সেরূপ আশঙ্কা নাই?

গুরু। দান, দয়াবৃত্তির অনুশীলন জন্য। যে দয়ার পাত্র তাহাকেই দান করিবে। যে আর্ত্ত সেই দয়ার পাত্র, অপরে নহে। অতএব যে আর্ত্ত তাহাকেই দান করিবে—অপরকে নহে। সর্ব্বভূতে দয়া করিবে বলিলে এমন বুঝায় না, যে যাহার কোন প্রকার দুঃখ নাই, তাহার দুঃখ মোচনার্থ আত্মোৎসর্গ করিবে। তবে, কোন প্রকার দুঃখ নাই, এমন লোকও সংসারে পাওয়া না। যাহার দারিদ্র্য দুঃখ নাই, তাহাকে ধনদান বিধেয় নহে, যাহার

রোগ স্থূল নাই, তাহার চিকিৎসা বিধেয় নহে। ইহা বলা কর্ত্তব্য, অনুচিত দানে অনেক সময়ে পৃথিবীর পাপ বৃদ্ধি হয়। অনেক লোক অনুচিত দান করে বলিয়া, পৃথিবীতে যাহারা সৎকার্য্যে দিন যাপন করিতে পারে, তাহারাও ভিক্ষুক বা প্রবঞ্চক হয়। অনুচিত দানে সংসারে আলস্য বঞ্চনা এবং পাপক্রিয়া বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, অনেকে তাই ভাবিয়া কাহাকেও দান করেন না। তাঁহাদের বিবেচনায় সকল ভিক্ষুকই আলস্য বশতই ভিক্ষুক, অথবা প্রবঞ্চক। এই দুই দিক্ বাঁচাইয়া দান করিবে। যাহারা জ্ঞানার্জ্জনী ও কার্য্যকারিণীবৃত্তি যথাবথরূপে অনুশীলিত করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ইহা কঠিন নহে। কেন না তাঁহারা বিচারক্ষম অথচ দয়াপর। অতএব মনুষ্যের সকল বৃত্তির সম্যক অনুশীলন ব্যতীত কোন বৃত্তিই সম্পূর্ণ হয় না।

গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে দান সম্বন্ধে যে ভগবদুক্তি আছে, তাহারও তাৎপর্য্য ঐ রূপ।

> দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
> দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃত ॥
> যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
> দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতং ॥
> অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
> অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতং ॥

অর্থাৎ "দেওয়া উচিত এই বিবেচনায় যে দান, যে প্রত্যুপকার করিবার সম্ভাবনা নাই তাহাকে দান, দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া যে দান, তাহাই সাত্ত্বিক দান। প্রত্যুপকার প্রত্যাশায় যে দান, ফলের উদ্দেশে যে দান, এবং অপ্রসন্ন হইয়া যে দান করা যায়, তাহা রাজস দান। দেশ কাল পাত্র বিচার শূন্য যে দান, অনাদর এবং অবজ্ঞাযুক্ত যে দান তাহা তামস দান।"

শিষ্য। দানের দেশ কাল পাত্র কিরূপে বিচার করিতে হইবে, গীতায় তাহার কিছু উপদেশ আছে কি?

গুরু। গীতায় নাই, কিন্তু ভাষ্যকারেরা সে কথা বলিয়াছেন। ভাষ্যকারদিগের রহস্য দেখ। দেশ কাল পাত্র বিচার করিবে, এ কথাটার বাস্তবিক একটা বিশেষ ব্যাখ্যা প্রয়োজন করে না। সকল কর্ম্মই দেশ কাল পাত্র

বিচার করিয়া করিতে হয়। দানও সেইরূপ। দেশ কাল পাত্র বিচার না করিয়া দান করিলে, দান, যাহাকে ইংরেজেরা Indiscriminate Charity" বলেন, তাহাতে পরিণত হয়। তাহা হইলে, দান আর সাত্ত্বিক হইল না, তামসিক হইল। কথাটার অর্থ সোজা বুঝিবার জন্য হিন্দু ধর্ম্মের কোন বিশেষ বিধির প্রয়োজন করে না। বাঙ্গালা দেশ দুর্ভিক্ষে উৎসন্ন যাইতেছে, মনে কর সেই সময়ে মাঞ্চেষ্টরে কাপড়ের কল বন্ধ—শিল্পীদিগের কষ্ট হইয়াছে। এ অবস্থায় আমার কিছু দিবার থাকিলে, দুই জায়গায় কিছু কিছু দিতে পারিলে ভাল হয়, না পারিলে, কেবল বাঙ্গালায় যা পারি দিব। তাহা না দিয়া, যদি আমি সকলই মাঞ্চেষ্টরে দিই, তবে দেশ বিচার হইল না। কেন না মাঞ্চেষ্টরে দিবার অনেক লোক আছে, বাঙ্গালায় দিবার লোক বড় কম। কাল বিচারও ঐ রূপ। আজ যে ব্যক্তির প্রাণ তুমি আপনার প্রাণপাত করিয়া রক্ষা করিলে, কাল হয় ত তাহাকে তুমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিতে বাধ্য হইবে, তখন সে প্রাণ দান চাহিলে তুমি দিতে পারিবে না। পাত্র বিচার অতি সহজ—প্রায় সকলেই করিতে পারে। দুঃখীকে সকলেই দেয়, জুয়াচোরকে কেহই দিতে চাহে না। অতএব "দেশে কালে চ পাত্রে চ" এ কথার একটা সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার বিশেষ প্রয়োজন নাই—যে উদার জাগতিক মহানীতি সকলের হৃদয়গত, ইহা তাহারই অন্তর্গত। এখন ভাষ্যকারেরা কি বলেন তাহা দেখ। "দেশে"—কিনা "পুণ্যে কুরুক্ষেত্রাদৌ।" শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধর স্বামী উভয়েই ইহা বলেন। তার পর 'কালে কি?" শঙ্কর বলেন "সংক্রান্ত্যাদৌ।" শ্রীধর বলেন, "গ্রহণাদৌ।" পাত্রে কি? শঙ্কর বলেন, "ষড়ঙ্গবিদ্বেদপারগায় ইত্যাদৌ আচার নিষ্ঠায়" শ্রীধর বলেন, "পাত্রভূতায় তপঃশ্রুতাদিসম্পন্নায় ব্রাহ্মণায়।" সর্ব্বনাশ! আমি যদি স্বদেশে বসিয়া মাসের ১লা হইতে ২৯ তারিখের মধ্যে কোন দিনে, অতি দীন দুঃখী পীড়িত কাতর একজন মুচি কি ডোমকে কিছু দান করি, তবে সে দান, ভগবদভিপ্রেত দান হইল না! এইরূপে ভাষ্যকারদিগের বিচারে অতি উন্নত, উদার এবং সার্ব্বলৌকিক যে হিন্দুধর্ম্ম, তাহা অতি সঙ্কীর্ণ, এবং অনুদার উপধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। এখানে শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধর স্বামী যাহা বলিলেন, তাহা ভগবদ্বাক্যে নাই। কিন্তু তাহা স্মৃতিশাস্ত্রে আছে। ভগবদ্বাক্যকে স্মৃতির অনুমোদিত করিবার জন্য, সেই উদার ধর্ম্মকে অনুদার এবং সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

এই সকল মহা প্রতিভাসম্পন্ন, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ মহামহোপাধ্যায়গণের তুলনায়, আমাদের মত ক্ষুদ্র লোকেরা পর্ব্বতের নিকট বালুকণা তুল্য, কিন্তু ইহাও কথিত আছে যে,—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে ॥*

বিনা বিচারে, ঋষিদিগের বাক্য সকল মস্তকের উপর এতকাল বহন করিয়া আমরা এই বিশৃঙ্খলা. অধর্ম্ম, এবং দুর্দ্দশায় আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আর বিনা বিচারে বহন কর্ত্তব্য করা নহে। আপনার বুদ্ধ্যনুসারে সকলেরই বিচার করা উচিত। নহিলে. আমরা চন্দনবাহী গর্দ্দভের অবস্থাই ক্রমে প্রাপ্ত হইব। কেবল ভারেই পীড়িত হইতে থাকিব—চন্দনের মহিমা কিছুই বুঝিব না।

শিষ্য। তবে এখন, ভাষ্যকারদিগের হাত হইতে হিন্দুধর্ম্মের উদ্ধার করা, আমাদের গুরুতর কর্ত্তব্য কার্য্য।

গুরু। প্রাচীন ঋষি এবং পণ্ডিতগণ অতিশয় প্রতিভা সম্পন্ন. এবং মহাজ্ঞানী। তাঁহাদের প্রতি বিশেষ ভক্তি করিবে, কদাপি অমর্য্যাদা বা অনাদর করিবে না। তবে যেখানে বুঝিবে, যে তাঁহাদিগের উক্তি, ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ, সেখানে তাঁহাদের পরিত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরাভিপ্রায়েরই অনুসরণ করিবে। এ কথাটা স্থানান্তরে কল করিয়া বুঝাইব।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

---

* মনু ১২ অধ্যায়, ১১৩ শ্লোকের টীকায় কুল্লুকভট্ট ধৃত বৃহস্পতি বচন

# শাস্ত্র সমর্থন।

অতি অল্প দিন হইল, বাঙ্গালার দুইটি প্রধান মাসিক পত্রে হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি দুইটি আক্রমণ প্রকাশিত হইয়াছে। বান্ধবে শ্রীযুক্ত প্রভাত চন্দ্র সেন নামক জনৈক লেখক মনুকে ভ্রান্ত অলৌকিক ও অবৈজ্ঞানিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং এই নবজীবনে শ্রীযুক্ত তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষার দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রভাত বাবুর সিদ্ধান্ত এই "অতএব (মনুর, স্বর্গ সম্বন্ধীয়) উল্লেখ ভ্রান্ত সংস্কারমূলক ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না; "অতএব এস্থলেও (পৃথিবী জলের উপরে ভাসমান ছিল) মনুর এই কথার ব্যত্যয় দেখা যাইতেছে"; "অতএব মনুর বাক্য অভ্রান্ত নহে"; "বাস্তবিক (মনুর ন্যায়) গ্রন্থ আমাদের ন্যায় ভ্রান্ত মনুষ্যকর্ত্তৃকই রচিত হইয়াছে।" তারাপ্রসাদ বাবুর সিদ্ধান্ত এই, "মনু এবং বেদব্যাস যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহাই যথার্থ শিক্ষা-বিভ্রাট। * আমরা অদ্যকার প্রস্তাবে হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি এই সমস্ত তীব্র আক্রমণের যথাসাধ্য সমালোচনা করিব।

---

* নবজীবনে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা এই।—"সম্প্রতি কেহ কেহ পাশ্চাত্য শিক্ষাকে 'শিক্ষা-বিভ্রাট' বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। 'আমরা অধঃপাতে যাইতেছি এবং যাইব"—ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা বলিব, মনু এবং বেদব্যাস যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহাই যথার্থ শিক্ষা-বিভ্রাট। যাহাই হৌক, পাশ্চাত্য বিদ্যা চর্চ্চা দ্বারা যদি আমরা আর কিছু না শিখি,—কেবল এই মাত্র জানিতে পারি, যে, আমাদের পুরুষকার আছে, এবং আমরা সাধনা করিলেই জ্ঞান ও ধর্ম্মে উত্তরোত্তর উন্নত হইতে পারিব, তাহা হইলে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিফল হইবে না।"

ঐ লেখাটুকু সম্পূর্ণ ভাবে তারাপ্রসাদ বাবুর নহে, উহাতে আমার যৎসামান্য সংস্রব আছে বলিয়া আমাকে দুই একটি কথা বলিতে হইতেছে;—

(১) "ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে * * * * শিক্ষা-বিভ্রাট" এই লেখায় এমন বুঝায় না, যে, লেখক মনু ও বেদব্যাসের উপদেশকে শিক্ষা-বিভ্রাট বলিতেছেন। বরং "আমরা অধঃপাতে যাইতেছি না" ইহাই প্রতিপন্ন করিতে তারাপ্রসাদ বাবু যখন বিশেষ যত্নশীল, তখন ইহাই বুঝা উচিত, যে ঐ শিক্ষাকে তিনি শিক্ষা-বিড়ম্বনা বলেন না।

তিনটি কারণে প্রভাত বাবু মনুকে ভ্রান্ত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।[৩] মনু বলেন, জলই সৃষ্টির প্রথম বস্তু। মনু স্বর্গকে বস্তু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মনু বলেন যে ব্রহ্মাণ্ড জলে ভাসমান ছিল। প্রভাত বাবু ইহার উত্তরে বলেন, যে, জলে যখন দুইটি বায়বীয় পদার্থের মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তখন জলকে সৃষ্টির প্রথম বস্তু বলিয়া স্বীকার করা যায় না। স্বর্গ সম্বন্ধে প্রভাত বাবু বলেন, স্বর্গকে কোন বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করা অবিহিত, কারণ "স্বর্গ কোনও বস্তু নহে"। পৃথিবীই সমস্ত জলের আধার, সুতরাং জলকে ব্রহ্মাণ্ডের আধার বলা যুক্তি ও বিজ্ঞানবিরুদ্ধ। এই রূপে প্রভাত বাবু মনুর তিনটি উক্তির অযথার্থতা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

এক্ষণে মনুর পক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে, যে, যে জলকে মনু, সৃষ্টির প্রথম বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে জল, সাধারণ জল নহে। সে জলের নাম "কারণ জল," "প্রলয়-পয়োধি জল"। এই জল হইতে জগৎ-স্রষ্টা ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। পরে সেই ব্রহ্মা সাধারণ জলের সৃষ্টি করেন। "প্রলয় পয়োধি জল" সম্বন্ধে ভাগবৎ বলিতেছেন, যে ঐ জল প্রলয় বায়ু দ্বারা সর্ব্বদাই বিলোড়িত, বিঘূর্ণীত ও উর্ম্মিমালাকুল হইয়া রহিয়াছে "তস্মাৎ যুগান্তশ্বসনাবঘূর্ণজলোর্ম্মিচক্রাৎ সলিলাৎ"। এই জলে এখনও গুণ-সন্নিবেশ হয় নাই। প্রকৃতির উপাদান সমস্ত এই জলের মধ্যে গূঢ়ভাবে বিরাজিত রহিয়াছে। মিল্টন যাহাকে "Chaos" "Deep profouud" "Abyss" বলেন, এই কারণবারিও প্রায় তাহাই। ভারত চন্দ্র বলিয়াছেন—

---

(২) মনু ও বেদব্যাস সম্বন্ধে তারাপ্রসাদ বাবু প্রবন্ধের অন্যত্র বলিয়াছেন :—মনুর প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি আছে। তিনিই নিষ্কাম ধর্ম্মের আদৌ শিক্ষা গুরু। মনু ও বেদব্যাসের ন্যায় মহাপুরুষ এই পৃথিবীতে অত্যল্প জন্মিয়াছেন।" নীলকণ্ঠ বাবু কি এটুকু লক্ষ্য করেন নাই?

(৩) "যাহা হৌক, পাশ্চাত্য বিদ্যাচর্চ্চা দ্বারা যদি আমরা আর কিছু না শিখি ইত্যাদি। ঐ 'যাহাই হৌক' পদটি থাকাতে বুঝা যায়, যে যাহাই হৌকের পূর্ব্বের কথা গুলি, লেখকের প্রতিপাদ্য বা উদ্দেশ্যব্যঞ্জক নহে, পরের কথা গুলিই—অর্থাৎ পাশ্চাত্য শিক্ষার সফলতা প্রদর্শনই—লেখকের প্রতিপাদ্য। 'যাহাই হৌক,' পদের ফল, নীলকণ্ঠ বাবু তারা-প্রসাদ বাবুকে দেন নাই।

(৪) নীলকণ্ঠ বাবু যে মতের খণ্ডনে প্রবৃত্ত, তারাপ্রসাদ বাবুর প্রবন্ধে ঠিক সেই রূপ মত না থাকিলেও, বঙ্গদেশে ঐ রূপ মতাবলম্বীর অভাব নাই। সুতরাং নীলকণ্ঠ বাবুর প্রবন্ধ নিরর্থক নহে। [নবজীবন সম্পাদক।]

"বিনা চন্দ্রানন রবি, প্রকাশি আপন ছবি, অন্ধকার প্রকাশ করিলা।
প্লাবিত কারণ জলে, বসি স্থল বিনা স্থলে, বিনা গর্ভে প্রসব হইলা॥
সাধারণ জলের সৃষ্টি সম্বন্ধে মনু যে ক্রম দেখাইয়াছেন, তাহা এই:—

"মনঃ সৃষ্টিং বিকুরুতে চোদ্যমানং সিসৃক্ষয়া।" ১ম অধ্যায়
আকাশং জায়তে তস্মাৎ তস্য শব্দগুণং স্মৃতং॥ ৭৫
আকাশাত্ত বিকুর্ব্বাণাৎ সর্ব্বগন্ধবহঃ শুচিঃ।
বলবান জায়তে বায়ুঃ স বৈ স্পর্শগুণোমতঃ॥ ৭৬
বায়োরপি বিকুর্ব্বাণাৎ বিরোচিষ্ণু তমোনুদং।
জ্যোতিরুৎপদ্যতে ভাস্বৎ তদ্রূপগুণমুচ্যতে॥ ৭৭
জ্যোতিষশ্চ বিকুর্ব্বাণাৎ আপো রসগুণাঃ স্মৃতাঃ।
অদ্ভ্যো গন্ধগুণা ভূমিরিত্যেষা সৃষ্টিরাদিতঃ॥ ৭৮

অর্থাৎ সৃষ্টির ক্রম এই।

১ম মহত্তত্ত্ব
২য় আকাশ
৩য় বায়ু
৪র্থ তেজ
৫ম জল
৬ষ্ঠ ক্ষিতি

মনু বৈজ্ঞানিক ছিলেন কিনা, তাহা ভগবান জানেন, কিন্তু তিনি বায়ুর সৃষ্টির পরে, সাধারণ জলের সৃষ্টির নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং স্বীকার করিতে হইতেছে. যে, মনু গ্যাসের সৃষ্টির পূর্ব্বে সাধারণ জলের সৃষ্টির কথা বলেন নাই।

এই সাধারণ জল হইতে "প্রলয়পয়োধি জল" সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সেই জলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কেন, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা শয়ান ছিলেন। স্বয়ং নারায়ণ সেই জল আশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম নারায়ণ হইয়াছে। এই প্রলয়পয়োধিজলে সমস্ত বিশ্ব নিমগ্ন ছিল; সুতরাং ইহা যে ব্রহ্মাণ্ড অপেক্ষা বৃহৎ তাহাতে সন্দেহ কি? এক্ষণে দেখা গেল, যে, প্রভাত বাবু মনুর যে তিনটি ভ্রম দেখাইয়াছেন, তাহার মধ্যে দুইটিতে তিনি নিজেই বালকোচিত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এক্ষণে মনুর লিখিত স্বর্গের বিবরণ আলোচনা করা যাউক। মনু বলিতেছেন:—

তাভ্যাং স শকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্ম্মমে।

মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টৌ অপাং স্থানঞ্চ শাশ্বতং ॥

অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চে স্বর্গ, মধ্যে আকাশ, ও নিম্নে ভূমি এই তিন লোক ব্রহ্মা সৃষ্টি করিলেন। প্রভাত বাবু বলেন, যে, স্বর্গ নামক কোন বস্তুই নাই। তাঁহার মতে স্বর্গ ভূবায়ুর বর্ণমাত্র। কিন্তু ভূবায়ুর বর্ণ কি বস্তু নহে? এবং আমরা কি বুঝিব, যে, যেখানে ভূবায়ুর বর্ণ আছে, সেখানে ভূবায়ু নামকও কোন বস্তু নাই? যদি স্বর্গে ভূবায়ুর বর্ণ থাকে, তবে স্বর্গে ভূবায়ুও আছে; এবং তাহা হইলে স্বর্গকে বস্তু বলা কোনরূপেই অসঙ্গত বা অযৌক্তিক নহে। ফলত মনু বলিতেছেন যে পৃথিবীর উপরে যে বায়ুস্তর আছে, তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ব্রহ্মা সর্ব্বোচ্চ ভাগের নাম স্বর্গ রাখিলেন ও সর্ব্বনিম্ন ভাগের নাম আকাশ রাখিলেন। পৃথিবীও এই দুই ভাগ বায়ুস্তর, তিনে মিলিত হওয়া "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" হইল। ইহার মধ্যে অবৈজ্ঞানিকতা কোথায়?

মনুর প্রথম অধ্যায় যত্ন সহকারে পাঠ করিলেই প্রভাত বাবু এ সমস্ত ভ্রমে নিপতিত হইতেন না। মনু একেবারে অভ্রান্ত হউন বা না হউন, তিনি যে আমাদের অপেক্ষা লক্ষগুণে অভ্রান্ত সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। প্রভাত বাবু ব্যাপ্য ব্যাপক ও ঈশ্বরাস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সমস্ত বিচার উত্থাপিত করিয়াছেন, ঢাকাস্থ প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় শীঘ্রই তাহার সমালোচনা করিবেন; সুতরাং তৎ সম্বন্ধে আমি কোন কথা না বলিয়া তারাপ্রসাদ বাবুর সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি।

২য়। অলৌকিক ধীশক্তিসম্পন্ন বৃহস্পতি যুক্তির সম্মাননা করিয়াছিলেন, সত্য; কিন্তু যে যুক্তির বলে ব্যাস ও মনুর শিক্ষা শিক্ষা-বিভ্রাট বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, সে যুক্তিকে বৃহস্পতিদেব যুক্তি-বিভ্রাট বলিতেন কি না, তাহা আমরা নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না, কারণ ঐ বৃহস্পতিই স্থলান্তরে বলিয়াছেন;

তাবচ্ছাস্ত্রানি শোভন্তে তর্কব্যাকরণানিচ।

ধর্ম্মার্থ মোক্ষোপদেষ্টা মনুর্যাবন্ন দৃশ্যতে ॥

অর্থাৎ মনু অন্য অন্য সকল শাস্ত্র অপেক্ষা তর্ক অথবা যুক্তি অপেক্ষা এবং ব্যাকরণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এতদ্ভিন্ন আমরা ইহাও দেখিতে পাই, যে,

পুরাণং মানবো ধর্ম্মঃ সাঙ্গো বেদশ্চিকিৎসিতং।

আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ ॥

ইহার অর্থস্থলে টীকাকার কুল্লুকভট্ট বলিতেছেন—"বিরোধী বৌদ্ধাদিতর্কৈর্ন হন্তব্যানি; অনুকূলস্তু মীমাংসাদিতর্কঃ প্রবর্ত্তনীয় এব" অর্থাৎ যে যুক্তিদ্বারা বেদ বা স্মৃতি হত হন তাহা ব্যবহর্ত্তব্য নহে, যে যুক্তি বেদ ও স্মৃতির অনুকূল সেই যুক্তিই প্রবর্ত্তনীয়। এই রূপ একদেশদর্শী যুক্তি তারাপ্রসাদ বাবুর মনোনীত হইবে কি না জানি না। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে যুক্তির এই রূপ ব্যবহারই আদরণীয়। আরও দেখুন

"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্কদ্বারা ঋষিদিগের ধর্ম্মোপদেশের ব্যাখ্যা করিবেন, তিনিই ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারিবেন, অন্যে পারিবে না।

তবে কি হিন্দুশাস্ত্রে যুক্তির আদর নাই? না তাহা নহে। মনুই বলুন, অথবা অন্য অন্য ধর্ম্মশাস্ত্রই বলুন সমস্তই যুক্তির উপর অবস্থাপিত, অথবা যুক্তির সাহায্যে সবলীকৃত। বেদ ঈশ্বরের যুক্তি, এ জন্য তাহা মনুষ্য-যুক্তির দ্বারা অকাট্য। এইরূপে মনু ঈশ্বর সদৃশ বা ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তির যুক্তি, সুতরাং তাহাও মনুষ্য-যুক্তির দ্বারা অকাট্য। হিন্দুশাস্ত্র বলেন, যে, যেখানে দেখিবে যে বেদের অথবা মনুর কোন অংশ তোমার নিকট অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হইতেছে, সেখানে বুঝিবে যে তুমিই ভ্রান্ত এবং মনু যাহা বলিতেছেন তাহা যৌক্তিক। আমরা, এমন কি তারাপ্রসাদ বাবুও, যখন সেক্ষপীয়রের কোন অংশ বুঝিতে না পারি, তখন মনে করি যে, এই অংশ আমি বুঝিতে পারিতেছি না। সেক্ষপীয়র ভ্রান্ত ইহা বলিতে আমাদের কোন মতেই সাহস হয় না। আমরা সেক্ষপীয়রের যে পরিমাণে সম্মান করি, বেদ বা মনুর প্রতি সেই পরিমাণেও সম্মান প্রদর্শন করিলে আমরা কখনই ধর্ম্মে বা ন্যায়ে পতিত হইব না।

তারাপ্রসাদ বাবু বেদকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু তিনি মনু অথবা পুরাণাদিকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু যদি বেদ অভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে মনুকেও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কারণ মনু সম্পূর্ণ রূপে বেদের উপর অবস্থাপিত।

যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্ম্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।
স সর্ব্বোঽভিহিতো বেদে সর্ব্বজ্ঞানময়ো হি সঃ॥

অর্থাৎ মনু যে কোন ধর্ম্মের বর্ণনা করিয়াছেন, তৎসমস্তই বেদে কথিত হইয়াছে। তবে বেদ অভ্রান্ত কি না, সে বিষয়ে অবশ্যই বিচার উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু এ বিচার তারাপ্রসাদ বাবু উত্থাপিত করেন নাই, সুতরাং এ বিচার আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের অঙ্গীভূত হইতে পারে না। তবে মনু ধর্ম্মের যে চারিটি লক্ষণ করিয়াছেন, তাহার এস্থলে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

"বেদ; স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্য লক্ষণং॥"

অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে বেদের মত প্রতিপালন করিতে হইবে; পরে স্মৃতির মতানুসারে কার্য্য করিতে হইবে। তৎপরে সদাচারের বশবর্ত্তী হইবে। সর্ব্বশেষে আত্মতুষ্টি খুঁজিতে হইবে। অর্থাৎ অন্য অন্য প্রধান ব্যক্তির যুক্তি অনুসারেই প্রধানতঃ কার্য্য করিতে হইবে। তবে যেখানে সেই রূপ যুক্তি পাওয়া যাইতেছে না, সেখানে নিজের যুক্তিই অবলম্বনীয়। শুদ্ধ যে অধম হিন্দুজাতিই এই রূপে নিজের যুক্তির উপর অনাদর প্রকাশ করে তাহা নহে। ইংরেজকুল-গৌরব মহামতি বর্কও এই কথা বলিতেছেন; " We are afraid to put meu to live and trade each on his own private stock of reason; because we suspect that this stock in each man is small, and that the individuals would do better to avail themselves of the general bank and capital of nation and ages."

তারাপ্রসাদ বাবুর প্রথম তর্ক এই যে হয় মনু ভ্রান্ত, নয় অথর্ব্ববেদ ভ্রান্ত। যদি বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত বলিয়া পরিগণিত করিতে হয়, তাহা হইলে মনু ভ্রান্ত, কেননা মনু বেদকে ত্রয়ী বলিয়া বারম্বার নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং মনু কুত্রাপি অথর্ব্ববেদের উল্লেখ করেন নাই। আর যদি মনু অভ্রান্ত হন, তাহা হইলে অথর্ব্ববেদ ভ্রান্ত; সুতরাং দেখুন হিন্দুশাস্ত্রকে রামে মারিলেও মারিয়াছে, রাবণে মারিলেও মারিয়াছে। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের পক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে, যে, মনু একস্থলে অথর্ব্ববেদের উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রুতীরথর্ব্বাঙ্গিরসীঃ কুর্য্যাদিত্যবিচারয়ন্।
বাক্শাস্ত্রং বৈ ব্রাহ্মণস্য তেন হন্যাদরীন্ দ্বিজঃ॥ ১১ অধ্যায়
৩৩ শ্লোক।

কুল্লুক ভট্ট টীকা করিতেছেন অথর্ব্ববেদে আঙ্গিরসীঃ (দৃষ্টাভিচারশ্রুতীঃ) অভিচারয়ন্ ইত্যাদি—। ভরত শিরোমণি অনুবাদ করিতেছেন,—"অথর্ব্ববেদোক্ত আঙ্গিরসী শ্রুতি অর্থাৎ অভিচারমন্ত্র পাঠ করিবে, ঐ মন্ত্রাত্মক বাক্যরূপশাস্ত্র দ্বারা শত্রুকে বিনাশ করিবে।" এই রূপে অথর্ব্ববেদের উল্লেখ করিয়াও মনু কি জন্য বারম্বার ত্রয়ী শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা অবশ্য বিচার্য্য বটে। কিন্তু এই বিচার যে তারাপ্রসাদ বাবু অদ্য প্রথম উত্থাপিত করিলেন, তাহা নহে। প্রায় অশীতি বৎসর পূর্ব্বে কোলব্রুক সাহেব এই প্রশ্নের যে মীমাংসা করিয়াছিলেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল। "The true reason why three first Vedas are often mentioned without any notice of the fourth, must be sought not in their different origin and antiquity, but iu the difference of their use and purport." অর্থাৎ—"অথর্ব্ববেদ যে অন্য অন্য বেদ হইতে ভিন্ন সময়ে বা ভিন্ন মূল হইতে রচিত হইয়াছে, তাহা নহে। কিন্তু অন্য অন্য বেদ হইতে ইহার উদ্দেশ্য ও ব্যবহার স্বতন্ত্র। এ জন্য আমরা সর্ব্বদাই তিন বেদের উল্লেখ দেখিতে পাই, কিন্তু অথর্ব্ববেদের উল্লেখ দেখি না।" পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমীও প্রায় এই কথাই বলিয়াছেন—"বেদ বিভাগ হইবার পূর্ব্বেই ঐ সমস্ত ত্রিবিধ রচনা বিমিশ্র থাকায় ত্রয়ী নামে ব্যবহৃত হইত। এবং সেই অবস্থাতেই ঐ ত্রয়ী বেদ হইতে...মহর্ষি অথর্ব্বা ঐহিকপ্রত্যক্ষফলপ্রদক শত্রুমারণাদির উপযোগী যজ্ঞ প্রকরণগুলি স্বতন্ত্র করিয়া প্রচলিত করেন।" ভাগবতেও লিখিত আছে—"অথর্ব্বাঙ্গিরসামাসীৎ সুমন্তুর্দারুণোমুনিঃ" অর্থাৎ অভিচারাদিকর্ম্মে প্রবৃত্ত দারুণস্বভাব সুমন্তু মুনি অথর্ব্ববেদে পারদর্শী হন। তবেই দাঁড়াইল, যে ক্রূর ও নৃশংস কর্ম্মের বিধান আছে বলিয়াই মনু অথর্ব্ববেদের বারম্বার উল্লেখ করেন নাই। আর ইহাও একরূপ বুঝা গেল, যে, মনুও ভ্রান্ত নহেন, অথর্ব্ববেদও ভ্রান্ত নহেন, তারাপ্রসাদ বাবুই ভ্রান্ত।

তারাপ্রসাদ বাবুর দ্বিতীয় তর্ক এই যে—হয় শশধর তর্কচূড়ামণি ভ্রান্ত নয় মনু ভ্রান্ত। যদি তর্কচূড়ামণি অভ্রান্ত হন, তাহা হইলে মনু ভ্রান্ত, কেন না তর্কচূড়ামণি মনুর আজ্ঞার বিরুদ্ধে শূদ্রদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেছেন। আর এই কারণেই যদি মনু অভ্রান্ত হন, তাহা হইলে তর্কচূড়ামণি ভ্রান্ত। কিন্তু এস্থলেও আর এক পূর্ব্বপক্ষ করা

যাইতে পারে, যে তর্কচূড়ামণিও ভ্রান্ত নহেন, মনুও ভ্রান্ত নহেন তারাপ্রসাদ বাবুই ভ্রান্ত।*

মনু এক স্থলে বলিয়াছেন

"ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মং ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ"

অর্থাৎ শূদ্রকে ধর্ম্মোপদেশ দিবে না, শূদ্রকে ব্রত শিক্ষা দিবে না। শুদ্ধ মূল ধরিলে বোধ হইতে পারে, যে মনু শূদ্রকে সকল শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। কিন্তু টীকার সহিত মূল পাঠ করুন, মনুর প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিবেন। কুল্লূকভট্ট টীকা করিতেছেন—"ব্রতঞ্চাস্য প্রায়শ্চিত্তরূপং সাক্ষাৎ ন উপদিশেৎ। কিন্তু ব্রাহ্মণং মধ্যে কৃত্বা তদুপদেশবিধানাৎ। যথাহ অঙ্গিরাঃ "তথা শূদ্রং সমাসাদ্য সদাধর্ম্মপুরঃসরং। অন্তরা ব্রাহ্মণং কৃত্বা প্রায়শ্চিত্তং সমাদিশেৎ।" প্রায়শ্চিত্তং ইতি সকল ধর্ম্মোপদেশস্য উপলক্ষণার্থং" যদি বলেন যে মনুর মূল ধরিয়াই অর্থ করিব টীকা ধরিব কেন? তাহা হইলে মূলই ধরুন;

ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিৎ নচ সংস্কারমর্হতি। ১০ম অধ্যায়
নাস্যাধিকারো ধর্ম্মে ধর্ম্মোস্তি ন ধর্ম্মাৎ প্রতিষেধনং॥ ১২৬
ধর্ম্মেপ্সবস্তু ধর্ম্মজ্ঞাঃ সতাং বৃত্তি মনুষ্ঠিতাঃ।
মন্ত্রবর্জ্জং ন দুষ্যন্তি প্রশংসাং প্রাপ্নুবন্তি চ॥ ১২৭
যথা যথা হি সদ্বৃত্তং আতিষ্ঠত্যনসূয়কঃ।
তথাতথেমঞ্চামুঞ্চ লোকং প্রাপ্নোত্যনিন্দিতঃ॥ ১২৮

অর্থাৎ "শূদ্রের পাতক নাই, সংস্কার নাই, ধর্ম্মে অধিকার নাই, ধর্ম্মে নিষেধও নাই। যদি মন্ত্রাংশ ত্যাগ করিয়া শূদ্রেরা দ্বিজদিগের ন্যায় আচরণ করে; তাহা হইলে তাহাদের নিন্দা না হইয়া প্রশংসাই হয়। পরগুণানিন্দক শূদ্র যে যে রূপে দ্বিজজাতির আচার অনুষ্ঠান করে; সেই সেই রূপে লোকে অনিন্দিত হইয়া মান্য হয় এবং পরলোকে স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হয়"। ফলত তারাপ্রসাদ বাবু যে শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছেন, শূদ্রমাত্রেই তাহাদের লক্ষ্য নহে। কারণ এই দুই শ্লোকে লিখিত আছে

ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ নোচ্ছিষ্টং নহবিষ্কৃতং।

---

* বঙ্গবাসীতে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের প্রতিবাদ প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে নীলকণ্ঠ বাবুর এই প্রবন্ধ লিখিত হয়।

[নবজীবন সম্পাদক]

কিন্তু দশম অধ্যায়ের ১২৫ শ শ্লোকে লিখিত আছে, যে, শূদ্রভৃত্যকে উচ্ছিষ্টমন্নং দাতব্যং জীর্ণানি বসনানি চ।"

এই দুই শ্লোকের সমন্বয় করিলে এই দাঁড়ায় যে আশ্রিত শূদ্রকে উচ্ছিষ্ট দান বা ধর্ম্মোপদেশ দান অবিহিত নহে। কিন্তু যে অনাশ্রয় শূদ্র তাহার প্রতি উচ্ছিষ্টও নিষিদ্ধ, ধর্ম্মোপদেশও নিষিদ্ধ। আবার কুল্লূকভট্টের টীকা অনুসারে ও অন্য অন্য স্মার্ত্তদিগের বচনানুসারে ব্রাহ্মণ সম্মুখে রাখিয়া সকল শূদ্রকেই উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে। যদি বলেন মনুর বিধি-নিষেধ ভাল বুঝিলাম না, তাহা হইলে অন্য অন্য শাস্ত্রকার হইতে উপদেশ লাভ করুন। এস্থলে ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, মনু যদি দুই প্রকার বিধানই দিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ দুই প্রকার বিধানকেই শিরোধার্য্য করিতেই হইবে। কারণ গৌতম বলিয়াছেন—

"তুল্যবলবিরোধে বিকল্প।"

এবং কুল্লূকভট্টও বলিয়াছেন—

স্মৃত্যোরপি বিরোধে বিকল্পঃ॥"

যাহা হউক এক্ষণে শূদ্রের প্রতি ধর্ম্মোপদেশ করা যায় কিনা, তৎসম্বন্ধে অন্য অন্য দু একটি বিষয়েরও আলোচনা করা যাইতেছে। ভাগবতে ব্রাহ্মণেরা, শূদ্র সূতকে বলিতেছেন।

"মন্যে ত্বাং বিষয়ে বাচাং স্নাতমন্যত্র ছান্দসাৎ।"

অর্থাৎ বেদ ভিন্ন অন্য অন্য সকল শাস্ত্রেই তোমাকে পারদর্শী বলিয়া আমরা জানি। নারদ পূর্ব্বজন্মে শূদ্র ছিলেন, কিন্তু তথাপি ঋষিরা তাঁহাকে নিতান্ত গুহ্য বিষয়েও জ্ঞানপ্রদান করিয়াছিলেন। রঘুনন্দন নানাবিধ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেনঃ—

"ততশ্চ স্নান শ্রাদ্ধপঞ্চযজ্ঞেতরত্র শূদ্রস্য মন্ত্রপাঠঃ প্রতীয়তে।"

অর্থাৎ শ্রাদ্ধ স্নান এবং পঞ্চযজ্ঞ ভিন্ন অন্য সকল কার্য্যেই শূদ্রেরা পৌরাণিক মন্ত্রপাঠ করিতে পারেন। পূজ্যপাদ সায়ণাচার্য্য বলিতেছেন—

"স্ত্রীশূদ্রয়োস্তু সত্যাং অপি জ্ঞানাপেক্ষায়াং,
উপনয়নাভাবেন অধ্যয়নরাহিত্যাৎ বেদ অধিকারঃ প্রতিবদ্ধঃ।
ধর্ম্মব্রহ্মজ্ঞানন্তু পুরাণাদি মুখেন উত্পাদ্যতে।"

স্ত্রীজাতির ও শূদ্রজাতির বেদে অধিকার নাই। কিন্তু পুরাণাদি দ্বারা তাঁহারা ধর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। এইরূপ শত শত প্রমাণ দেওয়া

যাইতে পারে। তাহার পর সদাচারও দেখুন। ভরত শিরোমণি স্মার্ত্ত-শ্রেষ্ঠ হইয়া স্বয়ং সাধারণের নিকট মনু প্রচার করিয়াছিলেন। তর্কচূড়া-মণি মহাশয়ের সহিত তারাপ্রসাদ বাবুর বড় বিরোধ নাই। কারণ তারা-প্রসাদ বাবু স্বয়ংই বলিয়াছেন—"বিবেকশক্তি অপ্রতিহত রাখিয়া স্বদেশের ধর্ম্মানুশীলন করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে।" তর্কচূড়ামণি মহাশয়ও বোধ হয় এই কথাই বলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে শাস্ত্রের সহিত বিবেকের অবিসম্বাদিতা প্রদর্শন করা। যখন ৺ রমানাথ ঘোষ বাবুর মতকে সায়ণাচার্য্যের মত অপেক্ষা বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করা হয়, এবং যখন শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বেদকে অসভ্য-গীত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এবং যখন তারাপ্রসাদ বাবুর মত পণ্ডিতেও রঘুনন্দনকে "তাঁতির" সহিত সমতুল্য বলিয়া উপহাস করেন, * এবং যখন ব্যাস ও মনুর শিক্ষা-বিভ্রাট বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, এবং যখন সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় সগর্ব্বে হিন্দুসমাজকে তুচ্ছ করিতে কুণ্ঠিত হন না, তখন হিন্দুসমাজের বড়ই দুঃসময় সন্দেহ নাই। এই দুর্দ্দিনে যে আমাদের হইয়া দু কথা বলিবে সেই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। হিন্দু-শাস্ত্র ও হিন্দুধর্ম্মের জন্য যাহার কিছু মমতা আছে সেই তর্কচূড়ামণি মহা-শয়কে সহর্ষে অভিবাদন করিবে সন্দেহ নাই।

তারাপ্রসাদ বাবুর ৩য় তর্ক এই যে হিন্দুশাস্ত্রে সত্যযুগকে নিষ্পাপ বলা হইয়াছে, অথচ সত্যে অনেকবিধ পাপকাহিনী শ্রুত হওয়া যায়। এইরূপে কলি, হিন্দুশাস্ত্রে পাপময় বলিয়া বর্ণিত আছে, কিন্তু কলিতে পুণ্যের অসদ্ভাব নাই, সুতরাং পাপের তারতম্যানুসারে যে যুগ বিভাগ করা হইয়াছে তাহাতে ভ্রান্তি হইতেছে।

সত্যযুগে যে কিছুমাত্রই পাপ ছিল না, তাহা নহে। ফলত যখন সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিনগুণ লইয়া সংসার সৃষ্ট হইতেছে, এবং যখন তমোগুণ

---

* তারাপ্রসাদ বাবুর লেখা এই:—"বেদ দূরে থাকুক, অনেক স্মার্ত্তের মনুসংহিতাতেই অধিকার নাই। বাঙ্গালার ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ীদের পক্ষে রঘুনন্দন সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছেন। এখন 'মোগল পাঠান হদ্দ হলো, পার্শি পড়ায় তাঁতি।" ইহাতে রঘুনন্দনের উপর উপহাস আছে কি? আমাদের বোধ হয়, অনধীতশাস্ত্র ব্রাহ্মণগণের শাস্ত্রব্যবসায়ী হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ আছে।

(নবজীবন সম্পাদক।)

পাপীর মূল, তখন সৃষ্টির আদি হইতেই পাপ আছে। ভাগবতে এরূপও লিখিত আছে, যে, ব্রহ্মা প্রথমে তমোগুণ হইতে পাপেরই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পরাশর সংহিতায় লিখিত আছে যে "কৃতে সম্ভাষণাৎ পাপং" অর্থাৎ সত্যযুগে পাপীর সহিত কথোপকথনে পাপ হয়। ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে হিন্দুশাস্ত্রকারেরাও সত্যকালে পাপের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন,। মনু বলিয়াছেন যে সত্যযুগে মনুষ্য চারিশত বৎসর বাঁচিত। টীকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন "চতুর্বর্ষশতায়ুষঞ্চ স্বাভাবিকং। অধিকায়ুঃ প্রাপকধর্ম্মবশাদধিকায়ু র্যোঽপি ভবন্তি।" অর্থাৎ চারিশত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকাই স্বাভাবিক নিয়ম। তবে যাগযজ্ঞাদির দ্বারা লোকে অধিকায়ুও হইতে পারিত। এইরূপে কলিতে একশত বৎসর পরমায়ু হইলেও সকলেই যে একশত বৎসর বাঁচে এরূপ নহে। সাধারণ নিয়ম একশত বৎসর বাঁচা। কেহ ইহার অধিকও বাঁচে। কেহ বা এক শত বৎসর পূর্ণ না হইতেই মরিয়া যায়। বয়স-বিষয়ে মনু যেরূপ সাধারণত কালনির্দ্দেশ করিয়াছেন। পাপ পুণ্যের সময় সেইরূপই বুঝিতে হইবে। লোকে সাধারণত পুণ্যবান্ ছিল, সত্যবাদী ছিল। ধর্ম্ম সাধারণত সম্পূর্ণ ছিল! কিন্তু অধর্ম্ম যে সত্যযুগে একেবারেই ছিল না, মনু এরূপ বলেন নাই। একটা সহজ কথাই ধরুন না কেন। যদি সত্যযুগে পাপ না থাকিত, তাহা হইলে সত্যযুগে মনুষ্য পশুপক্ষী কাহারও জন্মই হইত না, সকলেই নিষ্পাপ হইয়া ঈশ্বরে গিয়া লয় পাইত। ফলকথা মনু এবং অন্য অন্য শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, যে, সত্যযুগ হইতে ক্রমশই পুণ্যের হ্রাস ও পাপের বৃদ্ধি হইতেছে। ইহা প্রকারান্তরে তারাপ্রসাদ বাবুও নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। যদি সমাজকে শরীরী-পদার্থ বলিতে হয়, তাহা হইলে এইরূপ না বলিলে চলেই না। যদি শরীরী-পদার্থ মাত্রেরই উৎপত্তি বৃদ্ধি ও বিনাশ থাকে, তাহা হইলে সমাজ নামক শরীরীপদার্থেরই বা থাকিবে না কেন? স্পেন্সর বলেন, যে সমাজের এইরূপ বিনাশ হওয়াই সম্ভব। ইতিহাস দ্বারাও এই কথাই বারম্বার প্রমাণীকৃত হইতেছে,—

"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃক্ব-গতোত্তর কোশলা?"

তারাপ্রসাদ বাবুর শেষ তর্ক এই যে এই ভ্রান্ত মত দ্বারা আমরা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি ও হইতেছি। আমরা এরূপ বিশ্বাস করি না। আমরা

ত সকলেই জানি যে আমরা মরিব; তথাপি আমরা মৃত্যুশয্যাতেও সুখ কামনা পরিত্যাগ করিতে পারি না। সমাজ বিনষ্ট হইবে, এ কথা আমরা নামে মাত্র শুনি। কিন্তু ইহা আমাদের জীবনে কোনরূপ কার্য্য করে বলিয়া ত বোধ হয় না। আমরা অনেকে জানি যে এক সময়ে পৃথিবী বিনষ্ট হইবে; কিন্তু তাই বলিয়া আমরা কবে নিরাশ বা হতাশ্বাস হইয়াছি? এতদ্ভিন্ন আমাদের শাস্ত্রকারেরা আশার কথাও ত বলিয়াছেন। কল্কি ম্লেচ্ছ বিনাশ করিবেন, ইহা কি আশার কথা নয়? গীতায় বারম্বার বলা হইয়াছে যে, লাভালাভ সুখ দুঃখ প্রভৃতি বিবেচনা পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। শ্রীধর স্বামী ভারতের টীকাস্থলে বলিতেছেন—"এতচ্চ স্বরূপকথনমাত্রং বৈরাগ্যার্থং নতু ধর্ম্মসঙ্কোচার্থং।" এই যে ধর্ম্মের হ্রাস পাপের বৃদ্ধির কথা বলা হইল, ইহা স্বরূপকথন (Historical); ইহা দ্বারা তোমরা মনে বৈরাগ্য উৎপাদন কর, ধর্ম্মসঙ্কোচ করিও না। তোমাদের চারিদিকে কিরূপ বিপদ বিবেচনা করিয়া ধৈর্য্যের সহিত কর্ত্তব্য পালন কর। ফলত হিন্দুশাস্ত্রে উন্নতির পথে কোথাও বাধা দেওয়া হয় নাই। কর্ম্মফলে বিশ্বাস করিয়া সৎকার্য্য করুন, আশা সুফল লাভ করিবেন। দেখুন কলিকালে ধার্ম্মিক হওয়া অতি সহজ। কোন শাস্ত্রকার বলিতেছেন—"কলিতে তোমরা আর কিছু করিতে পারিবে না। কেবল অনবরত হরির নাম কর। তাহাতেই তোমরা মুক্ত হইবে।" আর এক শাস্ত্রকার বলিতেছেন—"অন্য অন্য যুগে তপস্যা, জ্ঞান, সত্য শৌচ প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল, এক্ষণে তোমরা তাহা পারিবে না। সৎপাত্রে দান করিও, তাহা হইলেই তোমরা মুক্ত হইবে।" আর এক শাস্ত্রকার বলিতেছেন—"পূর্ব্বে দুশ্চিন্তা করিলেও পাপ হইত। কিন্তু এক্ষণে তোমরা দুর্ব্বলচিত্ত হইয়াছ। তোমাদের জন্য এই ব্যবস্থা হইল, যে দুষ্কার্য্য ব্যতিরেকে তোমাদের পাপ হইবে না।" পাছে আমরা নিরাশ হইয়া একেবারে সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিত্যাগ করি, এ জন্য আমাদের প্রতি সহজ সহজ বিধান করা হইয়াছে। ইহাতেও যদি আমরা নিরাশ হই, তাহাতে শাস্ত্রকারদিগের দোষ কি? সেই মহানুভব শাস্ত্রকারগণ যাহা দিব্য চক্ষে সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহারা আমাদের নিকট অকপটে প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন।

উপসংহারে আমাদের এই মাত্র বক্তব্য, যে, হিন্দুশাস্ত্র বাস্তবিকই সমুন্নত

বিশেষ। ইহাতে রত্নও আছে এবং বিষও আছে,* কারণ এ সংসারে রত্নের যেরূপ প্রয়োজন বিষেরও সেইরূপ প্রয়োজন। কিন্তু রত্ন উত্তোলন করা যেমন সহজ, বিষ উত্তোলন করা তত সহজ নহে। দেখুন সমুদ্র মন্থনের সময় সকল দেবতায় মিলিয়া রত্নই তুলিয়াছিলেন। কিন্তু দেবাদিদেব মহাদেব ভিন্ন আর কেহই বিষোত্তলনে সমর্থ হন নাই। কেননা বিষ উত্তোলনের সর্ত্ত এই যে, যিনি বিষোত্তলন করিবেন, তাঁহার বিষ পানে সমর্থ হওয়া চাই। যে বিষ তুমি গলাধঃকরণ করিতে সমর্থ নও, সে বিষ তোমার উত্তোলন করায় প্রয়োজন কি? যে সর্পের উপর তোমার প্রভুত্ব নাই, সে সর্প লইয়া ক্রীড়া করিলে তুমি নিজেও বিনষ্ট হইবে, অন্যকেও বিনষ্ট করিবে। আর হিন্দুশাস্ত্রালোচকগণ! আপনাদের প্রতি সবিনয়ে এই নিবেদন করি, যে, আপনারা এই অভিমন্যু-বৃত্তি পরিহার করুন। শুদ্ধ হিন্দুশাস্ত্র-ব্যূহভেদ করিলে পৌরুষ নাই। অভিমন্যু ব্যূহভেদ করিতে পারিতেন। কিন্তু ব্যূহ হইতে নিস্ক্রামণ করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। আপনারাও সেইরূপে যুক্তি দ্বারা শাস্ত্র ব্যূহভেদ করিতে শিখিয়াছেন, কিন্তু ব্যূহ হইতে নিরাপদে ফিরিয়া আসিতে পারেন না। আপনারা পূর্ব্ব পক্ষ করিতে বিলক্ষণ পটু হইয়াছেন, কিন্তু মীমাংসার শক্তি আজিও আপনাদের হয় নাই। যে সন্দেহ আপনারা ভঞ্জন করিতে পারেন না, সে সন্দেহ তুলিবার প্রয়োজন কি? যখন আপনারা হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি ভক্তি উৎপাদন করিতে অসমর্থ, তখন হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি বিদ্বেষ উৎপাদন করায় লাভ কি? হিন্দুশাস্ত্রের শক্রুরা হিন্দুশাস্ত্রের বিদ্বেষী হউন, তাহাতে দুঃখ করিব না। কিন্তু আপনারা হিন্দুশাস্ত্রের মিত্র হইয়াও হিন্দুবিদ্বেষীদের সহিত যোগদান করিতেছেন ইহাই বড় আক্ষেপের বিষয়।

শ্রীনীলকণ্ঠ মজুমদার।

---

* তারাপ্রসাদ বাবুর কথা;—"আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র মহাসমুদ্র স্বরূপ ইহাতে অনেক রত্ন আছে, এবং মনুষ্যের অনিষ্টকর বস্তুরও অভাব নাই; এই রত্নাকর হইতে রত্নোদ্ধার করিতে হইলে, যুক্তি ভিন্ন অন্য উপায় নাই।" অর্থাৎ রত্ন তুলিতে গেলেই বিষ উঠিবে।

নীলকণ্ঠ বাবু বলেন, "যিনি বিষোত্তলন করিবেন, তাঁহার বিষ পানে সমর্থ হওয়া চাই।" আমরা বলি, তা কেন, তারাপ্রসাদ রত্ন তুলিতে গিয়া যদি সঙ্গে সঙ্গে বিষ তুলিয়া থাকেন, নীলকণ্ঠ তাহা পান করিয়া হজম করিলে ক্ষতি কি? (নবজীবন সম্পাদক।)

# বিশ্বের পরমায়ু।

আমাদের অণ্ডকটাহ * চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক। তাহা যোগৈশ্বর্য্য ও ভোগৈশ্বর্য্য ভেদে প্রধানত দ্বিবিধ। মহর্লোক অবধি বিষ্ণুপদাখ্য ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যে মহাসৌর স্বর্গচতুষ্টয় তাহা যোগফলের ভূমি। তৎসমস্ত অমল সত্বগুণ ও সূক্ষ্ম-আধ্যাত্মিক তেজসম্পন্ন। পৃথিবী, ভুবর্লোক, পিতৃলোক এবং সূর্য্যাবধি সপ্তর্ষিমণ্ডল পর্য্যন্ত গ্রহতারানক্ষত্র বিশিষ্ট দেবলোক এ সমস্তই ভোগরাজ্য। তৎসমূহ রজোমিশ্রিত সত্বগুণ ও কর্ম্মনিষ্পন্ন বা দেবজ্ঞান সম্পাদ্য আলোকপ্রধান। প্রাগুক্ত যোগৈশ্বর্য্য ভোগের স্বর্গচতুষ্টয় এবং শেষোক্ত ভোগৈশ্বর্য্যপ্রদ পৃথিবী, ভুবর্লোক ও পিতৃদেবমিলিত স্বর্লোক—এই ত্রৈলোক্য একত্র সপ্তস্বর্গের বাচ্য। এতদ্ব্যতীত পৃথিবীর অধম তমোগুণ প্রতিপাদিত সপ্তবিধ লোকের শ্রুতি আছে। তাহাকে সপ্ত পাতাল বলে। এই চতুর্দ্দশ ভুবন। স্থূল সূক্ষ্ম ধাতুক্ষয়ানুসারে দীর্ঘ বা অতিদীর্ঘ ভোগান্তে, ইহারা সমুদায়ই অধিকবার বা অল্পবার প্রলয়রূপ পরিবর্ত্তনাধীন।

যাঁহারা কাল, প্রকৃতি ও গ্রহনক্ষত্রের সংবাদ লইয়া থাকেন, তাঁহারা জানেন, যে, এই বিশ্বরাজ্যের কোন পদার্থই স্থির হইয়া নাহি। কোন পদার্থ একেবারে নষ্ট হইতেছে না—একভাবেও নাহি। কিন্তু সকল পদার্থই স্ব স্ব নিয়মকালান্তে পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত ও তিরোভূত হইতেছে সকল পদার্থই স্বল্প বা দীর্ঘ পরিমিত কালের বেগবান চক্রে আবর্ত্তিত হইতেছে। সকল পদার্থই দেশ কাল পাত্র ভেদে, হয় জাতি পুরঃসরে, নয় ব্যক্তি পুরঃসরে, হয় রূপান্তরে, নয় পূর্ব্বরূপে গমনাগমন করিতেছে। প্রত্যেক শুক্ল কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্র পূর্ব্ব পূর্ব্বরূপে উদিত হইতেছেন এবং মাসে মাসে সপ্তবিংশতি নক্ষত্রকে ভোগ করিয়া আবার তদ্রূপ ভোগে প্রবৃত্ত হইতেছেন। সূর্য্য একবার দ্বাদশরাশি ভোগ করত পুনর্ব্বার সে প্রকার ভোগ করিতেছেন। তাঁহার ভোগের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষচক্রের ন্যায় ষড়্ঋতু বিরাজ করিতেছে।

যেরূপ পক্ষে পক্ষে মাসে মাসে বর্ষে বর্ষে কতিপয় একই প্রকারের ঘটনা সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ কতিপয় নিরূপিত সংখ্যক অল্প বা বহু-

* এক একটি ব্রহ্মাণ্ডের নাম অণ্ডকটাহ। ব্রহ্মাণ্ড অনেক।

বর্ষ অন্তে অনেক ঘটনা পূর্ব্ববৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপ ঘটনা সমূহের পরিক্রম উপলক্ষে কালকে চক্রবৎ বলা যায়। কালচক্র নানাবিধ। (যথা বিঃ পুঃ ২।৮।৬৬) সংবৎসরাদয়ঃ পঞ্চ চতুর্ম্মাস বিকল্পিতাঃ। নিশ্চয়ঃ সর্ব্বকালস্য যুগমিত্যভিধীয়তে॥ সংবৎসরস্তু প্রথমোদ্বিতীয়ঃ পরিবৎসরঃ। ইদ্বৎসরস্তৃতীয়স্ত চতুর্থশ্চানুবৎসরঃ। বৎসরঃ পঞ্চমশ্চাত্র কালোহয়ং যুগসংজ্ঞিতঃ॥ ৩০ দিনের মাস সাবন মাস, সূর্য্যের এক রাশিগত কাল সৌর মাস, শুক্ল প্রতিপদ হইতে অমাবস্যাপর্য্যন্ত চান্দ্রমাস, চন্দ্রের সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ভোগকাল নাক্ষত্র মাস। এই চারি প্রকার মাস। চারি প্রকারেই বৎসর গণনা হয়। যে সময়ে শুক্লপ্রতিপৎ, চন্দ্র সূর্য্যের সমান নক্ষত্র ও সংক্রান্তি একেবারে উপস্থিত হয়, তখন এক দিনেই ঐ চারি প্রকার-মাস আরম্ভ হয়। পাঁচ বর্ষ পর্য্যন্ত উহাদের হ্রাস, বৃদ্ধি, অনৈক্য থাকে। পরে যখন পাঁচ বর্ষ পূর্ণ হয় তখন পূর্ব্ববৎ শুক্লপ্রতিপৎ, চন্দ্র সূর্য্যের এক নক্ষত্র ও সংক্রান্তি উপস্থিত হয়। সেই সময়ে আবার একদিনে ঐ চারি প্রকার মাসই আরম্ভ হয়। উক্ত চারি প্রকার মাসের এইরূপ প্রত্যেক পঞ্চবর্ষান্তযোগ ধরিয়া তাদৃশ প্রত্যেক পঞ্চবর্ষকে এক যুগ বলে। ঐ পাঁচ বর্ষের প্রথমের নাম সংবৎসর, দ্বিতীয় পরিবৎসর, তৃতীয় ইদ্বৎসর, চতুর্থ অনুবৎসর, পঞ্চম যুগবৎসর। ইহার এক একটির উল্লেখ দ্বারা ঐরূপ যুগের গত ও অনাগত অংশ নিরূপিত হয়।

পঞ্চবর্ষাপেক্ষা দীর্ঘতর যুগকাল সকলও আছে। যথা সৌরযুগ। অষ্টাবিংশতি সংখ্যক সৌর-বৎসর যাবৎ প্রতি সৌর দিনে রবি সোমাদি ক্রমে যে যে বার একবার সংঘটিত হয়, সেই সমস্ত বারের ঐ অষ্টাবিংশ বর্ষব্যাপী ভোগ কালের অন্তে পুনর্ব্বার তত্তুল্যকাল যাবৎ একাদিক্রমে সেই সেই সৌরদিন ভোগ হইয়া থাকে। অতঃপর চন্দ্রেরও এক প্রকার যুগ আছে। প্রত্যেক উনবিংশতি বর্ষ যাবৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব উনবিংশ বর্ষের অনুরূপ সমান তিথি সকল একাদিক্রমে সমান সৌরদিনে উপস্থিত হইয়া থাকে।

এই প্রণালিতে বার তিথি মাস ঋতু সম্বৎসর এক এক নিয়মিত কালকে অধিকার পূর্ব্বক কালচক্রে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইতেছে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র এবং পরস্পর যোগবদ্ধ হইয়া বর্ষে বর্ষে বা নিয়মিত যুগ-বর্ষে বার বার পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই অনাদি কালচক্রের মধ্যে প্রত্যেক গ্রহ, নক্ষত্র, স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পরিভ্রমণ করিতেছে।

কোন কোন গ্রহতারা কতিপয় দিনে, কোন কোন গ্রহাদি কতিপয় মাসে, কোন কোন গ্রহ নক্ষত্র কতিপয় বর্ষে, কোন কোনটি সহস্র সহস্র বর্ষে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট পথে নিজ নিজ বর্ষ পরিক্রম করিতেছে।

যেমন গ্রহতারাগণ কালচক্রে বিঘূর্ণিত হইতেছে, সেই রূপ সেই পরিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পরমায়ুও ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে। কেননা প্রকৃতিই সকলের উপাদান। কোন পদার্থ তাহাকে চিরকাল একভাবে ভোগ করিতে পারে না; কোন পদার্থে উহা চিরদিন সমান ভাবে থাকে না। পদার্থের দেহ, গঠন, গতি সমুদয়ই প্রকৃতির বিকার। কি গ্রহনক্ষত্রের, কি পার্থিব ভৌতিক পদার্থের, কি জীবদেহের সকলেরই সমান ভাব। কেবল পরমায়ুর স্বল্পতা ও দীর্ঘতা, পরিবর্ত্তনের শীঘ্রতা বা বিলম্ব মাত্রে ভেদ। এই রূপ পরিবর্ত্তন সকল যেমন জড় পদার্থে লক্ষিত হয়; যেমন সূর্য্য চন্দ্র গ্রহতারাগণের মধ্যে কার্য্য করে; যেমন তরু লতা ঔষধিতে দৃষ্ট হয়; যেমন প্রকাণ্ড গজরাজ, সিংহ, ও মনুষ্যাদি দেহে প্রবাহিত হয়; সেই রূপ মানবের শুভাশুভ ভোগ শক্তিতেও ভোগ্য পদার্থের শক্তিতে সংঘটিত হইয়া থাকে। মানসিক শক্তি, বুদ্ধির বল, ধর্ম্মের ভাব, জ্ঞানের দীপ্তি প্রভৃতি আন্তরিক প্রকৃতি সম্বন্ধেও কালে কালে বিস্তর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। যখন ব্যষ্টি-নর-স্বভাবে অল্প দিনের মধ্যে বিস্ময়-কর পরিবর্ত্তন সকল দৃষ্ট হয়; তখন সমষ্টি-নরস্বভাবে,—সমষ্টি মানবজাতির জ্ঞান, ধর্ম্মে—দীর্ঘকালান্তে যে আরো বিস্ময়-জনক পরিবর্ত্তন সকল দেখা দিবে, তাহাতে বিচিত্র কি ?

কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ যেমন সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহনক্ষত্রের গতি সংক্রমণ এবং তাহাদের রাশিচক্র ও বর্ষ যুগাদি ভোগের যথার্থ কাল নিরূপণ করিয়াছেন, উক্ত গ্রহ নক্ষত্রগণের পরমায়ুকাল নির্ণয়পক্ষে সেরূপ ক্ষমবান্ হন নাই। মানবের ভোগশক্তি, মানসিকশক্তি, জ্ঞানধর্ম্ম প্রভৃতি পৃথিবীর কত বয়ঃক্রমকালে, কি আকারে, পরিবর্ত্তিত হইবে তাহারও স্থির সিদ্ধান্ত করা গণিত-শাস্ত্রের অধিকার-ভুক্ত নহে। কিন্তু সকলের অন্তরে ইহা বিশদ রূপে অনুভূত হইতেছে, যে, তাহার কিছুই চিরকাল একভাবে যাইবে না। চন্দ্রকলার ও সাগরবেলার হ্রাসবৃদ্ধির ন্যায় মানব সমাজের ভোগ, প্রকৃতি, বুদ্ধি, বীর্য্য, জ্ঞান, ধর্ম্ম কিছুদিন উন্নত এবং কিছুদিন অবনত হইবে। উন্নতির পর অবনতি, অবনতির পর উন্নতি চক্রবৎ বর্ত্তনশীল। ইহা

স্বাভাবিক তাহা সকলেই জানেন। জ্যোতির্বিদ্গণ যেমন জ্যোতির্বিজ্ঞানবলে পৃথিবী ও গ্রহতারাসমূহের গতি পরিক্রমাদির কালসংখ্যা স্থির করিয়াছেন; সংসারতত্ত্বসন্ধিৎসু, ধর্ম্মাধর্ম্মের ক্ষয়বৃদ্ধিদর্শী ভোগশক্তি ও ভোগ্যধর্ম্মচিন্তক মহাপুরুষেরা সেইরূপ একটি উপায়দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম, মানসিক শক্তি ও শুভাশুভ ভোগ সম্বন্ধে ক্ষয় ও বৃদ্ধি কালের নিরূপণার্থ ব্যগ্র হইয়া থাকেন। এ সমস্ত তত্ত্ব-রাজ্যে একাল যাবৎ জগতে ঘোরতর পরিবর্ত্তন সকল হইয়া আসিয়াছে। সেই পরিবর্ত্তনের মধ্য হইতে অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম ও ভাবী-পরিবর্ত্তন সকল সংঘটনের ঋতুকাল, তাহার আগমনের অবশিষ্টকাল, আগমন সময় হইতে তাহার স্থিতিকাল এবং তাহার লক্ষণ প্রভৃতি নিরূপণ করণার্থে ঐরূপ দূরদর্শীগণ এই পৃথিবীতে চিরকালই কোন না কোন প্রকার যত্ন করিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহাদের অনেক গণনাও সফল হইয়াছে। যাঁহারা এই প্রকারের সার্ব্বভৌমিক গণনা সকল করেন, অন্যান্য দেশে তাঁহাদিগকে ভবিষ্যদ্‌বক্তা কহে, এ দেশে তাঁহারা যোগী বা ঋষি বলিয়া উক্ত হন। প্রত্যুত সেরূপ গণনা সকল এ দেশে পুরাণ শাস্ত্রের মধ্যে আছে এবং তাহা সনাতন বাক্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মানব সমাজের শুভাশুভ ভোগকাল, জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি ও অবনতির কাল, ভোগ ও ধর্ম্মের মৃত্যুরূপ চূড়ান্ত ক্ষয়কাল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও ভোগ ক্ষেত্র স্বরূপ পৃথিবীর ক্ষয়কাল, ভোগদায়িনী প্রকৃতির ক্ষয়কাল, শুভাশুভ কর্ম্মফল ভোগের স্থানস্বরূপ স্বর্গাদিলোকের ক্ষয়কাল,—শাস্ত্রানুসারে এই সমস্ত তত্ত্ব পরস্পর সম্বন্ধ-শৃঙ্খলে গ্রথিত। শাস্ত্রের বাক্য রাজাজ্ঞার ন্যায় অথবা গুরুর আদেশবৎ। তাহাতে প্রথমত কোন তর্ক স্থান পায় না এবং কোন বাহ্য যুক্তি উদ্ভাবনের আজ্ঞা নাই; সুতরাং শাস্ত্রসঙ্গত যুক্তি-ব্যতীত শাস্ত্রের অভিপ্রায় বুঝা দুঃসাধ্য।

শাস্ত্রের নিগূঢ় অভিপ্রায় এই যে, জীবগণের অনাদি অনির্ব্বচনীয় কর্ম্ম-বীজরূপী অজ্ঞান প্রকৃতি জীবের ভোক্তৃত্ব কর্ত্তৃত্বরূপ মনোবৃত্তির যেমন উপাদান, সেই রূপ তাঁহার কর্ম্মভূমি বা ভোগভূমিরূপ লোকমণ্ডল সমূহেরও উপাদান। অজ্ঞানপ্রকৃতি মূল, মন তাহার সৃষ্ট এক ভাগ, ভোগরাজ্য ও কর্ম্মক্ষেত্র তাহার প্রকাশিত আর এক ভাগ। এই দুই ভাগের মধ্যে মন—সাধক ও ভোগী; সৃষ্টিরাজ্য—উত্তর-সাধক ও ভোগ্য। সমষ্টি বৃদ্ধিতে উহার একটির শক্তি যদি ক্ষয় হয়, তবে অন্যটিরও হইবে। মন যদি দীর্ঘ কাল কর্ম্ম সাধন ও কর্ম্মফল

ভোগে পরিশ্রান্ত হইয়া তদনুরূপ দীর্ঘকাল নিদ্রাভিভূত হয়, তবে সৃষ্টিও সেই পরিমাণ কাল যাবৎ লুপ্ত, তমোভূত ও অপ্রজ্ঞাত থাকিবে। ফলে এটি সমষ্টি ভাব। সৃষ্টি ও প্রলয় সমষ্টি ভাবের অনুগত। ব্যষ্টি প্রকৃতির ক্ষয়ে কোন ব্যষ্টি জীবের মৃত্যু হইতে পারে; কেবল তাহারই পক্ষে ভোগরাজ্য অদর্শন হইতে পারে; কিন্তু তখন অনন্তকোটি কর্ম্মী, ভোগী, ও সাধক বিদ্যমান থাকিবে; তাহার উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র, ভোগভূমি ও শুভফলপ্রদ স্বর্গরাজ্য উত্তর সাধকরূপে বর্ত্তমান থাকিবে; কিছুই লয় পাইবে না। ভোক্তা ও ভোগ্যের মধ্যে—কর্ত্তা, ক্রিয়া ও কর্ম্মের মধ্যে—এই শৃঙ্খলা—এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। একই প্রকৃতি উভয়ের উপাদান, মূল, কারণ, উদ্ভবস্থান ও লয় স্থান। সেই প্রকৃতি, যখন দীর্ঘ ভোগান্তে স্বীয় সুব্যক্ত-মনাদি-সূক্ষ্ম আকার ও জড়-ব্রহ্মাণ্ডরূপ স্থূল-আকার ভঙ্গপূর্ব্বক পুনঃ অব্যক্তে পরিণত হইবে, তখন মনাদি ইন্দ্রিয়গণ, তাহাদের বাহ্যাবয়বরূপ স্থূল-দেহ এবং ভোগ্য সৃষ্টি সংসার সমুদয় ভঙ্গ হইয়া যাইবে। তখন অণ্ডকটাহস্থ সমুদয় গ্রহতারাগণের গতিরোধ হইয়া আসিবে; সূর্য্য নির্ব্বাণ হইবে; স্বর্গ ও পৃথিবী, বায়ু, অগ্নি ও জল দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন দগ্ধ ও প্লাবিত হইয়া পশ্চাৎ সূক্ষ্ম ভূতের আকার গ্রহণ করিবে, এবং সূক্ষ্মভূত অবশেষে সূক্ষ্মদেহ ও যোগৈশ্বর্য্যের সহিত অব্যক্ত প্রকৃতি হইয়া যাইবে। এইরূপ, প্রকৃতি হইতে সকলের উদয়কাল অবধি, পুনঃ প্রকৃতিতে লয় পর্য্যন্ত যে অননুভবনীয় প্রকাণ্ড দীর্ঘকাল তাহাই এই বিশ্বের পরমায়ু।

ঐ পরমায়ু ক্ষয় হইলে সমগ্র বিশ্বরাজ্য প্রকৃতিস্বরূপ বীজে লীন হইয়া যায়। সেই বীজের ক্ষয় নাই। তাহা জীবের অনাদি কর্ম্ম-বীজ ও ভোগ-বীজ। তাহাই জগৎ সৃষ্টির নিমিত্তে ঈশ্বরের সহকারিণী শক্তি। কিন্তু ঈশ্বরের আরো অনেক পরিমাণশক্তি আছে। সে সম্বন্ধে তিনি সৃষ্টি-সংসারের অতীত।

বিশ্বের প্রাগুক্ত প্রকার পরমায়ুকে প্রাকৃতিক সৃষ্টিকাল এবং তাহার অন্তকে প্রাকৃতিক প্রলয়কাল কহে। তাহার মধ্যে অনেকবার নৈমিত্তিক প্রলয় হইয়া পৃথিবী অবধি ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্মফল ভোগের প্রদেশ দগ্ধও জলপ্লাবিত হয়। তখন স্থূল সূক্ষ্ম ভূতগণ, মনপ্রধান সূক্ষ্মদেহ, এবং মহাসাত্বিক যোগৈশ্বর্য্যের ভোগ ভূমিস্বরূপ ব্রহ্মভুবন চতুষ্টয় অবশিষ্ট থাকে। প্রত্যেক নৈমিত্তিক সৃষ্টিকালের অভ্যন্তরে অনেকবার যুগ পরিবর্ত্তন হয়।

একবার সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, হইয়া আবার একাদিক্রমে সেইরূপ হয়। চন্দ্রকলার বৃদ্ধি ও হ্রাসের ন্যায় ধর্ম্ম, মানসিকশক্তি, ভোগ সুখ, শৌর্য্য, বীর্য্য প্রভৃতির স্বাভাবিক ও সাময়িক বৃদ্ধি ও হ্রাসই সেই সব যুগপরিবর্ত্তনের হেতু। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বুদ্ধি, মতি, ভোগ, বীর্য্য প্রভৃতি কতদিন উন্নত থাকিবে, কতদিন পরে কি পরিমাণ হ্রাসাবস্থ হইয়া থাকিবে, ক্রমে কতদিন পরে একেবারে অবনত হইয়া আবার উন্নতির পথবর্ত্তী হইবে, এই সকল গণনার দ্বারা যুগের নির্ণয় হয়। যুগ নির্ণয় পূর্ব্বক এমন একটি শেষ যুগের লক্ষণ লক্ষিত হয়, যাহার পর প্রলয় ব্যতীত পুনরায় জ্ঞান, ধর্ম্ম, ভোগ ও মানসিক শক্তি প্রভৃতি প্রকৃতিস্থ বা উন্নতির পথস্থ হইতে পারে না। এই কালটির গণনার দ্বারা নৈমিত্তিক প্রলয়-কালের অর্থাৎ কল্পকালের পরিমাণ নির্ণীত হয়। অল্প কাল নির্ণয় হইলে তদন্তর্গত ধর্ম্ম, জ্ঞান, ভোগ প্রভৃতির সাধারণ প্রকৃতিগত ক্ষয় এবং ব্রহ্মভুবনের ভোগ্য যোগৈশ্বর্য্যের বিশেষ বিনাশ সম্ভাবনা অনুভূত হয়। তাদৃশ ভোগাদির, বিশেষত যোগৈশ্বর্য্যের ক্ষয়কালের গণনাই বিশ্বের পরমায়ুর গণনা। এই সমস্ত গণনা জ্যোতিষ অথবা সামান্য গণিত বিদ্যার অন্তর্গত নহে। সে সকল বিদ্যা দ্বারা তাহার সত্যতা প্রমাণ করা যায় না। যাঁহাদের গণনাশক্তি তাদৃশ বিষয়-বিদ্যার মধ্যে বিচরণ করে, ঐ সমস্ত মহাগণনার রস তাঁহারা অনুভব করিতে পারেন না। কেবল যোগৈশ্বর্য্যসম্পন্ন যোগিগণ উহার মর্ম্ম জানেন, এবং সাধারণত ভারতীয় শাস্ত্রের প্রভাব যাঁহাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে, তাঁহাদের তাহাতে কোন বিপ্রতিপত্তি নাই।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।
খড়্গপুর।

# বাসন্তী পূজা।

মিলনে সৃজন—অমিলনে লয়,
বিজ্ঞানের এই মহামন্ত্রবয়,
গাইতেছে বিশ্ব সকল সময়,
সৃজন লয়ে,
শকতি সৌন্দর্য্য মিলনে বিকাশ,
অমিলনে অহা ঘোর সর্ব্বনাশ,
উন্মত্ত প্রকৃতি করে হা হুতাশ !
বিনাশ ভয়ে !

যামিনী মিলনে হাসে শশধর,
শশীর মিলনে তারকা সুন্দর,
তেমনি আবার মিশে চারুতর
তারকা নভে,
দূরে—অতিদূরে—দিক্‌দিগন্তরে
যেখানে যে আছে বিশ্ব চরাচরে
কেমন সুন্দর মিশে পরস্পরে,
হাসিছে সবে !

অরুণ উদয়ে উষা, আগমনে,
নবজীবনের মৃদু আন্দোলনে,
পরশ কোমল প্রভাত পবনে,
সুরভিশ্বাসে,
তরু লতিকার শ্যামল শোভায়,
কুসুমের মধুমাখা সুষমায়,
কোমল অলক্ত অরুণ আভায়,
প্রকৃতি হাসে !

আবার—
মিশি বাষ্পরাশি জলদে গর্জ্জিয়া,
কালান্তে অনলে বিশ্ব পুড়াইয়া,
গ্রহ উপগ্রহ ছুড়িয়া ফেলিয়া,
তুফানে ঝড়ে,
কি মহান্ এক করি হুলস্থূল
নাচে ধ্বংসমূর্ত্তি উলঙ্গ বাতুল,
ভয়ে আশঙ্কায় ব্রহ্মাণ্ড ব্যাকুল,
ত্রাসে শিহরে !

প্রকৃতির যেন মহান্ শ্মশান—
পাতাল পৃথিবী ব্যাপিয়া বিমান,
অর্দ্ধদগ্ধ অঙ্গ পূর্ণ চিতাস্থান
করিছে ধূধূ !
শকুনী গৃধিনী টানে না শব,
শৃগাল কুকুরে করে না রব,
সকলেই মৃত—সকলি নীরব,
ঘোর অট্টহাসে হাসিছে ভৈরব
প্রলয় শুধু

দেবগণ—
বুঝেছিল এই শকতির বল,
বুঝেছিল সুধা কেবলি বিফল,
বুঝেছিল বজ্র নিতান্ত দুর্ব্বল
অসুর নাশে,

ঐরাবত হস্তী উচ্চৈঃশ্রবা হয়,
মিছে কল্পতরু, কেহ কিছু নয়,
বৃথাই নন্দনে মন্দার নিচয়
ফুটিয়া হাসে!

বুঝেছিল ইহা সকল দেবতা
কিসে অমরের রবে অমরতা,
কিসে কি করিয়া মরমের ব্যথা
হইবে দূর,
বরুণের পাশ বৃথা অহঙ্কার,
কৃতান্তের দণ্ড নিতান্ত অসার,
চক্র সুদর্শনে কখনো না আর
মরে অসুর।

অলকার ধন তেমনি বিফল,
তেমনি কৌস্তভ মণি সুবিমল
দৈত্য-দাসত্বের পদক উজ্জ্বল
দেবের গলে,
পারিল না আর সহিতে অমর,
যে যেখানে ছিল, মিশিল সত্বর,
ইন্দ্র চন্দ্র যম বায়ু বৈশ্বানর
সুর সকলে!

সুপ্ত মহাশক্তি করিলা বোধন,
কোটি হস্ত ঊর্দ্ধে করি উত্তোলন
কোটি কণ্ঠে করি গভীর গর্জ্জন
বিদারি ব্যোম;—
হাসিলা চণ্ডিকা ঘোর অট্টহাস,
তীব্র জ্যোতিঃপুঞ্জ হইল বিকাশ,
নিখিল অনল বিজলী বিভাস
তপন সোম।

আগের অচল গগন পরশি
দাঁড়াইলা যেন শক্তি মহিয়সী,
গদা শেল শূল ভিন্দিপাল অসি
শোভিল করে।
ক্রোধে রক্তাধর করিলা দংশন,
নয়ন কালাগ্নি কৈল উদ্গীরণ,
প্রতি রোমকূপে বিদ্যুত যেমন
উছলে পড়ে।

ধরা যেন হ'ল ভরে টলমল,
ভয়ে উথলিল সপ্তসিন্ধু জল,
সভয়ে কাঁপিল অষ্ট মহাচল
চরণভরে।
ঊর্দ্ধে যোড় করে মুনি ঋষিগণ
কেহ ধ্যানেরত মুদিয়া নয়ন,
কেহ যোগাসনে করিলা স্তবন,
কাঁপিয়া ডরে!

ভাই ভাই তুমি মিলিয়ে তেমন,
পার না কি কভু করিতে যতন,
সুপ্ত মহাশক্তি করিতে বোধন?
পার না তুমি?
পারনা সে তুমি আর্য্য কুলাঙ্গার
নিবারিতে হায় দৈত্য-অত্যাচার?
পার না সে তুমি করিতে উদ্ধার
ত্রিদিব ভূমি?

দেবতার মত হ'য়ে একপ্রাণ,
নিজ নিজ তেজ করিয়ে প্রদান
কর মহিয়সী শকতি নির্ম্মাণ
মিলি সকলে,

সিংহের গরাসে মহিষ অসুর,
হীনবীর্য্য আজ যবন নিষ্ঠুর,
দেখিবে উভয়ে লুঠিতে দেবীর
চরণ তলে !

নিরখি সে মূর্ত্তি ভীমা ভয়ঙ্করী,
উদ্দাম আবেগে আনন্দ লহরী,
অন্নদা যশোদা রাজ রাজেশ্বরী
সহস্র ভুজা,
আরব ইরাণ চীন ম্যাঙ্গোলিয়া
মিশর জর্ম্মেণ ইটালি রুষিয়া
আতঙ্কে কাঁপিয়া, ত্রাসে শিহরিয়া,
করিবে পূজা !'

ভাই ভাই তুমি মিলিয়া তেমন,
পার না কি কভু করিয়া যতন,
সুপ্ত মহাশক্তি করিতে বোধন,
পার না তুমি ?
পার না কি তুমি আর্য্য-কুলাঙ্গার
নিবারিতে হায় দৈত্য-অত্যাচার !
পার না কি তুমি করিতে উদ্ধার
ত্রিদিব ভূমি ?

---

# অতীত।

" What am I ? Nothing. "
" Thou the soul of my life. "

অতীতই আমাদের হৃদয়ের অমরাবতী। অতীতের সেই মহান পবিত্র মন্দিরের চারি দিকেই সুখের পারিজাত ফুটিয়া আছে। চারিদিকেই প্রেমের অমর ছবি অঙ্কিত। হায়! আজ সে ফুল কে অন্বেষণ করে! কে তার ফুলের হাসির মধ্যে কান্নার নীরব মুর্ম্মরদাহ দেখিতে যায়! কে তাহার ছবির দিকে চায়! কেন? কে জানে কেন, এখানে এই রূপ হয়। তুমি ন আজ তুমিও সেই মৃত স্মৃতির নিস্তব্ধ সমাধি গৃহের অতিথি। আজ আত্মময়ী, অনন্তস্বরূপিণী। আজ তুমি আমার সব। আজ তুমি ফুলের গন্ধ ও চাঁদের জ্যোৎস্নার মতন অতীতের অনন্ত রাজ্যে বিরাজিত। তোমার স্নেহ কটাক্ষে সমস্ত অতীত পূর্ণ আলোকিত। আজ আমি সে আলোর হৃদয়ের সিংহাসনের উপর বসিয়া দেখিতেছি[illegible] অনন্তের ক্রোড়ে মানুষ মৃত্যুর হাত ধরিয়া যায়। মৃত্যু কি? মৃত্যু [illegible] একমাত্র পথ প্রদর্শক।

অতীত—তুমি, তুমি—অতীত। আজ বর্ত্তমানের এই শূন্য মন্দিরে স্মৃতির হাত ধরিয়া তোমার সেই—রাজ-রাজেশ্বরী মূর্ত্তির পূর্ণ ছায়া দেখিতে পাই। দেখিতে পাই—তোমার সেই মূর্ত্তির চারিদিকে কত পুরাণো কথা, কত পুরাতন গান, জীবনের কত পুরাতন দিন, ঝরে পড়া কত স্নেহ, গীত-গানের স্মৃতির মতন হাসি-অশ্রু-মাখা কত আদরের মুখ, নিশীথের হৃদয়-উন্মত্তকরী পুস্তিকা পাঠের কত গভীর সুখ দুঃখ—এক একটি রাগিণীর মত বিরাজ করিতেছে। বর্ত্তমানের নিস্তব্ধ অন্তঃপুরে অবিরাম ঐ সকল মিশ্রিত রাগিণীর অভিনয় হইতেছে।

কি চমৎকার! অতীতের বাসরঘর শ্মশানের উপর গঠিত! সে বাসর-ঘরের পুরোহিত মৃত্যু স্বয়ং। অতীত—অতীতের প্রত্যেক কথা এক একটি নন্দনকানন। অতীত কি? তা' কি বলিব। অতীতের ভাষা নাই। অতীত বুঝিতে পারি; কিন্তু বুঝাইতে পারি না। বুঝি, অতীতের কথা স্মরণ করিয়াই প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ হৃদয়ের সহিত বলিয়াছেন যে, "অতীত কালের সংখ্যাতীত মৃত মানুষের প্রেমে পৃথিবী আচ্ছন্ন; সমস্ত নগর গ্রাম কানন ক্ষেত্রে বিস্মৃত মনুষ্যের প্রেম শত সহস্র আকারে শরীর ধারণ করিয়া আছে, শত সহস্র আকারে বিচরণ করিতেছে; মৃত মনুষ্যের প্রেম ছায়ার মত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে; আমাদের সঙ্গে সঙ্গে উত্থান করিতেছে। আমরাও সেই মৃত মনুষ্যের প্রেম,—নানা ব্যক্তি আকারে বিকশিত।" আর আজ কতদিন হইল, শেলীর হৃদয়ের বাঁশী এই গান গাহিয়াছিল—

Forget the dead, the past? Oh yet
There are ghosts that may take revenge for it!

আজ সে-শেলী নাই! কিন্তু আমি ঐ গান, ঐ প্রেম এবং ঐ স্মৃতির হৃদয়ের মধ্যে শেলীকে দেখিতেছি। আজ—গান—প্রেম—স্মৃতি—শেলী একই। একটি ফুল হইয়া অতীতের মধ্যে ফুটিয়া আছে। কি স্বপ্নময় মধুর মিলন!

চিন্তাশীল কবি রবীন্দ্রনাথ "[illegible]লির" এক স্থানে লিখিয়াছেন, যে, "বাগানে এই যে বহুবৃদ্ধ [illegible] দেখিতেছ—একদিন কোন্ সকাল বেলায় কি সাধ করিয়া [illegible]তেছিল—সে জানিত সে ফুল তুলিবে, সে মালা [illegible]টি শুধু নাই, সেই সাধটি শুধু নাই, কেবল ফুল ফুটি[illegible] পড়িতেছে। আমি যখন

ফুল সংগ্রহ করিতেছি, তখন কি জানি কাহার আশার ধন কুড়াইতেছি, কাহার যত্নের ধনে মালা গাঁথিতেছি!” মানুষ নাই সত্য কথা বটে। কিন্তু সাধ আছে। তার যত সাধ সেই গাছটির প্রাণের মধ্যে রাখিয়া গিয়াছে। তার সাধবারি-বর্দ্ধিত বলিয়াইত সে ফুল আমাদের এত আদরের। আর তোমার জন্যইত সে ফুল ঝরিয়া পড়ে। তোমার উপরইত সংগ্রহের ভার।* সেই বকুল গাছইত তাহার পুরাতন স্বামীকে মাথায় করিয়া রাখিয়াছে। সে যে, সেই বকুল গাছটিকে—আপনার সর্ব্বস্ব—দিয়া গিয়াছে। সেই বকুলের ফুলের মধ্যে কি তুমি তাহার গন্ধ পাও না? তাই বলি, অতীতের সঙ্গে কাহারও কোন মিল নাই এ কথা বলিতে পারি না। অতীতকে সরাইতে পারি না। অতীত চিরকাল থাকিবে। তাহার সাধও চিরকাল থাকিবে। শেফালী—ফুল কোনকালে শুকাইবে না। উহারা অমর।

বড় আশার কথা। বড় সুন্দর দৃশ্য। দেখিতেছি—আমার অতীতের নিকুঞ্জ-কাননে তোমার জীবন্ত হাসি-ফুল-রাশি আজিও তেমনি ভাবে হাসিয়া সুগন্ধ বিতরণ করিতেছে। বর্ত্তমানের এই ঘোর অমাবস্যার অন্ধকারে অতীতের অদৃশ্য-গৃহ হইতে স্মৃতির সৈকত দিয়া তোমার আলো আসে। সে আলো, স্বর্গের আলো। সে আলো অতীত হইতে উৎপন্ন হইয়া দূর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। অতীতের হাতে তোমার আলো এক গাছি মালা। অতীত, সে মালা ভবিষ্যতের গলায় পরাইয়া দিয়াছে। অতীত ও ভবিষ্যৎ, সেই আলোর মালা লইয়া মালা বদল করিয়াছে। বড় সুন্দর—বিরহ-মিলন-বিবাহ বড় সুন্দর।

আবার আমার এই অতীতের মাথার উপর কত শত লোকের কত অতীতই জাগিতেছে। আমার অতীত—আজ আমার অতীত—সেই সব অতীতের কেন্দ্রস্থল। আজ আমার অতীত হইতে কিসের এক তরঙ্গ উঠিয়া সমস্ত অতীত তরঙ্গায়িত করিয়াছে। সেই তরঙ্গের বৈদ্যুতিক গতিতে অতীতের সেই প্রকাণ্ড [illegible] হইতে কত শত সুখের স্বপন, কত আশাশূন্য প্রেম, কত মিলনের [illegible] [illegible]বনের শারদীয় পৌর্ণমাসি,

---

* Thine are these [illegible]s,
Though ga[illegible]
[illegible]helley.

পূর্ণ-আশার কত বৈচিত্র্যময় সুখ কল্পনা, কত সৌন্দর্য্য, নৈশ সমীরণে গঙ্গাকে বসিয়া দুইটি অকপট হৃদয়ের কত অস্ফুট কথাও কত—সেই,—

"I, Beyond the limit of all else in the world,
Do love, prize, honour you!"

—উৎফুল্লহৃদয় আমার অতীতে, অতি ধীরে ধীরে মিশিতে মিশিতে কত শত সুখের তারা ফুটিয়া ফুটিতে লাগিল। কত সুখ—সুখের বসন্তের কি চির-জাগরণ। এই জন্যই অতীতের এত পক্ষপাতী। সেখানে বিচ্ছেদ নাই। মিলনের চির রাজত্ব।

অতীতকে ছাড়িয়া আমরা কতক্ষণ থাকিতে পারি? এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারি না। আমরা ত অতীতের মধ্যেই বাস করিতেছি। বর্ত্তমান যে, এক মুহূর্ত্তও নয়। আর অতীতের জীবন অনন্ত কাল ব্যাপিয়া। অতীত না থাকিলে বর্ত্তমানকে কে মানুষ করিত? বর্ত্তমানের প্রতি মুহূর্ত্ত অতীতের ক্রোড়ে জাগ্রত। অথবা অতীত ও বর্ত্তমানের পার্থক্য কোথায়? বর্ত্তমান অতীতে জন্মিয়া আবার অতীতে মিশিতেছে। সময়ের অনন্ত স্রোতে অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের তারতম্য কোথায়! অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ, কেবল কতকগুলি অর্থশূন্য শব্দের সমষ্টি। ইহাদের কোন বিশেষ গুণ নাই। ঠিক কথা। কালের একটানা সূত্রের মধ্যে অতীত বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের কোন বিচ্ছেদ গ্রন্থি দেখি না। এই চির প্রাচীন ভুবনমণ্ডলের শশীত আজও নবীন; অতীত—তুমি—তুমিও আমার চির-নবীন শশী।

এস তবে বাঞ্ছিত, এস আজ অতীতের পৃষ্ঠে তোমার নবজীবন প্রতিষ্ঠা করি। সেই আমার সুখ। সেই আমার শান্তি।

——00——

# উদ্ভট কথা।

## দ্বিতীয় শাখা।

Ordinary history is traditional; higher history is mythical; highest history is my[illegible]

সামান্য ইতিহা[illegible] উচ্চতর ইতিহাস পৌরাণিক বিবরণ মূলক; এবং [illegible] রহস্য-মূলক।

কাব্য সম্বন্ধেও [illegible] সামান্য কবিতা (স্বভাব) বর্ণনাময়ী; উচ্চত[illegible] উচ্চতম কবিতা (আধ্যাত্মিক) রহস্যময়ী।

ইতিহাস ও কাব্যের এইরূপ ক্রমোত্থিত স্তরে স্তরে—আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, এবং আধ্যাত্মিক ভাব যিনি না বুঝিয়াছেন, তিনিই ইতিহাস ও কাব্যে সত্য মিথ্যার প্রভেদ আরোপ করিয়া অনর্থক গণ্ডগোল করেন; তিনি শ্রেষ্ঠতম ইতিহাস ও শ্রেষ্ঠতম কাব্য কি, তাহা আপনিত বুঝেনই না, কাজেই অন্যকেও বুঝিতে দেন না। বাস্তবিক ইতিহাসে ও কাব্যে কোন রূপ ভাব-অভাব ভেদ নাই। দুইটিতে কোথাও পাশাপাশি থাকিয়া, কোথাও গলাগলি করিয়া, কোথাও মেশামেশি হইয়া,—ভাব-রহস্যময় বিশ্বের বিবরণ প্রদান করে।

তবে কি বর্ণনা ও কল্পনা একই বৃত্তি? না কখনই নহে। তবে উহার একটিও মিথ্যা নহে। আর ইহা সচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে, যদি নিকৃষ্ট মানবে বর্ণনা অধিকতর ফল-দায়িনী হয়, তবে শ্রেষ্ঠতর মানবে কল্পনা অধিকতর ফলদায়িনী। অন্তত সংসারধর্ম্মের সামান্য কার্য্যে—উভয়েই সমান কার্য্যকরী।

কিরূপে তাহা দেখাইতেছি। পাঁচটা দেখে শুনে একটা স্থির করাকে অন্বীক্ষণ বলা যায়। এই অন্বীক্ষণের উপর মনুষ্যজীবনের ষোল আনা নির্ভর করে বলিলেও চলে। এখন দেখা যাউক, কিরূপ সাধনে, কিরূপ সোপানে অন্বীক্ষণ হয়, এবং তাহাতে কেবল ঘটনার বর্ণনাই থাকে, না কল্পনার সাহায্যও হইতে হয়। আমরা দেখাইতেছি, যে বর্ণনা ও কল্পনা উভয়ে না মিলিলে অন্বীক্ষণ হয় না।

পড়িয়াছি, শুনিয়াছি;—

রামলক্ষ্মণাদি মরিয়াছেন,
যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুনাদি মরিয়াছেন,
হানিবল, সীজর, নেপোলিয়ানাদী মরিয়াছেন,
পিতামহ পর্য্যন্ত পূর্ব্বপুরুষেরা মরিয়াছেন,
আরও কত কোটি কোটি লোক লোক মরিয়াছেন;—শুনিয়াছি।

দেখিয়াছি;—

প্রতিবাসী মধ্যে শতজন মরিয়াছেন,
পরিবার মধ্যে দশজন মরিয়াছেন;

অতএব, সকল লোকই মরে। ইহাই অন্বীক্ষণ।

রাম লক্ষ্মণের মৃত্যু হইতে, পরিবারস্থ ব্যক্তি বর্গের মৃত্যু পর্য্যন্ত—সমস্তই ইতিহাসের বিষয়ীভূত ঘটনা বলিয়া স্বীকার করিতে পারি; কিন্তু ইতি-হাসকে ত ঐপর্য্যন্ত বলিয়াই আ[illegible] [illegible]তিনি মরিয়াছেন, তিনি মরিয়াছেন, সে মরিয়াছে, উহা[illegible] [illegible] ইহার অধিক আর বাগ্‌নিষ্পত্তি করিবার উপা[illegible] [illegible]া বলিয়া দেয়, অতএব সকল লোকই ম[illegible] [illegible]নায় মিলিত না হইলে অন্বীক্ষণ হয় না। [illegible] [illegible] অতএব' কথনই আসিতে পারিত না। [illegible] [illegible]ক্ষণের সিদ্ধান্ত,

মিথ্যা,—একথা কখন কেহ বলেন না। অন্বীক্ষণ সত্য, পরম সত্য, অথচ একান্তই কল্পনামূলক। আমরা সকলেই নিত্য জীবনে প্রতি নিয়তই অন্বীক্ষণের উপর সুতরাং কল্পনার উপর নির্ভর করিতেছি। দেখুন, আমরা উদ্ভট কথার প্রথম শাখায় যাহা বলিয়াছি, তাহা ঠিক কিনা। আমরা বলিয়াছি, যে অনেকে আপন আপন মনের খানাতল্লাসী করেন না বলিয়াই, কল্পনাকে মিথ্যা-প্রসবিনী বলিয়া অযথা নিন্দা করিয়া থাকেন।

বিচিত্র দেখুন, যাহাকে ইংরাজিতে বা বাঙ্গালায় (circumstantial evidence) ঘটনামূলক প্রমাণ বলে, বাস্তবিক তাহা কল্পনামূলক মাত্র। বর্ত্তমান ঘটনা এই যে, ভবেন্দ্র কাটা পড়িয়াছে। পূর্ব্ব ঘটনা এই যে, উপেন্দ্রের সহিত তাহার শত্রুতা ছিল; এক সময়, উপেন্দ্র যে চুপে চুপে ভবেন্দ্রের ঘরে গিয়াছিল, তাহা একজন দেখিয়াছিল। তাহার এক ঘণ্টা পরে, ত্রস্ত ভাবে বাহির হইয়া যায়, আর একজন দেখিয়াছে। বাড়ীতে গিয়া সে কাপড় ছাড়ে, তাহার চাকরাণী বলিতেছে। সেই ছাড়া কাপড়ে রক্তের দাগ আছে, এখনও দেখা যাইতেছে। অতএব উপেন্দ্র ভবেন্দ্রকে কাটিয়াছে। এই অতএবও কল্পনার কথা। ইতিহাসের ওকথা বলিবারই অধিকারই নাই। সুতরাং যাহাকে আমরা ঘটনামূলক প্রমাণ বলি, তাহা অংশ ত কল্পনা-মূলকও বটে।

অন্বীক্ষণ বা অনুমান এবং প্রমাণ যে রূপ অংশ ত ঘটনা মূলক, (Theory বা) দার্শনিক মতবাদও সেই রূপ। বিজাতীয় বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠ অগস্ত কোমৎ তাহা পরিষ্কার রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।

সূর্য্যকে কেন্দ্রস্থ করিয়া গ্রহ উপগ্রহাদি নিয়ত আকাশ মণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেছে। আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদগণের এই মত-বাদের, কল্পনা হইতেই উদ্ভাবনা এবং কল্পনাতেই ধারণা। কেবল জ্যোতিষী গণনা হইতে ওরূপ সিদ্ধান্ত আসে না। গ্রহগণের স্ফুট গণনা প্রাচীন কালেও ছিল; বিশেষ সূক্ষ্মতম গণনা না থাকিলেও, অনেকটা সূক্ষ্ম গণনা ছিল। অথচ পূর্ব্বতন জ্যোতির্ব্বিদগণ, সূর্য্যকেন্দ্রের সিদ্ধান্ত করেন নাই। চোখে দেখিতেছি বটে, যে সূর্য্যের দৈনন্দিন উদয়াস্ত হইতেছে, বুধ শুক্রের বক্রগতি, শনির শনৈঃ শনৈঃ গতি হইতেছে; পৃথিবী স্থিরা অচলা; কিন্তু কল্পনা বলে ভাবিতে হইবে, যে সূর্য্যই ইহাদের কেন্দ্রীভূত, এবং এই সাগরাম্বরা তুষার-স্তূপ-কিরীটিনী বিশাল ধরণী, অন্যান্য গ্রহগণের সহিত নভোমণ্ডলে বিচিত্র চক্র কক্ষে নিয়ত ভ্রাম্যমানা। মহাকবির মহীয়সী কল্পনার আশ্রয় না পাইলে, ঐ বিকট বিচিত্র সুন্দর [illegible] ধারণাই করিতে পারি না। অতীত-সাক্ষী ইতিহাস [illegible] অগ্রসর হইতে পারে না; জড় বিজ্ঞান বিঘূর্ণিত [illegible] করে; তখন রহস্যময়ী কল্পনা, তাহার [illegible] সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করেন। তখন বিজ্ঞান [illegible] বিজ্ঞানের শিরচুম্বন করেন। ইতিহাস [illegible]কে।

আবার আর এক দিক দিয়া কাব্য ইতিহাসের গৌরব বুঝা যাইতে পারে।

সচরাচর শুনা যায়, যে, ইতিহাস ( Real বা ) ঘটনা-মূলক এবং কাব্য ( Ideal বা ) ভাবমূলক। এবং সেই জন্য কাব্য অপেক্ষা ইতিহাস অনেক কার্য্যকর; কেননা কাজের কথা লইয়াই সংসার; ভাবের কথা শৈশবের খেলাধূলা, যৌবনের মোহলীলা, এবং স্থবিরের দুরাশা মাত্র। আমরা বলি, এ কথা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

যাহা ( Real বা ) প্রকৃত তাহা ক্ষণস্থায়ী সুতরাং ক্ষণভঙ্গুর। কিন্তু যাহা ( Ideal বা ) পরাকৃত, তাহা নিত্য সুতরাং অভঙ্গুর। প্রকৃতি পরিবর্ত্তনশীলা; পরাকৃতি স্থিরা অচলা।

মুখুয্যেদের মেঝো বৌ বড় সতীলক্ষ্মী; স্বামী,-শ্বশ্রূ,-সংসার-সেবায় দিনযামিনী যাপন করে। এত যে খাটুনি, এত যে টানাটানির সংসার, তবু মুখে কথাটি নাই, কিন্তু গোলাপি হাসিটুকু মুখে লাগিয়াই আছে। মেঝো বৌয়ের প্রশংসা প্রতিবাসীর মুখে ধরে না; মেঝোবৌয়ের প্রশংসা করিবার সময় তোমার মুখে খৈ ফুটিতে থাকে। অথচ তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রী দ্বিরাগমন যাত্রার পূর্ব্বে যখন তোমায় আসিয়া ধীরে ধীরে প্রণাম করিল, তখন তুমি তাহাকে "এসো মা, সাবিত্রীর সমান হও," বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে। কৈ 'মুখুয্যেদের মেঝোবৌয়ের মত হও,' এ কথা ত বলিলে না! আমরা সকলেই এইরূপ করি।

মেঝোবৌ যতই কেন প্রশংসনীয়া হৌন না, তিনি প্রকৃত মানবী বৈত নন; লুকান ছাপান, কোন না কোন খুঁত ত থাকিতে পারে; দুই দিনে দশ দিনে, দশ বৎসরে কিছু না কিছু পরিবর্ত্তনত হইতে পারে। কিন্তু সাবিত্রীর পরাকৃতি; তাহাতে ত কোন খুঁত থাকিবার সম্ভাবনাই নাই; আর পরিবর্ত্তন — তাহাও অসম্ভব। আশীর্ব্বাদ করিবার সময় কাজেই সাবিত্রীর উল্লেখ করাই ভাল।

অবশ্য আমরা কেহই এরূপ বিচার বিতর্ক করিয়া আশীর্ব্বাদ করি না। কিন্তু আমরা ইতিহাস প্রসূত চরিত্র অপেক্ষা কাব্য সৃষ্ট চরিত্রের কার্য্যত যে অধিকতর গৌরব করি, তাহা নিশ্চয়। তবে আবার ঘটনার আদর, ভাবের অনাদর করিবে কেন? আবার বলি, যাহারা ভাব ভাবিতে জানে, কল্পনায় যাহারা আদর্শ-চিত্র [illegible] ধারণা করিতে পারে; এরূপ সভ্যতর মানবের কাছে বর্ণনা [illegible] গরীয়সী। আমাদের চিত্তে ও চরিত্রে ঐ কথাই প্রমাণ [illegible]

# নবজীবন।

২য় ভাগ } বৈশাখ ১২৯৩। { ১০ম সংখ্যা।


## ঋগ্বেদের দেবগণ।

### ষষ্ঠ প্রস্তাব। আচার ব্যবহার ও সভ্যতা।

পূর্ব্বের পাঁচ প্রস্তাবে আমরা ঋগ্বেদের দেবদিগের সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছি। ঋগ্বেদের সময়ের হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার ও সভ্যতার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ একটি প্রস্তাবের ভিতর দেওয়া অসম্ভব। কেবল দুই একটি অতি জ্ঞাতব্য বিষয়ে দুই একটি মাত্র কথা আমরা বলিতে পারি।

আর্য্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া প্রথমে সিন্ধুনদীতীরে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন, এবং সিন্ধুর শাখানদীগুলির তীরে ক্রমে বিস্তৃত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে নিবাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের উপনিবেশের চারিদিকে অনার্য্য-অসভ্য জাতিগণ তখনও অবশ্যে বাস করিত, এবং আর্য্যদিগের সহিত সর্ব্বদাই ঘোর যুদ্ধে লিপ্ত হইত। ঋগ্বেদের শত শত স্থানে এই অনার্য্যদিগের শত্রুতা বিষয়ের উল্লেখ আছে, ঋষিগণ ইন্দ্রাদি দেবকে দস্যুদিগের বিনাশ সাধন জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। কালক্রমে সবলবাহু আর্য্যগণ আপনাদিগের উপনিবেশ বিস্তৃত করিতে লাগিলেন, অগ্নিদ্বারা অরণ্যদাহ করিয়া ক্রমেই কৃষি বিস্তৃত করিতে লাগিলেন, আপনাদিগের গো মেষ ও অশ্বসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন, নূতন নূতন স্থানে নূতন নূতন গ্রাম নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে আধুনিক পঞ্জাব হইতে অযোধ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত উত্তর পশ্চিম ভারতবর্ষ জয় করিয়া তথায়

আর্য্যনগর ও গ্রাম' আর্য্য শিল্পকার্য্য ও আর্য্যকৃষি কার্য্য বিস্তার করিলেন। ক্রমে তাঁহারা সরযূও অতিক্রম করিয়া গেলেন,—

"হে ইন্দ্র! তুমি সরযূর অপর পারে অর্ণ ও চিত্ররথকে হনন করিয়াছ।"

৪ মণ্ডল, ৩৬ সূক্ত, ১৮ ঋক্।

এই বিস্তীর্ণ প্রদেশ খণ্ডে—আর্য্যগণ শত শত গ্রাম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি হইবে। ঋগ্বেদে গ্রামের বিষয় অনেক স্থানে উল্লেখ আছে,

"হে প্রভা সম্পন্ন ধনবান্ অগ্নি! তুমি সকলের দর্শনীয়, তুমি পূর্ব্বগামী উষার পর দীপ্ত হও, তুমি গ্রাম সমূহের রক্ষক।"

১ মণ্ডল, ৪৪ সূক্ত, ১০ ঋক্।

"যেন দ্বিপদ ও চতুষ্পদগণ সুস্থ থাকে, যেন আমাদের এই গ্রামে সকলে পুষ্ট ও রোগশূন্য হইয়া থাকে।" ১ মণ্ডল, ১১৪ সূক্ত ১ ঋক্।

এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে অবস্থান করিয়া আর্য্যগণ চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি চাষ করিতেন, গো মেষাদি চতুষ্পদগণকে পালন করিতেন, এবং সময়ে সময়ে সেই গো মেষাদির আহার্য্য উৎকৃষ্ট তৃণ ক্ষেত্রের অন্বেষণে এক দেশ হইতে অন্য প্রদেশে পর্য্যটন করিতেন।

"পূষা আমার জন্য সোমের সহিত ছয় ঋতু বার বার আনিয়াছেন, কৃষক যেরূপ গরু দ্বারা বার বার যব চাষ করে।" ১।২৩।১৫।

"যে জল আমাদিগের গাভী সকল পান করে সেই জলদেবীকে আহ্বান করি, যে জল নদীরূপে বহিয়া যাইতেছে, তাহাদিগকে হব্যদান করা বিধেয়।" ১।২৩।১৮।

"যে সকল উপায় দ্বারা শূর মনুকে শস্যাদি দান করিয়া রক্ষা করিয়াছিলে, হে—অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।" ১।১১২।১৮।

"হে—অশ্বিদ্বয়! তোমরা আর্য্য মনুষ্যের জন্য লাঙ্গল দ্বারা চাষ করাইয়া, যব বপন করাইয়া শস্যের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া, ও বজ্র দ্বারা দস্যুকে বধ করিয়া বিস্তীর্ণ জ্যোতি প্রকাশ করিয়াছ।" ১।১১৭।২১।

এই প্রকার শত শত ঋক্ হইতে প্রকাশ হইতেছে যে, তৎকালের গ্রামবাসী হিন্দুগণ এক্ষণকার গ্রামবাসীদিগের ন্যায় লাঙ্গল দ্বারা কৃষি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া শস্য উৎপাদন করিয়া এবং গো মহিষ রক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিত। কিন্তু তখন একটি ভয় ছিল—অদ্য যাহা নাই। আর্য্য

গ্রামগুলির প্রান্তে অনার্য্য দস্যুগণ বাস করিত, তাহাদিগের মধ্যে রাজা ছিল, সেনা ছিল এবং তখনও তাহাদিগের প্রভূত ক্ষমতা ছিল। জঙ্গলে বা নদীবক্ষে তাহারা সর্ব্বদাই আর্য্যদিগকে আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিত; কখন বা তাহাদিগের কৃষ্ণকায় সৈন্য আর্য্যদিগের গৌরবর্ণ যোদ্ধাদিগের সম্মুখে যুদ্ধে উপনীত হইত। গ্রামবাসীদিগকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইত, কৃষকগণ ও আয়ুধ ধারণ করিয়া নিজ নিজ ক্ষেত্র, নিজ নিজ সম্পত্তি রক্ষা করিতে প্রস্তুত ছিল।

কৃষিকার্য্য ও পল্লিগ্রামের কথা শেষ করিবার পূর্ব্বে আমরা কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে একটি সূক্ত এখানে উদ্ধৃত করিব।

"আমাদিগেব সখার ন্যায় ক্ষেত্রপতির সহিত আমরা বিজয় লাভ করিব; তিনি আমাদিগের গো অশ্বদিগকে পোষণ করিয়া আমাদিগকে সুখী করুন।

"হে ক্ষেত্রপতি! গাভী যেরূপ দুগ্ধ দেয়, তুমি সেইরূপ মিষ্ট ও প্রচুর ও মধুশ্চ্যুত ও ঘৃতের ন্যায় জল দাও। যজ্ঞপতি আমাদিগকে সুখী করুন।

"ওষধি সমূহ আমাদিগের পক্ষে মধুযুক্ত হউক, আকাশ জল ও অন্তরীক্ষ আমাদিগের প্রতি মধুযুক্ত হউন, ক্ষেত্রপতি আমাদিগের প্রতি মধুযুক্ত হউন, আমরা যেন শক্র কর্ত্তৃক নিবারিত না হইয়া তাঁহার আশ্রয় লাভ করি।

"আমাদের উক্ষগণ সুখে বহন করুক, মনুষ্যগণ সুখে পরিশ্রম করুক, লাঙ্গল সুখে কর্ষণ করুক, প্রগ্রহ গুলি সুখে বন্ধন করুক, সুখে প্রতোদ প্রেরণ কর।

"শুন ও সীর! আমাদিগের স্তুতি বাক্যে তুষ্ট হও, এবং আকাশে সৃষ্ট বৃষ্টিজল দ্বারা এই পৃথিবী সিঞ্চন কর।

"হে সৌভাগ্যবতী সীতা! * তুমি প্রসন্ন হও, আমরা তোমায় স্তুতি করি; যেন তুমি আমাদিগের পক্ষে সুভগা ও সুফলা হও।

"ইন্দ্র সীতাকে ধারণ করুন, পূষা তাঁহাকে লইয়া যাউন; সীতা উদকপূর্ণ হইয়া বৎসর বৎসর (শস্য) দোহন করুন।

---

* লাঙ্গলের ফলায় ভূমিতে যে রেখা করে, তাহার নাম সীতা। ঋগ্বেদে তিনি স্তুত হইয়াছেন, যজুর্ব্বেদে তিনি দেবী হইয়াছেন, রামায়ণে তিনি মহাকাব্যের নায়িকা হইয়াছেন। উপাখ্যানের এই রূপ উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়।

"লাঙ্গলের ফালসকল সুখে ভূমি কর্ষণ করুক, বলদের রক্ষক সুখে বলদের সঙ্গে সঙ্গে যাউক; পর্জ্জন্য সুখে বৃষ্টিদান করুন, শুন ও সীর আমাদিগকে সুখ দান করুন।" ৪ মণ্ডল, ৫৭ সূক্ত।

কিন্তু ঋগ্বেদে কেবল যে কৃষিকার্য্য ও গোরক্ষণ ও গ্রাম সমূহের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা নহে; শিল্পকার্য্য ও নগরেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

"ইন্দ্র হব্যদাতা দিবোদাসের জন্য প্রস্তর নির্ম্মিত শতপুরী ধ্বংস করিয়াছেন।" ৪।৩০।২০।

"সোম পানে হৃষ্ট হইয়া আমি (ইন্দ্র) শম্বরের ৯৯ নগর ধ্বংস করিয়াছি, অবশিষ্ট এক নগর দিবোদাসের নিবাসের জন্য দান করিয়াছি, সেই অতিথিগ্বকে আমি যজ্ঞে রক্ষা করিয়াছি।" ৪।২৬।৩।

এইরূপ অনেক স্থানে নগরের উল্লেখ আছে; কোন কোন স্থানে প্রস্তর নির্ম্মিত বা লৌহময় নগরের উল্লেখ আছে, কোথাও বা শতভুজী নগরের উল্লেখ আছে। অতএব সে সময়ে যে সিন্ধু ও গঙ্গা যমুনাতীরে আর্য্যগণ বড় বড় নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। প্রস্তর নির্ম্মিত নগর অথবা প্রস্তর প্রাচীর বেষ্টিত নগর ছিল একরূপও বোধ হয়; কেননা পর্ব্বত-সঙ্কুল দেশে প্রস্তরখণ্ড আনিয়া তদ্দ্বারা গৃহ প্রাচীরাদি নির্ম্মাণ করা বিস্ময়কর নহে। কিন্তু লৌহময় নগর বোধ হয় কেবল ঋষিদিগের কল্পনা সৃষ্ট;—অতি দুর্গম নগরকে উপমাস্থলে লৌহময় নগর বলিয়া গিয়াছেন।

নগরবাসীগণ যে নানারূপ শিল্প ও অন্যান্য ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিত তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। ৯ মণ্ডলের ১১২ সূক্তে এবং ১০ মণ্ডলের ৯৭ সূক্তে সূত্রধার, চিকিৎসক, পুরোহিত, কর্ম্মকার, কবি ও যে নারীগণ ধান ভানে,—তাহাদিগের উল্লেখ আছে। শকট নির্ম্মাণের অনেক উল্লেখ আছে; এবং ধাতুদ্বারা নানা রূপ পাত্রাদি অস্ত্রাদি ও দ্রব্যাদি নির্ম্মিত হইত। তন্তুবায়ের ব্যবসায় বিলক্ষণ রূপে পরিচিত ছিল; টানা ও পোড়েনকে "তন্তু" ও "ওতু" বলিত;—"আমি তন্তু ও জানি না, ওতু ও জানি না।" ৬।৯।১।

অন্য স্থানে আছে "উষা ও রাত্রি বয়নকুশল রমণীদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের সাহায্যে গমনাগমন করত যজ্ঞের রূপ নির্ম্মাণার্থ পরস্পরকে আনুকূল্য করিয়া বিস্তৃত তন্তু বয়ন করিতেছেন। ২।৩।৬

এই উপমা হইতে উপলব্ধি হয় তৎকালে দুই জন নারী একত্র পরিশ্রম করিয়া টানা ও পোড়েন সঞ্চালন করিয়া বস্ত্র প্রস্তুত করিত।

তৎকালে সমুদ্র-গামী নৌকা প্রস্তুত হইত; অশ্বিদ্বয় মজ্জমান ভুজ্যুকে শত দাঁড় নৌকায় উঠাইয়া সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়া আনিলেন ।১।১১৬।৩ অন্যান্য অনেক স্থলে সমুদ্র গমনের কথা আছে।

ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে অতি সুন্দর বস্ত্রাদি, সুবর্ণের অলঙ্কারাদি-রুক্ম (বক্ষের অলঙ্কার) স্রক্ অর্থাৎ হার, খাদি অর্থাৎ বালা ও মল, এবং শিরস্ত্রাণ, বর্ম্ম, খড়্গ, ধনুর্ব্বাণ, নিষঙ্গ, বর্শা, পরশু প্রভৃতি যুদ্ধের অস্ত্রাদির ও নানা প্রকার শিল্পের উল্লেখ আছে, সুতরাং ভারতবর্ষে আসিয়া আর্য্যগণ আপনাদিগের রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা সভ্যতা লাভ করিয়াছিলেন,—স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। ধনবানদিগের দানের কথা আছে, নর্ত্তকীদিগের বেশভূষার কথা আছে, (১।৯২।৪) এবং সুভূষণ সম্পন্না বন্দীদাসীদিগেরও উল্লেখ আছে। (৮,৪৬,৩৩) কিন্তু সে সময়ে নরনারীগণ কি প্রকার বেশ করিত, কি প্রকার বস্ত্র পরিধান করিত, তাহার বিশেষ বর্ণনা আমি পাই নাই।

আর্য্যগণ যেমন আর্য্যবর্ত্তে বিস্তৃত হইতে লাগিল তেমনই ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য সংস্থাপন করিতে লাগিল। সিন্ধুনদী হইতে সরযুতীর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রদেশ খণ্ড এক রাজার অধীন ছিল না, অনেক গুলি ভিন্ন ভিন্ন জনপদ ও রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ঋগ্বেদে অনেক রাজার নাম পাওয়া যায়। ভব্যরাজা সিন্ধুতীরে বাস করিতেন (১।১২৬।১)। চিত্র ও অন্যান্য রাজাগণ সরস্বতীতীরে রাজত্ব করিতেন, (৮।২১।১৮)। দশজন রাজা সুদাসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, (৭।৩৩।৩)। অন্যান্য অনেক স্থানে অনেক রাজাদিগের ও তাঁহাদিগের নিবাস-স্থানের উল্লেখ আছে।

দেবদিগের বর্ণনা হইতে তৎকালে রাজাদিগের সমৃদ্ধি ও অবস্থা অনেকটা অনুভব করা যায়। রাজাদিগের ন্যায় ইন্দ্র বহুস্ত্রী বেষ্টিত হইয়া বাস করেন (৭।১৮।২)। মিত্র ও বরুণ সহস্র স্তম্ভ শোভিত সহস্র দ্বার বিশিষ্ট অট্টালিকায় বাস করেন (২।৪১।৫; ৫।৬২।৬; ৭।৮৮।৫)। বরুণ সুবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া দূত পরিবেষ্টিত হইয়া রাজত্ব করিতেছেন (১।২৫।১০ ও ১৩)।

রাজাদিগের যজ্ঞ নির্ব্বাহার্থ অনেক ঋত্বিক ও পুরোহিত থাকিত, এবং কখন কখন রাজাগণ তাঁহাদিগকে অনেক সুবর্ণ রৌপ্য শকট ও গো অশ্বাদি দান করিতেন। অনার্য্যদিগের সহিত বা অন্য আর্য্য রাজাদিগের সহিত যুদ্ধ হইলে নরপতিগণ নিজ নিজ সৈন্য লইয়া প্রস্তুত হইতেন। মহাভারতের সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জনপদ ও ভিন্ন ভিন্ন নরপতিদিগের যেরূপ সমৃদ্ধি, ক্ষমতা,

সভ্যতা ও যুদ্ধে পারদর্শিতা দেখিতে পাওয়া যায়, ঋগ্বেদের সময় সেরূপ দেখা যায় না। কিন্তু ঋগ্বেদের সময়ের আর্য্যসমাজও সেই ছাঁচে গঠিত; ঋগ্বেদের সময়ের আর্য্যগণ সেইরূপ ভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার অধীনে বাস করিতেন, এবং সময়ে সময়ে পরস্পরের সহিত লিপ্ত হইতেন।

নরপতি দিগের অধীনে নগরে "পুরপতি" এবং গ্রামে "গ্রামনী" থাকিতেম। (১।১৭৩।১০) ও (১০।৬২।১১)।

যব প্রভৃতি নানারূপ শস্য মনুষ্যের আহার দ্রব্য ছিল। বৃষ পাক করারও উল্লেখ আছে (১।১৬৪।৪৩) অশ্ব পাককরা ও প্রচলিত ছিল (১।১৬২ সূক্ত।) মহিষাদি পাককরারও উল্লেখ আছে, তৎকালের আর্য্যগণ সোমরস ভক্ত ছিলেন, এবং সুরা ও সুরাবিক্রেতারও উল্লেখ আছে। (১।১১৬।৭ ও ১।১৯১।১০)

এক পুরুষের সহিত সচরাচর এক নারীরই বিবাহ হইত, কিন্তু ধনাঢ্য লোক ও নরপতি গণের মধ্যে বহুবিবাহ ও প্রচলিত ছিল।

"সপত্নীদ্বয় স্বামীর উভয় পার্শ্বে থাকিয়া যেরূপ তাহাকে সন্তাপ দেয়, সেই রূপ এই পার্শ্বস্থ কূপের ভিত্তিসকল আমাকে সন্তাপ দিতেছে"। ১।১০৫।৮

"ইন্দ্র একাই সমস্ত নগর অধিকার করিলেন, যেমন একপতি স্ত্রী সমূহকে গ্রহণ করে।" ৭।২৬।৩

অনেক কন্যা অবিবাহিতা থাকিতেন, এবং তাঁহারা পিতৃসম্পত্তির অংশ পাইতেন,—তাহাও দেখা যায়। বিধবাদিগের চির-বৈধব্যের প্রথা তখন প্রচলিত ছিল না। অথর্ববেদে নারীর দ্বিতীয় স্বামীর কথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

"যে নারী প্রথম পতি হারাইয়া অন্যপতি প্রাপ্ত হয়, তাহারা অজ পঞ্চৌদন প্রদান করিলে আর বিচ্ছিন্ন হয় না।

দ্বিতীয়বার বিবাহিতা পত্নী তাহার দ্বিতীয় স্বামীর সহিত একলোকে বাস করে, যদি সে অজ পঞ্চৌদন প্রদান করে।" অথর্ব্ববেদ।৯।৫ ২৭।২৮

ঋগ্বেদের সময় সতীদাহের প্রথাও প্রচলিত ছিল না। ঋগ্বেদে বিধবার প্রতি এই আদেশ,—"নারী উত্থান কর, জীব জগতে প্রত্যাবর্ত্তন কর, তুমি য হার নিকট শয়ন করিয়া আছ, তাঁহার জীবন গত হইয়াছে। আমাদিগের নিকট আইস। যে পতি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তোমাকে মাতা করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি তুমি পত্নীর কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছ।"

পুত্রহীন বিধবা তাঁহার দেবরকে বিবাহ করিবার মনুসংহিতায় যে বিধান আছে, ঋগ্বেদে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"বিধবা যেরূপ দেবরকে শয়নে অভিমুখ করে, নারী যেরূপ পুরুষকে শয়নে অভিমুখ করে, হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগকে কে গৃহে আনিতেছে।
১০।৪০।২

স্বামী মন্দ হইলে পত্নী কুপথগামী হয় রক্ষকহীনা নারীও কুপথ গামিনী হয়;—এরূপ কথাও ঋগ্বেদে স্থানে স্থানে পাওয়া যায়।

"অক্ষক্রীড়ায় যাহার অর্থ নাশ হয়, তাহার পত্নীকে অন্যে সম্ভোগ করে।"
১০।৩৪।৪

মন্দ লোকদিগকে ভ্রাতৃহীন নারী ও পতিবিদ্বেষিণী পত্নীদিগের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ৪।৫।৫

কুপথ গামিনী গোপনে প্রসূতা হইয়া সন্তানকে দূরে ফেলিয়া আইসে তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায়। ২।২৯।১

গৃহস্থা নারী স্বামীকে তুষ্ট করিবার জন্য যত্ন করেন, প্রত্যূষে উঠিয়া গৃহ কার্য্যাদি সম্পাদন করেন, যজ্ঞকালে স্বামীর সহিত একত্র যজ্ঞ সম্পাদন করেন, তাহার ভূয়োভূয় উল্লেখ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। বিদ্যাবতী রমণী ঋগ্বেদের ঋষি বলিয়া পরিচিতা হইয়া স্তোত্র রচনা ও উচ্চারণ করিতেন, ঋত্বিকের কায্য করিতেন, যজ্ঞ সমাধা করিতেন। ৫।২৮ সূক্ত।

আদিম হিন্দুদিগের দেবদেবী ও ধর্ম্মবিশ্বাসের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তাহাদিগের যজ্ঞানুষ্ঠানের রীতি সম্বন্ধে দুই একটি কথা এখানে বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আসিয়াই দেখিলেন এ দেশ অরণ্য পূর্ণ এবং সেই অরণ্যে অসংখ্য বর্ব্বর জাতি বাস করে। তখন হইতেই "আর্য্য" ও "অনার্য্য" এই দুই জাতির সৃষ্টি হইল। "ইন্দ্র দস্যুকে বধ করিয়া আর্য্য "বর্ণ" কে রক্ষা করিয়াছেন।" (৩।৩৪।৯) ঋগ্বেদ রচনার সময় অন্য কোন জাতি ছিল না, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এ চারি জাতি ছিল না। গৃহ পতি নিজেই যজ্ঞ সম্পাদন করিতে পারিতেন, তাঁহার স্ত্রী কন্যা পুত্রাদি সে যজ্ঞ সম্পাদনে সহায়তা করিতেন। এই রূপ পরিবারের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বা শ্রেষ্ঠ পুরুষ পরিবারের সকলের কুশলের জন্য, কৃষির সফলতার জন্য, গো বৎসাদির রক্ষার জন্য অথবা দুর্দ্দান্ত অনার্য্যদিগের ধ্বংশের জন্য সোমরস

ও ঘৃতাহুতি দিয়া আকাশের কল্পিত দেবদিগের আরাধনা করিতেন। পুরোহিত ডাকাইবার আবশ্যক ছিল না, পুরোহিতদিগের একটি ভিন্ন জাতি ছিল না।

তথাপি সমাজের মধ্যে বিজ্ঞগণ মন্ত্ররচনায় ও যজ্ঞ সম্পাদনে অধিক নৈপুণ্য লাভ করিতেন, এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে ঋত্বিকের ব্যবসা অবলম্বন করিতেন। নরপতিগণ ও ধনাঢ্যগণ নিজে যজ্ঞ সম্পাদন না করিয়া এই ঋত্বিকগণকে ডাকাইতেন, এবং এক একটি বড় যজ্ঞে ১৬ জন ঋত্বিকও নিযুক্ত হইতেন। ধনাঢ্যগণ ঋত্বিক্‌দিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দান করিতেন, এবং তাঁহাদিগের গৃহেও অনেক বেতনভোগী ঋত্বিক্‌ও বাস করিতেন।

সে সময় অঙ্গিরা, মনু, বশিষ্ঠ, ভৃগু, অত্রি প্রভৃতি কয়েকটি ঋষিবংশ যজ্ঞ সম্পাদন ও মন্ত্র রচনায় নৈপুণ্য লাভ করিয়া বিশেষ খ্যাতি পাইয়াছিলেন, এবং ঋগ্বেদের সমস্ত মন্ত্র বংশানুক্রমে তাঁহাদিগের কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁহারা পুত্র কলত্র বেষ্টিত হইয়া, ভূমি ও গো অশ্বাদি অধিকার করিয়া সাংসারীর ন্যায় সংসারে বাস করিতেন এবং বেদের অনুশীলনা ও যজ্ঞাদি সম্পাদন দ্বারা কাল যাপন করিতেন। আবার অনার্য্যদিগের সহিত যুদ্ধের সময় তাঁহারাই যুদ্ধে লিপ্ত হইতেন। বনবাসী ফলমূলহারী ঋষি বা তপস্বী ঋগ্বেদের সময় ছিল না।

সে সময়ে দেব দেবির মন্দির বা বিগ্রহ ছিল না। আকাশই দেব দিগের অনন্ত অক্ষয় মন্দির, আলোক বা সূর্য্য, মরুৎগণের ভীষণ গতি বা বজ্রের ভয়ঙ্কর শব্দই তাঁহাদের দেবতা। প্রকৃতির সরল স্বভাব সন্তানগণ প্রকৃতিকেই উপাসনা করিতেন, সেই গৌরবান্বিত প্রকৃতির উপাসনা করিতে করিতে প্রকৃতির আদি নিয়ন্তাকে তাঁহারা অনুভব করিলেন।

কুম্ভকারের দ্বারা বিগ্রহ প্রস্তুত করাইয়া মনুষ্য গৃহে সে বিগ্রহ স্থাপন করাইয়া, বেতনভোগী পুরোহিতের দ্বারা তাহার নিকট কতকগুলি অবোধগম্য মন্ত্র পাঠ করান,—আর প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া স্বয়ং ভক্তিভাবে প্রকৃতির নিয়ন্তাকে আহ্বান করা,—এই দুই প্রকার ধর্ম্মের মধ্যে কতদূর প্রভেদ! ভারতবর্ষে আর্য্য মন সত্যের পথ হইতে কাল ক্রমে বহুদূর বিপথে আসিয়া পড়িয়াছে, সাধারণ লোকের অজ্ঞানতা,—শ্রেণী বিশেষের স্বার্থপরতা, ও সকল শ্রেণীর মানসিক বলহীনতাই—ইহার প্রধান কারণ। জ্ঞানালোকের সহিত আবার হিন্দু জাতি সরল পথ প্রাপ্ত হইবে, জাতিহিতৈষী হিন্দু মাত্রেরই ইহা একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

# কল্পকাল।

অণ্ডকটাহের মধ্যে যত লোকমণ্ডল আছে সে সমস্তই মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ন্যায় পরস্পর-সম্বদ্ধ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। তন্মধ্যে ব্রহ্মভুবন চতুষ্টয় মস্তক-স্বরূপ। মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও ব্রহ্মলোক সেই মস্তকেরই বিভাগ। ব্রহ্মলোকই যোগৈশ্বর্য্যের ভাস্বর এবং হৈরণ্যগর্ভ রাজ্য। ইহাই আদিত্য লক্ষণ প্রধান স্বর্গ এবং সৃষ্টির প্রাণস্বরূপ, 'এত বৈ প্রাণানাং আয়তনং' (প্রশ্নে) ইহাই ব্রহ্মাণ্ডের মস্তিষ্কস্বরূপ; তপোলোক ললাট; জনলোক ভ্রূসন্ধি; মহর্লোক চক্ষু। অন্যান্য লোক সকল কণ্ঠ অবধি অধো-অধোভাগরূপে প্রলম্বিত। মস্তিষ্ক স্বরূপ ব্রহ্মলোক যতদিন প্রকৃতিস্থ থাকিবে ততদিন প্রাকৃতিক প্রলয় হইবে না। কিন্তু মস্তক মণ্ডলের নিম্নে, অপ্রধান অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে সময়ে সময়ে নৈমিত্তিক প্রলয় ও নৈমিত্তিক উদয় হইবে। শাস্ত্রানুসারে নির্গুণ মোক্ষ, পরম জাগ্রত-অবস্থারূপী ও অপরিলুপ্ত চৈতন্যস্বভাব। তাহা সৃষ্টির অতীত এবং ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রাপ্য। কোন প্রলয়ে সে অবস্থা আহত হয় না। কিন্তু মস্তিষ্ক-রূপী উক্ত মস্তক-মণ্ডল স্বপ্নস্থান স্বরূপ। অপ্রধান অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপী সমস্ত সৃষ্টিরূপ স্থূলদেহ নিদ্রাভিভূত, সুষুপ্ত, অসাড় হইলেও উক্ত মস্তিষ্করূপী ব্রহ্মভুবন, অন্তঃপ্রজ্ঞ, সৃষ্টি সংসারের সমাবেশ স্থান, মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রাণের আধারক্ষেত্র, সূক্ষ্ম ভোগালয়, অস্থূল অণিমাদ্যৈশ্বর্য যুক্ত তৈজসপুরী ইত্যাদি সূক্ষ্ম সুখরাজ্যরূপে অবস্থিতি করে। স্বপ্নে যেমন সূক্ষ্মের ভোগ—মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি সূক্ষ্মধাতুর যোগ—ঐ ব্রহ্মভুবন চতুষ্টয়ে তাহারই আভাস যোজিত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডের নিম্নস্থ অঙ্গসমূহ, অর্থাৎ স্বর্লোক হইতে ভূলোক ও তন্নিম্নস্থ সপ্ত পাতালগত সাধারণ প্রকৃতি নিদ্রিত, প্রলুপ্ত, ভগ্ন ও ক্ষয় হইলেও ঐ ব্রহ্মভুবন মহাসূক্ষ্ম ভোগরাজ্যরূপে জীবিত থাকিবে। স্বপ্নে মানবদেহ পর্য্যঙ্কোপরি মৃতবৎ নিপতিত থাকিলেও, মন যেমন বারাণসীক্ষেত্রে—আনন্দকাননে—আনন্দভোগ করিতে পারে, সেইরূপ নৈমিত্তিক প্রলয়ে ব্রহ্মার স্থূলদেহরূপ ভূর্ভুবঃ প্রভৃতি ত্রৈলোক্যের ঘোর নিদ্রাকালে, ব্রহ্মার মহামৌলি স্বরূপ মানস রাজ্য সূক্ষ্ম যোগানন্দের উৎস উৎপাদিত হইয়া থাকে।

শাস্ত্রানুসারে ঐ স্বর্গচতুষ্টয়ের পরমায়ুই স্বয়ং ব্রহ্মার পরমায়ুরূপে উক্ত হয়। ব্রহ্মা সর্ব্বজীবের সূক্ষ্ম শরীরের অধিষ্ঠাতা। তৎসম্বন্ধাধীন তাঁহাকে হিরণ্যগর্ভ কহে। যোগিগণ সাধন প্রভাবে যে মহাবিদ্যা উপার্জ্জন করেন, তাহার নাম হিরণ্যগর্ভ বিদ্যা। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বিবিধ। ক্রিয়াপরতন্ত্র ও বস্তু পরতন্ত্র। যাহা বস্তু পরতন্ত্র ব্রহ্মজ্ঞান, তাহা স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্বপ্রকার উপাধি ও ঐশ্বর্য্যবর্জ্জিত। শারীরকে (৩।২) 'প্রকৃতৈতাবত্বংহি প্রতিষেধতি ইত্যাদি' তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞান প্রকৃতির অতীত। তাহা ব্রহ্মরূপ পরম বস্তুর অধীন এবং সাধন নিরপেক্ষ। তাহা সত্যজ্ঞান এবং নির্গুণ মুক্তি শব্দের বাচ্য। যাহা ক্রিয়া-পরতন্ত্র-ব্রহ্মজ্ঞান তাহাই সাধন-প্রভাব। তাহার যে সিদ্ধি তাহাই যোগৈশ্বর্য্য। তাহারই নামান্তর হিরণ্য গর্ভ-বিদ্যা। শারীরকে কর্ম্মাঙ্গ প্রকরণে (৩।৪।১) কহিয়াছেন 'পুরুষার্থোতঃ শব্দাৎ'; বেদে আছে আত্ম-বিদ্যার সাধন দ্বারা সগুণোপাসকের সকল পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়। এই বিদ্যা বলে যোগিগণ স্থূল দেহের বীজস্বরূপ সূক্ষ্ম দেহের উপরি প্রভুত্ব লাভ করেন। তাহাতে তদনুষঙ্গীরূপে স্থূল সৃষ্টির বীজস্বরূপ সূক্ষ্ম প্রকৃতি কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহাদের আয়ত্তাধীন হয়। এই সূক্ষ্মরাজ্য পরমাত্মার যে কর্ত্তৃত্বের অধীন তাঁহার নাম হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা। সেই হিরণ্যগর্ভ, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়, সূক্ষ্ম প্রাণবায়ু, স্থূলবিষয় হইতে বিনিবৃত্ত মনোবুদ্ধি প্রভৃতি সূক্ষ্মদেহ সমষ্টির অধিষ্ঠাতা। এই মর্ত্ত্যলোকে স্থূল দ্বারা সূক্ষ্ম আবৃত। ইহার কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া সকলই স্থূল। ইহার উর্দ্ধতন পিতৃ-দেব-মিলিত স্বর্লোকও স্থূল, —কর্ম্মফলভোগের প্রদেশ। তথায় স্বর্গবাসিগণের সূক্ষ্ম ঐশ্বর্য্যের প্রভাব অল্পই। কিন্তু উক্ত ব্রহ্মভুবনচতুষ্টয়, সূক্ষ্ম ঐশ্বর্য্য ও সত্ত্বগুণের চরম রাজ্য। তথাকার কর্ম্মী, ক্রিয়া ও ভোগ্য সমুদয়ই সূক্ষ্ম। কর্ম্মী—ঐচ্ছিক দেহধারী; ক্রিয়া—সঙ্কল্প প্রধান; এবং ভোগ্য—সগুণানন্দ ও সগুণমুক্তি। ঐসমস্ত সূক্ষ্ম ভোগী ও ভোগ্য এত দীর্ঘস্থায়ী যে, তাঁহাদের পরমায়ু, তাঁহাদের অধিষ্ঠাতৃদেব ব্রহ্মার পরমায়ু, এবং তাঁহাদের স্থান ব্রহ্মভুবনচতুষ্টয়ের পরমায়ু—সমান বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

ভোগশক্তি ও ভোগ্য পদার্থের শক্তি কেবল প্রকৃতিরই বিকার। যোগৈশ্বর্য্য অতি সূক্ষ্ম ও সাত্ত্বিক বটে, কিন্তু তাহাও প্রকৃতির সুসূক্ষ্ম পরিণাম। তাহা ও ভোগ, তবে বিশুদ্ধতম ভোগ এইমাত্র। শুদ্ধ প্রকৃতির উপাসনা করিলে সে সম্পদ্ লাভ হয় না। হিরণ্যগর্ভরূপ সূত্রাত্মার সহিত সমুচ্চয়-

পূর্ব্বক অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রণিধান সহকারে যোগসাধনাদি করিলে উক্তরূপ সম্পদ্ ও অমৃতত্ব লাভ হয়। "সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা হসম্ভূত্যা হমৃতমশ্নুতে॥" (বাজসনেয়।) যে ব্যক্তি হিরণ্য গর্ভ ও প্রকৃতি উভয়ের সমুচ্চিত উপাসনা করে সে ব্যক্তি হিরণ্যগর্ব্ভের উপাসনা প্রভাবে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য পাইয়া মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হয় এবং প্রকৃতির অধিকারস্থ দীর্ঘস্থায়ী জীবন লাভ করে। কাঠকে উক্ত হইয়াছে, "কামাস্যাপ্তিঞ্জগতঃ প্রতিষ্ঠাং ক্রতোরনন্ত্যমভয়স্য পারং, স্তোমমহদুরু গায়ং প্রতিষ্ঠাং" ইত্যাদি। হিরণ্যগর্ভোপাসনার ফলস্বরূপ যে হিরণ্যগর্ত্ত লোক তাহা সকল কামনার পরিসমাপ্তি স্থান, তাহা সকল জগতের আশ্রয়, ভূরি কাল স্থায়ী, সকল অভয় স্থানাপেক্ষা অভয় সম্পন্ন, সমস্ত ঐশ্বর্য্যের আকর, এবং বিস্তীর্ণগতিস্বরূপ। তাহা হইতে শীঘ্র চ্যুতি হয় না। যদি ও হিরণ্যগর্ত্তসেবী যোগিগণের এরূপ সম্পদ্ সর্ব্বত্র প্রাপনীয়; কিন্তু ব্রহ্মলোকই ঐপ্রকার ঐশ্বর্য্যের নিকেতন তাহা সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধ। তদ্বিষয়ক ভূরি বার্ত্তা ছান্দোগ্যে এবং শারীরকে আছে। পুরাণাদি শাস্ত্রেও তাহার অভাব নাই। শারীরকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (৪।৩।১০) "কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহিতঃ পরমভিধানাৎ।" ব্রহ্মলোকের বিনাশ হইলে পর যোগিগণ তাহার অধ্যক্ষ হিরণ্যগর্ব্ভের সহিত পরব্রহ্মকে লাভ করেন। ব্রহ্মলোকের প্রতি সহস্র "অমৃত" বিশেষণ প্রদত্ত হইলেও তাহা বিনাশশীল, এবং তাহ [illegible] শশীল—একথা শাস্ত্রের বার বার উক্ত হইয়া [illegible]

ব্র [illegible] র্ত্তরূপ দীর্ঘজীবনের স্থিতি ও প্রলয় কাল সম্বন্ধে [illegible] ত এবং পুরাণশাস্ত্রে যে অঙ্কপাত আছে তাহার [illegible] য় না। ফলত কথিত আছে যে, কেবল যোগীগং [illegible] রেন। সামান্য বুদ্ধিতে তাহা প্রতিফলিত হয় না। মানব স্মৃতিতে (১ অঃ) আছে যে, মানুষ ও দেব-সম্বন্ধিনী দিনরাত্রি সূর্য্যকর্ত্তৃক বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে রাত্রি জীবগণের নিদ্রার নিমিত্তে। মনুষ্যদিগের এক মাসে পিতৃগণের এক দিনরাত্রি হয়। তাহা পক্ষদ্বয়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে কৃষ্ণপক্ষ তাঁহাদের দিন, এবং শুক্লপক্ষ রাত্রি। মানবীয় এক বর্ষে দেবতাদের একদিন রাত্রি হয়। তন্মধ্যে সূর্য্যকর্ত্তৃক নিয়মিত উত্তরায়ণ তাঁহাদের দিন এবং দক্ষিণায়ন রাত্রি। যথা,—

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| মানবীয় | ১ মাস | ... | ... | পিতৃ | ১ দিবারাত্রি |
| ঐ | ১ বর্ষে | ... | ... | দৈব | ১ দিবারাত্রি |
| ঐ | ৩০ বর্ষে | ... | ... | পিতৃ | ১ বর্ষ |
| ঐ | ৩৬০ বর্ষে | ... | .. | দৈব | ১ বর্ষ |
| ঐ | ৪ যুগে | ... | ... | ঐ | ১২০০০ বর্ষ। |

যাহা ব্রহ্মলোকের বা ব্রহ্মার দিনরাত্রি তাহা যুগের গণনা দ্বারা নিশ্চয় হয়। যথা,—

| যুগ | যুগের ভোগকাল মানবীয় বর্ষ | যুগের ভোগকাল পৈত্র বর্ষ | যুগের ভোগকাল দৈব বর্ষ |
|---|---|---|---|
| সত্য | ১৭২৮০০০ | ৫৭৬০০ | ৪৮০০ |
| ত্রেতা | ১২৯৬০০০ | ৪৩২০০ | ৩৬০০ |
| দ্বাপর | ৮৬৪০০০ | ২৮৮০০ | ২৪০০ |
| কলি | ৪৩২০০০ | ১৪৪০০ | ১২০০ |
| সমষ্টি | ৪৩২০০০০ | ১৪৪০০০ | ১২০০০ |

মনুতে আছে যে ঐরূপ এক সহস্র চতুর্যুগ সংখ্যাতে ব্রহ্মার একদিন হয়, এবং ঐ পরিমাণে তাঁহার এক রাত্রিও হয়। এই প্রকার দীর্ঘদিন ও দীর্ঘরাত্রির জ্ঞান যাহাদের আছে, তাঁহাদিগকে 'অহোরাত্রবিৎ' কহে। গীতাস্মৃতিতে (৮ অঃ) কহিয়াছেন যে, মানবীয় চতুঃসহস্র যুগপরিমিত ব্রহ্মলোকের দিনমান এবং তত্তুল্যকালপরিমিত রাত্রিকাল,—তাহা যাঁহারা জানেন, "তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ" তাঁহারাই অহোরাত্রবিদ্। গীতাভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য কহেন যে, তাঁহারাই কালসংখ্যাবিদ্। শ্রীধর স্বামী কহেন, "সহস্রংযুগানি পর্য্যন্তোঽবসানং যস্য তদ্ব্রহ্মণোঽহস্তদ্যে বিদুঃযুগসহস্র-মন্তো যস্যা স্তাং রাত্রিঞ্চ যোগ বলেন যে বিদন্তএব সর্ব্বজ্ঞাজনা অহোরাত্রবিদঃ। যেষাস্ত কেবলং চন্দ্রাদিগত্যৈব জ্ঞানং তে তথাহোরাত্রবিদোন ভবন্তি অল্পদর্শিত্বাৎ। যুগশব্দেনাত্র চতুর্যুগ অভিপ্রেতং চতুর্যুগসহস্রন্ত ব্রহ্মণো-দিনমুচ্যত ইতি বিষ্ণুপুরাণোক্তেঃ ব্রহ্মণো ইতিচ মহর্লোকাদিবাসিনা-মুপলক্ষণার্থং। * * * তাবৎ প্রমাণেব রাত্রস্তথ্যৈশ্চাহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদি-ক্রমেণ বর্ষশতং ব্রহ্মণঃ পরমায়ুরিতি।" (গীঃ ৮।১৭।) স্বামীকৃত এই টীকার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মার দিন যাহা সহস্র যুগপরিমিত, তাহা যে সকল সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি যোগবলে জানেন, তাঁহারাই অহোরাত্রবিদ্। যাঁহাদের কেবল

চন্দ্র সূর্য্যের গতি মাত্রই জ্ঞান, তাঁহারা উক্তরূপ দিবারাত্রিজ্ঞ নহেন, যেহেতু তাঁহারা অল্পদর্শী। এস্থলে যুগশব্দে চতুর্যুগ। সহস্র চতুর্যুগ পরিমাণে যে কাল তাহাই ব্রহ্মার দিন বলিয়া উক্ত হয়। তাঁহার রাত্রিও সেই পরিমিত। গীতার 'আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ' ইত্যাদি পূর্ব্বশ্লোকে যে 'ব্রহ্মলোক' শব্দ আছে তাহা মহর্লোকাদি ব্রহ্মভুবনচতুষ্টয়কেই লক্ষ্য করে। সেই সমস্ত লোকে উক্ত পরিমিত দিবারাত্রি প্রচলিত। উক্ত প্রকার দিবারাত্রি দ্বারা কল্পিত পক্ষ মাসাদি ক্রমে একশত বর্ষ ব্রহ্মার অথবা ঐ ভুবন চতুষ্টয়ের পরমায়ু।

এস্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে, যোগৈশ্বর্য্য, ও সগুণমোক্ষানন্দ সম্ভোগের মহাস্বর্গস্বরূপ যে ব্রহ্মভুবনচতুষ্টয় তাহার পরমায়ুকাল জ্যোতির্ব্বিদ্যা অথবা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। সূক্ষ্মশরীর, সূক্ষ্মবিভূতি, সূক্ষ্ম-ঐশ্বর্য্যের ব্যবহার ও সূক্ষ্ম-সম্ভোগক্ষেত্ররূপী ব্রহ্মলোক, এ সমস্তই যোগী ও সূক্ষ্ম প্রকৃতিদর্শীগণের ধারণার বিষয়। সুতরাং তাদৃশ সূক্ষ্ম সৃষ্টির ব্যবহার্য্য দিবারাত্রি ও তাহার পরমায়ুর কাল নিরূপণ তাঁহাদেরই কার্য্য। তাহা জ্ঞাত হওয়ার প্রণালী স্বতন্ত্ররূপে উক্ত হয় নাই। তাহা যোগৈশ্বর্য্যেরই অনুগত। কিন্তু তাহার অঙ্কপাত শাস্ত্রে আছে। ইতিপূর্ব্বে মানব, পিতৃ ও দেব পরিমাণে যে চতুর্যুগ সমষ্টির অঙ্কপাত করা গিয়াছে, কল্পের পরিমাণ তাহারই সহস্র গুণ। ব্রহ্মার দিনমান অর্থাৎ ব্রহ্মভুবনের ব্যবহৃত দিনমানের নাম কল্প। কল্পকালও যাহা, নৈমিত্তিক সৃষ্টির পরমায়ুও তাহা। ব্রহ্মার রাত্রিকালেই ব্রহ্মলোকাদি স্বর্গচতুষ্টয়ের রাত্রিমান। তাহার পরিমাণও ব্রহ্মদিনের তুল্য। তাদৃশ দিবারাত্রি দ্বারা একশত বর্ষ গণনা করিলে, যে সুদীর্ঘকাল হয় তাহাই ব্রহ্মার পরমায়ু। মহর্লোকাবধি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ব্রহ্ম চতুষ্টয়ের পরমায়ু। তাহাই প্রাকৃতিক সৃষ্টির চূড়ান্ত পরমায়ু, তাহার পর প্রাকৃতিক প্রলয়। ৩৬০০০ দিন ও তত্তুল্য রাত্রিতে একশত বর্ষ হয়। সুতরাং ৩৬০০০ কল্প (বা ৩৬০০০ নৈমিত্তিক সৃষ্টিকাল) ও তত্তুল্য নৈমিত্তিক প্রলয় কাল ধরিয়া ব্রহ্মার বা ব্রহ্মভুবনের আয়ুস্থির হইয়াছে। যথা—

| যুগাদি | মানব পরিমাণে বর্ষ সংখ্যা | পিতৃ পরিমাণে বর্ষ সংখ্যা | দেব পরিমাণে বর্ষ সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| চতুর্যুগ | ৪৩২০০০০ | ১৪৪০০০ | ১২০০০ |
| ব্রহ্মদিন | ৪৩২০০০০০০০ | ১৪৪০০০০০০ | ১২০০০০০০ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ব্রহ্মদিবা ও রাত্রি | ৮৬৪০০০০০০০ | ২৮৮০০০০০০ | ২৪০০০০০০ |
| ব্রহ্মবর্ষ | ৩১১০৪০ কোটি | ১০৩৬৮ কোটি | ৮৬৪ কোটি |
| ব্রহ্মআয়ু | ৩১১০৪০০০ কোটি | ১০৩৬৮০০ কোটি | ৮৬৪০০ কোটি |

উপরি উক্ত মহা গণনা জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অন্তর্গত নহে ইহাই অভিপ্রায়। যদি তাহা হইত তবে মন্বাদি স্মৃতিতে 'যোগ বলেন যে বিদুঃ, তেঽহোরাত্র বিদোজনা' ইত্যাদি বিশেষ উক্তি থাকিত না। বরং তৎপরিবর্ত্তে জ্যোতিষের উল্লেখ থাকিত। ফলে জ্যোতিষের অনধিকার হইলেও ভারতবর্ষীয় জ্যোতির্ব্বিদগণ প্রয়োজনস্থলে উক্ত যুগ ও কল্পকালের সংখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতিবর্ষের নবপঞ্জিকায় তাহাই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে এবং শক, সম্বৎ প্রভৃতি সামান্য কালসমূহের সহিত সেই জগৎ সৃষ্টির মহা-শকেরও অঙ্কপাত হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে যে যুগচতুষ্টয় প্রচলিত আছে তাহাও সামান্যযুগ-বর্ষ সমূহের ন্যায় কোন জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় কাল নহে। ইতিপূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, মানব-সমাজের ধর্ম্ম, বুদ্ধি ও ভোগাদিকে অধিকার পূর্ব্বক সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, ও কলি এই চারিযুগ, ষড়ঋতুর ন্যায় পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হইয়া থাকে। সত্যযুগ হইতে জ্ঞান, ধর্ম্ম, শক্তি, বীর্য্য, আনন্দ, বিষয়ভোগ, প্রভৃতি ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া কলিযুগে তৎসমস্ত মন্দীভূত হয়, এবং পাপের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তাহার পর স্বভাবত ধর্ম্মও ভোগাদির আবার উন্নতি হইয়া সত্যযুগের উদয় হয়। ঋষিরা যোগবলে নিরূপণ করিয়াছেন যে, ঐরূপ ১০০০ সত্য, ১০০০ ত্রেতা, ১০০০ দ্বাপর, ও ১০০০ কলিযুগ হইয়া গেলে একটি অবান্তর প্রলয়দ্বারা প্রকৃতি পুনঃ শুদ্ধতা লাভ করিবে, কিন্তু তাহার মধ্যগত যুগপরিবর্ত্তন সকল প্রলয় ব্যতীত সম্পন্ন হইবে। কেননা, তাদৃশ পরিবর্ত্তন কালে প্রকৃতি তত দূষিত হইবে না।

ইতিপূর্ব্বে প্রত্যেক যুগের যে বর্ষ সংখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা প্রনিধানপূর্ব্বক দেখিলে বুঝা যাইবে যে, মানব-সমাজের ধর্ম্ম ও সুখভোগের কাল, ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। সত্যযুগে মানব-সমাজের জ্ঞান, ধর্ম্মও সুখভোগ চারিপাদে পূর্ণ ছিল; ত্রেতা হইতে কলি পর্য্যন্ত তাহার এক এক পাদ খর্ব্ব হইয়া কলিযুগে এক পাদমাত্র অবশিষ্ট আছে। এই নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক যুগের ভোগ-কালও ক্রমে পাদে পাদে হ্রাসাবদ্ধ হইয়াছে। কলিতে ধর্ম্ম ও সুখাদি ভোগের কাল ৪৩২০০০ মানবীয় বর্ষ;

দ্বাপরে তাহার দ্বিগুণ ৮৬৪০০০ বর্ষ; ত্রেতায় তাহার তিনগুণ ১২৯৬০০০ বর্ষ; এবং সত্যে তাহার চারিগুণ ১৭২৮০০০ বর্ষ। এই সমস্ত গণনাও যোগ-বলে লব্ধ হইয়াছিল। তাহা সামান্য বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হয় না। ফলত যোগের অসাধারণ প্রভাব। তাহার দ্বারা ভূত ও ভবিষ্যৎ নখদর্পণস্থ হয়, ব্যবধান ও দূরত্ব বিদূরিত হয়, এবং অমৃতায়মান শান্তি-বারি-পূর্ণ ধর্ম্ম মেঘ হৃদয়াকাশে উত্থিত হয়। প্রকৃতির গুপ্ত ভাণ্ডারে, অদৃশ্য সূক্ষ্মরাজ্যে ব্রহ্মভূবন হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত লোকমণ্ডলে, প্রকৃতির যত শোভা, সম্পৎ ও ঐশ্বর্য্য আছে, সে সমস্তই যোগরূপ পবিত্রনেত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহা অসম্ভব নহে, অস্বাভাবিকও নহে।

শাস্ত্র পাঠে সংগ্রহ হয় যে, 'ভূ-ধাতু,' 'জলধাতু' এবং 'জ্যোতি-ধাতু' অথবা 'অন্ন', 'প্রাণ,' ও 'জ্ঞান' এই ত্রিবিধ তত্ত্ব—সমুদায় ভোগের উপাদান। তন্মধ্যে ভূলোকের ভোগ, দেহ বা অন্ন-প্রধান। স্বার্থমিশ্রিত-ধর্ম্ম, শৌর্য্য বীর্য্য, প্রাণ প্রভৃতি সকলই অন্নধাতুতে রচিত। ধন, প্রজা, পশু, যশ সমস্তই অন্নময়। সমস্তই স্থূল-ভোগ্য, অল্প এবং ক্ষণস্থায়ী। দিবাকরের প্রত্যেক উদয়াস্ত তৎসমূহকে ক্ষয় করে। সেই নিয়মে অন্নধাতু-প্রধান ভোগীর দিনে দিনে আয়ুক্ষয় হয়। ঊর্দ্ধ ৩৬০০০ দিবারাত্রি যাবৎ মানব তাহা ভোগের অধিকারী। ঐকালে তাঁহার শ্রুতি সিদ্ধ শতবর্ষ পরমায়ু শেষ হইয়া যায়। মৃত্যুর পর তাদৃশ মানব এই ভূলোকেই পুনরায় জন্মেন এবং পুনরায় ঐ নিয়মের বশতাপন্ন হন। কিন্তু যোগ প্রভাবে আয়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পিতৃ-লোকের ভোগ জল-প্রধান অথবা প্রাণ-পর। তাহা চন্দ্রোপলক্ষিত ভোগ; চন্দ্রগ্রহ জলধাতু প্রধান। জল ও প্রাণ, অন্নাপেক্ষা সূক্ষ্মপদার্থ। তাহা প্রজা, পর্জ্জন্য, মানসিক সুখ, এবং অন্নের কারণস্বরূপ। যে সকল গৃহপতি, পৃথিবীর মঙ্গলার্থে সেই সকল অপেক্ষাকৃত নিস্বার্থ-ধর্ম্ম ও সূক্ষ্মভোগের কামনা পূর্ব্বক প্রজাগণের হিতার্থ প্রাজাপত্যব্রত, ইন্দ্রযাগ ও ইষ্টাপূর্ত্তাদি ক্রিয়া করেন, তাঁহাদের পার্থিব পরমায়ু তাদৃশ পুণ্যবশত শতবর্ষের অধিক হইতে পারে না, হইলেও ক্ষতি নাই। কেননা তৎফলে পরলোকের নিমিত্তে তাঁহারা দীর্ঘতর পরমায়ু সঞ্চয় করেন এবং পিতৃলোকে গিয়া তাহাভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সেই পরমায়ু ও তদ্ভুক্ত ভোগাদি, সূর্য্যের উদয়াস্তদ্বারা শীঘ্র শীঘ্র নিয়মিত ও হ্রসিত হইয়া থাকে। তাহাতে তাঁহাদের স্বীয়মানে এক

শতবর্ষ পরমায়ু হইলে, তাহা আমাদের শতবর্ষের ত্রিংশদ্গুণ অর্থাৎ ৩০০০ বর্ষ হইবেক। তাহাদের যতই পরমায়ু হউক, ভোগ সমাপ্ত হইলে তাঁহারা পুনর্ব্বার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা স্থূল-অন্ন-ধাতু-প্রধান নহেন, কিন্তু অন্নের অথবা পৃথিবীর সূক্ষ্মমূর্ত্তি স্বরূপ প্রাণ ও জলধাতু-প্রধান। চন্দ্রের কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষ জলধাতুর নিয়ামক এজন্য তাঁহারা চন্দ্র-ধাতু-প্রধানরূপে কথিত হন। চন্দ্রের যে অংশ সূর্য্যের সুষুম্না রশ্মিদ্বারা পৃথিবীর দিকে দিন দিন শুক্ল হয়, তদ্ভুক্ত কালকে আমরা শুক্লপক্ষ বলি, সেই কালটি পিতৃলোকের রাত্রি-কাল। তাঁহার যে অংশ ঊর্দ্ধভাগে গগনমার্গের দিকে শুক্ল হয়, অর্থাৎ যাহা পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণ দৃষ্টিগোচর হয় না তদ্ভুক্ত পক্ষটি আমাদের কৃষ্ণপক্ষ হইলেও পিতৃলোকের দিবাকাল। অতএব পক্ষদ্বয়ে বিভক্ত সেই দীর্ঘ দিবা ও দীর্ঘ রাত্রিকাল দ্বারা পিতৃস্বর্গস্থ উপাদেয় ভোগ, ধর্ম্ম ও সুখ নিয়মিত হইয়া থাকে। এই পার্থিব ও পৈত্র ভোগকাল সামান্যগণনায় সিদ্ধান্ত নহে, কিন্তু যোগও সূক্ষ্ম দূরদৃষ্টির ফল।

ভূলোকের ভোগ যেমন ভূ-ধাতু ও অন্ন-প্রধান, এবং পিতৃস্বর্গীয় ভোগ যেমন তদপেক্ষা সূক্ষ্ম জল-ধাতু ও প্রাণ-প্রধান, সেইরূপ দেবস্বর্গের ভোগ আলোক ধাতু ও জ্ঞান-প্রধান। তাহা মানবীয় দিবা বা শুক্ল কৃষ্ণপক্ষদ্বয় দ্বারা নিয়মিত হয় না। তাহা সূর্য্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন দ্বারা শাসিত হইয়া থাকে। চন্দ্র যেমন পার্থিব প্রাণ ও জলধাতু-প্রধান, সূর্য্য সেইরূপ আলোক-ধাতু ও জ্ঞান-ধাতু-প্রধান, যাঁহাদের চিত্ত দেব-যজ্ঞ, দেবতা জ্ঞানরূপ বিদ্যা, প্রতীকোপাসনা, বাসন্তীয়া ও শরদীয়া প্রভৃতি উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ বিহিত পূজাদ্বারা প্রসাদ সম্পন্ন, দিবারাত্রি বা পক্ষদ্বয় পরিমাণে তাঁহাদের আয়ুক্ষয় হয় না; কিন্তু উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন বিশিষ্ট দ্বাদশ মাস পরিমাণে তাহা হইয়া থাকে। উত্তরায়ন তাঁহাদের দিবস এবং দক্ষিণায়ন রাত্রি। সুতরাং তাঁহাদের দিবা-রাত্রি যখন আমাদের একবর্ষ পরিমিত, তখন তাঁহাদের একবর্ষ আমাদের ৩৬০ বর্ষ পরিমিত এবং তাঁহাদের শতবর্ষ আমাদের ৩৬০০০ বর্ষ পরিমিত। এই নিয়মে আমাদের ৪ যুগে অর্থাৎ ৪৩,২০,০০০ বৎসরে তাঁহাদের ১২০০০ বর্ষ মাত্র। প্রাগুক্ত প্রকার দেবজ্ঞানী মহাপুরুষদিগের যে স্থানে গতি হয়, তাহার প্রচলিত দিবারাত্রি ও যুগাদির এই নিয়ম। সেই স্থানের নাম দেব-লোক বা দেবস্বর্গ। তথাকার ভোগ সমাধা হইলে ভোগীগণ পৃথিব্যাদি নিম্নস্থ লোকমণ্ডলে পুনরাবর্ত্তিত হন, কিন্তু যাঁহাদের চিত্ত জ্ঞানপ্রধান-সূক্ষ্ম-

জ্যোতিঃ বা হিরণ্য গর্ভরূপ সূক্ষ্ম প্রাণের উপযাচক তাঁহারা তথা হইতে ক্রমোন্নতি সহকারে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত উত্থান করেন।

তেজ, আলোক ও জ্ঞান ধাতুর যে উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম ও সাত্ত্বিকাংশ তাহা ব্রহ্মভুবন চতুষ্টয়ের ভোগোপাদান। যাঁহারা পার্থিব, পৈত্র ও দৈব ভোগ প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক মহা সূক্ষ্মা প্রকৃতিরূপিণী হিরণ্যগর্ভ-বিষয়া ব্রহ্মবিদ্যা ও যোগজা-বিভূতির সেবা করেন, যাঁহারা ব্রহ্মচারী ও বনবাসী হইয়া অপ্রতীকোপাসনায় ও যোগধারণে ব্রতী হন, তাঁহারাই ব্রহ্মভুবনের অধিকারী। তাঁহাদের উন্নত মানসিক ধাতু। যোগৈশ্বর্য্য ও সঙ্কল্পাত্মিকা সাত্ত্বিকী শক্তি-সম্পন্ন তাঁহাদের স্থূলদেহ ধারণ—তাদৃশ শক্তি বশাৎ ঐচ্ছিক মাত্র। এই সৌর জগতের সূর্য্য; অথবা, স্থূল ভোগীদিগের শাস্তা অন্য কোন জগতের সূর্য্য, তাঁহাদের অথবা তাঁহাদের মোক্ষ পুরীচতুষ্টয়ের সংযামক নহে। "নৈব তত্র ন নিম্লোচ নোদিয়ায় কদাচন।" (ছাঃ ৩। ১১। ২) সেই ব্রহ্মলোকে এই সূর্য্য কখন অস্তগতও হন না, উদিতও হন না। তাৎপর্য্য এই যে, 'ব্রহ্মলোকে সূর্য্য জীবন হ্রাস করেন না।' (তত্ত্ববাধিনী) সেই লোক, জগৎ-সবিতা হিরণ্যগর্ভরূপ মহাসূক্ষ্ম সূর্য্যের অধিকারস্থ। 'যত্রামৃতঃ স পুরুষোহ্যব্যয়াত্মা' যেখানে প্রথমজ অব্যয়াত্মা অমৃতস্বরূপ হিরণ্যগর্ভ সংসারের বীজরূপে যাবৎ সংসার স্থায়ী তাবৎকাল অবস্থিত আছেন। (শাঙ্কর ভাঃ ১ মুঃ ২-খঃ ১১ শ্রু।) 'তেষামসৌ বিরজোব্রহ্মলোক ন যেষু জিহ্ম মনৃতং ন মায়াচেতি।' (১ প্রঃ ১৬।) যাঁহাদের কৌটিল্য বা অসত্য ব্যবহার নাই এবং মিথ্যাচাররূপা মায়া নাই। 'আদিত্যোপলক্ষিত উত্তরায়ণঃ প্রাণাত্মভাবঃ বিরজঃ শুদ্ধঃ অসৌব্রহ্মলোকঃ তেষাং।' (শাঙ্কর ভাঃ ১ প্রঃ ১৬) তাঁহাদেরই নিমিত্তে এই আদিত্যোপলক্ষিত, উত্তরাগতিস্বরূপ, সূক্ষ্মপ্রাণস্বরূপ, রজোমলবর্জ্জিত, বিশুদ্ধ ব্রহ্মলোক। 'অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মান মন্বিষ্যাদিত্যমভিজয়ন্তে। এতদ্বৈ প্রাণানামায়তনমেতদ-মৃতমভয় মেতৎ পরায়ণমেতস্মান্ন পুনরাবর্ত্তন্ত ইতি।' (ঐ ১০) যাঁহারা তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও হিরণ্যগর্ভবিষয়া বিদ্যাদ্বারা হিরণ্যগর্ভরূপ সূক্ষ্ম সমষ্টি প্রাণাত্মাকে অন্বেষণ করেন, তাঁহারা উত্তর পথদ্বারা হিরণ্যগর্ভ-ভুবনরূপ আদিত্যলোকে গমন করেন। এই লোকই প্রাণ সকলের আয়তন, ইহাই অমৃত, ইহাই পরমগতি, ইহা হইতে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। ভূলোক পিতৃলোক, এবং দেবলোকে ভোগের যতবিধ উপাদান আছে, এই ব্রহ্মলোক,

তাগার সূক্ষ্ম ও তৈজস আয়তন ক্ষেত্র। এখানে সূক্ষ্ম জ্যোতি ও জ্ঞান-জ্যোতি বিরাজিত। প্রভু হিরণ্যগর্ভ হইতে তাহা নিঃসৃত হইয়া যোগী ও তাপসমণ্ডলের মহৈশ্বর্য্য ও বিভূতিস্বরূপ হইয়াছে। ঐ বিভূতি তত্রত্য ভোক্তাগণের সঙ্কল্পিত অন্তর্দ্ধানাবস্থায় সাত্ত্বিক জ্ঞান মাত্র; কিন্তু তাঁহাদের ঐচ্ছিক দেহ প্রকাশ ও ভোগাদিকালে তাহা সঙ্কল্পরূপ-শক্তি-সম্পন্ন। প্রাগুক্ত দেবলোক এবং এই শেষোক্ত ব্রহ্মভুবনচতুষ্টয় উভয়ই উত্তর মার্গে স্থিত। উভয়ই অর্চ্চিবাদি মার্গ ও দেবযান নামে উক্ত হয়।

সর্ব্ব সঙ্কল্পের আশ্রয়, সর্ব্ব প্রকার প্রাকৃতিক শক্তির নিয়ামক, এবং সর্ব্ব জ্ঞানের সমষ্টি আধার ও আকরস্বরূপ প্রভু হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টি-সঙ্কল্পরূপ জাগরণ এবং সৃষ্টিশক্তির বিশ্রামরূপ নিদ্রাই যথাক্রমে ব্রহ্মলোকে দিবস ও রাত্রি শব্দের বাচ্য। প্রকৃতির সত্ত্বগুণ-নিষ্পাদিত জ্ঞান, শক্তি, ভোগ প্রভৃতির ক্ষয় হইলেই ঐ বিরামকাল উপস্থিত হয়। মানবীয় এক সহস্র চতুর্যুগের পর এবং দৈব ১২০০০০০০ বর্ষের অন্তে সেই কালটি আগত হয়। ঐকালে যোগৈশ্বর্য্যরূপ সূক্ষ্ম প্রাকৃতিকতত্ত্ব নিদ্রিত হয় বলিয়া উহা ব্রহ্মভুবনের রাত্রিস্বরূপ। তাদৃশ রাত্রির পরিমাণ সহস্র চতুর্যুগব্যাপী। যোগৈশ্বর্য্যই সকল স্থূল ঐশ্বর্য্য ও প্রাণের সূক্ষ্ম আয়তন। সুতরাং তাহার নিদ্রাতে নিমগ্ন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়ে লীন হয় এবং তাহার জাগরণে পুনঃ সৃষ্ট হয়। এইরূপ প্রলয় ও সৃষ্টিতে, সূক্ষ্মভূতগণ এবং সূক্ষ্মদেহ সমূহ বিনষ্ট ও কৃত হয় না। তাহার সহিত কেবল স্থূলাবয়বেরই সম্পর্ক। এইরূপ সৃষ্টির নাম নৈমিত্তিক সৃষ্টি এবং তাহার পরমায়ুর নাম কল্পকাল। আর, এইরূপ প্রলয়কে নৈমিত্তিক প্রলয় ও কল্পান্ত কহে।

ঐরূপ জাগরণ ও নিদ্রা অর্থাৎ দিবারাত্রিই ব্রহ্ম দিবারাত্রি শব্দের বাচ্য। তাদৃশ দিবারাত্রিকে অধিকার পূর্ব্বক ব্রহ্মার শত বর্ষ পরমায়ু ভোগ হয়। তদ্ভুক্ত প্রতিদিনে একটি নৈমিত্তিক সৃষ্টির উদয় হয় এবং প্রতিরাত্রিতে নৈমিত্তিক প্রলয়। অতএব ব্রাহ্মপরিমিত উক্ত শতবর্ষের মধ্যে তাদৃশ সৃষ্টি ও প্রলয় পুনঃ পুনঃ ৩৬০০০ বার সংঘটিত হয়। তাহার পর প্রকৃতি-শক্তি মূলত নিস্তেজ হইয়া যখন পুনঃ সংশোধনার্থ পরব্রহ্মে প্রবেশ করে, সেইকালকে প্রাকৃতিক প্রলয় কহে। তাহাতে প্রকৃতির সূক্ষ্মধাতু পর্য্যন্ত উপসংহৃত হয়। সূক্ষ্মভূত, সূক্ষ্মবিভূতি, ও সূক্ষ্মদেহ, কারণরূপিণী শক্তিতে পরিণত হইয়া পরব্রহ্মেতে সাম্যাবস্থা লাভ করে। তখন ব্রহ্মার সহিত

ব্রহ্মভুবনস্থ সমস্ত যোগী পরব্রহ্মে প্রবেশ করেন। ব্রহ্মার প্রাগুক্ত প্রকার দিনরাত্রি ও পরমায়ু সংখ্যা যাহা উক্ত হইয়াছে, সে সমস্তই যোগ-নিষ্পাদ্য গণনা। সামান্য বুদ্ধিতে তাহা স্ফূর্ত্তি পায় না।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

---

# বঙ্গে ইংরাজাধিকার।

## ৫।

উমিচাঁদের সম্বন্ধে যে দুই খানি অঙ্গীকার পত্র প্রস্তুত হয়, তাহার এক খানি শ্বেত ও অপর খানি লোহিত বর্ণের। লোহিত বর্ণের পত্রে উমিচাঁদকে প্রতিশ্রুত অর্থ দিবার কথা ছিল, কিন্তু শ্বেত বর্ণের পত্রে তাহার কিছুই ছিলনা, সুতরাং শ্বেতবর্ণ পত্রখানি প্রকৃত ও লোহিত বর্ণ পত্রখানি অলীক। ক্লাইব প্রকৃত অঙ্গীকার পত্রে ওয়াট্‌সনের নাম জাল করিয়া, উভয় পত্রই ওয়াট্‌সের নিকট প্রেরণ করিলেন, এবং এ সম্বন্ধে কি করিতে হইবে, তাহাও লিখিয়া পাঠাইলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, রায় দুর্লভ ও মীরজাফর সৈন্যদল লইয়া পলাশীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইংরাজেরা অকস্মাৎ পলাশীতে নবাবের সৈন্য দেখিয়া মনে করেন, নবাব তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণে অগ্রসর হইতেছেন। কিন্তু নবাব ইহাতে প্রকাশ করেন যে, ইংরেজদিগের অনিষ্ট-সাধন জন্য পলাশীতে সৈন্য স্থাপিত হয় নাই। সিরাজউদ্দৌলা যখন এইরূপে আত্মদোষ ক্ষালন করিতেছিলেন, তখন সহসা আর একটি ঘটনায় অদূরদর্শী অপরিপক্কমতি হতভাগ্য সিরাজকে অধিকতর চক্রান্ত জালে জড়িত করিয়া তুলে।

১৭৫৭ অব্দের ৩রা মে হঠাৎ কলিকাতায় একটি অপরিচিত পুরুষ উপস্থিত হন, আগন্তুকের নাম গোবিন্দ রায়। তিনি মহারাষ্ট্র সেনাপতি বলজী রাওর দূত বলিয়া আপনার পরিচয় দেন। তাঁহার নিকট বলজী রাওর একখানি পত্র ছিল, এই পত্রে বলজীরাও প্রস্তাব করিয়াছিলেন

যে, যদি কলিকাতার ইংরেজ গবর্ণর সম্মত হন, তাহা হইলে, তিনি এক লক্ষ সৈন্য সহিত বাঙ্গালায় উপস্থিত হইবেন, এবং ইংরেজদিগের সহযোগী হইয়া নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন। এই পত্র উপস্থিত হইলে, ইংরেজদিগের সমিতিতে উহার সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক হয়, অবশেষে ক্লাইব বিশেষ চতুরতা দেখাইয়া, উহা নবাবের নিকট পাঠাইবার প্রস্তাব করেন। তিনি এই বলিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করেন যে, উপস্থিত পত্র নবাবের নিকট পঁহুছিলেই, ইংরেজদিগের উপর নবাবের বিশ্বাস জন্মিবে। নবাব আপাতত বুঝিতে পারিবেন যে, ইংরেজদিগের কোনও দুরভিসন্ধি নাই, কেননা তাহারা মহারাষ্ট্র সেনাপতির গোপনীয় পত্র দেখাইয়া আপনাদিগের সদাশয়তার পরিচয় দিতেছে। সমিতিতে ক্লাইবের এই প্রতারণাময়ী যুক্তির সম্মান রক্ষিত হয়—সকলেই উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করেন, সুতরাং ক্লাইব বলজীরাওর গোপনীয় লিপি ও আপনার লিখিত আর একখানি পত্র স্ক্রাফ্টন সাহেব দ্বারা নবাবের নিকট পাঠাইয়া দেন। ক্লাইব আপনার পত্রে প্রকাশ করেন যে, মহারাষ্ট্র সেনাপতির গোপনীয় পত্র পাঠাইয়া দেওয়াতেই সপ্রমাণ হইতেছে, ইংরেজেরা নবাবের সহিত শান্তভাবে থাকিতে ইচ্ছা করিতেছেন। নবাব কেন যে পলাশীতে সৈন্য রাখিয়াছেন, ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না। এই সৈন্য থাকাতে ইংরেজদিগের বাণিজ্যের অনেক ক্ষতি হইতেছে এবং ইহাতে ইংরেজদিগের মনে এই সন্দেহ হইতেছে যে, যখন সুযোগ উপস্থিত হইবে, তখনই নবাব তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইবেন। যখন নবাব গভীর আশঙ্কার তরঙ্গে দোলায়মান ছিলেন, ইংরেজদিগের উপর যখন তাঁহার গভীর অবিশ্বাসের সঞ্চার হইয়াছিল, তখন বলজীরাওর পত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। পত্র পাইয়া সিরাজ আবার বিচলিত হইলেন—আবার একটির পর আর একটি চিন্তার তরঙ্গ তাঁহাকে আন্দোলিত করিতে লাগিল। তিনি আবার এই চিন্তার আবেগে অধীর হইয়া, সুখময় স্বপ্নের অপূর্ব্ব-বিভ্রম দেখিতে লাগিলেন।

নবাব বলজীরাওর পত্রের বিষয় পূর্ব্বে কিছুই জানিতেন না। বলজীরাও যে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া বাঙ্গালা আক্রমণ করিবেন, ইহা পূর্ব্বে তাঁহার বিদিত হয় নাই। এখন সহসা এই বিপদের সংবাদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। নবাব বুঝিলেন যে, ইংরেজেরা তাঁহার হিত-সাধন

মানসেই এই সংবাদ তাঁহাকে জানাইয়া সাবধান করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং ইংরেজদিগের উপর তাঁহার অপরিসীম বিশ্বাসের আবির্ভাব হইল। তিনি ভাবিলেন, ইংরেজদিগকে অবিশ্বাস করা তাঁহার পক্ষে অন্যায় হইয়াছে—ইংরেজগণ প্রকৃত প্রস্তাবে অবিশ্বস্ত বা অসাধু নহেন। তাঁহারা অবিশ্বস্ত হইলে, কথনও বলজীর পত্র পাঠাইয়া দিতেন না, সুতরাং ইংরেজদিগের সদভিপ্রায়ের উপর সন্দেহ স্থাপন করা কখনও উচিত নহে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, নবাব সুখের আবেশে, ইংরেজদিগের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।—সুখের আবেশে, ইংরেজদিগকে শুভানুধ্যায়ী পরম মিত্র বলিয়া মহীয়ান্ করিয়া তুলিলেন। ক্লাইবের চাতুরী ফলবতী হইল। বলজীরাওর পত্র নবাবের সমক্ষে অধিকতর মোহের অন্ধকার বিস্তার করিল। নবাব অধিকতর মোহজালে জড়িত হইয়া ক্লাইবের প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিতে উদ্যত হইলেন, তিনি প্রথমে মীরজাফরকে সৈন্য সহিত মুর্শিদাবাদে আসিবার জন্য আদেশ দিতে চাহিলেন। মারহাট্টারা বাঙ্গালা আক্রমণ করিলে, রাজা দুর্লভরাম ইংরেজদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, সেই আক্রমণ নিরস্ত করিতে পারেন, এই অভিপ্রায়ে তিনি দুর্লভরামকে সৈন্যের সহিত পলাশীতে রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতে আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত হইবে ভাবিয়া, ওয়াট্‌স ও স্ক্রাফ্‌টন সাহেব নানা কৌশলে নবাবকে সমুদায় সৈন্য ফিরাইয়া আনিতে পরামর্শ দিলেন, নবাব কিছুক্ষণ ইতস্তত করিয়া, অবশেষে এই পরামর্শ অনুসারেই কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন। মীরজাফর আপনার সৈন্য দল লইয়া মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার চারি দিন পরে, রাজা দুর্লভরামও অবশিষ্ট সৈন্যের সহিত নবাবের নিকট উপস্থিত হইলেন।

মহারাষ্ট্র সেনাপতির পত্র সিরাজের হস্তগত হওয়াতে, ইংরেজদিগের পক্ষে একরূপ অচিন্তনীয় সুযোগ উপস্থিত হইল। ইংরেজদিগের উপর নবাবের যে ক্রোধ ও অবিশ্বাসের আবির্ভাব হইয়াছিল, এই পত্র তাহা দূর করিল। ইহা নবাবের মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইয়া দিল যে, ইংরেজ হইতে আর কোনও আশঙ্কা নাই। যখন ইংরেজেরা নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন, নবাবকে পদচ্যুত করিবার উপায় স্থির করিতেছিলেন, যখন তাঁহাদের রাজ্যভোগ লালসা বলবতী

হইয়া উঠিয়াছিল, তখন ইহা নবাবের মনে ইংরেজ বিদ্বেষ দূরীভূত করিয়া ফেলে।

এই পত্র আর একদিকে ইংরেজদিগের বিশেষ অনুকূল হইয়াছিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সিরাজ বয়সের অল্পতা প্রযুক্ত সময়ে সময়ে বুদ্ধির চাঞ্চল্য দেখাইতেন। মীরজাফরের উপর পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার অবিশ্বাস ও বিরাগের সঞ্চার হইয়াছিল। এত দিন তিনি ভয়ে কিছু বলিতে পারেন নাই, এখন ইংরেজেরা সহায় আছেন ভাবিয়া সিরাজ অধিকতর সাহসী হইয়া উঠিলেন। মীরজাফর পলাশী হইতে প্রত্যাগত হইলে, নবাব তাঁহার প্রতি সাতিশয় কঠোর-ভাব দেখাইলেন। ইহাতে মীরজাফর স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, নবাবের সহিত তাঁহার আর সদ্ভাবের আশা নাই; সুতরাং তাঁহার পূর্ব্ব-বিদ্বেষ দৃঢ়তর হইল—প্রতিহিংসা বলবতী হইয়া উঠিল—তিনি আপনার প্রাসাদে আসিয়া অধীনস্থ সমস্ত সৈন্য ও কর্ম্মচারীকে আদেশ প্রাপ্তিমাত্র মুহূর্ত্তমধ্যে প্রস্তুত হইতে কহিলেন। নবাবের বিরুদ্ধে তাঁহার সহিত ইংরেজদিগের যে ষড়যন্ত্র হইতেছিল, এখন হইতে তাহার কার্য্য অধিকতর সুনিয়মে ও সত্বরতার সহিত সম্পাদিত হইতে লাগিল। এইরূপে বলজীর পত্র উভয় দিকেই ইংরাজদিগের সমূহ উপকার সাধন করিল—ইহা একদিকে যেমন ইংরাজদিগের উপর নবাবের বিশ্বাস জন্মাইয়া দিল, অপর দিকে, তেমনই নবাবের একজন প্রধান সেনাপতিকে তাঁহার ঘোরতর শত্রু করিয়া তুলিল।

এই সময়ে, ওয়াট্‌স সাহেব আপনার একজন বিশ্বস্ত দূত দ্বারা মীরজাফরের নিকট সন্ধিপত্র পাঠাইয়া দেন। মীরজাফর যদিও এখন সিরাজউদ্দৌলার ঘোরতর বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিলেন, যদিও এখন যে কোন উপায়ে হউক, সিরাজের সর্ব্বনাশ সাধন তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তথাপি তিনি রাজা দুর্লভরামের সহিত পরামর্শ না করিয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে সম্মত হইলেন না। ৩রা জুন রাজা দুর্লভরাম পলাশী হইতে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগত হন। ইহার পর দিন মীরজাফর তাঁহাকে সন্ধিপত্র দেখান। রাজা দুর্লভরাম সন্ধিপত্রে বহুসংখ্যক অর্থ দেওয়ার প্রস্তাব দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এই সকল টাকা দেওয়া হইলে, রাজকোষ শূন্য হইয়া উঠিবে, প্রজাদিগের উপর দৌরাত্ম্য করিয়া অর্থ সংগ্রহ না করিলে, আর

আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে না সুতরাং তিনি নবাবের ধনাগারে এখন যে অর্থ আছে, তাহা মীরজাফর ও ইঙ্গরেজদিগের মধ্যে তুল্যরূপে ভাগ করিয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু ওয়াট্স সাহেব এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন না। তিনি সন্ধি-পত্র-নির্দ্দিষ্ট কোনও প্রস্তাবের কোনও অংশ পরিত্যাগ করিতে নিতান্ত অসম্মতি দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির কোনও ব্যাঘাত হইল না। তিনি চতুরতা পূর্ব্বক দুর্লভ রামকে আপনার পক্ষে আনিলেন। আর দুর্লভ রাম কোনরূপ আপত্তি দেখাইলেন না। সুতরাং ৪ ঠা জুন মীরজাফর সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। ঐ দিনই নবাব মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া, খোজাহাদী নামক এক ব্যক্তিকে প্রধান সেনাপতি করিলেন। বলা বাহুল্য যে, উপস্থিত সন্ধিপত্রের বিষয় এ পর্য্যন্ত নবাবের গোচর হয় নাই, নবাব কেবল আন্তরিক বিদ্বেষ-প্রযুক্ত মীরজাফরকে এইরূপ দণ্ডিত করেন।

মীরজাফর এইরূপে সেনাপতির পদ হইতে বিচ্যুত হওয়াতে নবাবের উপর অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং অধিকতর আগ্রহের সহিত ইংরেজ বণিকদিগের প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিতে উদ্যত হইলেন। যেদিন মীরজাফর পদচ্যুত হন, তাহার পরদিন তাঁহার সহিত ওয়াট্স্ সাহেবের সাক্ষাৎ হয়। অন্তঃপুরচারিণীদিগকে যেরূপ বস্ত্রাচ্ছাদিত পাল্কিতে লইয়া যাওয়া হয়, ওয়াট্স্ সাহেব নবাবের ভয়ে সেইরূপ পাল্কীতে চড়িয়া মীরজাফরের কাছে গিয়াছিলেন। সুতরাং উহাতে নবাবের লোকদিগের মনে কোনও রূপ সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ভাবিয়াছিল কোনও অন্তঃপুর মহিলাই ঐ পাল্কিতে যাইতেছে। ওয়াট্স্ মীরজাফরের নিকট উপনীত হইলেন মীরজাফর কহিলেন, যে, এখন তিনি অনায়াসে ৩ হাজার সৈন্য লইয়া ইংরেজদিগের সপক্ষতা করিতে পারেন। কিন্তু রাজ্যের অন্যান্য প্রধান লোক নবাবের উপর যেরূপ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ঐ সকল লোককে তিনি আপনার পক্ষে আনিতে পারিবেন। ইহার পর মীরজাফর গম্ভীর ভাবে শপথ করিয়া আপনার প্রতিশ্রুতি-পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, এবং কলিকাতার ইংরেজদিগকে পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অনুসারে অভীষ্ট বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য ওয়াট্স্ সাহেবকে বিশেষ অনুরোধ করেন। ইহার পর তিনি দুইখানি সন্ধিপত্র আপনার কোনও বিশ্বস্ত

কর্ম্মচারীর দ্বারা কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতে স্বীকৃত হন। এইরূপে কথাবার্ত্তা হইলে ওয়াট্‌স্ সাহেব বিদায়গ্রহণ করেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় ছদ্মভাবে আপনার আবাস-গৃহে ফিরিয়া আসেন।

এখন ওয়াট্‌স্ সাহেবের কেবল আর একটি মাত্র কার্য্য বাকি রহিল। উমিচাঁদের সম্বন্ধে যে দুইখানি প্রতিজ্ঞাপত্র প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা গোপনে গোপনে ২।৪ জনের কাণে উঠিয়াছিল। এই সময়ে উমিচাঁদ মুর্শিদাবাদে ছিলেন। যদি উপস্থিত বিষয় তাঁহার গোচর হয়, তাহা হইলে সমস্ত পণ্ড হইবে এই আশঙ্কায় ওয়াট্‌স্ সাহেব তাঁহাকে তাড়াতাড়ি কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি উমিচাঁদকে অধিকতর নিরাপদ করিবার ভাণ করিয়া কৃত্রিম বন্ধুতা দেখাইয়া পরামর্শ দিলেন যে, এখন নবাবের সহিত যেরূপ বিবাদের সূত্রপাত হইতেছে, তাহাতে মুর্শিদাবাদে থাকিলে তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিবে। সুতরাং স্ক্রাফ্‌টন সাহেবের সহিত তাঁহার তাড়াতাড়ি কলিকাতায় প্রস্থান করা উচিত। ওয়াট্‌স্ সাহেবের কৌশল ব্যর্থ হইল না। উমিচাঁদ ধনাগার হইতে কিছু টাকা লইবার জন্য একদিন মাত্র অপেক্ষা করিতে চাহিলেন। কিন্তু যখন তিনি নবাবের কোষাগার হইতে টাকা পাইলেন না, তখন আর মুর্শিদাবাদে অপেক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন না। উমিচাঁদ ৮ই জুন কলিকাতায় পঁহুছিলেন। ইহার ২ দিন পরে দুইখানি অঙ্গীকার পত্র লইয়া মীরজাফরের দূত কলিকাতায় আসিল। কলিকাতার ইংরাজ-সমিতি পূর্ব্বেই সমুদায় বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন; এখন অঙ্গীকার পত্র দুইখানি উপস্থিত হওয়ামাত্র অঙ্গীকার পত্রের যেখানি অলীক, সেইখানি উমিচাঁদকে দেখান হইল। উমিচাঁদ দেখিলেন যে, এই পত্রে তাঁহার সমস্ত দাবি পূরণের কথা লেখা রহিয়াছে; ইংরেজ সমিতির সকলেই ইহাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। সুতরাং যে গভীর সন্দেহে তাঁহার হৃদয় আন্দোলিত হইয়াছিল, তাহা দূর হইল। উমিচাঁদ প্রতিজ্ঞাপত্র দেখিয়া আশ্বস্ত ও সন্তুষ্ট হইলেন।

সমুদায় ঠিক হইল। চাতুরীতে, প্রবঞ্চনা-বলে, বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে একজনের সর্ব্বনাশ ও আর একজনকে হতাশ্বাস করিবার সমুদয় কথাবার্ত্তা, সমুদয় কৌশল ও সমুদয় মন্ত্রণা ঠিক হইয়া গেল। ক্লাইব এখন সুযোগ বুঝিয়া শেষ কার্য্য-সাধনে উদ্যত হইলেন। তিনি স্পষ্ট বিতে

পারিলেন যে, তিনি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাহা সম্পন্ন হইলে সমস্ত বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যায় ইংরেজ কোম্পানির প্রভু-শক্তি বদ্ধমূল হইবে, অধিকন্তু ইহাতে তাঁহার নিজের নামও ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবে। সুতরাং তিনি এ সুযোগ ছাড়িতে কোন আশঙ্কায় বা ভয়ে, নিরাশায় বা নিরুৎসাহে পশ্চাৎপদ হইলেন না। ইংরেজ সৈনিক পুরুষেরা ২০০ শত খানি নৌকায় করিয়া নবাবের বিরুদ্ধে যাত্রা করিল; সিপাহিরা স্থলপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। নবাবের যে ২ জন দূত ক্লাইবের সঙ্গে ছিল, ক্লাইব তাহাদিগকে ইহার পূর্ব্ব দিনই বিদায় দিয়াছিলেন; দূত দ্বয়ের দ্বারা তিনি নবাবের নিকট একখানি পত্র পাঠাইয়া দেন। এই পত্রে ক্লাইব সাহস করিয়া নবাবের নিকট লিখেন যে, ফেব্রুয়ারি মাসে নবাবের সহিত যে সন্ধি হয়, নবাব সে সন্ধির নিয়ম পালন না করাতে দোষী হইয়াছেন। কলিকাতায় তিনি যে সম্পত্তি লুঠিয়া লইয়াছেন, ৪ মাসের মধ্যে তাহার পাঁচ ভাগের একভাগের বেশি ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই। ইংরেজদিগের সহিত তাঁহার সন্ধি থাকাতেও তিনি আপনার সাহায্যার্থ ফরাসি সেনাপতি বুসিকে আহ্বান করিয়াছেন, এবং এই সময়ে ল নামক আর একজন ফরাসি সেনাপতির অধীনে আপনার রাজধানীর ১০০ শত মাইলের মধ্যে একদল ফরাসি সৈন্য রাখিয়াছেন। এইরূপে ইংরেজদিগের যারপরনাই অবমাননা করা হইয়াছে। এইরূপ অবিশ্বাসের কার্য্য এবং এইরূপ শত্রুতা করাতেও ইংরেজেরা একদিন অসাধারণ ধীরতা দেখাইয়া আসিয়াছেন। যখন আফগানদিগের আক্রমণ আশঙ্কায় নবাব বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন ইংরেজেরা তাঁহার সাহায্যার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেও ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু নবাবের পুনঃ পুনঃ গর্হিতাচরণে এখন তাঁহাদের স্থিরতা বিচলিত হইয়াছে। তাঁহারা আর কোনও উপায় না দেখিয়া মুর্শিদাবাদে আসিয়া এই বিষয়ের বিচার ভার নবাব সরকারের প্রধান কর্ম্মচারী মীরজাফর খাঁ, রাজা রায় দুর্লভ, জগৎশেঠ মহাতাপচাঁদ এবং মোহনলালের উপর সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ক্লাইবের আশা আছে যে, নবাব এই সালিসিতে সম্মত হইয়া নর শোণিত পাত বন্ধ রাখিবেন। ইহার পর, ক্লাইব পত্রের উপসংহারে কহেন যে, বর্ষাকাল উপস্থিত হওয়াতে নবাবের নিকট হইতে উত্তর পঁহুছিতে অনেক বিলম্ব হইবে। এজন্য গুরুতর প্রয়োজনের অনুরোধে তিনি স্বয়ং তাঁহার নিকট যাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

রাজ্যাধিপতির নিকট এরূপ কঠোর পত্র বোধ হয় আর কেহ কখন পাঠায় নাই, এবং রাজ্যাধিপতির কাছে এরূপ গর্ব্ব, এরূপ ঔদ্ধত্য ও এরূপ অপমান সূচক ভাব, বোধহয়, আর কেহ কখন প্রকাশ করে নাই। একদল বিদেশী যাঁহার অধিকারে বাস করিয়া যাঁহার অধিকৃত রাজ্যের সমৃদ্ধিতে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিতেছিল, তিনিই শেষে সেই বিদেশী, বিজাতি, লাভালাভ গণনা-নিপুণ, ক্রয় বিক্রয় ব্যবসায়ী বণিকদিগের এইরূপ অবজ্ঞা ও এইরূপ অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। স্থির ভাবে বিচার করিলে, এ বিষয়ে ইংরেজ ব্যবসায়ীদিগেরই গুরুতর অপরাধ লক্ষিত হয়। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি যখন ক্লাইব তরুণমতি নবাবকে আপনাদের সৈন্য বল দেখাইয়া চমকিত করেন, সেই দিন হইতেই ইংরেজেরা নবাবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নানা কার্য্য করিয়া নবাবকে ঘোরতর অপদস্থ করিয়া তুলেন। তাঁহারা নবাবের মতের বিরুদ্ধে চন্দন নগর অধিকার করেন। সেনাপতি লর অধীনে যে ফরাসি সৈন্য ছিল, তাহাদিগকে কাশিম বাজার হইতে তাড়াইয়া দিতে জোর করিয়া নবাবের মত লওয়ান, নবাব সরকারে যে সকল কৃতঘ্ন কর্ম্মচারী ছিল, তাহাদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং শেষে এই কৃতঘ্ন কর্ম্মচারীদিগের উপরই নবাবের ব্যবহার সম্বন্ধে বিচার করিবার ভার দিবার প্রস্তাব করেন। এইরূপ অবাধ্যতা এইরূপ অনধিকার-চর্চ্চা ও শান্তির এইরূপ ব্যাঘাত চেষ্টা কখনও মার্জ্জনীয় নহে। যে তরুণ-বয়স্ক যুবক সর্ব্বদা নানা আশঙ্কায় ব্যতিব্যস্ত থাকিতেন, রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত যাঁহার অধঃপতন-সাধনে উদ্যত হইয়াছিল, ক্লাইব তাঁহাকেই রাজ্যচ্যুত সম্পত্তিচ্যুত করিবার জন্য এইরূপ ধার্ম্মিকতা, সদাশয়তা ও ধীরতার ভাণ করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্ম, সৎসঙ্কল্প ও সদাচারের দোহাই দিয়া আপনাদিগকে নির্দ্দোষ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি পত্রে যে সদুদ্দেশ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অকৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাস ঘাতকতার পরিপূর্ণ। তাঁহার কথা ও তাঁহার কার্য্যের কোন মূল্য নাই, তিনি ধীরতার নামে অধীরতার এক শেষ দেখাইয়াছেন, সুবিচারের নামে অবিচারের চূড়ান্ত পরিচয় দিয়াছেন এবং ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের প্রশ্রয় বৃদ্ধি করিয়াছেন। বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার অদ্বিতীয় অধিপতি নির্দ্দোষ তরুণমতি যুবক তাঁহা-রই কৌশল জালে জড়িত হইয়া, তাঁহারই চাতুরী ভেদ করিতে না পারিয়া, বিস্তীর্ণ রাজ্য ও বিপুল ধন সম্পত্তির সহিত জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দেন।

এদিকে মুর্শিদাবাদে এই ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের সম্বন্ধে কানাঘুসা হইতে লাগিল। মীরজাফর, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, জারলতিফ খাঁ প্রভৃতি সকলেই আপনাদের মধ্যে এই বিষয় লইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন। কথা ক্রমে নবাবের কাণে উঠিল। নবাব আভাসে বুঝিতে পারিলেন যে, কোন একটি গুরুতর ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হইতেছে। মীরজাফর এই ষড়যন্ত্রের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়াছেন। নবাব মীরজাফরের উপর পূর্ব্বেই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এখন উপস্থিত ষড়যন্ত্রের আভাস পাইয়া অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার দুরদৃষ্ট ও চাঞ্চল্য প্রযুক্ত তিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বেই ক্রোধের আবেগে মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন। নবাব, আপনার সঙ্কল্প, ফলোন্মুখ হওয়ার পূর্ব্বে, চাপিয়া রাখিতে জানিতেন না। মীরজাফর পূর্ব্বহইতেই নবাবের সঙ্কল্প বুঝিতে পারিয়া সাবধান হইয়া চলিতে লাগিলেন। নবাব যে তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন এবং তাঁহাকে দণ্ডিত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠিয়াছেন, মীরজাফর ইহা জানিতে পারিয়া বিশেষ সাবধানে কার্য্য করিতে লাগিলেন। ৮ই হইতে ১৪ই জুন পর্য্যন্ত মীরজাফর ও ওয়াট্‌স্ সাহেব, উভয়েরই মনে বড় আশঙ্কা জন্মিয়াছিল। নবাব ক্রোধের আবেগে কখন কি করিয়া বসেন, মীরজাফর সর্ব্বদা সে জন্য চিন্তিত ছিলেন। এখন তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া ওয়াট্‌স্ সাহেবকে পলাইতে কহিলেন। ওয়াট্‌স্ সাহেব এই প্রস্তাবে আর অমনোযোগ দেখাইলেন না। ১৩ই জুন তিনি কার্য্য-পরিদর্শনচ্ছলে কাশিমবাজার গমন করেন। সেইখানে আর ৩ জন ইংরেজ তাঁহার সহিত মিলিত হন। রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময়ে সকলে অগ্রদ্বীপে উপনীত হন। এইখানে নবাবের যে সকল সৈনিক পুরুষ ছিল, তাহারা নিদ্রিত ছিল, সুতরাং তাঁহাদের আর কোনও ব্যাঘাত উপস্থিত হইল না। তাঁহারা ক্রমে ভাগীরথী বাহিয়া পরদিন কালনায় আসিলেন। ওয়াট্‌স্ সাহেব কালনা হইতে মীরজাফরের নিকট লোক পাঠাইয়া আপনার নিরাপদে উপস্থিতির সংবাদ জানাইলেন।

সিরাজউদ্দৌলা যখন মীরজাফরের আবাস-গৃহ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন ওয়াট্‌স্ সাহেব ও তাঁহার সঙ্গিগণের পলায়ন সংবাদ তাঁহার নিকট পহুছিল। এই সংবাদে তিনি অতিশয় ভীত হইয়া উঠিলেন। ইহাতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ইংরাজেরা তাঁহার বিরুদ্ধে সমুখিত

হইয়াছে। ভয়ের আবেগে তাঁহার মানসিক ভাব পরিবর্ত্তিত হইল, তিনি আবার মীরজাফরের সহিত সদ্ভাব-স্থাপনে অগ্রসর হইলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বয়সের অল্পতাপ্রযুক্ত নবাবের তাদৃশ ধীরতা বা স্থিরপ্রতিজ্ঞতা ছিল না। কোন দূরদর্শী অভিজ্ঞ লোকের মন্ত্রণায় পরিচালিত হইলে, নবাব এখনও ইংরেজদিগের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া আপনাকে নিরাপদ করিতে পারিতেন। তিনি মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাইয়াছিলেন। এই প্রমাণ পাইয়াই সেই বিশ্বাসঘাতককে দণ্ডিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। নবাব যদি আপনার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিয়া তুলিতেন, মীরজাফর যদি তাঁহার আদেশে দণ্ডিত ও নির্ব্বাসিত হইতেন, তাহা হইলে তিনি অনায়াসেই আপনার বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া বিদেশী বণিকদিগের আক্রমণ নিরস্ত করিবার সুবিধা পাইতেন। কিন্তু বুদ্ধির চাঞ্চল্য প্রযুক্ত নবাব প্রতিমুহূর্ত্তে এক সঙ্কল্প ছাড়িয়া অন্য সঙ্কল্প অনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। এ সময়ে কোন দূরদর্শী ব্যক্তি তাঁহাকে সৎপথ দেখাইয়া দেন নাই। তাঁহার বিশালরাজ্যের শাসন-ভার যাঁহাদের হস্তে সমর্পিত ছিল, তাঁহারা পর্য্যন্ত এসময়ে তাঁহার উচ্ছেদ-সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। গভীর আশঙ্কার তীব্র জ্বালা হতভাগ্য নবাবকে প্রতিমুহূর্ত্তে বিচলিত করিয়া তুলিত। তিনি একবার যাহা ভাল বুঝিতেন, আর একবার তাহাই অনিষ্টের হেতুভূত বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং তাঁহার অভিসন্ধি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইত। তিনি মীরজাফরকে দণ্ডিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এখন ওয়াট্‌স্‌ সাহেবের পলায়নে ভীত হইয়া মীরজাফরের প্রতি সদ্ভাব দেখাইয়া তাঁহাকে আপনার পক্ষে আনিতে উদ্যত হইলেন। মীরজাফরের সহিত নবাবের সাক্ষাৎ হইল। মীরজাফর মুখে স্বীকার করিলেন যে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তিনি ইংরেজদিগের কোনও রূপ সাহায্য করিবেন না; নবাব স্বীকার করিলেন যে শান্তি স্থাপিত হইলে, তিনি মীরজাফরকে তাঁহার পরিবারবর্গ ও সম্পত্তি সঙ্গে লইয়া নিরাপদে স্থানান্তরে যাইতে অনুমতি দিবেন।

মীরজাফরের আশ্বাসবাক্যে নবাবের ভয় দূর হইল; কিন্তু যে একবার বিশ্বাসঘাতক বলিয়া পরিচিত হইয়াছে, সে আপনার অঙ্গীকার কতদূর রক্ষা করিবে, নবাব তাহা বুঝিলেন না। তিনি সরলভাবে সকলকেই বিশ্বাস করিতেন; যাহার মুখে মিষ্ট কথা শুনিতেন; তাহাকেই বিশ্বাসী ও আত্মীয় ভাবিতেন;

বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরকেও তিনি এখন হিতৈষী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। মীরজাফরের আশ্বাস বাক্যে তাঁহার হৃদয় শান্ত হইল, সাহস বৃদ্ধি পাইল; ক্লাইব তাঁহার নিকট যে শেষ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পঁহুছিবার পূর্ব্বেই তিনি ক্লাইবের নিকট একখানি পত্র পাঠাইলেন। অসময়ে ও তাঁহার অজ্ঞাতসারে ওয়াট্‌স্‌ সাহেব পলাইয়া যাওয়াতে এই পত্রে তিনি ক্লাইবকে ভর্ৎসনা করিলেন, এবং কহিলেন যে তাঁহার অসদ্ব্যবহার ও তাঁহার সন্দেহ প্রযুক্ত তিনি এখন পর্য্যন্ত পলাসীতে আপনার সৈন্য রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই পত্র পাঠাইবার পর নবাব তাঁহার নিজের ও মীরজাফরের সমস্ত সৈন্য পলাসী যাত্রা করিবার আদেশ দিলেন, এবং ফরাসি সেনাপতি লকে তাঁহার সাহায্যার্থ ভাগলপুর হইতে আসিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। ১২শে জুন নবাবের সমস্ত সৈন্য পলাসীর অভিমুখে যাত্রা করিল।

এদিকে ইংরেজেরা অগ্রসর হইতেছিলেন। ১৭ই জুন ক্লাইব দুই শত ইউরোপীয় ও পাঁচ শত দেশীয় সৈন্য সহ সেনাপতি আইয়ার কূট সাহেবকে কাটোয়ার দুর্গ অধিকার করিতে পাঠাইলেন। এই দুর্গটি মৃত্তিকায় নির্ম্মিত। নবাবের কর্ম্মচারীরা প্রায় সকলেই বিশ্বাসঘাতক ছিলেন। উপস্থিত সময়ে নবাবের কাটোয়ার দুর্গের সেনাপতিও বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি বিনা যুদ্ধে দুর্গ হইতে প্রস্থান করিতে প্রতিশ্রুত হন, কূট সৈন্য সহ উপস্থিত হইলে, দুর্গাধ্যক্ষ মুখে তাঁহাকে বাধা দিবার ভয় দেখাইলেন বটে, কিন্তু কার্য্যে কিছুই করিলেন না। দুর্গাধ্যক্ষ দুর্গ ছাড়িয়া প্রস্থান করিলেন। দুর্গ সহজেই কূটের হস্তগত হইল। এই দুর্গে এত শস্য সঞ্চিত ছিল যে, তাহাতে ১০ হাজার লোকের একবৎসরের আহারের সংস্থান হইতে পারিত। সেনাপতি সমস্ত শস্য-সম্পত্তি অধিকার করিলেন। যে বিশ্বাস ঘাতকতার ফলে পলাসির প্রান্তরে হতভাগ্য সিরাজের অধঃপতন ঘটে, কাটোয়াতে তাহার সূত্রপাত হইল।

মীরজাফর, নবাবের সহিত তাঁহার পুনর্ম্মিলনের সংবাদ ক্লাইবকে জানাইয়াছিলেন। তিনি যে, ইংরেজদিগের কোনও সাহায্য করিবেন না বলিয়া নবাবের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, ক্লাইবকে তাহাও লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ইংরেজদিগের নিকট যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছেন তাহা পালন করিতে যে, উদাসীন হইবেন না, তাহা পত্রের

শেষে স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করেন। যে ব্যক্তি নিজে বিশ্বাসঘাতক সে যে অপরের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না, তাহার স্থিরতা নাই; সুতরাং ক্লাইব মীরজাফরের কথায় বড় একটা সুস্থির হইলেন না। ইহার পর মীরজাফরের আর একখানি পত্র তাঁহার নিকট পেঁাছিছিল। এই পত্র ১৯শে জুন লিখিত হয়। মীরজাফর এই পত্রে উল্লেখ করেন যে তিনি সেই দিনই পলাসিতে যাইতেছেন। সৈন্যগণের দক্ষিণভাগে তিনি অবস্থিতি করিবেন। কিন্তু তাঁহার নিজের ও নবাবের সৈন্যের বূহ রচনার সম্বন্ধে কোন কথা পত্রে লেখা হইল না; অধিকন্তু মীরজাফর কি ভাবে ইংরেজদিগের সাহায্য করিবেন, তাহাও কিছু খুলিয়া বলিলেন না। এই পত্র পাইয়া ক্লাইবের হৃদয় কিছু শান্ত হইল বটে, কিন্তু তিনি এখনও ইতস্তত করিতে লাগিলেন। অল্পমাত্র সৈন্য লইয়া নবাবের বহুসংখ্য সৈন্য আক্রমণ করা যে, কতদূর অসমসাহসের কার্য্য, তাহা তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন। এখন নানা আশঙ্কায় তিনি বিচলিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার যথোচিত সাহস ও উদ্যম ছিল; কিন্তু তিনি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, বিশ্বাসঘাতকদিগের সহিত যেরূপ গুরুতর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন এবং আপনি নানারূপ চাতুরী ও বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়া যেরূপ দুরূহ কার্য্য-সাধনে অগ্রসর হইতেছেন, তাহাতে নানা দুশ্চিন্তা আসিয়া তাঁহার শান্তির ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। মীরজাফর তাঁহার সাহায্য করিবেন কিনা, তাহা এখনও তিনি ভালরূপ বুঝিতে পারেন নাই। যে নিজে বিশ্বাসঘাতক, সে একজনের নিকট কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া পরক্ষণে যে তাহার অন্যথাচরণ করিবে না,—তাহারই বা প্রমাণ কি? ক্লাইব কেবল ইহাই ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি উপস্থিত বিষয়ে আপনার সতীর্থদিগের সহিত পরামর্শ করিতে উদ্যত হইলেন। অবিলম্বে সমরসংক্রান্ত মন্ত্রণা-সভার অধিবেশন হইল। ২০ জন ইংরেজ সৈনিকপুরুষ এই সমিতিতে উপস্থিত হইয়া কর্ত্তব্য অবধারণে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্লাইব উপস্থিত সভ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহাদের সৈন্যগণ এখনই ভাগীরথী পার হইয়া নবাবের সৈন্য আক্রমণ করিবে, কি কাটোয়ার দুর্গে যে সকল শস্য পাওয়া গিয়াছে, তাহাই সম্বল করিয়া বর্ষাকালের শেষ পর্য্যন্ত কাটোয়ায়

অবস্থিতি করিবে এবং ইহার মধ্যে মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট সাহায্যপ্রাপ্তির বন্দোবস্ত করা হইবে? ক্লাইব অপরাপর সভ্যদিগের অভিমত প্রকাশের পূর্ব্বেই কাটোয়ায় থাকা উচিত বলিয়া নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু সেনাপতি আইয়র কূট এই প্রস্তাবের বিরোধী হইয়া উঠিলেন। তিনি কহিলেন যে, ইহাতে সময় পাইয়া ফরাসি সেনাপতি ল নবাবের সহিত মিলিত হইবেন। তাঁহার মতে অবিলম্বে নবাবের সৈন্য আক্রমণ করা উচিত। যদি কাটোয়ায় থাকিতে হয়, তাহা হইলে তিনি একেবারে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার প্রস্তাব করিতে পারেন; কিন্তু ইহাতে ইংরেজ জাতির নামে কলঙ্ক স্পর্শিবে এবং ইংরেজ কোম্পানির স্বার্থেরও ব্যাঘাত জন্মিবে। ৬ জন সৈনিকপুরুষ সেনাপতি কূটের পক্ষ সমর্থন করিলেন। সমর সমিতিতে উভয় পক্ষের তর্ক বিতর্ক শেষ হইল, কিন্তু ক্লাইবের চিন্তা দূর হইল না। ক্লাইব একাকী কিয়দ্দূরে বৃক্ষশ্রেণীর ছায়ায় বসিয়া আবার গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া যাওয়া ভাল, কি কাটোয়ায় থাকা উচিত, ক্লাইব কেবল মনে মনে এই প্রশ্নের আন্দোলন করিতে লাগিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা কাল গভীর চিন্তার পর সমুদয় বিষয়ের মীমাংসা হইল। ক্লাইব শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। পথে তাঁহার সহিত সেনাপতি কূটের সাক্ষাৎ হইল। তিনি কূট সাহেবকে কহিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্ব সঙ্কল্প দূর হইয়াছে। ক্লাইব এই কথা মাত্র বলিয়া শিবিরে আসিলেন, এবং পরদিন প্রাতঃকালে সকলকে ভাগীরথী পার হইতে হইবে,—এই আদেশ-লিপি লিখিতে বসিলেন। আদেশ-লিপি লিখিত হইল। ২২শে জুন প্রাতঃকালে চতুর চূড়ামণির আদেশে সমস্ত ইংরাজ সৈন্য কাটোয়া হইতে পলাশীর অভিমুখে অগ্রসর হইল।

---

# নাচত ময়ূর।

১

নাচত ময়ূর তুমি নাচ ত ময়ূর।

চঞ্চলা চপলা বালা, মেঘ সনে করে খেলা,

চেঁচায় পাগল পারা দাম্ভিক দর্দ্দুর।

সুমধুর কেকারব কর ত ময়ূর।

চিকুকের ঝন্ঝনি, শুনিয়া প্রমাদ গণি,
মার কোলে কাঁদে শিশু ভয়েতে আতুর,
নাচ ত, পাইবে শিশু প্রমোদ প্রচুর।

২

নাচ ত ময়ূর তুমি পেখম খুলিয়া,
দেখিয়া মোহন চাঁদ ঝলমল কোটি চাঁদ
নীরদের স্নিগ্ধ মন যাইবে ভুলিয়া,
যাবে না কোথাও বায়ু বাহনে ছুলিয়া।
দেখিয়া বিচিত্র শোভা, মুনির মানসলোভা,
বৃষ্টিছলে মেঘদেহ যাইবে গলিয়া,
শস্য প্রসূ হবে রসা সে রসে মাতিয়া।

৩

নাচ ত ময়ূর তুমি ঘাড় উঁচু করি,
অহিভূক্ বিহঙ্গম, সে কি এত মনোরম,
এই ভেবে ঈর্ষাভরে মলিনা শর্ব্বরী
গৌরবে গলায় পরে তারার ন'নরী।
সমুজ্জ্বল পীতবর্ণ খাদ পরিহীন স্বর্ণ
তারাহারে বিভূষিতা হয়ে বিভাবরী
মনে করে তার মত নাহিক সুন্দরী।

৪

নাচ ত ময়ূর তুমি দেখুক রজনী,
কি ছার সোণার জরি, করে সে কাফ্রি নারী,
তোমার কলাপে কত নীলকান্ত মণি!
অমন পালিস্ পায়া পায় না রজনী।
ভূপতির পাটরাণি, হয়োনা'কো অভিমানী,
সংখ্যায় গণিত লয়ে গোটাকত মণি,
বনের বিহঙ্গ অঙ্গে মাণিকের খনি

৫

নাচ ত ময়ূর তুমি দোলায়ে চরণ
সম্পৎ ত্যজিয়া শূলী, সার করি ভিক্ষা ঝুলি,

ছাই মাখি গায়ে, পরি হাড়ের ভূষণ,
তথাপি তোমার রূপে মুগ্ধ ত্রিলোচন;
কালকূট পানে নয়, নীলকণ্ঠ মৃত্যুঞ্জয়,
শোভায় সাধের সাধ উমা-বিমোহন
নীলকণ্ঠ, নীলকণ্ঠ করেন ধারণ।

৬

নাচ ত ময়ূর তুমি হেলায়ে শরীরে,
দুর্লভ কৌস্তভ ভুলে, ভ্রমি কালিন্দীর কূলে,
গোপবেশী বিষ্ণু যারে তুলেছেন শিরে,
নাচুক সে জন পূর্ণ-প্রমোদ গভীরে।
অনুকারি যার পুচ্ছ, অন্য ভূষা করি তুচ্ছ,
চক্ষুময় হন ইন্দ্র সকল শরীরে,
করুক সে গর্ব্ব-হারা উর্ব্বশী নটীরে।

৭

নাচ ত ময়ূর তুমি দেমাকের ভরে।
আসমুদ্র হিমাচল, ছিল যার করতল
প্রবল প্রতাপ সেই দিল্লীর ঈশ্বরে,
দেখাতে মহিমা নিজ সামন্ত নিকরে,
তক্ত তাউসেতে বসি, মনে বড় ছিল খুসি,
সাহজাঁহা জানিত না কি ঘটিবে পরে!
ময়ূরে কার্ত্তিক বিনা কে চড়িবে পরে?

৮

নাচ ত ময়ূর তুমি নাচ ত ময়ূর।
তোমারে দেখিয়া পাখি, ভাবে বিমোহিত থাকি,
খানিক মনের জ্বালা করি আমি দূর,
শোকতাপে চিত্ত মম বড়ই বিধুর।
শোভারাশি একাধারে, দেখিয়া সে বিধাতারে
নির্ম্মাণ-নৈপুণ্য তবে বাখানি প্রচুর।
নাচ ত ময়ূর তুমি নাচ ত ময়ূর।

# ধ্রুব।

হিন্দু আজ উৎসন্নপ্রায়। আজিকার দিনে ধ্রুব-কথা কওয়া ভাল—ধ্রুব-কথা কওয়া আবশ্যক। হিন্দুর পুরাণে ধ্রুব-কথা বড়ই অপূর্ব্ব।

উত্তানপাদ রাজার সুরুচি ও সুনীতি নামে দুই মহিষী ছিলেন। রাজা সুরুচিকে যত ভাল বাসিতেন, সুনীতিকে তত বাসিতেন না। রাজার সুরুচির গর্ভে এক পুত্র হয়, তাহার নাম উত্তম, এবং সুনীতির গর্ভে এক পুত্র হয়, তাহার নাম ধ্রুব। একদিন রাজা উত্তমকে কোলে করিয়া সিংহাসনে বসিয়া আছেন, এমন সময় ধ্রুব তথায় আসিল এবং ভাইকে পিতার কোলে বসিয়া খেলা করিতে দেখিয়া আপনিও পিতার কোলে উঠিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু সুরুচি ঠাকুরাণী তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন। অতএব সুরুচির ভয়ে রাজা ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া লইতে পারিলেন না। ইহা দেখিয়া সুরুচি ধ্রুবকে বলিলেন—'যে কোলে তুমি উঠিতে চাহিতেছ, সে কোলে উঠিবার যোগ্য তুমি নহ। পৃথিবীর মধ্যে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চক্রবর্ত্তী, কেবল সেই সে কোলে উঠিবার যোগ্য। তুমি যদি আমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিতে, তাহা হইলে ঐ কোলে উঠিতে পারিতে। ঐ রাজসিংহাসন সম্রাটের স্থান। আমার পুত্র উত্তমই ঐ স্থানের অধিকারী এবং উপযুক্ত। সুনীতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া কোন্ সাহসে তুমি ঐ উচ্চস্থান অধিকার করিতে ইচ্ছা করিতেছ?' বিমাতার তিরস্কার বালক ধ্রুবের বুকে লাগিল। বালক ক্রুদ্ধ হইয়া মাতার কাছে গেল এবং তাঁহাকে সকল কথা বলিল। দুঃখিনী সুনীতির প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। চিরকাল দুঃখভোগ করিয়া তিনি সকল দুরাশা পরিত্যাগ করিতে শিখিয়াছিলেন। অতএব তিনি বালক ধ্রুবকে দুঃখ করিতে নিষেধ করিলেন। এবং বলিলেন যে, লোকে পুণ্যফলে রাজসিংহাসন, রাজছত্র, অতুল ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি লাভ করে। তোমার পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি ছিল না বলিয়া এ জন্মে তোমার ভাগ্যে রাজপদ ও অতুল ঐশ্বর্য্য হইল না। অতএব তোমার যে অবস্থা তাহাতেই তোমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

পুণ্যোপচয় সম্পন্নস্তস্যাঃ পুত্রস্তবোত্তমঃ।
মমাপুত্রস্তথাজাতঃ স্বল্পপুণ্যো ধ্রুবোভবান্॥
তথাপি দুঃখং ন ভবান্ কর্ত্তুমর্হতি পুত্রক।
যস্য যাবৎ স তেনৈব স্বেনতুষ্যতি বুদ্ধিমান্॥

মানুষের এ জন্মের অবস্থা তাহার পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের ফল। অতএব আপনার কর্ম্মফলে যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। ইহা অদৃষ্টবাদীর কথা। সুনীতি হিন্দুরমণী। হিন্দুরমণী অদৃষ্টবাদিনী। তাই সুনীতি এই কথা বলিলেন। কিন্তু যে অদৃষ্ট মানে তাহার কি অবস্থান্তরের আশা নাই? আছে বৈকি। সুনীতি বলিলেন:—

যদি বা দুঃখমত্যর্থং সুরুচ্যা বচসা তব।
তৎপুণ্যোপচয়ে যত্নং কুরু সর্ব্বফল প্রদে॥
সুশীলো ভব ধর্ম্মাত্মা মৈত্রঃ প্রাণিহিতে-রতঃ।
নিম্নং যথাপঃ প্রবণাঃ পাত্রমায়ান্তি সম্পদঃ॥

অথবা যদি সুরুচির বাক্যে তোমার মনোমধ্যে অতিশয় দুঃখ বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাহাতে সকল প্রকার অভীষ্ট ফল পাওয়া যায় এরূপ পুণ্যসঞ্চয়ে যত্নবান হও। এবং সুশীল, ধর্ম্মাত্মা ও সর্ব্বপ্রাণীর হিতানুষ্ঠানে রত হইয়া সকলের প্রতি বন্ধুবৎ ব্যবহার করিতে আরম্ভ কর, কারণ জল যেমন নিম্নাভিমুখেই গমন করে, সেইরূপ সকল ঐশ্বর্য্যই সৎপাত্রের প্রতি ধাবমান হইয়া থাকে।

(শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কারের অনুবাদ।)

কর্ম্মদোষে বা পুণ্যাভাবে দুরবস্থা হইলে সেই দুরবস্থা হইতে যে নিষ্কৃতি নাই তা নয়। সৎকর্ম্ম করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিলে অবশ্যই উত্তম অবস্থা লাভ করা যায়। একবার পাপ করিলে তজ্জন্য যে অধোগতি হয় তাহা অপরিবর্ত্তনীয় নয়। অদৃষ্টবাদের এমন অর্থ নয় যে, মানুষের ভাগ্যে যাহা একবার ঘটে তাহার ভাগ্যে তাহা চিরকালই থাকিয়া যায়, কখনই সে তাঁহা ছাড়াইতে পারে না। তাই অদৃষ্টবাদিনী সুরুচি পুত্র ধ্রুবকে বলিলেন—পুণ্যসঞ্চয় কর, একদিন না একদিন অবশ্যই মনোমত পদ ও সম্মান প্রাপ্ত হইবে। অতএব এক প্রকার কর্ম্মের ফল অন্য প্রকার কর্ম্মের দ্বারা অতিক্রম করা যায়। তবেই বুঝিতে হইতেছে যে কোন একটি কর্ম্মফল হইতে একেবারেই যে নিষ্কৃতি নাই তা নয়। ভিন্নরূপ কর্ম্ম করিয়া

মানুষ আবার সেই ভিন্ন কর্ম্মের ফলভোগী হয় এবং এই প্রকারে পূর্ব্ব কর্ম্মফল হইতে মুক্তিলাভ করে। অতএব কোন একটি কর্ম্মফল ভোগ করিবার সময় সেই কর্ম্মফল হইতে মুক্তিলাভ করণার্থ ভিন্ন রকম কর্ম্ম করিতে যে চেষ্টা বা উদ্যম আবশ্যক, তাহা মনুষ্যের সাধ্যাতীত নয়। অর্থাৎ কর্ম্মফল অথবা যাহাকে চলিত কথায় অদৃষ্ট বলে তাহা অত্যজ্য, অনন্ত-কালস্থায়ী বজ্রনিগড় নয়। ইউরোপীয় দার্শনিকেরা যে অদৃষ্টবাদকে ভীষণ Eastern fatalism বলিয়া থাকেন, সে অদৃষ্টবাদ হিন্দুশাস্ত্রে নাই।

সুনীতির কথা ধ্রুবের মনে ধরিল না। সুনীতির কথামত চলিতে গেলে ধ্রুবকে তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিয়া তবে ইহজন্মের পুণ্যফলস্বরূপ উৎকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়। ধ্রুব তাহা করিতে অস্বী-কৃত হইলেন। তাহা করিলে তাঁহার ত আবার কর্ম্মেরই ফলভোগ করা হইল, কর্ম্মের গুণেই উৎকৃষ্ট পদলাভ করা হইল, তাঁহার নিজের কি করা হইল, তাঁহার নিজের গুণে কি পাওয়া হইল? ধ্রুব পুরুষকারের পূর্ণ অবতার। তিনি মাতাকে স্পষ্টই বলিলেন:—

অম্ব! যৎত্বমিদংপ্রাহ প্রশমায় বচো মম।
নৈতদ্ দুর্ব্বচসা ভিন্নে হৃদয়ে মম তিষ্ঠতি॥
সোঽহং তথা যতিষ্যামি যথা সর্ব্বোত্তমোত্তমম্।
স্থানং প্রাপ্স্যাম্য শেষাণাং জগতামপি পূজিতম্॥
সুরুচির্দ্দয়িতা রাজ্ঞস্তস্যা জাতোঽস্মি নোদরাৎ।
প্রভাবংপশ্য মে হম্ব! বৃদ্ধস্যাপি তবোদরে॥
উত্তমঃ স মম ভ্রাতা যো গর্ভেন ধৃতস্তয়া।
স রাজাসনমাপ্নোতু পিত্রাদত্তং তথাস্তু তৎ॥
নান্য দত্তমভীপ্সামি স্থানমম্ব স্বকর্ম্মণা।
ইচ্ছামি তদহংস্থানং যন্ন প্রাপ পিতা মম॥

(বিষ্ণুপুরাণ প্রথম অংশ, ১২ অ—২৪-২৮।)

জননি! তুমি আমার সান্ত্বনার নিমিত্ত যে সকল কথা বলিলে, তাহা আমার হৃদয়ে স্থান পাইতে পারিতেছে না, কারণ বিমাতার দুর্ব্বাক্যে আমার হৃদয় একেবারে বিদীর্ণপ্রায় হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমি যাহাতে নিখিল জগতের পূজ্য ও সকলের শ্রেষ্ঠতম স্থান প্রাপ্ত হই, তদ্বিষয়ে যত্নবান হইব। রাজা আমার বিমাতা সুরুচিকে ভাল বাসেন, আমি তাঁহার

উদরে জন্মি নাই, তোমার উদরে জন্মিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু জননি! আমার কিরূপ প্রভাব দেখ। আমার ভ্রাতা উত্তমকে তুমি গর্ভে ধারণ কর নাই, পিতা তাহাকে রাজসিংহাসন প্রদান করুন, সে পৃথিবীর সম্রাট হউক, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। মাতঃ! যাহা অন্যে দিবে, এরূপ পদ আমি চাই না। যাহা আমার পিতাও প্রাপ্ত হন নাই, স্বীয় পুণ্য দ্বারা এরূপ শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিতে ইচ্ছা করি।

(শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কারের অনুবাদ।)

কি অভিমান! কি তেজ! কি আকাঙ্ক্ষা! কি সাহস! কি বিক্রম! রাজ্য চাই না, রাজ্য ত তুচ্ছ জিনিস। সম্রাট হইতে চাই না, সম্রাট হওয়া ত তুচ্ছ কথা। চাই অনন্ত বিশ্বের পূজ্য হইতে, অনন্ত বিশ্বের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান পাইতে, যে স্থান পিতা পিতামহ কেহ কখনও পান নাই, চাই সেই স্থান পাইতে! আর সে স্থান কাহারো কাছে ভিক্ষা চাই না, স্নেহের বা অনুগ্রহের দান স্বরূপ চাই না আপনার তেজে, আপনার ক্ষমতায়, আপনার প্রভাবে আপনি করিয়া লইতে চাই। ইহাকেই বলে পূর্ণ পুরুষত্ব, ইহাকেই বলে পুরুষকারের পূর্ণমাত্রা। এই অপূর্ব্ব পুরুষকার লইয়া ধ্রুব আর একটি মাত্র কথা না কহিয়া বনে গমন করিলেন। বনে কয়েকটি ঋষির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাদিগকে মনের কথা খুলিয়া বলিলেন। তাঁহারা সকলেই বলিলেন যে, বিষ্ণুকে পরিতুষ্ট করিতে পারিলে সকল অভিলাষই পূর্ণ হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন করিয়া বিষ্ণুকে পরিতুষ্ট করা যায়। তাঁহারা তাঁহাকে যোগ প্রণালী বুঝাইয়া দিলেন। যোগ প্রণালী শিখিয়া তিনি আর একটি বনে গমন করিয়া এক পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া যোগে ভগবানকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ভগবান তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন। তখন ক্ষুদ্র বালকের পদভরে সসাগরা পৃথিবী বিকম্পিত হইয়া উঠিল, নদ নদী সমুদ্র বিক্ষোভিত হইল, পৃথিবী যায় যায় হইল। দেবতারা ভয়ে আকুল হইয়া তাঁহার যোগ ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মায়া প্রভাবে যোগমগ্ন বালক দেখিলেন যে তাঁহার দুঃখিনী মাতা অতি কাতরভাবে তাঁহার কাছে আসিয়া অতিশয় করুণস্বরে তাঁহাকে সেই উৎকট তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিতেছেন। ধ্রুব দেখিয়াও দেখিলেন না, শুনিয়াও শুনিলেন না। তখন দেবতারা তাঁহাকে নানাপ্রকার ভয় দেখাইতে লাগিলেন। পিশাচরূপ ধারণ করিয়া

তাঁহারা দলে দলে ধ্রুবের সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিলেন এবং ভীষণ অস্ত্র সকল ঘুরাইতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে অসংখ্য শৃগাল আসিয়া ভীষণ শব্দ করিতে লাগিল। শব্দ করিবার সময় তাহাদের মুখ হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল। কিন্তু সমস্ত বিভীষিকাই নিষ্ফল হইল। যোগমগ্ন বালক যোগেই মগ্ন রহিলেন। তখন ভগবান হরি সেই বালকের তন্ময়তা দেখিয়া পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার অভিলষিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধ্রুবলোক প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সকল লোকই সেই ধ্রুবলোক দেখিয়া—সেই ধ্রুবলোক ধরিয়া—ভবসাগরে পাড়ি দিতেছে, কেবল আমরাই দিই না! তাই আজ আমরা পৃথিবীতে এত হেয়।

ধ্রুবের অসাধারণ পুরুষকার আমাদের নাই—তাই আমরা মনুষ্য মধ্যে এত হীন হইয়া পড়িয়াছি। তুমি বলিবে, যে অদৃষ্ট বা কর্ম্মফল মানে, সে পুরুষকারের কথা কয় কেমন করিয়া? উত্তর—কর্ম্মফলের অর্থ এই যে, মন্দ কর্ম্ম করিলে মন্দ অবস্থায় থাকিতে হয়। কারণ স্বভাবচরিত্র মন্দ না হইলে লোকে মন্দ কর্ম্ম করে না। এবং মন্দ কর্ম্ম করিলে মন্দ স্বভাবচরিত্র আরো মন্দ হইয়া যায়। স্বভাবচরিত্র মন্দ হইলে মানুষ ভাল অবস্থায় থাকিবার যোগ্য হয় না, মন্দ অবস্থায় থাকিবারই যোগ্য হয়। মন্দের সহিত মন্দেরই মিল হয়, ভালর মিল হয় না। যে দুষ্কর্ম্ম করিয়া আপন স্বভাব চরিত্র মন্দ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার মন্দ কর্ম্মের দিকেই স্বভাবত ঝোঁক হয় এবং সেই জন্য তাহাকে জোর করিয়া সুখ সচ্ছন্দের অনুকূল অবস্থায় রাখিলেও সে শীঘ্র সে অবস্থাকে সুখ সচ্ছন্দের প্রতিকূল করিয়া তুলে। এ কথার প্রমাণ আমাদের দেশে বোধ হয় এখন প্রতি ঘরেই পাওয়া যায়। এই জন্যই শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হয়। এবং এই জন্যই মহাভারতে ধর্ম্মব্যাধের মুখে শুনিতে পাই যে মাংস বিক্রয় রূপ নৃশংস কর্ম্ম ছাড়িয়া দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সে সে কর্ম্ম ছাড়িয়া দিতে পারে নাই।* বদ্ধমূল স্বভাব ও সংস্কারকে পরাজয় বা বিনষ্ট করা বড়ই কঠিন। অতএব বদ্ধমূল স্বভাব ও সংস্কারের সহিত যে অবস্থার মিল থাকে, সেই অবস্থা ভোগ করাই সৃষ্টির নিয়মসঙ্গত। অতএব কর্ম্মফলবাদ ও নিয়মবাদ একই কথা। আচ্ছা, তাই যদি হইল, তবে আবার

* মহাভারত, বনপর্ব্ব মার্কণ্ডেয় সমস্যাপর্ব্বাধ্যায়, ২০৭ অধ্যায়।

পুরুষকারের কথা কেন? পুরুষকারের দ্বারা কর্ম্মফল অতিক্রম করিবার কথা কেন? কথা এইজন্য যে, নিয়ম অব্যর্থ হইলেও নিয়মের দ্বারা নিয়ম রোধ করা যায় এবং নিয়মের দ্বারা নিয়ম রোধ করাও একটি নিয়ম। অগ্নি বস্ত্রকে দগ্ধ করে, ইহা একটি স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু যে বস্ত্র অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে, তাহাতে জল ঢালিয়া দিলে অগ্নি আর তাহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, কেননা অগ্নিতে জল দিলে অগ্নি থাকে না এবং অগ্নির কার্য্যও থাকে না, ইহাও একটি স্বাভাবিক নিয়ম। অতএব নিয়মের দ্বারা নিয়ম রোধ করা যায়। এবং সেইজন্য নিয়মের দ্বারা নিয়ম রোধ করাও একটি স্বাভাবিক নিয়ম। সেইরূপ কর্ম্মদোষে মন্দ অবস্থা ভোগ করা যেমন একটি স্বাভাবিক নিয়ম, তেমনি মন্দ অবস্থায় থাকিয়া চেষ্টা ও যত্ন করিয়া স্বাভাবচরিত্র সংশোধন করিয়া মন্দ অবস্থার পরিবর্ত্তে ভাল অবস্থা লাভ করিতে পারাও একটি স্বাভাবিক নিয়ম। সেই চেষ্টা ও যত্নের নাম পুরুষকার। অতএব পুরুষকারের দ্বারা কর্ম্মফল অতিক্রম করা যাইতে পারে এবং পুরুষকারের দ্বারা কর্ম্মফল অতিক্রম করা একটি স্বাভাবিক নিয়ম। চেষ্টা বা পুরুষকার দ্বারা যে মন্দ স্বভাবকে বিনষ্ট করিয়া ভাল স্বভাব লাভ করিতে পারা যায় এবং সেই ভাল স্বভাব লাভের ফলস্বরূপ মন্দ অবস্থার পরিবর্ত্তে যে ভাল অবস্থা লাভ করিতে পারা যায়, ইহা যুক্তিদ্বারা সহজেই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। কিন্তু সেরূপ করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। অনেক লোককে আপন আপন চেষ্টা দ্বারা মন্দ স্বভাব ত্যাগ করিয়া ভাল স্বভাব লাভ করিতে এবং মন্দ অবস্থার পরিবর্ত্তে ভাল অবস্থা প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়—ইহাই এ কথার যথেষ্ট এবং অতি উৎকৃষ্ট প্রমাণ। মানুষের ভাল মন্দ দুই রকম হইবারই প্রবৃত্তি আছে। সেই দুই প্রবৃত্তিই মানব প্রকৃতির অন্তর্গত। মানুষ ভাল হইলেও যেমন তাহার মন্দ প্রবৃত্তিকে উৎসাহিত করিয়া মন্দ হইবার ক্ষমতা আছে, তেমনি মন্দ হইলেও ভাল হওয়ার উপকারিতা কোন রকমে বুঝিতে পারিলে ভাল প্রবৃত্তিকে উৎসাহিত করিয়া ভাল হইবার ক্ষমতাও তাহার আছে। মানুষের এই ক্ষমতাকেই আমরা পুরুষকার বলি, ইংরাজেরা free will (স্বাধীন ইচ্ছা) বা will power (ইচ্ছাশক্তি) বলেন। উপদেশ উত্তেজনা লাভালাভ বোধ প্রভৃতি নানা কারণে মানুষ এই ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া থাকে এবং সেই সকল কারণ ব্যতীত এই ক্ষমতার পরিচালনা হয় না। কিন্তু কারণ ব্যতীত এ ক্ষমতার পরিচালনা হয় না বলিয়া এ ক্ষমতা কে মানুষের

স্বভাব চরিত্র ও অবস্থা নিয়মিত করিবার পক্ষে প্রভূত পরিমাণে কার্য্যকরী নয়, তা নয়। কারণ সাপেক্ষ হইলেও মানুষের পুরুষকার মানুষের একটি ব্রহ্মাস্ত্র। ব্রহ্মঅস্ত্র বলিয়া পুরুষকার এত মহামূল্য সামগ্রী। কারণ ব্যতীত সে ব্রহ্ম অস্ত্র চলে না বলিয়া, কি তাহার কোন মূল্য বা কার্য্যকারিতা নাই? মাংসপেশীর সহিত হস্তস্থিত অসি চালনা করিতে হয় বলিয়া কি অসির কোন মূল্য বা কার্য্যকারিতা নাই? তাই ইংরাজিওয়ালাদিগকে বলি যে মানুষের will বা পুরুষকার free বা স্বাধীন হউক আর নাই হউক, উহা মানুষের মহা কার্য্যকরী মহামূল্য অস্ত্র। তাহা হইলেই হইল, মানুষের আর কিছু চাই না। অতএব মানুষ কর্ম্মফল ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াও নিজের চেষ্টা বা পুরুষকারের বলে সে কর্ম্মফল অতিক্রম করিতে পারে একথায় কিছুমাত্র অসঙ্গতি বা অযৌক্তিকতা নাই। কিন্তু তাহাই যদি হয়, তবে কেমন করিয়া বলি যে হিন্দুশাস্ত্রকারের অদৃষ্টবাদানুসারে মানুষ সম্পূর্ণরূপে অবস্থার দাস এবং মন্দ অবস্থাকে ভাল অবস্থায় পরিণত করিতে একেবারেই অক্ষম? না, তেমন কথা বলিবার যো নাই। হিন্দু শাস্ত্রকারের মুক্তিবাদ বুঝিয়া দেখিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে ইউরোপীয় দার্শনিকেরা যাহাকে Oriental fate বা এতদ্দেশীয় অব্যর্থ অদৃষ্ট বা বিধিলিপি বলিয়া থাকেন হিন্দুশাস্ত্রানুসারে তাহা একেবারেই অসম্ভব। হিন্দু শাস্ত্রকারের মুক্তিবাদের অর্থ এই যে, সকল মনুষ্যকেই নিকৃষ্ট বা অধম মায়াময় প্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট বা সর্ব্বোত্তম ঈশ্বর-প্রকৃতি লাভ করিয়া ঈশ্বরে লীন হইয়া মুক্তি লাভ করিতে হইবে। মানুষ যদি অধম অবস্থার দাস হইত অর্থাৎ মানুষের যদি অধম অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া উত্তম অবস্থা লাভ করিবার শক্তি বা পুরুষকার না থাকিত, তবে ত হিন্দু শাস্ত্রকার তাহার জন্য মুক্তিব্যবস্থা করিতে পারিতেন না এবং হিন্দুশাস্ত্রে মুক্তিবাদ থাকিত না। হিন্দু শাস্ত্রকারের মতে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যে প্রকার সম্বন্ধ, তাহাতে জীবাত্মাকে পরমাত্মায় লীন হইতেই হইবে—এক জন্মে না হয় দশ জন্মে, এক যুগে না হয় দশ যুগে, দশ যুগে না হয় দশ কল্পে—পরমাত্মায় লীন হইতেই হইবে, অর্থাৎ নিকৃষ্ট অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট অবস্থা লাভ করিতেই হইবে। নহিলে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যে সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ মিছা হইয়া যায় এবং পরমাত্মার পূর্ণআত্মত্বও থাকে না। জীবাত্মার আপন ক্ষমতায় অধম অবস্থা অতিক্রম করিয়া উত্তম অবস্থা লাভ না করিলেই

নয়। আপন চেষ্টায় উন্নতি—ইহা ব্যতীত হিন্দুশাস্ত্রকারের সৃষ্টিতত্ত্ব মিছে হয়, পরমাত্মতত্ত্ব মিছে হয়, মুক্তিতত্ত্ব মিছে হয়, সৃষ্টিতত্ত্ব দাঁড়ায় না, মুক্তিতত্ত্ব দাঁড়ায় না, পরমাত্মতত্ত্ব দাঁড়ায় না। অতএব ইউরোপীয় দার্শনিকেরা যাহাকে Oriental fate অর্থাৎ অনতিক্রমণীয় অদৃষ্ট বা বিধিলিপি বলিয়া থাকেন, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে তাহা একেবারেই অসম্ভব এবং পুরুষকার বা দুরবস্থা অতিক্রম করিবার শক্তি না হইলেই নয়। তাই হিন্দুর কথিত ধ্রুব কথায় এত অসাধারণ ও অপরিমিত পুরুষকার দেখিতে পাই। তাই হিন্দুর পুরাণে দেখিতে পাই ধ্রুব সমস্ত কর্ম্মফল তুচ্ছ করিয়া দেবদুর্লভ পদ লাভ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং প্রতিজ্ঞা বলে স্থির ও অবিচলিত চিত্তে সমস্ত বাধা সমস্ত বিঘ্ন বিষম বিভীষিকা সব অতিক্রম করিয়া সেই দেবদুর্লভ পদ লাভ করিয়াছেন। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগেরও এই প্রকার প্রতিজ্ঞা ও পুরুষকার ছিল। তাঁহারা যাহা কর্ত্তব্য মনে করিতেন, প্রাণপণে তাহা সম্পন্ন করিয়া তবে ছাড়িতেন, তাহা সম্পন্ন করণার্থ যাহা কিছু করিবার আবশ্যক হইত, বীরবিক্রমে নির্ভীক চিত্তে এবং অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াও তাহা করিতেন। আয়োধ ধৌম্য ঋষির শিষ্য আরুণির কথা মনে আছে কি? গুরু আরুণিকে জল নির্গমন নিবারণার্থ শস্যক্ষেত্রে আইল নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। আদেশ পালন করিব বলিয়া গিয়া আরুণি দেখিলেন যে আইল নির্ম্মাণ করা অসাধ্য। তিনি জল নির্গমন নিবারণার্থ নানা উপায় পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু সকল উপায়ই বিফল হইল। তখন আপন প্রতিজ্ঞা ভাবিয়া স্বয়ং ক্ষেত্রপার্শ্বে শয়ন করিয়া জল নির্গমন বন্ধ করিলেন*। শাপগ্রস্ত পিতৃপুরুষদিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত ভগীরথ কি বিষম সাহস প্রতিজ্ঞা পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের কর্ম্মই না করিয়াছিলেন। পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ রামচন্দ্র কতদিন ধরিয়া কত কষ্টই সহ্য করিয়াছিলেন, এবং সীতাকে পুনর্লাভার্থ কি অসাধ্য সাধনই না করিয়াছিলেন! মহাঋষি বিশ্বামিত্র উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণত্ব লাভ করণার্থ কত কষ্ট সহ্য করিয়া কি অলৌকিক কাণ্ড করিয়াছিলেন। তুমি বলিবে, এসব গল্প-কথা এসব কথা বিশ্বাস করি না। আচ্ছা, তর্কের খাতিরে স্বীকার করিলাম যে এসব গল্প-কথা, যাহাকে ইউরোপীয়েরা ইতিহাস বলে, এসব কথা তা নয়। কিন্তু যাঁহারা এরকম গল্পকথা রচনা করেন, তাঁহারা

* মহাভারত, আদি পর্ব্ব, অনুক্রমণিকা পর্ব্বাধ্যায়, তৃতীয় অধ্যায়।

কি ধাতুর লোক ছিলেন বল দেখি? তাঁহারা কি ভয়ানক প্রতিজ্ঞা ও পুরুষকারে সম্পন্ন লোক ছিলেন না? নহিলে, যে মুক্তিকে তাঁহারা মানুষের পরম পদার্থ বলিয়া বুঝিতেন, সেই মুক্তি লাভ করণার্থ তাঁহারা এত করিতেন কেন? স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি মধুর মায়াময় সংসার, যাহা হইতে দুই দিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইলে তুমি আমি কাঁদিয়া আকুল হই, সেই সংসার চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিয়া, যে ইন্দ্রিয়ের ভোগসুখে তুমি আমি এত মুগ্ধ, চিরকালের জন্য সেই ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া, বিভীষিকাময় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, অনশনে বা অনশন তুল্য স্বল্পাশনে রৌদ্র বৃষ্টি ঝড় ঝন্‌ঝাবাত মাথায় পাতিয়া লইয়া, মুক্তির জন্য তাঁহারা কত বৎসর ধরিয়া ভগবানের ধ্যান করিতেন। ইহা কি সামান্য প্রতিজ্ঞা ও সামান্য পুরুষকারের কর্ম্ম? এরকম প্রতিজ্ঞা ও পুরুষকারের কথাকে ত গল্প-কথা বলিতে পার না। এখনত যে এমন যোগী ও তপস্বী দেখিতে পাওয়া যায়। আর যোগী তপস্বীর কথাই বা কাজ কি? আজিকার অধঃপতিত হিন্দু সমাজে ইংরাজি শিক্ষা লাভ করেন নাই, এমন স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কি সেই পুরাতন ধাতু দেখিতে পাওয়া যায় না? আজিও কি অসংখ্য হিন্দু নরনারীকে ধর্ম্মচর্য্যার্থ এবং পারলৌকিক মঙ্গলার্থ অর্দ্ধাশন উপবাস ইন্দ্রিয়নিগ্রহ বিলাসবর্জ্জন কঠিন ব্রতাচরণ ব্যয়-ও-শ্রমসাধ্য তীর্থ দর্শন ও ভ্রমণ করিতে দেখা যায় না? ইহাও কি প্রতিজ্ঞা ও পুরুষকারের প্রমাণ নয়? আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের অসাধারণ প্রতিজ্ঞা ও পুরুষকার ছিল বলিয়াই তাঁহারা জ্ঞান পথে ও ধর্ম্ম পথে এত উন্নত হইতে পারিয়াছিলেন। গ্রীক বল রোমান বল ইংরাজ বল ফরাসী বল জর্ম্মাণ বল যে যা উন্নতি করিয়াছে কেবল অসাধারণ প্রতিজ্ঞাও পুরুষকারের বলেই করিয়াছে। কিন্তু অসীম প্রতিজ্ঞা ও পুরুষকার সম্পন্ন হিন্দুর বংশে জন্মিয়া আজ আমাদের প্রতিজ্ঞাও নাই পুরুষকারও নাই। আমাদের কোন রকমের উন্নতি করিবার প্রতিজ্ঞা নাই। যদি বা কখনও উন্নতি সাধনার্থ একটা কাজ করিব মনে করি সে সঙ্কল্প বেশিদিন থাকে না, দুই একটা সামান্য বাধা বিঘ্ন দেখিলেই তাহা ছাড়িয়া দি, আর বাধা বিঘ্ন না দেখিলেও দিন কতক পরেই যেন তাহা 'বেমালুম' ভুলিয়া যাই। তাই আজ ধ্রুব-কথা উত্থাপন করিলাম—ধ্রুবের সেই বজ্রকঠিন প্রতিজ্ঞা, সেই অমানুষী পুরুষকার ও সেই সুরাসুরদুর্লভ সাহস ও বিক্রমের কথা উত্থাপন করিলাম। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের ধ্রুব, কি আমাদেরও ধ্রুব হইবে না? আমাদের পূর্ব্ব

পুরুষেরা তাঁহাদের অভিলষিত ও শ্রেয় কর্ম্মে যেমন ধ্রুব-সঙ্কল্প হইতেন, আমরাও কি আমাদের অভিলষিত ও শ্রেয় কর্ম্মে সেইরূপ ধ্রুব-সঙ্কল্প হইব না? আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কর্ত্তব্য সাধনে যে ধ্রুবমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন আমরাও কি আমাদের কর্ত্তব্য সাধনে ও উন্নতি সাধনে সেই ধ্রুবমন্ত্রে দীক্ষিত হইব না? হিন্দুর ধ্রুব শব্দ বলে যে হিন্দু ধরণীর ন্যায় দৃঢ়, ধরণীর ন্যায় ধীর, ধরণীর ন্যায় ধারণাক্ষম, ধরণীর ন্যায় উন্নতিশীল, ধরণীর ন্যায় অনন্তপথের পথিক। আমরা কি ধ্রুব-কথা ভুলিতে পারি? আজিকার দিনে ধ্রুব-কথাই আমাদের বেদ, ধ্রুব-কথাই আমাদের পুরাণ, ধ্রুব-কথাই আমাদের স্মৃতি হওয়া উচিত। তাহা কি হইবে না?

অদৃষ্ট বিষয়ে যখন এত কথা কহিলাম, তখন আরো একটা কথা না কহিলে চলে না। ইউরোপীয় দার্শনিকেরা যে এতদ্দেশের অনুল্লঙ্ঘনীয় অদৃষ্টের কথা বলিয়া থাকেন তাহার কি কোন হেতু নাই? হেতু আছে। এদেশের লোক পার্থিব উন্নতি সম্বন্ধে ইউরোপীয়দিগের ন্যায় উদ্যমশীল নয়। এদেশের লোককে পার্থিব অবস্থার উন্নতি করিতে বলিলে তাহারা প্রায়ই বলিয়া থাকে—তুমি ও যেমন, উন্নতির জন্য আবার চেষ্টা করিব কি? অদৃষ্টে উন্নতি থাকে চেষ্টা না করিলেও উন্নতি হইবে, অদৃষ্টে না থাকে, সহস্র চেষ্টা করিলেও উন্নতি হইবে না। একথার মোটামুটি অর্থ এই যে, প্রত্যেক মানুষের একটা বাঁধাধরা অদৃষ্ট আছে, তাহা ফলিবেই ফলিবে, কিছুতেই তাহার অন্যথা হইবে না। ত্রিকালজ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের কাছে প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনের ভবিষ্যৎ ঘটনা অবশ্য প্রকাশ আছে। অতএব ভগবান বলিতে পারেন ভবিষ্যতে কোন মনুষ্যের অদৃষ্টে কি ঘটিবে। কিন্তু মানুষ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না কি ঘটিবে। তবে মানুষ এ কথা বলিতে পারে যে আমি বলিতে পারি আর নাই পারি, কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে একটা ঘটিবেই ঘটিবে, তখন আমি চেষ্টা করিলেও তাহা ঘটিবে, চেষ্টা না করিলে ও তাহা ঘটিবে। মানুষের ভুল এইখানে। আমরা যাহা কিছু পাইতে ইচ্ছা করি সকলই আমাদের চেষ্টা করিয়া পাইতে হয়—আমরা যাহা কিছু কখনও পাইয়াছি সকলই চেষ্টা করিয়া পাইয়াছি। অতীত কালে দেখিয়াছি যে যাহা কিছু পাইয়াছি সবই চেষ্টা করিয়া পাইয়াছি। তবে যাহা ভবিষ্যতে পাইতে হইবে কেবল তাহারই সম্বন্ধে কেন বলিবে, যদি তাহা আমার অদৃষ্টে থাকে তবে আমি তাহা চেষ্টা

করিলেও পাইব, না করিলেও পাইব? ফল কথা এই যে, এ দেশের লোকে প্রকৃত পক্ষে অনুল্লঙ্ঘনীয় অদৃষ্ট মানেন না। তাঁহাদিগকে পার্থিব উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে বলিলে তাঁহারা বলেন বটে যে পার্থিব উন্নতি আমাদের অদৃষ্টে থাকিলে আমরা চেষ্টা করিলেও হইবে, না করিলেও হইবে এবং এই বলিয়া প্রায়ই নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারাই ত পারলৌকিক উন্নতির নিমিত্ত কত চেষ্টা করিয়া থাকেন। পারলৌকিক উন্নতি অদৃষ্টে থাকে, চেষ্টা করিলেও হইবে, না করিলেও হইবে, এরূপ ভাবিয়া ত নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন না। তাঁহারাই ও অল্প-পরিশ্রম-সাধ্য সামান্য অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া ক্ষুধার শান্তি করেন। ভোজন অদৃষ্টে থাকে, অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন করিলেও ভোজন করিতে পাইব, রন্ধন না করিলেও পাইব, এরূপ ভাবিয়া রন্ধন না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন না। অতএব বুঝা যাইতেছে যে তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে অব্যর্থ অদৃষ্ট মানেন না। তবে যে পার্থিব উন্নতি করিবার বেলা অব্যর্থ অদৃষ্টের কথা তুলিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকেন, তাহার বোধ হয় দুইটি কারণ আছে। প্রথমত এদেশের জল বায়ু এমনি যে উহা মানুষকে কিছু অলস শ্রমকাতর বা বিশ্রামপ্রিয় করে। সেইজন্য বিষয় কর্ম্মের ন্যায় যে সকল কাজে উন্নতি করিতে গেলে বেশি শারীরিক পরিশ্রম ইত্যাদি করিতে হয় সে সকল কার্য্যে উন্নতি করিতে এদেশের লোকের স্বভাবতই কিছু অনিচ্ছা হইয়া থাকে। দ্বিতীয়ত বহু পূর্ব্বকাল হইতে এদেশের লোক অধিক পরিমাণে ধর্ম্মপ্রিয় হইয়াছে এবং সেইজন্য তাহারা সেই পরিমাণে পার্থিব সম্পদ ও উন্নতিকে হেয় ও অনর্জ্জনীয় মনে করিয়াছে। লোকে যাহা হেয় ও অনর্জ্জনীয় বলিয়া মনে করে, তাহা অর্জ্জন করিবার জন্য তাহাদের বড় একটা ইচ্ছাও হয় না, পারও করে না, পরিশ্রম করিতেও প্রবৃত্তি না। জলবায়ুর গুণে এদেশের লোকের যে আলস্য হইয়া থাকে, এই মানসিক প্রকৃতি তাহা বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। সেইজন্য এদেশের লোক পার্থিব উন্নতি সাধনের বেলায় অব্যর্থ অদৃষ্টের দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে। যাহা তাহারা উত্তম ও উৎকৃষ্ট বলিয়া বুঝে সেই ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উন্নতি সাধন করিবার বেলা তাহারা অব্যর্থ অদৃষ্টের দোহাই দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া না থাকিয়া কঠিন উদ্যম করে। এবং রন্ধনাদি যে সকল কাজ না করিলে নয় এবং অল্প পরিশ্রমে করা যায়, সে সকল কাজ সম্বন্ধে তাহারা অব্যর্থ অদৃষ্টের দোহাই দিয়া

চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না, যথাযথ পরিশ্রম করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। কেবল অলসস্বভাব বশত যে পার্থিব উন্নতি তাহারা হেয় মনে করে এবং যাহা সাধন করিতে প্রভূত পরিশ্রম প্রয়োজন, সেই শ্রমসাধ্য পার্থিব উন্নতি সাধনের কথায় তাহারা অব্যর্থ অদৃষ্টের উল্লেখ করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে। তাহাদের অব্যর্থ-অদৃষ্ট-বাদ প্রকৃতপক্ষে তাহাদের যুক্তি সমুদ্ভূত বা বিশ্বাস মূলক অব্যর্থ-অদৃষ্ট-বাদ নয়। তাহাদের অব্যর্থ-অদৃষ্ট-বাদ তাহাদের অলস প্রকৃতি ও ধর্ম্মসংস্কারসমুদ্ভূত একটা ওজর মাত্র। পণ্ডিত ও দার্শনিক-দিগের সে রকম অব্যর্থ-অদৃষ্ট-বাদকে প্রকৃতপক্ষে একটা অব্যর্থ-অদৃষ্ট-বাদ বলিয়া গণনা করা অন্যায়। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিত ও দার্শনিকেরা সেই অন্যায় কার্য্যটি করিয়াছেন এবং এখন পর্য্যন্তও করিতেছেন।

আমরা বুঝিলাম যে আমাদের শাস্ত্রে অব্যর্থ-অদৃষ্টবাদ অসম্ভব এবং আমাদের মধ্যে লোক সাধারণে যে অব্যর্থ-অদৃষ্ট-বাদের কথা কয়, তাহা তাহাদের একটা ওজর মাত্র, যুক্তি বা বিশ্বাস মূলক কথা নয়। এখন আমরা যদি বুঝি যে আমাদের জীবন রক্ষার্থ, জাতি রক্ষার্থ, দেশরক্ষার্থ ও ধর্ম্মচর্য্যার্থ আমাদের পার্থিববল ও সম্পদ আবশ্যক হইয়াছে, তবে আমাদের পুরুষকারের বলে পুরুষকার বৃদ্ধি করিয়া, আমাদের শারীরিক আলস্য-প্রবণতা পরাজয় করিয়া, সেই পূর্ণ পুরুষকারাবতার ধ্রুবের ন্যায় সর্ব্বকল্যাণদাতা ভগবানের নাম করিয়া সকল বাধা সকল বিঘ্ন সকল বিভীষিকা অতিক্রম ও উপেক্ষা করিয়া অপরিসীম পার্থিবশক্তি ও সম্পদ সঞ্চয় করিয়া সকলে এক মনে এক প্রাণে সেই সর্ব্বশক্তি এবং সর্ব্ব সম্পদরূপী ভগবানের সেবায় আমাদিগকে নিযুক্ত হইতে হইবে এবং পৃথিবীকে স্বর্গের সহিত মিশাইয়াফেলিতে হইবে। অতএব আইস সকলে ধ্রুব-মন্ত্রে দীক্ষিত হই। আজিকার দিনে, আমাদের এই অবস্থায়, সেই অপূর্ব্ব ধ্রুব-মন্ত্রে দীক্ষিত না হইলে আমাদের মৃত্যুও ধ্রুব। অতএব আবার বলি—আইস সকলে ধ্রুব-মন্ত্রে দীক্ষিত হই।

# আর্য্যবীরগণের দিগ্বিজয়।

কেহ কেহ বলেন ভারতবর্ষীয় নৃপতিরা চিরদিনই হয় পরস্পর বিরোধে কাল কর্ত্তন করিতেন, নয় যুদ্ধাদি চেষ্টা রহিত হইয়া থাকিতেন। ভারতের বাহিরে তাঁহাদিগের লোভাকর্ষক বস্তু কিছুই ছিল না; সুতরাং তাঁহারা ভারতের বহিঃস্থিত কোন দেশে সৈন্য পরিচালনা করিতেন না। যে রাজার দিগ্বিজয় বাসনা একান্ত বলবতী হইত, তিনি ভারতীয় নরপতিদিগকে পরাভূত ও স্ববশীকৃত করিয়া, সার্ব্বভৌম সম্রাট প্রভৃতি গৌরবান্বিত উপাধি গ্রহণ করত, সন্তুষ্ট থাকিতেন।

কিন্তু আমরা এইরূপ সংস্কার বিশিষ্ট লোকদিগকে নিতান্ত ভ্রান্ত মনে করি। যদিও সমগ্র ভারতের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তথাপি মনঃসংযোগ সহকারে সংস্কৃত সাহিত্যাদি অধ্যয়ন করিলে জানিতে পারা যায়, পূর্ব্বকালে কতিপয় মহাবল পরাক্রমশালী আর্য্যবীরপুরুষ দিগ্‌জিগীষায় উত্তেজিত হইয়া প্রবল বেগে ভারতবর্ষের বাহিরে বিজয়িনী বাহিনী পরিচালনা করিয়া নানাদেশে আর্য্যবৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন এবং সেই সমস্ত দেশাধিপতিরা নম্রভাবে আর্য্যবিজেতার অনুগমন করিতেন। মধ্যকালে যে দোর্দ্দণ্ড পারসীক, তাতার প্রভৃতির প্রচণ্ড প্রতাপে সময়ে সময়ে ভারতের অন্তস্তল পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত হইত, ভারতীয় জিগীষু মহাবীরগণের অনিবার্য্য বীর্য্যগরিমার নিকটে একদিন তাহাদিগকেও মস্তক অবনত করিতে হইয়াছিল। কতকগুলি ভিন্ন দেশজয়ী আর্য্যবীরের বিবরণ প্রকাশ করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

## রঘু।

### (১)

অযোধ্যাধিপতি মহারাজ রঘু সিন্ধুনদ উত্তরণ করিয়া গান্ধার (কান্দাহার) জয় করিয়া পারসীক সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবল অশ্বারোহী পারসীকেরা তাঁহার প্রচণ্ড গতি প্রতিরোধ করে। অবশেষে এক মহাযুদ্ধে আর্য্য সম্রাট বিজয় লাভ করেন এবং গর্ব্বিত পারসীক বীরগণ শূন্যমস্তকে বিজেতার শরণাপন্ন হইয়া রক্ষা পায়। রঘু পারস্য জয় করিয়া (বর্ত্তমান স্বাধীন তাতার নিবাসী) বীর্য্যবান্ হূণ এবং কাম্বোজ দিগকে আক্রমণ করিয়া অধীনতা স্বীকার করাইয়াছিলেন।

মহাকবি কালিদাস রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে এই বিষয়ের মনোহারিণী বর্ণনা করিয়াছেন। *

(২)

অর্জ্জুন।

মহাভারতীয় সভাপর্ব্বের দিগ্বিজয় পর্ব্বে লিখিত আছে, মহাবীর অর্জ্জুন বাহ্লীক, কাম্বোজ, দরদ, ঋষিক প্রভৃতি জাতিকে সংগ্রামে পরাভূত করিয়া ভারত সম্রাট্ যুধিষ্ঠিরের অধীন করিয়াছিলেন। তৎপরে জয়দর্পিত পাণ্ডু-নন্দন সুদূর হরিবর্ষ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া সেই দেশে পাণ্ডব প্রাধান্য স্থাপিত করত প্রতিনিবৃত্ত হন। এই বাহ্লীক বর্ত্তমান বাল্‌খ দেশ, কাম্বোজ অধুনাতন পারস্যের অংশ বিশেষ, ঋষিক প্রভৃতিরা তাতার দেশের কোন অংশে অধিবাস করিত। দরদ—দার্দি-স্থানবাসী বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান চীনতাতার পূর্ব্বকালে হরিবর্ষ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। †

---

* পারসীকাংস্ততো জেতুং প্রতস্থে স্থলবর্ত্মনা।
ইন্দ্রিয়াখ্যানিব রিপূন্ তত্ত্বজ্ঞানেন সংযমী ॥

*      *      *      *

সংগ্রামস্তুমুলস্তস্য পাশ্চাত্যৈরশ্বসাধনৈঃ।
শার্ঙ্গকূজিতবিজ্ঞেয়প্রতিযোধে রজস্যভূৎ ॥
ভল্লাপবর্জ্জিতৈস্তেষাং শিরোভিঃ শ্মশ্রুলৈর্মহীম্।
তস্তার সরঘাব্যাপ্তৈঃ স ক্ষৌদ্রপটলৈরিব ॥
অপনীতশিরস্ত্রাণাঃ শেষাস্তং শরণং যযুঃ।
প্রণিপাতপ্রতীকারাঃ সংরম্ভো হি মহাত্মনাম্ ॥

*      *      *      *

তত্র হূণাবরোধানাং ভর্ত্তৃষু ব্যক্তবিক্রমম্।
কপোলপাটলাদেশি বভূব রঘুচেষ্টিতম্ ॥
কাম্বোজাঃ সমরে সোঢ়ুং তস্য বীর্য্যমনীশ্বরাঃ।
গজালানপরিক্লিষ্টৈরক্ষোটৈঃ সার্দ্ধমানতাঃ ॥

রঘুবংশ চতুর্থ সর্গ।

† ততঃ পরমবিক্রান্তো বাহ্লীকান্ পাকশাসনিঃ।
মহতা পরিমর্দ্দেন বশে চক্রে দুরাসদান্ ॥
গৃহীত্বা তু বলং সারং ফাল্গুনঃ পাণ্ডুনন্দনঃ।
দরদান্ সহ কাম্বোজৈরজয়ৎ পাকশাসনিঃ ॥

*      *      *      *

(৩)

ভীম।

বীরকুলতিলক ভীমসেন পূর্ব্বদিক্ বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া লৌহিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রের পর পারস্থ (আধুনিক ব্রহ্মাদি) ম্লেচ্ছ দেশ ও দ্বীপ সমূহ আর্য্য সাম্রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। *

(৪)

নকুল।

শৌর্য্যবান নকুল পশ্চিম দিক্‌স্থিত দেশসমূহ জয় করিয়াছিলেন। পহ্লব, বর্ব্বর, যবন, শক প্রভৃতি জাতি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। পহ্লব পারসীক দিগের পূর্ব্ব নাম; ইহাদের প্রাচীন ভাষার নাম পহ্লবী। যবন ও বর্ব্বরেরা পারস্যের পশ্চিম উত্তরাংশে বাস করিত। তৎকালীন শক নামে প্রসিদ্ধ জাতি এক্ষণে তাহার জাতির অন্তর্ভূত। গ্রীক গ্রন্থে তাহাদিগকে শাকী বলে। †

---

সরো মানস মাসাদ্য হাটকানভিতঃ প্রভুঃ।
গন্ধর্ব্বরক্ষিতং দেশ মজয়ৎ পাণ্ডব স্তুতঃ॥
* * * *
উত্তরং হরিবর্ষন্তু স সমাসাদ্য পাণ্ডবঃ।
ইয়েষ জেতুং তংদেশং পাকশাসন নন্দনঃ॥
* * * *
ততো দিব্যানি বস্ত্রানি দিব্যান্যাভরণানি চ।
ক্ষৌমাজিনানি দিব্যানি তস্য তে প্রদদুঃকরম্॥

মহাভারত সভাপর্ব্ব অর্জ্জুন দিগ্বিজয় পর্ব্ব।

* * * * * যে চ সাগরবাসিনঃ।
সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভঃ॥
* * * *
বসুতেভ্য উপাদায় লৌহিত্য মগমদ্বলী॥
স সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছ নৃপতীন্ সাগরানূপবাসিনঃ।
করমাহারয়ামাস রত্নানি বিবিধানি চ॥

মহাভারত সভাপর্ব্ব ভীম দিগ্বিজয়।

† ততঃ সাগর কুক্ষিস্থান্ ম্লেচ্ছান্ পরম দারুণান্।
পহ্লবান্ বর্ব্বরাংশ্চৈব কিরাতান্ যবনান্ শকান॥
ততো রত্নান্যুপাদায় বশে কৃত্বা চ পার্থিবান্।
ন্যবর্ত্তত কুরুশ্রেষ্ঠো নকুলশ্চিত্রমার্গবিৎ॥

মহাভারত সভাপর্ব্ব নকুল দিগ্বিজয়

(৫)

অশোক।

অশোক মগধ সাম্রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট। তিনি খৃঃ পূঃ ২৬৩ অব্দ হইতে খৃঃ পূঃ ২২৩ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষ, আফগানিস্থান এবং মধ্য এসিয়ার কিয়দংশ তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। ভারত ও আফগানিস্থানের গিরিগাত্রে মহারাধিরাজ অশোকের অনুশাসন খোদিত আছে। অশোক ভারতেতিহাস প্রসিদ্ধ।

(৬)

ললিতাদিত্য।

রাজতরঙ্গিনীর চতুর্থ তরঙ্গে উল্লিখিত মহাবীরের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। ললিতাদিত্য খৃষ্টীয় ৬৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কাল দিগ্বিজয় ব্যাপারে অতিবাহিত হয়। তিনি কেবল কাশ্মীরের নহে কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের অতুল গৌরবের নিদান। সমস্ত ভারতে এবং কাম্বোজ, দরদ প্রভৃতি দেশে, এমন কি, উত্তর কুরু পর্য্যন্ত বীরচূড়ামণি দুর্দ্দান্ত ললিতাদিত্যের বিজয় পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। তিনি দ্বিতীয় দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়া উত্তরাপথ জয় করেন। অবশেষে তদ্দেশীয় আর্য্যনক নামক প্রদেশে অতিশয় তুষারপাত হওয়াতে সেই স্থানে সসৈন্য ললিতাদিত্যের প্রাণবিয়োগ হয়। কথিত আছে যে দেশে সূর্য্যোদয় হয় না, তিনি এমন দেশ পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। অনেক পণ্ডিত প্রধানের মতানুসারে বর্ত্তমান সাইবিরিয়া পূর্ব্বে উত্তর কুরু, উত্তরাপথ প্রভৃতি নামে আখ্যাত হইত। এবং আর্য্যনককে গ্রীকেরা আরিয়ানা বলিতেন।

(৭)

বাপ্পারাও।

মিবারের রাণাদিগের আদিপুরুষ মহাবল বাপ্পরাও সম্ভবত ৭২৮ খৃষ্টাব্দে চিতোর অধিকার করিয়া দীর্ঘকাল শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। তিনি সমস্ত রাজপুতানা ও সিন্ধু আত্ম শাসনাধীন করত শেষ বয়সে সিন্ধুনদ পার হইয়া আফগানিস্থান আক্রমণার্থ ধাবিত হন। দুর্জ্জয় আফগানেরা তাঁহার দুর্নিবার প্রচণ্ড বেগ সহ্য করিতে সমর্থ না হইয়া বাধ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। তৎপরে কান্দাহার, কাশ্মীর, ইরান, তুরান, কাফ্রিস্থান প্রভৃতি দেশবাসীরা সেই অমিত-তেজা ক্ষত্রিয় বীরের পদানত হয়।

বাপ্পা অনেক যবনকন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের গর্ভসম্ভূত পাঠানদিগের বংশ পরম্পরা একাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। *

(৮)

দেবপাল দেব।

মহারাজাধিরাজ দেবপাল দেব খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে গৌড়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ, এমন কি মধ্য এসিয়া পর্য্যন্ত জয় করেন। সেই দিগ্বিজয়কালে ভীষণ হুণ দেশীয় বীরগণের গর্ব্ব খর্ব্বীকৃত, উৎকলদেশীয়দিগের মস্তক অবনত এবং গুর্জ্জর ও দ্রাবিড়ের রাজাদিগের গৌরব বিনষ্ট হইয়াছিল। দিগ্বিজয় ব্যাপার সমাহিত করিয়া গৌড়সম্রাট মুদ্গগিরিতে (আধুনিক মুঙ্গেরে) এক মহতী সভার অধিবেশন করেন যাতায়াতের সুবিধার নিমিত্ত গঙ্গার উপর প্রকাণ্ড সেতু নির্ম্মিত এবং হয় উত্তর দেশীয় নৃপতিগণের প্রেরিত অশ্বসমূহের পদধূলিতে চতুর্দ্দিক অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হয়। প্রায় সমুদয় পরাজিত মহীপতিরাই দেবপালদেবের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে সেই সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে মহাবীর দেব পাল সমস্ত ভূপালবৃন্দে পরিবৃত হইয়া যে অনুশাসন প্রণয়ণ করিয়াছিলেন মুঙ্গেরে তাহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বুদ্বাল নামক স্থানে দেবপালের

---

The foe was defeated and driven out of the country ; but instead of returning to Cheetore, Bappa continued his course to the ancient seat of his family, Gajni, expelled the Barbarian called "Selim", placed on the throne a chief of the Chawura tribe, and returned with the discontented nobles. * * * *

* * * * * * * *

Bappa had reached the patriarchal age of one hundred, when he died. An old volume of historical anecdotes, belonging to the chief of Dailwara, states that he became an ascetic at the foot of MerJ, where he was buried alive after having overcome all the kings of the west, as in Ispahan, Kandahar, Cashmere, Irak, Iran, Tooran, and Kafristhan ; all of of whose daughters he married and by whom he had one hundred and thirty sons, called Nosheyra Pathans.

*Todd's Rajasthan.*

অনেক মন্ত্রীর প্রণীত একখানি অনুশাসন পত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই দুই পত্রের সাহায্যে গৌড়েশ্বরের বিজয় বৃত্তান্তাদি সংগৃহীত হইল। *

সংস্কৃত সাহিত্য আলোড়ন করিলে এইরূপ আরও অনেক মহাবীরের বিবরণ সংগৃহীত হইতে পারে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে দেশীয় শিক্ষিত নবীন লোকেরা ইউরোপের সমুদয় দিগ্বিজয়ী বীরগণের বিবরণ কণ্ঠস্থ করিয়া থাকেন কিন্তু দেশীয়দিগ্বিজয়ী দিগের বিবরণ জানিতে কিছুমাত্র চেষ্টা বা অনুগ্রহ প্রকাশ করেন না। সম্প্রতি অনেক কৃতবিদ্য দেশীয় ব্যক্তির প্রাচীনতত্ত্ব জানিবার স্পৃহা হইয়াছে দেখিয়া আমরা অদ্য তাহাদিগকে এই প্রবন্ধ উপহার দিলাম।

---

" * * * He who conquered the earth from the source of the Ganges as far as the well known bridge constructed by the enemy of Dasasya, from the river of Luckicool as far as the habitation of Boroon, who going to subdue other princes, his young horses meeting their females at Kamboge, they mutually neighed for joy!"

From the translation of the Inscription of Devapal found at Moonghyr.

" * * * The King of Gour for a long time enjoyed the country of the eradicated race of Sotkala, of the Hoons of humbled pride, of the kings of Dravir and Goorjar, whose glory was reduced and the universal sea-girt throne."

From the translation of the Inscription of one of the ministers of Devapal found at Bodal.

"At Moodgagiri where is encamped his victorious army; across whose river is constructed for a road a bridge of boats; * * * * * *; * * * whither so many mighty chiefs of Jombood-wipa sesort to pay their respects * * * There Devapal Deva * * * issues his commands."

From the translation of the Inscription of Devapal found at Moonghyr.

*Asiatic Researches. Vol. I.*

# মহামায়া।

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

### পত্র।

অমূল্য যমুনার শবসৎকারের যথাবিহিত ব্যবস্থা করিয়া, পল্লিপার্শ্বে একটি নিভৃতস্থানে দাঁড়াইয়া যমুনা যে পত্রখানি দিয়াছিল, তাহা পড়িবার উদ্যোগ করিলেন। প্রথমেই পত্রের শেষ ভাগে নাম দেখিলেন,

মহামায়া দেবী—

চক্ষুঃ বাষ্পাকুল হইল, পদতলে কেমন একরূপ ঝুনু ঝুনু হইতে লাগিল। বসিয়া পড়িলেন। রুমাল দিয়া মুখ মুছিয়া, রুমাল দিয়াই বাতাস খাইতে লাগিলেন;—ক্রমে সুস্থ হইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন;

"স্বস্তি! সকলের প্রণয় আলয়!

এই পত্রবাহক—যুবক নহে, যমুনা। যমুনা আপন ইচ্ছায় পাগল হইয়াছিল, এখন অনিচ্ছায় তাহাই দাঁড়াইল। আবার ইদানী তাহার হাসি খুসী বড় বাড়িয়াছে, কবে কি করিবে, বলিতে পারি না। আমি কিন্তু নিমিত্তের ভাগিনী হইব। তাই আপনাকে এই পত্র লিখিলাম। যখন দেশে থাকিবেন, প্রত্যহ একদণ্ড তাহার গান শুনিতে পারিবেন না কি?

যমুনার কাছে প্রভাবতীর বার্ত্তা পাইয়াছি। হয়ত প্রভাবতী, আপন মন না জানিয়া, হৃদয়ে তুষানল পুষিতেছে। কে জানে কবে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে! আপনি ভগবানের অনুগৃহীত। প্রভাবতীকে, তাঁহার পিতামহীকে রক্ষা করুন। আপনার পিতৃ দেবের মুখের দিকে দেখুন, আপনাদের সংসারের জঞ্জাল দূর করুন।

আমি সন্ন্যাসীর কন্যা; আজন্ম সন্ন্যাসিনী। পরম স্বামীর আরাধনায় পিতৃদেব আমাকে নিয়োগ করিয়াছেন। নিভৃতে আমরা বাস করিতেছি। কেহই আমাদের সন্ধান জানেন না। সুতরাং আপনি বৃথা আর আমাদের অনুসন্ধান করিবেন না। আপনার বিবাহের রাত্রিতে আমি মঙ্গলাচরণের জন্য স্বয়ং আপনার নিকট উপস্থিত হইব।

যমুনার গান শুনিবেন। গম্ভীরা প্রভাবতীকে গাহিতে শিখাইবেন।

মহামায়া দেবী।"

"যমুনার গান শুনিবেন" এইখানে অমূল্য কাঁদিয়া ফেলিলেন। যমুনার শেষ গান তখনও তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল। "আমি কিন্তু নিমিত্তের ভাগিনী হইব" তবে আর তুমি 'আজন্ম সন্ন্যাসিনী' কৈ! তোমার মনে পাপ আছে। ভালবাসা—পাপ? পাপ বৈ কি? নহিলে ভাল বাসিলে এত ভুগিতে হয় কেন?

অমূল্য ভাবিতে ভাবিতে স্বগৃহাভিমুখে দ্রুত পদে যাইতেছেন এমত সময় তাঁহার বাম হস্তে একটি গুলি আসিয়া লাগিল, তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া উঠিল, অজস্র শোণিত স্রাব হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পতিত হইলেন।

ক্ষণেক পরে তথায় একটি লোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন অমূল্যর তখন অল্প অল্প নিশ্বাস পতন হইতেছে—কিন্তু বিন্দুমাত্র জ্ঞান নাই—তিনি অমূল্যর চাদর দ্বারা ক্ষতস্থানে উত্তম করিয়া বন্ধন করিয়া তাহাকে কোলে করিয়া লইয়া চলিলেন। কিছুক্ষণ পরে মৃতপ্রায় অমূল্যসহ সর্ব্বানন্দের বাসায় উপস্থিত হইলেন।

সর্ব্বানন্দ অমূল্যকে এতাদৃশ অবস্থায় দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন "এ কি!"

আগন্তুক অমূল্যকে যে অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা বিবৃত করিলেন, বলিলেন, "আমি তাঁহাকে চিনিতাম, সুতরাং আপনার নিকট আনিলাম।"

সর্ব্বানন্দ অশ্রু গদ গদ স্বরে তাঁহাকে শত ধন্যবাদ দিলেন।

বাটীর মধ্যে মহা ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল। লোকটি চলিয়া গেলেন, সর্ব্বানন্দ তাঁহাকে আর একটু অপেক্ষা করিতে অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। তিনি তথা হইতে দ্রুত পদে রণ-ক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হইলেন। পরে অন্যান আহতদিগের সাধ্যমতে সেবা সুশ্রুষায় নিরত হইলেন।

---

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

### জননী ও সন্তান।

অমূল্য অনেক চিকিৎসায়, অনেক সেবায়, অনেক সুশ্রূষার এযাত্রা রক্ষা পাইয়াছেন, কিন্তু এখনও বড় দুর্ব্বল। আহারান্তে সকলে শয়ন করিলেন; এমত সময় দুর্গাবতী দেখিলেন অমূল্যরতন স্বীয় কক্ষে করকপোলিত

হইয়া চিন্তা মগ্ন; সেই শোণিত শূন্য পাণ্ডুবর্ণ বদনমণ্ডলে চিন্তার ঘোর মসিলেখা দর্শনে তাঁহার প্রাণ আকুল হইল; তিনি বসনাঞ্চলে চক্ষের জল মুছিয়া মনে মনে বলিলেন "ভগবান্ এ হতভাগিনীকে এক দণ্ডও সুখ দিতে নেই? দুধের ছেলে—ওর ভাবনা দেখিয়ে আমায় কি এতই কাঁদাতে হয়?" দুর্গাবতী ক্ষনেক নীরব হইয়া একদৃষ্টে চিন্তামগ্ন প্রাণাধিক সন্তানের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, পরে একটি উষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, অমূল্য গাঢ় চিন্তামগ্ন থাকায় তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না, দুর্গাবতী বলিলেন "অমূল্য।"

অমূল্য চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন "অঁ্যা।"

দুর্গা। বাবা কি ভাবছ?

অমূল্য। না, এমন কিছু নয়।

দুর্গা। সে কি বাবা, আমি যখন তখন যে তোকে ভাব্‌তে দেখি—অমূল্য বল্. তুই কি ভাবিস্ তা আমায় বল্।

অমূল্য একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে বল্লেন "অনেক দেনা পত্র আছে—"

দুর্গা। না অমূল্য, ওকথা নয়—তোমায় যে দিন দেনার জন্য ধরে নিয়ে যায়, সে দিনও তোমার যেরূপ মুখভাব দেখেছি, এখনও তাই দেখছি।

অমূল্য। আমার মন কেমন উদাস হয়েছে, সেই জন্য কোন বিশেষ দুর্ঘটনায় বেশি খারাপ হয় না, যেমন তেমনি থাকে।

দুর্গাবতী চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন "আমি তোর ওকথা শুন্‌তে আসিনি, ওকথা শুনবো না. আমায় সত্য কথা বল—আর তোর শুক্‌নো মুখ দেখতে পারি না।"

দুর্গাবতী আবার চক্ষের জল মুছিলেন।

অমূল্য। মা সেত সুখের কথা নয়,—সে কথা শুনে ত দুঃখ বই সুখ হবে না।

দুর্গা। তোমার মুখে যদি হাসি না দেখি, তবে আর আমার কি সুখ? আমি কি তার কোন উপায় করতে পারবো না?

অমূল্য। না মা তা পারবে না। পারলে বল্‌তাম।

দুর্গা। অমূল্য মায়ের প্রাণ যে কি রকম, তা তুই জানিস না, বুক চিরে রক্ত দিলেও যদি ছেলে সুখী হয়, মা তাও দিতে পারে।

এতক্ষণে অমূল্যর চক্ষে জল আসিল; বলিলেন "আজ নয়, কাল বলিব।"

দুর্গাবতী একবার অমূল্যর বদনের দিকে তাকাইয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। কক্ষান্তরে যাইয়া দেখেন প্রভাবতী দণ্ডায়মানা, প্রভাবতী বলিলেন "মা আমার ভয় করছিল, পাছে আমি যে সকল কথা বলেছি তা বলে ফেল।"

দুর্গা। তুমি বারণ করেছ, তা কি বল্‌তে পারি।

প্রভা। মহামায়ার ত সন্ধান নেই।

দুর্গা। তাইত মা।

প্রভা। এখন হয় কি, এমন করে ত মানুষ বাঁচে না।

দুর্গা। ওর দেখে শুনে আমাতে আর আমি নেই, আমার হাত পা পেটের ভিতর সেঁদিয়া গেছে।

প্রভাবতী তাহার কোন উত্তর না দিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

দুর্গা। মা কেমন আছেন?

প্রভা। ভাল নয়।

দুর্গা। চল তাঁকে দেখিগে।

উভয়ে ধীরে পাদবিক্ষেপে প্রভাবতীর পিতামহীর কক্ষে গমন করিলেন। তাঁহার আজি এক সপ্তাহ হইল অত্যন্ত পীড়া হইয়াছে।

---

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

### দুর্গাবতী ও প্রভাবতী।

প্রভাবতীর পিতামহীর পীড়া ক্রমশ সাংঘাতিক ভাব ধারণ করিল, অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি প্রাণসম প্রভাবতীকে ইহ সংসারে, এই অনন্ত বিস্তৃত অন্তঃসার শূন্য, সার্থপর সংসারে,—একাকিনী রাখিয়া অনন্ত কালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন। এই বিশাল কাল সমুদ্রে আর একটি জল বুদ্বুদ জলে মিশাইল।

মানব আপনার লোককে সুখে আছে দেখিয়া, সুখে মরিতে পারে, কিন্তু দুঃখে থাকিতে দেখিয়া, মরিতে বড় কষ্ট। নিয়তির কাল চক্রে জাগতিক সকল বস্তু সকল প্রাণি অহর্নিশি ঘুরিতেছে, সেই চঞ্চল পরিবর্ত্তন হইতে কাহারও পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই—সে কাহারও মুখ চাহে না, কাহারও দিকে ফিরিয়া তাকায় না, আপন মনে আপনি ঘুরে, আর এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড

সেই আমূল পরিবর্ত্তনের সহিত আপন অজ্ঞাতে আপনা হইতে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে—সামান্য ক্ষুদ্র প্রাণ মনুষ্য কোন ছার! আজি সেই পরিবর্ত্তনে প্রভাবতীর পিতামহীর একটি ঘোরতর পরিবর্ত্তন হইল, সে পরিবর্ত্তনের নাম কি তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু তাহা আপাতত বড় ক্লেশকর! সে বিচ্ছেদ প্রভাবতীর হৃদয় দহিল, প্রাণ কাঁদিল। কিন্তু তাঁহার পিতামহী সুখে মরিলেন, প্রভাবতীর সহিত অমূল্যর বিবাহ হইবে, এ ধারণা তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় বদ্ধ মূল ছিল। তিনি মৃত্যু কালে প্রভাবতীকে সকলের হাতে হাতে সঁপিয়া দিলেন। এ দৃশ্যে সকলেরই চক্ষে জল আসিল কিন্তু দুর্গাবতীর তুল্য কাহারও হৃদয় কাঁদিল না,—প্রভাবতীরও নয়!

বৃদ্ধার মৃত্যুর কিছু দিবস পরে এক দিন প্রভাবতী দুর্গাবতীর হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন "মা আর কেন বাবাকে এসকল কথা বল, মহামায়ার ভাল করিয়া অনুসন্ধান করা হউক।"

দুর্গাবতীর চক্ষু লাল হইল, বলিলেন "প্রভা, আজ এ কথা কেন?—তাঁকে এ কথা বলতে তুমি কতবার নিষেধ করছ, কিন্তু আজ সহসা এ কথা কেন?"

প্রভা। ঠাকুরমার জন্যে বড় ভাবনা ছিল, তিনি এ কথা শুনলে কি বাঁচতেন! তাই বলতে নিষেধ করেছিলাম—মা আর সহ্য হয় না, দাদার মলিন মুখ আর দেখা যায় না।

প্রভাবতীর দুই চক্ষু বহিয়া জল পড়িল। দুর্গাবতী বিস্মিত লোচনে প্রভাবতীর প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে কহিলেন "না প্রভা আমি তা পারব না।"

প্রভা। কেন মা!

দুর্গা। তোমার মনে কষ্ট দেবো!

প্রভাবতীর কুঞ্চিত অধর প্রান্তে বিষাদসূচক মৃদু হাসি দেখা দিল, বলিলেন "আমার কষ্ট হবে? না মা—কখন না, আমি বড় সুখী হব।"

দুর্গা। তবে আচ্ছা তোমার একটি পাত্রের ঠিক করি।

প্রভা। কেন মা?

দুর্গা। তোমার বিবাহ দেবো না।

প্রভা। সে কি মা! তোমার মুখে এ কথা! বিবাহ কি দুবার হয়—মনের বিবাহই ত বিবাহ।

দুর্গাবতী সবিস্ময়ে বলিলেন "সে কি প্রভা, তুমি বিয়ে করবে না!"

প্রভা। না, কখন না, আমি যদি বিবাহ করতে পারি, তবে বিধবারা বিবাহ করতে পারে না কেন? মা তুমি কি বিধবাকে বিবাহ করতে মত দাও?

দুর্গা। তোমার মত কচি মেয়ে বিধবা হলে তাহার বিবাহ দেওয়া যায়।

প্রভা। মা, আমার মত মেয়ে কি ভাল বাসতে জানে না, যে একবার ভাল বেসেছে, যে স্বামী চিনেছে, সে কি কখন বিবাহ করতে চায়!

দুর্গাবতী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া তথা হইতে কক্ষান্তরে যাইয়া অঝোরে কাঁদিতে লাগিলেন। প্রভাবতী নিবিষ্ট চিত্তে গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন, তাঁহার চক্ষু দিয়া তখন বারি বিন্দুও পতিত হইল না।

অমূল্য এক দিন ভাবিয়াছিলেন, প্রভাবতী দেবী; আমরা বলি, প্রভাবতী প্রকৃত মানবী।

---

# উদ্ভট কথা।

## তৃতীয় শাখা।

ইতিহাসের তুলনায় কাব্যের অগৌরব করিয়াই অনেকে ক্ষান্ত নহেন, তাঁহারা আবার কাব্যের ঐতিহাসিক সমালোচনা করিতে ভাল বাসেন। তাহা যে হয় না, বা করিতে নাই, এ কথা আমরা বলি না; আমরা বলি, যে ঐরূপ সমালোচনা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের চর্চ্চার বিষয়। ঐরূপ আলোচনায় তুমি আমি সময় ক্ষেপ করিলে, কেবল যে সময়ের অপব্যবহার হয়, এমত নহে, প্রত্যুত তাহাতে কাব্যের পরাকৃতা সৃষ্টির মহত্ত্ব নষ্ট হয়, কাব্য প্রদত্ত দৃষ্টান্তের বল কমিয়া যায়, এবং আদর্শের আকর্ষণী শক্তি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়।

বালকের মুখেও মধ্যে মধ্যে শুনা যায়, যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ড বাল্মীকির লেখা নহে, উহা সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত; রামের সীতাবর্জ্জনের কথা মিথ্যা; শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকের পর রাম-সীতায় আর বিচ্ছেদ হয় নাই।

কাব্যেই কি, আর ইতিহাসেই কি, এইরূপে সত্য মিথ্যার বিচার করিতে, আমাদের বিশেষ আপত্তি আছে।

প্রথম ইতিহাসের কথা দেখ;—একখানি ইতিহাস দুইজনে বা দশজনে লিখিতেছেন,—তাহার মধ্যে একজনের লেখাকে মূল ও এবং অন্যের লেখাকে প্রক্ষিপ্ত এবং মিথ্যা বল কি? মনে কর লিবি এবং পলিবিয়স্ উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রোমের ইতিহাস লিখিলেন, তাহার একখানি সত্য, আর একখানি মিথ্যা কি? কখনই মিথ্যা নহে। কোন দেশের ধারাবাহিক বিবরণ দশজনে ক্রমে ক্রমে লিখিতে পারেন; একজন মানুষের জীবন চরিতও ক্রমে ক্রমে দশজনে লিখিতে পারেন। আগের লেখা, পরের লেখা দেখিয়া সত্য মিথ্যা কিছুই বলা যায় না।

কাব্যে—একথা অধিকতর রূপে খাটে। দশজনে ইলিয়দ লিখিয়াছেন বলিয়া ইলিয়দ্ কি একখানি পূর্ণকাব্য নহে? না; তাহার সমস্তই প্রক্ষিপ্ত বলিবে?

প্রক্ষিপ্ত অর্থ যদি পরে যোজিত হয়, তাহা হইলে, এই মনুষ্য দেহে—তোমাতে আমাতে, ঐ উদ্ভিজ্জশরীরে—তরুলতায়, ঐ জড় ভূমিতে,—মরু, বেলায়, ঐ আকাশের চন্দ্রসূর্য্যে, ঐ পৃথিবীর গ্রাম নগরে, ঐ নগরের মঠমন্দিরে, কোথায় রাশিরাশি প্রক্ষিপ্ত নাই! সর্ব্বত্রইত পরে যোজনা চলিতেছে। কিন্তু কেবল এক সাহিত্য সমালোচনার সময় ব্যতীত, আর কখনত তুমি কোন অংশ পরে যোজিত বলিয়া তাহার অগৌরব কর না। তোমার গোঁপ জোড়াটিও সে দিনকার প্রক্ষিপ্ত; কই তাহাতে তা দিতেত ছাড় না? তোমার শ্মশ্রুরাজিও ঘোর প্রক্ষিপ্ত; কই এক দিনও ত চুম্‌রাইতে ছাড় না? কেবল সাহিত্যের বেলায় নূতন নিয়ম করিবে কেন?

স্ত্রীলোকের গোঁপ—প্রক্ষিপ্ত পদার্থ বটে; হাসিবার সামগ্রী বটে,—প্রার্থনীয় বস্তু নহে। কেননা স্ত্রীলোকের গোঁপ বড় অসাজন্ত, বড় অখাপন্ত। স্ত্রীলোকের কোমলকান্তির ছন্দের সহিত তাহাদের গোঁপ মিল খায় না; অন্যান্য স্ত্রীলোকের মুখের সহিত সগোঁপ স্ত্রীমুখ খাপে না।*

তবে আমাদের সেই প্রথম কথা আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আর একদিক দিয়া আসিল। আমরা প্রথমেত বলিয়াছি, যে খাপিল কি না খাপিল,

* দিল্লীর ষ্টেশনের হোটেলে, আমি একদিন একজন শ্বেতাঙ্গী সগোঁপ রমণী দেখিয়াছিলাম। সেই এক হাস্যকরী বিভীষিকা।

তাহা লইয়াই বিশ্বাস ও অবিশ্বাস; খাপিল, কি না খাপিল, তাহা লইয়াই—সত্য ও মিথ্যা ধরা যায়, এবং এখন দেখা যাইতেছে, যে খাপিল, কি না খাপিল—এইটি ধরিয়াই কোন বিষয়টি প্রক্ষিপ্ত কি না, তাহা বুঝিতে পারা যায়। বে-খাপ সংযোজনা হইলেই প্রক্ষিপ্তি দোষ হয়; খাপ-সই সংযোজনা হইলে, আর প্রক্ষিপ্তি দোষ হয় না।

স্ত্রীলোকের দাড়ি গোঁপের কথা তুলিয়া আমরা একটা কথা এড়াইয়া আসিয়াছি; কিন্তু কথাটি পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক।

এমন তর্ক হইতে পারে, যে স্বভাবেও দুই একটা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে। সেই সকল নৈসর্গিক বিড়ম্বনা লইয়া কোন দিকেই মীমাংসা হইতে পারে না। পুরুষের দাড়ি গোঁপ উঠার কথা লইয়া বিচার চলিতে পারে। পুরুষের দাড়ি গোঁপ প্রক্ষিপ্ত নহে। আমরা পূর্ব্বে রহস্যচ্ছলে পুরুষের দাড়ি গোঁপ যে সেদিনকার প্রক্ষিপ্ত বলিয়াছি, সেটা আমাদের ভুল। কেননা পুরুষের দাড়ি গোঁপে সংযোজনা নাই, পরিণতি আছে মাত্র। পরিণতি কে কেহই প্রক্ষিপ্তি বলেন না, এবং পরিণতির অগৌরব কেহ করেন না। পূর্ব্ব পক্ষীয়গণ আরও বলিতে পারেন, মনুষ্য দেহে, উদ্ভিচ্ছরীরে, জড় রাজ্যে, জলে স্থলে, যে সংযোজনা ক্রিয়া নিয়ত চলিতেছে, তাহা পরিণামের সংযোজনা; সুতরাং তাহাতে কিছুমাত্র প্রক্ষিপ্তি দোষ নাই।

এই পূর্ব্ব পক্ষের তিনরূপ উত্তর পক্ষ আছে। প্রথম উত্তর, এই যে সংসারে পরিণতি ব্যতীত যোজনা নাই। ঐ যে আমার সম্মুখস্থ মল্লিকা চারায় কুসুম গুলি, মন্দ বাতাসে আস্তে আস্তে ফুটিতেছে, উহাও যেরূপ পরিণাম, আর এই যে আমি মসী-লেখনী-যোজনে একটির পর একটি বর্ণ সংযোগ করিতেছি, ইহাও সেইরূপ পরিণাম। ঐ যে বৃহস্পতি মঙ্গল স্থির ধীর জ্যোতিতে, স্থির ধীর গতিতে আমার মাথার উপর দিয়া চলিয়াছেন,—উহাও যেরূপ পরিণাম, আর ঐ দীন দুঃখী রুগ্ন দেহে ভগ্নস্বরে ভিক্ষা করিতেছে—ইহাও সেইরূপ পরিণাম। এই জগতে কেবল শক্তির পরিণাম ব্যতীত আর কিছুই নাই। পরিণামের মাঝখানে কোথাও আমরা একখানি হস্ত বা একটি মস্তিষ্ক দেখিলে, খানিকটা পরিণামকে আমরা সংযোজনা নাম দেই মাত্র। বাস্তবিক পরিণাম ভিন্ন কোন সংযোজনা নাই।

দ্বিতীয় কথা—যদি মস্তিষ্কের মধ্যবর্ত্তিতা দেখিয়া সংযোজনা বলিয়া একটি স্বতন্ত্র পদার্থ—স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে মনুষ্য কৃতি মাত্রই

সংযোজনা। আর, এক জন মনুষ্যের কৃতিতে আর এক জন মনুষ্যের কৃতি সংযোজনাকে প্রকৃত প্রক্ষিপ্ত বলিলে, সেই প্রক্ষিপ্তও দোষাবহ হয় না। কাব্যের প্রক্ষিপ্ত বাদে তোমায় আমায় বিরোধ যাইতেছে। সুতরাং ওটি ছাড়িয়া দিয়া মনুষ্যের অন্যরূপ কৃতির পর্য্যালোচনা করা যাউক। দেখা যাউক, অন্যত্র মনুষ্যের কৃতি যোজনাকে আমরা প্রক্ষিপ্ত বলি কি না?

একজন সুনিপুণ চিত্রকর একটি বিস্তৃত উপবনের মধ্যস্থিত মন্মথ মূর্ত্তি চিত্র করিয়াছে। সহকার শাখায় নবকিসলয় ঝলমল করিতেছে; পার্শ্বস্থিতা মাধবী সহস্র বাহুতে আলিঙ্গন করিতে ব্যগ্র; তবু যেন ধরি ধরি-করিয়া ধরিতে পারিতেছে না। পলাসের নিবিড় পত্র ঘটার মধ্যে তেমনই নিবিড় রক্তচ্ছটা—দূরহইতে যেন সদ্য জাত দাবানল বলিয়া ভ্রম হয়। নির্ম্মল সরসী কূলে, বকুলের পাশে মন্মথ দণ্ডায়মান। কণ্ঠে—বেলার কণ্ঠি, বক্ষে যূঁয়ের গোড়ে, কাণে চাঁপার দুল, হস্তে কুসুম শরাসন, মস্তকে ফেরের উপর ফের দিয়া ফুলময় উষ্ণীশ। মল্লিকা-স্তবকে ভ্রমর ভ্রমরী বিচরণ করিতেছে—মন্মথ স্থির দৃষ্টিতে তাহাই দেখিতেছেন। মনে করুন, বহু কাল পরে, এই চিত্রের পার্শ্বে—আর এক জন চিত্রকর কুসুম-ভূষণ-ময়ী রতি মূর্ত্তি চিত্রণ করিল। বনফুলে তাঁহার কবরীবন্ধন—জাতি ফুলের ঝালরে তাঁহার অবগুণ্ঠন। তাহাঁর ফুলের কাঁচলি, ফুলের আঁচলি। ফুলময় তালবৃন্ত লইয়া মন্মথের লক্ষ্য ভ্রমর ভ্রমরীকে মল্লিকা গুচ্ছ হইতে যেন অপসারিত করিতেছেন। দুই জন বিভিন্ন চিত্রকর বিভিন্ন সময়ে এই দুইটি মূর্ত্তি চিত্র করিয়াছেন বলিয়া শেষের টি প্রক্ষিপ্ত— সুতরাং অগৌরবের সামগ্রী—বলিবে কি? এখন তর্কস্থলে, যাহাই বল, আর কখন কেহও বলেন নাই।

চিরদিনই দেখিতেছি কুম্ভকার গঠন করিল, চিত্রকর চিত্র করিল, সাজওয়ালা সাজাইল, তবে পূর্ণ প্রতিমা হইল। অর্থাৎ স্বভাবে যেমন পরিণতি আছে—সুচারু শিল্পেও সেইরূপ পরিণতি আছে। দুই জন বা দশজন কারিগরে, একটি কারুকার্য্য করে বলিয়া, কার্য্যের কোন ক্ষতি হয় না, এবং শেষের কার্য্যও কাহারও অনাদরের পদার্থ হয় না।

তৃতীয়, কথা, এবং এইটিই আমাদের মূল কথা—এই যে, স্বভাবের সর্ব্বত্রই, মানব কার্য্যের সর্ব্বত্রই, উন্নতি, বৃদ্ধি, পুষ্টি, পরিণতি, স্ফূর্ত্তি—আছে—তবে কি কেবল কাব্যেই সেরূপ কিছু নাই? এমন কখনই হইতে পারে না। সকল সামগ্রীর মত কাব্যও গজাইয়া উঠে, ক্রমে ক্রমে

কাব্যও ফুটে, বাড়ে, পাকে; কোন বিশেষ কাব্যের প্রকৃতি ও পরিণামের গতি বুঝিয়া যিনি কাব্যের পরিপোষণার্থ তাহাতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উদ্ভাত করেন, তাহাঁর কীর্ত্তি অতি মহতী; উহাতে প্রক্ষিপ্তির দোষ হয় না। পরিণতির ঐশ্বর্য্য উদ্ভাসিত হয়।

জগতে অতুলনীয় মহাকাব্য রামায়ণ লইয়াই আমরা এই প্রক্ষিপ্তবাদের বিচার করিব।

উদ্ভট কথার প্রথমেই আমরা বলিয়াছি, "যে রামচন্দ্র নামে একজন রক্ত মাংসের মনুষ্য হস্ত পদাদি লইয়া এই পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য বিচরণ করিয়াছিলেন কি না—এই কথা ভাবিরয়া, এই কথার বিচার করিয়া তোমার আমার মত সামান্য জীবের কোন ফল নাই।" * * * "তোমার আমাব পক্ষে সংসার ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য বা আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি জন্য—ঐ কথার বিচার করিয়া কোন ফল" নাই। অর্থাৎ রামায়ণ কতদূর ঐতিহাসিক বা প্রামাণিক, আমাদের পক্ষে তাহার বিচার করা আমরা আবশ্যক বোধ করি না।

আমাদের মূল কথা ঐ; সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রক্ষিপ্তবাদের কথা তুলিয়া—এই বলিতে চাই যে, রামায়ণকে কেবল কাব্য বলিয়া ধরিয়া লইলে, রামায়ণ একজনের লেখা কি না, একাধিক কবির লেখা হইলে, কতটুকু কাহার লেখা—ইত্যাদি বিষয়ের বিচারেরও প্রয়োজন নাই।

রামায়ণের ন্যায় জাতীয় মহাকাব্য—জাতীয় কৃতি ও জাতীয় সম্পত্তি। একজনে বা দশজনে, উহার শ্লোক যোজনা করিলেও উহাতে কোটি কোটি লোকের মনোভাব সমষ্টি সন্নিবেশিত থাকে। জুবর্টের মহামেলা কি কেবল জুবর্টেরই কীর্ত্তি বলিবে? মূল ধারণা জুবর্টের, এবং তাহাতেই তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব বলিতে হয়। সমগ্র সপ্তকাণ্ড রামায়ণ যদি মহর্ষি বাল্মীকির রচনা হয়, তাহা হইলেও তাঁহার কৃতিত্ব সেইরূপ বলিতে হইবে। তবে জড় পদার্থ সংগ্রহের জন্য জুবর্টকে যেরূপ ভিক্ষা করিতে হইয়াছিল, জাতীয় মনোভাব সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে সম্ভবত সেরূপ ভিক্ষা করিতে হয় নাই। মনীষীগণের মহদাত্মায় সমগ্র জাতীয় জীবন প্রতিফলিত হয়; তাঁহাদের মহাকাব্যে জাতীয় মনোভাব সুতরাং প্রকটিত হয়।

আর্য্য চরিত্রের সরলতা, সত্যপালন, সহিষ্ণুতা, দার্ঢ্য, বীর্য্য, নিষ্ঠা,—জড়ে উদাসীনতা, জীবে মায়া মমতা, প্রীতি, ভক্তি, আনুরক্তি; আর্য্য সমাজে

অনার্য্যের উৎপাত,—আর্য্য রাজ পরিবারের কলঙ্ক-বৃক্ষ বহু বিবাহ ও সেই কলঙ্ক বৃক্ষের কণ্টকময় ফল সপত্নী-বিদ্বেষ,—পুরুষের পত্নীভক্তি, নারীর পাতিব্রত্য, ভ্রাতৃপ্রণয় ও ভ্রাতৃ বিবাদ—জাতীয় জীবনের সমগ্র চরিত কেমন স্বতন্ত্র ভাবে, অথচ মহাযোগে রামায়ণে মিলিত রহিয়াছে। দশটিভাব একত্র হইয়া রামনামে একটি মহাভাব হইয়াছে। রঘু-বীর, দশরথ-তনয়, লক্ষ্মণাগ্রজ, সীতাপতি, রাবণারি, সুগ্রীব-সহায়, বিভীষণ-মিত্র, হনুমৎপ্রভু—শ্রীরাম। সেইরূপ দশরথ, সেইরূপ লক্ষ্মণ, সেইরূপ রাবণ, সেইরূপ সীতা। তাহাতেই এমন বিশ্ববিশ্রুত মহাকাব্য জগতে আর নাই। এই অতুল্য মহাকাব্য মৃত না জীবন্ত? আমরা বলি জীবন্ত এবং পরিণতিশীল।

উত্তরকাণ্ড বাল্মীকির রচিত হৌক, আর নাই হৌক, উহা প্রক্ষিপ্ত, সুতরাং আদরণীয়, অবিশ্বসনীয় এবং ত্যজ্য—একথা কখনই বলিতে দিব না। এ বিষয়ে বাঙ্গালি কবি কৃত্তিবাস বড় সার কথা বলিয়াছেন।

"উত্তর কাণ্ডেতে ছয় কাণ্ডেরি বিশেষ;
সীতাদেবী করিলেন পাতালে প্রবেশ।

এই বিশেষ কথাটি বড় সুন্দর, বড় সার্থক; ছয় কাণ্ডের স্ফূর্ত্তিই উত্তরকাণ্ডে; উত্তর কাণ্ডেই ছয় কাণ্ডের বিশিষ্ট পরিণতি। উহার জান, উহার মূল কথা পরিণতির পরিণতি—

সীতাদেবীর পাতাল-প্রবেশ।

দেবীর পাতাল-প্রবেশের পরও অনেক কথা উত্তর কাণ্ডে আছে; স্বয়ং রামের সরযূ প্রবেশের বার্ত্তা আছে; কিন্তু উত্তর কাণ্ডের পরিচয়ে, কৃত্তিবাস সে সকল কোন কথা বলেন না।

রাম চন্দ্র করিলেন সরযূ প্রবেশ।

সচ্ছন্দে বলা যাইতে পারিত; কৃত্তিবাস তাহা বলেন নাই। স্বীকার করিতে, হয়ত একটু কুণ্ঠিত হইতে হইবে, কোলব্রুক, শ্লেগেল পাঠ নিষ্ফল হইয়াছে, ভাবিয়া হয়ত একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে হইবে—কিন্তু এমন সম্ভব হইতে পারে, যে প্রাচীন কৃত্তিবাস ওঝা ঠাকুর তোমা আমা অপেক্ষা কাব্যের অধিকতর রসগ্রাহী ছিলেন।

উত্তরকাণ্ডে যে ছয়কাণ্ডের বিশেষ স্ফূর্ত্তি, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। যে রামরাজ্য এখন জগদ্বিখ্যাত, সেই রাজ্যেশ্বর আদর্শ নৃপতি রাজারামকে, আমরা বিশেষরূপে উত্তর কাণ্ডেতেই দেখিতে পাই।

আত্মচরিত্রে প্রজাকে সদ্দৃষ্টান্ত দান করা—রাজার একান্ত কর্ত্তব্য। আর্য্য-নারীর চরিত্রে কেহ মিথ্যা রটনা করিলেও আর্য্যনারী কলঙ্কিত হন। এই কঠোর শিক্ষা প্রজাসাধারণকে প্রদান করিবার জন্য রাজারাম সীতা সাম্রাজ্ঞীকে বিসর্জ্জন করেন। ইদানী রাজ-কর্ত্তব্যতা আমরা জানি না; সাংসারিক আত্মত্যাগ,—তাহাও ভুলিতে বসিয়াছি সুতরাং রামের সীতা বিসর্জ্জন আমরা বুঝিতেই পারি-না। সুতরাং উত্তরকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত বলিলেই সকল বালাই যায়। "ও সকল মিথ্যা কথা!" "তা কি কখন হয়!"

বাস্তবিক মিথ্যা কথা নয়, কিন্তু বড় বিষম কাণ্ড! 'স্ত্রীবিসর্জ্জন মাত্রই ক্লেশকর—মর্ম্মভেদী। যে কেহ আপন স্ত্রীকে বিসর্জ্জন করে, তাহারই মর্ম্মো-চ্ছেদ হয়। যে বাল্যকালের ক্রীড়ার সঙ্গিনী, কৈশোরে জীবন সুখের প্রথম শিক্ষাদাত্রী, যৌবনে যে সংসার সৌন্দর্য্যের প্রতিমা, বার্দ্ধক্যে যে জীবনাবলম্বন—ভাল বাসুক, আর না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে? গৃহে যে দাসী, শয়নে যে অপ্সরা, বিপদে যে বন্ধু, রোগে যে বৈদ্য, কার্য্যে যে মন্ত্রী, ব্যসনে যে সখী, বিদ্যায় যে শিষ্য, ধর্ম্মে যে গুরু,—ভাল বাসুক আর না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জ্জন করিতে পারে? আশ্রমে যে আরাম, প্রবাসে যে চিন্তা, স্বাস্থ্যে যে সুখ, রোগে যে ঔষধ, অর্জ্জনে যে লক্ষ্মী, ব্যয়ে যে যশঃ, বিপদে যে বুদ্ধি, সম্পদে যে শোভা,—ভাল বাসুক বা না বাসুক কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জ্জন করিতে পারে? আর যে ভাল বাসে, পত্নী বিসর্জ্জন তাহার পক্ষে কি ভয়ানক দুর্ঘটনা! আবার যে রামের ন্যায় ভাল বাসে," সীতার জন্য যে সবংশে রাবণ পাত করিয়াছে—"তাহার কি কষ্ট! কি সর্ব্বনাশ! কি জীবন-সর্ব্বস্ব-ধ্বংস যন্ত্রণার অধিক যন্ত্রণা!" লোক শিক্ষার্থ লোকরঞ্জনার্থ—শ্রীরামের এই আত্মোৎসর্গই—রাজা রামের বিশেষ পরিচয়। এই পরিণতিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নিঃক্ষেপ করিবে?

উত্তরকাণ্ডে-সহিষ্ণুতা প্রতিমা সীতাসতীরও বিশেষ স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ছয় কাণ্ডের মধ্যে, সীতা রাজ কুলবধূ হইয়া ও দুইবার বনবাসিনী। প্রথমবারে সীতা স্বেচ্ছায় পতি শুশ্রূষার্থ, পতি সোহাগে সোহাগিণী হইয়া, রাম সহবাসে বনবাসিনী। সম্মুখে যে স্বর্ণসিংহাসন চমক দিতেছিল, সেদিকে তিনি একবার ফিরিয়া দেখিলেন না, যে কৈকেয়ী মাতা হইতে এই দারুণ অনর্থপাত হইল, তাঁহার দুর্বুদ্ধির কথা একবারও ভাবিলেন না, প্রফুল্লমনে স্বামীর অনুসারিণী হইলেন। বনবাসেও একদিন বিমর্ষভাব

নাই; বনচারী জীব জন্তুর, পশু পক্ষীর লালনের পালনের যেন সদাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। এই এক বিচিত্র মূর্ত্তি। কিন্তু অশোকবনের মূর্ত্তি আরও বিচিত্র! সেই রাম-গত-প্রাণা এখন আর রামকে দেখিতে পান না; সেই লক্ষ্মণ প্রহরীই বা কোথায়! যাহা বলিতে নাই, রাবণ আসিয়া তাহাই বলেন, যাহা শুনিতে নাই, সীতা তাহাই শুনেন, যাহা করিতে নাই রাবণের চেড়ীগণ সীতার উপর তাহাই করে। যাতনার উপর যাতনা, মধ্যে মধ্যে মনে হয়, রাম বিচ্ছেদের তিনিই ত মূল,—যদি তিনি স্বর্ণমৃগের অনুসরণ করিতে রামকে অনুরোধ না করিতেন—সীতা আর ভাবিতে পারেন না। এত দুঃখেও তবু তিনি রাম সোহাগে সোহাগিনী। তাঁহারই জন্য ত আজি চারিদিকে"জয় জয় রাম" ধ্বনিত হইতেছে। শ্রীরামের বিক্রমে আজি কনক লঙ্কা টলিতেছে—তাঁহারই জন্য ত। স্বামীবিচ্ছেদ যেন কাহারও কপালে কখন না হয়, কিন্তু যদি কখনও হয়, তাহা হইলে তাহাতে যেন এমনই সোহাগই থাকে!

কিন্তু উত্তরকাণ্ডের বনবাস, কেবলমাত্র যন্ত্রণাময়। সীতা যে স্বামী-সোহাগে বঞ্চিত হইয়াছেন, এ সংশয় সীতার মনে একবারও উঠে নাই। কোনও আর্য্যসতী কখন সে ভাবনা ভাবেন না। সীতার দারুণ দুঃখ, যে হয়ত মুনীপত্নীরা মনে করিবেন, যে তিনি স্বামী সোহাগে বঞ্চিতা হইয়াছেন; হয়ত তাঁহারা রামের প্রজা বাৎসল্যের গভীরতা বুঝিবেন না, হয়ত সীতার জন্য তাঁহারা রামকে কি কথাই বলিবেন! "হাঁ লক্ষ্মণ, রাম কি জন্য আমাকে বনে দিলেন, এই কথা মুনিপত্নীরা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি কি বলিব?" জিজ্ঞাসা করি, এই সীতা যদি না দেখিতে, তবে সেই অশোকবনের সীতা, সেই পঞ্চবটীর সীতা—বুক চিরিয়া, বুকের ভিতর বসিতে পারিত কি?

আর, সীতার সেই শেষ পরীক্ষা। সেই শুভ্র বসনে, আনত আননে সভাস্থলে আগমন; রামের সেই সস্নেহ গম্ভীর আবেদন এবং আদেশ। আর সর্ব্বশেষে সীতার সেই সতীত্বের শপথে প্রাণদানে পরীক্ষা-দান। বিলাত হইতে এক প্রক্ষিপ্তবাদ আনিয়া তোমরা রামায়ণ হইতে এই সকল ত্যাগ করিতে বল? তাহা কি কখন পারা যায়? ছয়কাণ্ডের বিশেষ যাহাতে আছে, রামায়ণের সেই অপূর্ব্ব পরিণাম, কখন কি ত্যাগ করিতে পারা যায়? তাজ মহলের গম্বুজ সর্ব্বশেষে হইয়াছে বলিয়া, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বল? ত কি কখন পারা যায়!

# নবজীবন।

২য় ভাগ } জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩। { ১১শ সংখ্যা।

## নৈমিত্তিক প্রলয়।

একসহস্র সত্য, একসহস্র ত্রেতা, এক সহস্র দ্বাপর এবং এক সহস্র কলিযুগ লইয়া ব্রহ্মার একদিন হয়। ব্রহ্মার একদিনের নাম এক কল্প। এক এক কল্পের মধ্যে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর হইয়া থাকে। তদন্তে ব্রহ্মার দিবাবসান ও নিদ্রাকাল উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ত্রৈলোক্যের সার্ব্বভৌমিকী স্থূলশক্তি ক্ষয়জন্য ঈশ্বরীয় স্থূল সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব-রূপ ব্রহ্মার নিদ্রা কল্পিত হইয়াছে। সে নিদ্রা কেবলমাত্র প্রকৃতির স্থূল-ধাতুর ও তদন্তর্গত ব্রহ্মকর্ত্তৃত্বের বিরাম বোধক। নতুবা ঈশ্বরের নিদ্রা অসম্ভব।

ব্রহ্মার দিবাবসান অর্থাৎ ব্রহ্মনিদ্রা নিমিত্ত যে ত্রৈলোক্যের লয়, তাহার নাম নৈমিত্তিক প্রলয়। এই প্রলয় দ্বারা কৃতক শব্দবাচ্য ভূলোক, ভুবলোক, ও পিতৃদেবমিলিত স্বর্গলোক,—এই লোকত্রয় বিনষ্ট হয়। জনলোক, তপোলোক ও ব্রহ্মলোকের তুলনায় এই ত্রিলোক-বিশ্ব স্থূল ভোগের স্থান। এসমস্ত লোকে যেরূপ স্থূল ভোগের অধিকার, যেরূপ বাসনা ও অদৃষ্ট বিদ্যমান, এবং অন্ন, জল, তেজঃ, প্রভৃতির যেরূপ স্থূল প্রভাব বর্ত্তমান, তাহা সামান্যত প্রকৃতির স্থূল-ধাতু মাত্র। সেই সমষ্টি স্থূল-ধাতু ক্ষয় অথবা অধিষ্ঠাতৃদেবতা ব্রহ্মার দিবাবসান—একই কথা। সেই অবস্থা উপস্থিত হইলেই উপরি উক্ত লোকত্রয় নৈমিত্তিক প্রলয়ে বিলীন হইয়া থাকে।

নৈমিত্তিক প্রলয়ে পঞ্চীকৃত ভূত-পঞ্চের মহাতেজোময় ও পরম পবিত্র দীর্ঘস্থায়ী সত্বাংশ দ্বারা বিরচিত জন, তপ ও ব্রহ্মলোকের বিন্দুমাত্র ক্ষতি

হয় না। যে সকল সাধুব্রত পুরুষেরা পৃথিবী অবধি ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত স্বর্গত্রয়ের ভোগ্য বিষয়ানন্দ, পিতৃ ও দৈবকর্ম্ম-নিষ্পন্ন সামান্যফল প্রভৃতি হীন ভোগ ত্যাগ করিয়া যোগসাধন, সন্ন্যাস, বা ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা চিত্তকে উন্নত করিয়াছেন, তাঁহারাও বিপদ্‌গ্রস্ত হন না। তাঁহারা ভূতপঞ্চের নির্য্যাসিত যে প্রকার সত্ত্বগুণের সেবা করেন; সূক্ষ্মভূত নিষ্পন্ন মনোবুদ্ধি-প্রধান সূক্ষ্ম দেহ মাত্রের অবলম্বনে যে প্রকার বিচরণাদি করেন, বাহ্য ইন্দ্রিয়, প্রাণ বায়ু, ক্ষুৎ, পিপাসা প্রভৃতিকে দমন-পূর্ব্বক যেরূপ মানসিক সূক্ষ্মশক্তির ভজনা করেন, বাহ্য যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে প্রকার প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া করেন, বাহ্য দেব-দেবীর পূজা ত্যাগপূর্ব্বক যে প্রকার সূক্ষ্মদেহাদির অধিষ্ঠাতৃ হিরণ্যগর্ভাদি দেবতার ধ্যান ধারণা করেন,—তাহাতে উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট ত্রৈলোক্যের বিনাশে তাঁহাদের সূক্ষ্ম দেহাবলম্বন পূর্ব্বক সূক্ষ্ম ঐশ্বর্য্যভোগের ও তাহার ফলদাতা স্বরূপ হিরণ্যগর্ভদেবের সহবাসে সাত্ত্বিক আনন্দ সম্ভোগের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না। অত এব ত্রিভুবনের তাদৃশ বিলয়কালে জনলোক, তপোলোক ও ব্রহ্মলোক অটল থাকে। তথাকার নিবাসিগণ তখন রক্ষা পান এবং ত্রৈলোক্যে সেই সকল উন্নত স্বর্গের ভাগী যত যোগী, সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী থাকেন, সে সময়ে তাঁহারা সস্কল্প মানসত্যক্ত স্থূলকলেবর সকল অবাধে ত্যাগপূর্ব্বক ঐ সমস্ত জ্যোতির্ম্ময় ভুবন আশ্রয় করেন। তাদৃশ মহাবিপ্লব সময়ে মহর্লোক একেবারে জনশূন্য হইয়া যায়। মহর্লোকবাসী মহাত্মারা সকলেই যোগৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন। এজন্য তাঁহারা সকলেই উদ্ধার লাভ পূর্ব্বক জনলোক আশ্রয় করেন।

অতএব নিশ্চয় হইল যে, নৈমিত্তিক প্রলয়ে অন্ন, জল, তেজঃ প্রকৃতির স্থূল প্রভাব বিনষ্ট হয়। সূক্ষ্ম, সাত্ত্বিক ও তৈজস প্রভাব বর্ত্তমান থাকে। সূক্ষ্মভূতগণ ও স্থূল ভূত সংখ্যা সমুদয়ই বর্ত্তমান থাকে। কেবল পৃথিবী এবং পিতৃ ও দেবলোকে ধ্রুব তারা পর্য্যন্ত পৃথিবীর ন্যায় যত বসতি-স্থান, ভোগ্য-স্থান, ও সুখধাম আছে, সমস্তই, প্রলয়-কবলিত হয়। উপরিউক্ত বৃহদায়তন ক্ষেত্রের অন্তর্গত দেব পিতৃ প্রজাপোষক সূর্য্যচন্দ্র পৃথিব্যাদি প্রত্যেক ভূগোলক সঙ্কর্ষণানলে দগ্ধ হইয়া প্রলয়াগ্নি সম্ভূত অথচ স্বয় অব্যবহিত কারণ স্বরূপ ক্রমে একার্ণবীভূত হইয়া যায়। উহার কুত্রাপি একটি জীবও বিদ্যমান থাকে না। উহার জাগ্রত কালে পরমাত্মার ব্রহ্মানামক যে

অধিষ্ঠান, উহার নিয়মানে নিযুক্ত থাকে, তাহাই নিদ্রিত হইয়া যায়। এক মহাঘোরা কালরাত্রি এই ত্রিভুবনকে গ্রাস করিয়া ফেলে। তাহার নাম ব্রহ্মরাত্রি (ব্রহ্মার রজনী)। যদবধি জনলোক, তপোলোক ও ব্রহ্মলোক অবস্থিত করে, সে পর্য্যন্ত পৃথিবী হইতে ধ্রুবতারা পর্য্যন্ত যে ত্রিলোকবিশ্ব, তাহা এইরূপে বার বার প্রলয় প্রাপ্ত এবং বার বার সৃষ্ট হয়। সেইজন্য তৎসমূহকে 'কৃতক' কহে। 'ত্রৈলোক্যমেতৎ কৃতকং' 'কৃতকং প্রতিকল্পং কার্য্যত্বাৎ। (বিঃ পুঃ ২।৭।১৯।)

জীবের স্থূলশরীর, পার্থিব প্রাণ, এবং স্বর্গীয় কলেবর সম্বন্ধীয় যে সুখভোগের অধিকার তাহা স্বভাবত চিরস্থায়ী নহে। তাহার সহিত প্রকৃতির যে অংশের লিপ্ততা এবং ঈশ্বরের যে কর্তৃত্ব বিদ্যমান আছে তাহাও চিরস্থায়ী হইতে পারে না। এই কারণে নৈমিত্তিক প্রলয়ে, দেহ, ভোগস্থান প্রকৃতি এবং তাহাদের সুব্যক্ত সম্বন্ধের যুগপৎ প্রলয় উপস্থিত হইয়া থাকে এবং তাহার অন্তর্গত ঈশ্বরীয় কর্তৃত্বস্বরূপ ব্রহ্মাও নিদ্রাভিভূত হন।

জীবদেহে নিদ্রাই একটি প্রলয়, কিন্তু-মৃত্যুর ন্যায় তাহা ভয়ঙ্কর নহে। মৃত্যুকে যদি প্রাকৃতিক প্রলয়ের সহিত তুলনা দাও, তবে নিদ্রা, নৈমিত্তিক বা অবান্তর প্রলয়ের তুল্য হইবে। অতএব জীবদেহে নিদ্রাই ক্ষুদ্র প্রলয়-স্বরূপ। শরীরের বীর্য্য ও শক্তি প্রতিদিনই নিস্তেজ হইয়া যেমন প্রতিদিনই নিদ্রা উপস্থিত করে, সেইরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ভূরাদি ত্রিলোকের সমুদয় ব্যবহারিক শক্তি প্রত্যেক সহস্র চতুর্যুগান্তে হ্রাস হইয়া যায়। তাহাতেই ব্রহ্মনিদ্রা, নৈমিত্তিক প্রলয় বা কল্পান্ত সংঘটিত হয়। এইরূপ অবান্তর প্রলয় অস্বাভাবিক নহে। জীবদেহে সমস্ত দিনের জাগরণ ও পরি-শ্রমের পর নিদ্রা উপস্থিত হওয়া যদি স্বাভাবিক হয়, বৃক্ষ সকলের এক বা দুই বর্ষকাল ফল ধারণান্তে ফল প্রসবের শক্তি ক্ষয় জন্য যদি এক বা বর্ষদ্বয় বিরাম গ্রহণ করা স্বাভাবিক হয়, ফল ও পুষ্প বৃক্ষ সমূহের ঋতুবিশেষে নবপল্লব, মুঞ্জরী, পুষ্প, ফল প্রসবান্তে অবশিষ্ট ঋতুকালে সুষুপ্তবৎ থাকা যদি স্বাভাবিক হয়, দীর্ঘকাল স্বল্প-বৃষ্টি, মন্দবায়ু, উত্তাপাতিশয্যের পর যদি মহামহা বৃষ্টি ও ঝড় উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক হয়, তবে এই ত্রিলোক-বিশ্ব, সহস্র-চতুর্যুগব্যাপ্ত ও জীবন্ত থাকিয়া তাহার পর ক্রমশ শক্তিক্ষয়, বীর্য্যক্ষয়, ভোগক্ষয় বশতঃ নৈমিত্তিক প্রলয়রূপ যে একটি ঘোর নিদ্রাতে অভিভূত হইবে তাহাকেও স্বাভাবিক ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। যখন এই পৃথিবীতে সময়ে

সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্তর উৎপাত দেখা দিতেছে, তখন অবান্তর-প্রলয়রূপা বৃহৎ বিপদ সকলও যে প্রত্যেক নিরূপিত সময়ান্তে উপস্থিত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যখন পৃথিবী, অগ্নি ও জলপ্লাবনে অদৃশ্য হইতে পারে, তখন স্বর্গও যে পারিবে না; এমন স্থির করা উচিত নহে, কারণ স্বর্গও ভোগের স্থান। যেখানে ভোগ আছে, সেই খানেই ক্ষয় আছে।

ফলত ঋষিরা আমাদের ন্যায় যুক্তি পরতন্ত্র হইয়া বা কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া এই সকল প্রলয়ের বিবরণ শাস্ত্র-বদ্ধ করেন নাই। এ সমস্ত তত্ত্ব ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশ স্বরূপ; তাঁহাদের যোগারূঢ়া ও বিক্ষেপ-চলন-বর্জ্জিতা বুদ্ধিতে উদয় হইয়াছিল। আমাদের পারলৌকিক উপকারার্থ তাহা তাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন। এইক্ষণ আমাদের যেরূপ যুক্তি ও বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা আমরা ঐ সকল তত্ত্ব পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারি না। তথাপি শাস্ত্রীয় যুক্তির অনুগত হইয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিলে বুঝিতে পারি যে, আমার শরীররূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে যখন নিত্য নিত্য নিদ্রারূপ নৈমিত্তিক প্রলয় হইতেছে, এবং একদিন মৃত্যুরূপ মহাপ্রলয় হইবে; তখন সেই সকল ধাতুতে বিনির্ম্মিত, তদীয় উত্তর-সাধক-রূপ ভূরাদি ত্রৈলোক্য কেন সেইরূপ নৈমিত্তিক লয়কে না পাইবে? এবং কেনই বা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডীয় সমস্ত স্থূল-সূক্ষ্ম তত্ত্ব কোন নিরূপিত দীর্ঘকালান্তে মহাপ্রলয়ে কবলিত না হইবে? শাস্ত্রীয় যুক্তির প্রসাদাৎ আরো বুঝিতে পারি যে, যখন, সূক্ষ্মদেহ-নিবন্ধন আমার এই পৃথিবীতে বা অন্য লোকে পুনরুদয় হইবে, তখন সর্ব্বভূতের সূক্ষ্মবীজ-স্বরূপিণী প্রকৃতি নিবন্ধন এই নৈমিত্তিক বা প্রাকৃতিক সৃষ্টি আবার কেন প্রকাশ না পাইবে? চিন্তা ব্যতীত, ধ্যান ব্যতীত, সাধনা ব্যতীত, শাস্ত্রাচার্য্যের বাক্যে শ্রদ্ধা ব্যতীত,—এ সকল তত্ত্ব ধারণ করা যায় না। অশ্ব, রথ, দাস, দাসী, অট্টালিকা, সংবাদপত্র, পুস্তকালয়, সভারোহণ, বক্তৃতা, অর্থকরী-বিদ্যা এবং অন্যান্যরূপ বিষয়বুদ্ধিপ্রদ ব্যাপারের মধ্যে ঐ সকল তত্ত্বের স্থান হয় না, কেবল স্থির চিত্ত শাস্ত্রীয় বুদ্ধি সম্পন্ন ধীরেরা তাহার সত্যতায় নিঃসংশয় হয়েন।

প্রাকৃতিক সৃষ্টি অবধি প্রাকৃতিক প্রলয় পর্য্যন্ত ব্যাপী বিষ্ণুর যে দিবাভাগ তদন্তর্গত কালমধ্যে যতবার নৈমিত্তিক সৃষ্টি ও প্রলয় হয় তাহা হিরণ্যগর্ভের অধিকারভূত। মানবের যেমন শতবর্ষ পরমায়ু, ব্রহ্মারও সেইরূপ ব্রাহ্মপরিমিত শতবর্ষ পরমায়ু। প্রত্যেক মানব যেমন আত্মেন্দ্রিয়ে

মনোবুদ্ধি প্রাণাদির ব্যষ্টি-মাত্র, তদবস্থায় কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বের আধার বিশেষ, এবং স্বতন্ত্র কার্য্যমাত্র, ব্রহ্মা সেইরূপ সমস্ত সূক্ষ্মদেহাবচ্ছিন্ন আত্মার সমষ্টি অধিষ্ঠাতা। সেই কারণে তিনি বেদান্তাদি শাস্ত্রে জীবঘন বলিয়া উক্ত হন। তিনি সমুদয় কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বের নিয়ন্তা এবং সামান্যত সমস্ত পৃথক পৃথক্ কার্য্যের অখণ্ড ঘনীভূত কারণ স্বরূপ। ব্যষ্টি লক্ষণাক্রান্ত মানবের যেমন জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও মৃত্যু এই চারি অবস্থা, সমষ্টি লক্ষণাক্রান্ত ব্রহ্মারও ঐ চারি অবস্থা। ঐ সমষ্টি অবস্থা চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রত্যেকে স্ব স্ব জাতীয় সমগ্রব্যষ্টি অবস্থার বীজস্বরূপ। সর্ব্বজীবের একাত্মন এবং অখণ্ড প্রাণ স্বরূপ ব্রহ্মার জাগরণেই সকলের সৃষ্টিরূপ জাগরণ ও স্থূল দেহের আবির্ভাব। এই জাগ্রত অবস্থায় তাঁহার সংজ্ঞা বিরাট। জগতে স্থূলদেহ ও জাগ্রত অবস্থা আবির্ভূত হওয়ার পূর্ব্বে সূক্ষ্মদেহও অঙ্কুরাবস্থা মাত্র ছিল। সামান্য স্বপ্নে, স্বপ্ন-দেহ ও ভোগ্য পদার্থ যেমন স্থূলত্বে পরিণত হয় না, কেবল অঙ্কুরবৎ অথবা জাগরণ ও নিদ্রার সন্ধিবৎ উপলব্ধি হয়, তদ্রূপ অঙ্কুরবৎ বা সন্ধিবৎ ছিল। সর্ব্বজীবের এইরূপ সূক্ষ্মাবস্থা স্বতন্ত্র বা স্বয়ম্ভূ নহে, কিন্তু তজ্জাতীয় একমাত্র সর্ব্বগত সমষ্টি বা সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক তত্ত্বের ব্যষ্টিভাব। সেই সমষ্টি ভাবটি ব্রহ্মার স্বপ্নাবস্থারূপে কথিত হয়। সেই অবস্থা সমস্ত অঙ্কুরের গর্ভাঙ্কুর। কাঠকে 'ঊর্দ্ধমূলঃ অবাক্শাখঃ' ইত্যাদি শ্রুতির ভাষ্যে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—"অবিদ্যাকামকর্ম্মাব্যক্ত বীজ প্রভবঃ পরব্রহ্ম বিজ্ঞানক্রিয়া শক্তিদ্বয়াত্মক হিরণ্যগর্ভাঙ্কুরঃ সর্ব্বপ্রাণি লিঙ্গভেদস্কন্ধঃ।" অবিদ্যাকাম কর্ম্মস্বরূপিণী বীজপ্রকৃতি এই সংসার বৃক্ষের প্রভবস্থান, পরব্রহ্মের জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তিদ্বয়রূপী হিরণ্যগর্ভ তাহার অঙ্কুর, সর্ব্বপ্রাণীর সূক্ষ্ম-শরীর তাহার স্কন্ধ। পৃথক্ পৃথক্ সূক্ষ্ম দেহ সেই মূল অঙ্কুরাবস্থারই ব্যষ্টি। সেই অবস্থাই ব্রহ্মার সূক্ষ্ম বা স্বপ্নাবস্থা। তাদৃশ অবস্থায় তিনি হিরণ্যগর্ভ নামে কথিত হন। সুষুপ্তি অবস্থাতে তিনি স্বসৃষ্ট সর্ব্বভূতের লয়স্থান এবং ভাবী সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ। তখন উপাদানকারণ-রূপিণী প্রকৃতিও তাঁহার সহিত নিদ্রিত হয়। এই অবস্থায় তাঁহার সংজ্ঞা, সর্ব্বজ্ঞ জগৎ,কারণ,ঈশ্বর,মহত্তত্ত্ব ইত্যাদি। মৃত্যু সময়ে,ঈশ্বর,হিরণ্যগর্ভ,বিরাট, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি সংজ্ঞার অভাববশত তিনি প্রাকৃতিক-সৃষ্টির বীজভূতা আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্তের লয়স্থানস্বরূপিণী পরমাত্মার তটস্থা-শক্তিতে লীন হইয়া যান এবং তাঁহার অধিকারস্থ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার অনুবর্ত্তী হয়। জীব যেমন

মৃত্যুর পর সূক্ষ্মদেহ নিবন্ধন পুনঃ শরীর ধারণ করেন, ব্রহ্মাণ্ড সেইরূপ অনাদি কামকর্ম্মবীজস্বরূপিণী ঐশী-শক্তিবশাৎ পুনরাবির্ভূত হইয়া আবার নৈমিত্তিক সৃষ্টি ও নৈমিত্তিক প্রলয় করিয়া থাকেন।

নৈমিত্তিক অর্থাৎ অবান্তর প্রলয় অনেকবার হইয়া গিয়াছে। ঋষিরা তাহা যোগবলে জানিয়াছিলেন। ব্রহ্মার ১০০ বর্ষ পরমায়ুর মধ্যে ৫০ বর্ষ গত হইয়াছে। তাহা তাঁহার 'প্রথম পরার্দ্ধকাল' বলিয়া কথিত হয়। সেই ৫০ বর্ষের মধ্যে ১৮০০০ দিনমান ও ১৮০০০ রাত্রিমান ছিল। তন্মধ্যে প্রথম বর্ষে (অর্থাৎ প্রথম ৩৬০ দিন ও ৩৬০ রাত্রিতে) তিনি কিছু সৃষ্টি করেন নাই। সেই কাল যাবৎ তিনি পরব্রহ্মের সৃষ্ট অণ্ডেতে বাস করিয়াছিলেন। সেই এক ব্রাহ্মবর্ষের মানবীয় পরিমাণ ৩১১০৪০০০০০০০০০ বর্ষ। সেই দীর্ঘকাল যাবৎ এই ব্রহ্মাণ্ড নানা গ্রহতারারূপে বিভক্ত না হইয়া একমাত্র মহাসৌর অণ্ডে ঘনীভূত ছিল। ব্রহ্মার আয়ত্তাধীন প্রকৃতিশক্তির স্বাভাবিক বিক্ষেপবশাৎ কালক্রমে তাহা হইতে জ্বলন্ত পাবকের স্ফুলিঙ্গের ন্যায় গ্রহতারা চন্দ্রসূর্য্য দশদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া অসীম গগনমণ্ডলকে শোভাময় করিয়াছে। সুতরাং ১৮০০০ দিবারাত্রি হইতে উপরি উক্ত ৩৬০ দিবারাত্রিকে বিয়োগ করিলে ১৭৬৪০ দিন ও ১৭৬৩৮ রাত্রি অবশিষ্ট থাকে। অতএব ব্রহ্মার বিগত ৫০ বর্ষক্রমের মধ্যে ১৭৬৪০ বার নৈমিত্তিক সৃষ্টি ও ১৭৬৪০ বার নৈমিত্তিক প্রলয় হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত নৈমিত্তিক সৃষ্টি ও প্রলয় বর্ত্তমান প্রাকৃতিক-সৃষ্টিরই অন্তর্গত। তাহার প্রথমটির নাম ব্রাহ্মকল্প এবং দ্বিতীয়ের নাম পাদ্মকল্প ছিল। অবশিষ্ট ১৭৩৮টি কল্পের নাম শাস্ত্রে আছে কিনা সন্দেহ।

এখন ব্রহ্মার দ্বিপরার্দ্ধ আয়ু আরম্ভ হইয়াছে। দ্বিপরার্দ্ধের অর্থ তাঁহার দ্বিতীয় ৫০ বর্ষ। এই কাল মধ্যে ১৮০০০ বার নৈমিত্তিক সৃষ্টি ও ১৮০০০ বার নৈমিত্তিক প্রলয় হইবে। ঐ দ্বিতীয় ৫০ বর্ষের মধ্যে সম্প্রতি কেবল তাঁহার প্রথম দিন মাত্র চলিতেছে। সুতরাং এই বর্ত্তমান নৈমিত্তিক-সৃষ্টি উক্ত ১৮০০০ সৃষ্টির প্রথমটি মাত্র। ইহার নাম শ্বেতবরাহ কল্প। অন্যান্য কল্পের ন্যায় এ কল্পেও ১০০০ সত্য, ১০০০ ত্রেতা, ১০০০ দ্বাপর ও ১০০০ কলিযুগ আছে। তন্মধ্যে ২৮টি সত্য, ২৮টি ত্রেতা, ২৮টি দ্বাপর এবং ২৭টি কলিগত হইয়া গিয়াছে। এখন অষ্টাবিংশতি কলিযুগ প্রবর্ত্ত হইয়াছে। একটি সত্য, একটি ত্রেতা, একটি দ্বাপর, একটি কলি,

এই চারিটি একত্রে এক মহাযুগ শব্দে কথিত হয়। সুতরাং অষ্টাবিংশতি মহাযুগের কলিযুগ এখন বর্ত্তমান। অবশিষ্ট মহাযুগ সকল ভবিষ্যৎ কালের গর্ব্ভে তিমিরাবৃত রহিয়াছে। কাল কি অচিন্ত্য ব্যাপার! ব্রাহ্ম পরিমিত ৩০ দিন ও ৩০ রাত্রি ধরিয়া ব্রহ্মার মাস পরিকল্পিত হয়। অতএব বর্ত্তমান শ্বেতবরাহ কল্পটি ব্রহ্মার দ্বিপরার্দ্ধ কালের অন্তর্গত প্রথম বর্ষের (অর্থাৎ এক শত বর্ষের) প্রথম মাসের প্রথম দিন স্বরূপ। এই প্রথম মাসের অবশিষ্ট ২৯ দিনে যে ক্রমে ২৯টি কল্প হইবে তাহার নাম শব্দকল্পদ্রুমে আছে। তাহার পর্য্যায়ে ১২৯৭০টি কল্প হইবে, তাহার নাম শাস্ত্রে না থাকিতে পারে। সে সব নাম করণ হইয়াছে কি না সন্দেহ।

এই বর্ত্তমান শ্বেতবরাহ কল্পের অন্তর্গত এক সহস্র মহাযুগের অষ্টাবিংশতি মহাযুগ এখন চলিতেছে। অবশিষ্ট ৭২টি মহাযুগ অনাগত। তাহার এক একটি মহাযুগ (অর্থাৎ চতুর্যুগ) মানবীয় ৪৩২০০০০ বর্ষ পরিমিত। অতএব সমুদয়ের পরিমাণ মানবীয় ৪১৯৯০৪০০০০ বর্ষ। এই মহাকাল গত হইলে পর, আগামী নৈমিত্তিক-প্রলয় সংঘটিত হইবে; তাহার পূর্ব্বে প্রলয় হইবে না; কিন্তু মন্বন্তর, ও যুগ পরিবর্ত্তন নিমিত্ত অল্প বিস্তর বিপদ সমূহ, বহু বহু কালান্তে এক এক বার উপস্থিত হইতে পারে।

শাস্ত্রে আছে যে, নৈমিত্তিক প্রলয় নিকটবর্ত্তী হইলে ভূমণ্ডল শতবর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টিতে শস্যহীন ও ক্ষীণপ্রায় হইবে। তাহাতে সূর্য্যের সপ্ত কিরণ পরিপুষ্ট হইয়া এককালে সপ্তসূর্য্যের উদয় হইবে। সেই উত্তাপে ভূমণ্ডল জলকণাশূন্য হইবে। বৃক্ষলতা জীবজন্তু সমস্ত বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। পৃথিবী কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় নগ্ন আকৃতি ধারণ করিবে। সেই সময় সঙ্কর্ষণাগ্নি সমুদয় পাতালতল দগ্ধ করিয়া ভূতলকে ভস্মসাৎ করিবে। ত্রিলোকস্থ অন্যান্য লোক মণ্ডল সমূহও দগ্ধ হইয়া যাইবে। কেন না সে সমস্তই ভূমণ্ডলের সঙ্গে একই সম্বন্ধ শৃঙ্খলে গ্রথিত। ভোক্তা, ভোগ্য, ভোগায়তন ও ভোগধাম এই সমস্ত সম্বন্ধই বিরাম প্রাপ্ত হওয়া প্রলয়ের হেতু। সুতরাং নৈমিত্তিক প্রলয়ে ভূলোকাবধি ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত সমস্তই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। সমস্ত লোকমণ্ডল সঙ্কর্ষণানলে দগ্ধ হইয়া অণ্ডকটাহরূপ ভুবন-কোষ এক মহা-ভর্জ্জন-কটাহের আকার ধারণ করিবে। তৎকালে যোগৈশ্বর্য্য সম্পন্ন মহাপুরুষেরা স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক জনলোকে উত্থান করিবেন। মহর্লোক দগ্ধ হইবে না, কিন্তু জনশূন্য হইয়া যাইবে। তথাকার ব্রহ্মজ্ঞ ও যোগীগণ জনলোক

আশ্রয় করিবেন। সঙ্কর্ষণাগ্নি এইরূপে দশদিকে আপনার জ্বালামালারূপ মহান্ আবর্ত্ত বিস্তার করিলে, ত্রৈলোক্যের কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে না। সমস্তই ভস্ম ও বাষ্পাকার হইয়া যাইবে। তাহা হইতে ক্রমে মহামেঘ সমূহ উৎপন্ন হইবে। তাহার মহাশব্দে নভোমণ্ডল পূর্ণ হইবে। তৎপরে সমস্ত লোকমণ্ডলে শতাধিক বর্ষকাল স্থূল ও অবিরল জলধারা বর্ষিত হইবে। ধ্রুব ও সপ্তর্ষি পর্য্যন্ত সমস্ত ত্রিলোক সেই জলে প্লাবিত হইয়া যাইবে। সমস্ত ত্রিলোক একার্ণবীভূত হইবে। তাহার পর ত্রিলোকব্যাপী মহাবায়ু উত্থিত হইবে। সেই বায়ু শতবর্ষ বহিবে। তাহাতে মেঘ সকল সংহার প্রাপ্ত হইবে। অনন্তর ব্রহ্মরূপী বিষ্ণু, সমুদয় বায়ু সংহারপূর্ব্বক সেই একার্ণবে শেষশয্যায় শয়ন করিবেন। তিনি সত্যসত্যই নিদ্রা যাইবেন এমন উক্ত হয় নাই। কেবল স্থূল জগতের সহ তাঁহার সম্বন্ধ রহিত হইবে, ইহাই উক্ত শয়ন বা নিদ্রার তাৎপর্য্য। তিনি আপনা আপনি থাকিবেন ইহাই উদ্দেশ্য। তৎকালে সূক্ষ্ম ও যোগৈশ্বর্য্য সম্পন্ন জনলোক, তপোলোক ও ব্রহ্মলোক থাকিবে। তথাকার ব্রহ্মজ্ঞ ও যোগীগণ সেই ব্রহ্ম রাত্রিতে ধ্যানযোগে ভগবতী যোগনিদ্রাকে আশ্রয় করিবেন। সেই সমুদয় রাত্রিকাল যাবৎ নিম্নস্থ ত্রৈলোক্য একার্ণবীভূত থাকিবে। নিম্নে দশদিক্ নিস্তব্ধ, ও গাঢ় অন্ধকারাবৃত হইবে। সেই জল, সর্ব্বগুণযুক্ত হইয়া ভাবি সৃষ্টির উপাদান কারণরূপে অবস্থিতি করিবে। তৎকালীন চতুর্দ্দিক্ব্যাপী নিস্তব্ধ অন্ধকারময় অসীম কারণ-জলে একমাত্র ব্রহ্মরূপী নারায়ণ শেষশয্যা-শায়ী হইয়া ভাবি সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ রূপে ভাসমান থাকিবেন। ইহারই নাম নৈমিত্তিক প্রলয়। এইরূপ প্রলয় স্মরণ পূর্ব্বক ভূতমাত্রা ও ইন্দ্রিয়মাত্রা প্রভৃতি জগতের উপাদান কারণকে নিত্য কহা গিয়া থাকে। কিন্তু প্রাকৃতিক প্রলয়কে স্মরণ করিলে সর্ব্বভূতের সদ্রূপ আধারস্বরূপ একমাত্র ব্রহ্মভিন্ন কিছুই নিত্য শব্দের যোগ্য হয় না।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

---

# অপূর্ব্ব ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

## রেলগাড়ি অধ্যায়।

চারি বৎসরের বেশী হইবে না, একবার গ্রীষ্মাবকাশ কালে মনে করিলাম ঢাকা যাই, প্রাচীন সহরটা দেখিয়া আসি; ইচ্ছার সহিত কিছুকাল যুদ্ধ করিয়া হারি মানিলাম—যাইতেই হইল। রজনী ঠিক সাড়ে আট ঘটিকার সময় সিয়ালদহের আড্ডায় উপনীত হইলাম। লোকে লোকারণ্য। রেলগাড়ি গুলি গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া আসিয়া যথা স্থানে দাঁড়াইল, এঞ্জিন্‌টা হুহুঙ্কার নাদ ছাড়িতে লাগিল, যেন যাইতে চায়। দেখিয়া ব্যস্ত হইলাম, কেননা এখনও টিকিটের ঘর খোলা হয় নাই। ঘণ্টা বাজিল, সঙ্গে সঙ্গে টিকিট ঘরের জানালা খুলিয়া গেল। অমনি শ্রাদ্ধের কাঙালির মত এক এক জানালায় শত শত লোক দাঁড়াইয়া ঠেলাঠেলি আরম্ভ করিল। কাহার সাধ্য টিকিট ক্রয় করে। দেখিয়া আমার প্লীহা চম্‌কিয়া গেল। সাহেবেরা ঘরের ভিতর ঢুকিয়া অনায়াসে আপনাপন টিকিট আনিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া আমিও চলিলাম, কিন্তু দ্বারবান যাইতে দিল না। শুদ্ধ না যাইতে দেওয়া নয়, তাহার সঙ্গে আর যাহা করিয়াছিল, তাহা বলিব না; বলিবার দরকারও নাই; তাহা দেশী আরোহী মাত্রেই বোধহয় অবগত আছেন।—সেদিন ঢাকা যাইবার আশা ছাড়িয়া বাড়ী চলিলাম। পরদিন যথা সময়ে আবার সিয়ালদহে উপনীত হইয়া, টিকিটঘরে ঢুকিয়া টিকিট লইলাম। কেহ কিছু বলিল না—আজ আমি সাহেব সাজিয়াছিলাম। দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজিয়া গেল আরোহিরা তাড়াতাড়ি যাইয়া গাড়িতে আসন লইল। দেখি, এক এক খানি গাড়ি এক একটি সিরাজুদ্দৌলার ব্লাকহোল হইল। চতুর্থশ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণীর অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল, এই সকল আরোহীর মৃতশরীর পরাম্পর্কে নিহিত হইবে। আমার দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিন্তু খুঁজিয়া দ্বিতীয় শ্রেণী পাই না; অবশেষে দেখিতে পাইলাম দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য সবে চারিখানি বেঞ্চ। দুখানী পুরুষের, দুখানি স্ত্রীলোকের জন্য। স্ত্রীলোকের গাড়ির দ্বারে উহা যে কেবল স্ত্রীলোকের জন্যই তাহা লেখা রহিয়াছে সুতরাং তাহাতে

উঠিতে চেষ্টা করিলাম না। পুরুষের গাড়িতে পুরুষ পূর্ণ—অতিরিক্ত ডোজে পূর্ণ। ষ্টেসন মাষ্টারকে যাইয়া অবশ্য জানাইলাম। আমি সাহেব, সুতরাং তৎক্ষণাৎ স্ত্রীলোকের গাড়ি আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। লিখিত কাষ্ঠফলক উঠাইয়া লওয়া হইল। গাড়ি ছাড়িল। আমি শয়ন করিলাম।

"বগ্‌লো–বগ্‌লো—চাই চুরট, চাই পান—বিশ মিনিট গাড়ি রহেগা"; ইত্যাদি সুমিষ্ট শব্দে উঠিয়া বসিলাম। উঠিয়াই দেখিলাম, কাহার কতক গুলিন লগেজ আমার গাড়িতে রহিয়াছে। তাহার পর দেখিলাম, একজন উঁচু দরের ইংরেজ (ধরণে বোধ হইল সিবিলিয়ান) গাড়ির দরজা ধরিয়া প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইয়া। আমি ভদ্রতা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম—

"মহাশয় এ জিনিশ গুলি কি আপনার?

"হাঁ।"

"আপনি এই গাড়িতে যাইবেন?"

"হাঁ।"

"কোথায় যাইবেন?"

"সম্প্রতি গোয়ালন্দে।"

"পরে।"

"ঢাকা।"

ঠিক এই সময়ে সাহেবের একজন লোক আসিয়া গাড়িতে বসিল—অবশ্য চাপরাশী। সাহেব চলিয়া গেলেন,—আমি দেখিলাম, ষ্টেশন মাষ্টারকে চুপি চুপি কি বলিয়া—প্রথম শ্রেণীর গাড়িতে যাইয়া উঠিলেন। মনে মনে বলিলাম বেশ্—প্রকাশ্যে চাপরাশীকে বলিলাম "টিকিট দেখ্‌লাও।" দেখাইল, দেখিলাম, চতুর্থ শ্রেণীর। মিথ্যাবাদী সাহেবের উপর ক্রোধ হইল—বলিলাম, "নামিয়া যাও, এ গাড়ি নয়।" চাপরাশী ফাঁপরে পড়িল। তাহার সাহেব বলিয়াছে, এই গাড়িতে বসিতে, আবার আমি সাহেব বলিতেছি—যাইতে, এখন সে কি করিবে। "না ধরিলে রাজা বধে, ধরিলে ভুজঙ্গ" সে ইতস্তত করিতে লাগিল, আমি পুলিশম্যান ডাকিলাম; তাহারা উহাকে নামাইয়া দিল। উহা দেখিয়া সাহেব আসিয়া ক্রোধ করিয়া পুলিশম্যানকে বলিল, 'হামারা আদমী এই গাড়িমে যাগা।" আমি বলিলাম, "তোমার লোক তোমার গাড়িতে লইয়া যাইতে পার।" ইহাতে সাহেব ক্রোধ রক্তিম চক্ষে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আমি প্রথম শ্রেণীর

আরোহী, আমার লোক চতুর্থ শ্রেণীর টিকিট লইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে যাইতে পারে।" সাহেবের উপর আমার একটু রাগ ও একটু ঘৃণা হইয়াছিল—আমিও অমনি তৎক্ষণাৎ তীব্রস্বরে বলিলাম "তুমি যে প্রথম শ্রেণীর আরোহী, তৎ সম্বন্ধেও আমার সন্দেহ আছে।" এইবার, সাহেব নরম হইলেন। অনুভবে বুঝিলাম, এও দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহী। গাড়ি ছাড়িবার সময় হইল, সাহেব প্রথম শ্রেণীতে আর তাহার লোকটা চতুর্থ শ্রেণীতে যাইল। গাড়িও ছাড়িল। চাপরাশীর কাছে শুনিয়াছিলাম, লোকটা মাজিষ্ট্রেট, আর ব্যবহারে বুঝিতে পারিলাম, লোকটা ছোট লোকও বটে, পাজিও বটে। কেন না এতগুলি টাকা বেতন পাইয়াও—অল্পের জন্য, রেল কোম্পানিকে লগেজের পয়সা গুলি ফাঁকি দিবার চেষ্টা। আমি আরও অনেক এইরূপ ছোট লোক সাহেব দেখিয়াছি, যাহারা এই গাড়িতে যাইব বলিয়া, এ গাড়িতে কিছু, ও গাড়িতে কিছু এইরূপে মালের বিলি ব্যবস্থা করিয়া, আর কতগুলি মাল লইয়া অন্য গাড়িতে যায়। আমাদের নায়কও সেই দলের সাহেব। দুর্ভাগ্য—এরাই আবার বিচারক! যাহা হউক, আমিও সাহেবকে কিছু জব্দ করিবার জন্য মনে মনে একটা উপায় স্থির করিলাম। একে বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক, তায় সাহেবের পোষাক, এখন আমাকে পায় কে? ইহাকেই সাহেবেরা আপনা ভাষায় বলে "টিট্ ফর ট্যাট্"—এখন সাহেবের ট্যাট্ হইতে, বাঙ্গালীর টিটটী ভাল হইয়া ছিল কি না, পাঠক বিচার করিবেন।

কূট বুদ্ধিতে বাঙ্গালীর মাথা বেশ চলে, সুতরাং আমাকে অনেকক্ষণ ভাবিতে হইল না। অল্প ক্ষণের মধ্যেই গাড়ি আসিয়া পরের ষ্টেশনে থামিল। অমনি আমি গম্ভীর নাদে, সাহেবী টোনে, গার্ডকে ডাকিলাম। ডাকিবা মাত্রই গার্ড আসিয়া হাজির। আমি তাহাকে একটু ব্যস্ত ও একটু (Serious) ক্যজের লোক হইয়া কহিলাম—"দেখ গার্ড! এই বেওয়ারিশ মালগুলি কাহার পড়িয়া আছে; তুমি এখনই তুলিয়া লইয়া যাও; নচেৎ খোয়া গেলে তুমি দায়ী হইবে; আমি হইব না, তোমায় বলিয়া রাখিলাম।" ইহা শুনিয়া গার্ড যথার্থই একটু ব্যস্ত হইল এবং তৎক্ষণাৎ কুলি ডাকিয়া মাল গুলিন ব্রেক্‌বানে নিতে প্রবৃত্ত হইল। সাহেব তাঁহার মালগুলিন স্থানান্তরিত হইতেছে দেখিয়া অতি ক্রোধে আসিয়া গার্ডকে বলিলেন, "তুমি কাহার কথায় আমার জিনিষ পত্র স্থানান্তর করিতেছ?" গার্ড আমাকে দেখাইয়া বলিল "ইনি বলিতেছেন,

এগুলি বেওয়ারিশ, ; বিশেষত আমিও দেখিতেছি, ইহার মালিক এ গাড়িতে কেহ নাই, এবং এত গুলি মাল যে ওজন হইয়াছে, তাহারও কোন লেবেল ইহার গায়ে নাই সুতরাং ব্রেকবানে রাখিয়া দিব, যাহার জিনিষ, তিনি শেষ ষ্টেশনে ওজন মত ইহার দাম দিয়া লইয়া যাইবেন।" এখানে গাড়ি অনেক ক্ষণ থাকে না, বিশেষত ষ্টেশন মাষ্টার তাঁহার পরিচিত নহে—অগত্যা সাহেব আমার দিকে চাহিয়া একটি ভ্রুকুটি করিয়া চলিয়া গেলেন। মাল গুলি, গার্ড লইয়া গেল। বলা বাহুল্য যে আমি বিশাল হাস্য করিয়া সাহেবের ভ্রুকুটির জবাব দিয়া ছিলাম।

এখানে বলিয়া রাখা উচিত, যে সম্প্রতি রেলওয়ে গবর্ণমেণ্টের হাতে এ সকল বিসদৃশ ঘটনা আর প্রায়ই ঘটে না—কর্ম্মচারিগণ রাঙ্গামুখ দেখিয়াও, নিয়ম রক্ষা করিতে ভুলেন না। এই জন্য সাহেব মহালে ষ্টেট রেলওয়ের বিরুদ্ধে এত দুঃখের কাহিনী শুনা যায়।

যাহা হউক, গাড়ি ছাড়িয়া দিলে আমি শয়ন করিলাম; রাত তখন প্রায় দুইটা। কিছু নিদ্রার আবেশ হইয়াছে—আবার "চাই পান, চাই চুরট"—গাড়ি থামিল। কিছুকাল পরে, মৃদু হস্তে কে গাড়ির দরজা ঠেলিতেছে—খুলিতে পারিতেছে না। উঠিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইলাম। একটি সুন্দরী রমণী আমাকে দেখিয়া দু-পা সরিয়া গেলেন। আমি বাঙ্গালায় কহিলাম "কি চাও" রমণী ভয়ের স্বরে ইংরেজিতে বলিলেন "Is this Second Class Carriage ?" আমি গাড়ির দ্বার খুলিয়া বলিলাম "হাঁ—আপনি এই গাড়িতে আসিবেন,—আসিতে পারেন, আমি বাঙ্গালী"। রমণী হাসিয়া, এবার সাহসের সহিত আমাকে হাসি মুখে প্রকারও "Thanks" দিয়া গাড়িতে উঠিলেন। একটি বাবু কিছু জিনিষ দিয়া গেলেন, আমি তাহা গুছাইয়া রাখিলাম। আবার মৃদুহাসি আবার "Thanks"। বলিতে লজ্জা করে বঙ্গরমণীর মুখে ইংরেজী ধন্যবাদ আমাকে বড়ই মিষ্ট লাগিয়াছিল। গাড়ি ছাড়িল। কিছুকাল উভয়েই চুপ করিয়া রহিলাম, রমণী আমাকে দেখিতেছিল কি না, বলিব না। আমি ভাল করিয়া দেখিতে ছিলাম। কেন না আমি কিছু বিভ্রাটে পড়িয়া ছিলাম। কেন না, কোন্ রূপে কাহার আবির্ভাব আমার গাড়িতে হইল, তাহাই আমি ভাবিতে ছিলাম। প্রথম মনে করিয়াছিলাম, কোন উচুদরের কীর্ত্তনওয়ালী; কিন্তু সঙ্গে প্যানটুলন পরা বাবু দেখিয়া, মৃদঙ্গ না দেখিয়া, ইংরেজী কথা শুনিয়া, খরতাল ছড়াছড়ি না দেখিয়া এবং পদে খাইহীল—লেডীসু দেখিয়া,

মনে একটা খটকা বাধিয়া গেল। তাই এখন রমণীর আপাদ মস্তক ভাল করিয়া দেখিতে ছিলাম—রমণীর বয়স্ অনুমান ১৬।১৭; একহারা ও একটু দীর্ঘাকার শরীর; মুখখানি বেশ সুন্দর—ওষ্ঠাধর তাম্বুল-রাগ-বর্জ্জিত—বর্ণ ন শ্যাম ন গৌর; মুখে অল্প অল্প পাউডার দেওয়া; কর্ণে ক্ষুদ্র শম্বুকের দোলক; প্রকোষ্ঠে রৌপ্য চুড়ি। গলায় লম্বা স্বর্ণ চেন: তাহার সঙ্গে বক্ষের পকেটে ঘড়ি। পরিধানে সাদা সিমি বা শর্ট ও কালাপেড়ে ধুতি, ফুল মোজা ও বুট জুতা।—পাঠক বলুন দেখি এ রমণী কে?

কলিকাতা অঞ্চলে এক দল চটুকে ছেলে—বৎসর বৎসর স্কুলের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী হইতে বাহির হইয়া আনন্দ-সংসারে বিলীন হয়েন,—আমি তাহাদের একজন হইলে, হয়ত সুবিধা পাইয়া এ হেন রমণীর সঙ্গে বেশ কিছু রসিকতার ছড়াছড়ি করিতাম, টপ্পা গাইতাম, টপ্পা গাইতে বলিতাম। দীনবন্ধু বাবুর নদের চাঁদের মত বিশ্বস করিতাম না—এ খোষ-পোষাকী রমণী গৃহস্থ কামিনী হইতে পারেন।—আর যদি প্রাচীন দলের হিন্দু হইতাম, তাহা হইলেও হয়ত, দুর্গানাম স্মরণ করিয়া, একটু সরিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিতাম, "ওগো বাছা, কোথায় বায়না হইয়াছে?" যাহা হউক, আমি সহজেই বুঝিতে পারিলাম, যে হয় ইনি—আজি কালিকার পরীক্ষোত্তীর্ণা ধাত্রী হইবেন, না হয় কোন ব্রাহ্ম-রমণী কিম্বা ব্রাহ্ম-কন্যা হইবেন। আমার বদনে বিলক্ষণ একটা (Brown study) ভাবনার চিহ্ন পড়িয়া গিয়াছে, রমণী বুঝিতে পারিয়া, অগ্রে তিনিই নিস্তব্ধ-ভাব দূর করিলেন। কহিলেন, "মহাশয় বড়ই ভদ্র লোক।" কিন্তু আমি তাঁহার কথার উত্তর দিতে পারিলাম না। কেন না এ কথায় "হাঁ, আমি ভদ্রলোক" ইহাও বলা যায় না, কিম্বা "আমি ভদ্র লোক নয়" ইহাই বা কিরূপে বলি? আমার ভাবনা ঘুচিল না। সুতরাং পুনরায় তিনি কহিলেন,—"আপনি বিলাত হইতে কত দিন আসিয়াছেন"? তাঁহার কথার এইবার জবাব দিলাম। বলিলাম,—

"আপনি আমাকে বড় ভদ্রলোক কহিয়াছেন তার পরই কহিতেছেন, আমি বিলাত হইতে কবে আসিয়াছি—যদি বিলাত যাওয়ার সঙ্গে এ ভদ্রতার কিছু সংস্রব থাকে, তবে আমাকে স্বীকার করিতে হইবে, আমি কোনক্রমে ভদ্রলোক নই।"

রমণী উত্তর শুনিয়া, একটু আশ্চর্য্যান্বিত ও একটু স্তম্ভিত হইলেন।

ইংরেজ বাঙ্গালীকে ইংরেজ মনে করিয়া অবশেষে নেটিব্ টের পাইলে যেরূপ স্তম্ভিত হন—বোধ হয়, সেইরূপ স্তম্ভিত হইলেন। আমি দেখিয়া শুনিয়া আবার বলিলাম "আমি যে বিলাত যাই নাই—একথাটার আপনি একেবারে শেষ মীমাংসা করিয়া লইবেন না।"

রমণী এইবারে একেবারে আনন্দে অধীরা হইয়া হাসিয়া বলিল—"ও না, না, না,—আপনি বলুন আর নাই বলুন, আমি আপনাকে দেখিয়াই বুঝিয়াছি।"

আমি একেবারে ও সকল কথা ছাড়িয়া দিয়া অন্য কথা পাড়িলাম, বলিলাম—

"আপনি একাকিনী কোথায় যাইতেছেন?"

"আমি একাকিনী নহি, সঙ্গে লোক আছে।"

"লোক কোথায়?"

"থার্ড ক্ল্যাশে।"

"কেন?"

"তিনি বাবার কেরাণী, কার্য্যানুরোধে কলিকাতা আসিয়া ছিলেন,—এ দিকে আমাদেরও ছুটি হইল, তাই তাঁরি সঙ্গে বাবার কাছে যাইতেছি। প্রথমে উভয়ে এক গাড়িতেই আসিতে ছিলাম—বড় ভিড়, এইজন্য টিকিট বদ্‌লাইয়া এই গাড়িতে আসিয়াছি।"

"কেরাণী বাবু আপনার পরিচিত?"

পরিচিত না হইলেও বাবার চিঠি আনিয়া ছিলেন।"

"পিতা যাইতে লিখিয়াছেন?"

"না।"

"তবে কিরূপে যাইতেছেন?"

"ছুটি হইলে আমি ত একাকীই যাইয়া থাকি, উপরন্ত লোক পাইলাম, বিশেষ সুবিধাই হইয়া গেল।"

"কত দূর যাইবেন?"

"বরিশাল।"

"ষ্টীমারে যাইবেন?"

"ষ্টীমারেই যাইব বটে, ঢাকা হইয়া যাইব।"

"কেন?"

"দিদির সহিত দেখা করিয়া যাইব।"

"আপনি কোথায় পড়েন ?"

"বেথুন স্কুলে থার্ড ইয়ার ক্লাসে"

"বিএ ক্ল্যাসে ?"

"হাঁ।"

"বোর্ডিংএ থাকেন।"

"না—আগে ছিলাম।"

"কেন ?"

"তাহার অনেক রহস্য।" এইবারে বেথুন স্কুলের বোর্ডিংএর অনেক রহস্য শুনিতে পাইলাম, কিন্তু সে কথা এখানে নয়।

এইরূপে ক্রমে আমাদের যত আলাপ হইতে লাগিল, ততই উভয়ের মানসিক নৈকট্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং উভয়ে সরিয়া অধিকতর নিকটে বসিলাম। অপরে দেখিলে মনে করিত হিন্দু স্বামী স্ত্রীতে, বা ব্রাহ্ম ভ্রাতা ভগিনীতে আলাপ করিতেছে। পরিচয় এবং অন্যান্য অনেক কথার পর আবার এইরূপ কথোপকথন চলিতে লাগিল। প্রথম আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—

"আপনার বিবাহ হইয়াছে ?"

"না—,—আপনার ?"

"আমারও হয় নাই ?"

কিছুকাল নীরবে থাকিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন।

"আপনি কি মেম্ বিবাহ করিবেন ?"

"বলিতে পারি না"

"কেন বিদ্যাবতী বুদ্ধিমতী বাঙ্গালির মেয়েও ত পাওয়া যায় ?"

"আদৌ বিবাহ করিব কি না তাহা ঠিক করি নাই।"

এইখানে বিবাহ করা উচিত কি অনুচিত এসম্বন্ধে তিনি আমাকে একটি লেক্‌চার দিয়া বলিলেন—'আপনাকে বিবাহ করিতে হইবে, আমি ভাল মেয়ের ঘটকালি করিয়া দিব।" আমি বলিলাম,—

"যদি কখন ভাল মেয়ে পান, তার একখানি ফটোগ্রাফ্ আমাকে পাঠাইয়া দিবেন।" রমণী একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমার কয়েক জন সহপাঠিকা বন্ধুর ফটোগ্রাফ্ আমার নিকট আছে, তারই একখানি আপনাকে দিতেছি

পছন্দ হইলে জানাইবেন।" এই বলিয়া একটি চর্ম্মপেটিকা খুলিয়া একখানি ক্যাবিনেট সাইজ্ ফটোগ্রাফ্ আমার হাতে দিলেন। আশ্চর্য্য! এ তাঁহার নিজের ফটোগ্রাফ্। দেখিয়া আমি হাসিলাম, তিনিও হাসিলেন। এরূপ উপহার পাইলে ইংরেজ যে ভাবে উহার সম্মান প্রদর্শন করেন; আমিও তাহাই করিয়া উহা আমার ওয়েষ্ট-কোটের পকেটে রাখিয়া দিলাম। পাঠক অবাক্ হইবেন, কেননা দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে এত বড় একটা ব্যাপার করিয়া ফেলিলাম।

পাঠক অবাক হউন বা না হউন, আমি কিন্তু একটা কথা ভাবিয়া বড়ই অবাক্ হইলাম,—কথাটা এই—আমি বড়ই কুৎসিত—তাই অবাক হইতে-ছিলাম—যে বাঙ্গালীর মেয়ে কালেজে পড়িয়া কিছু বেশী গোছ লেখাপড়া শিখিলে কি ডেস্‌ডিমনার অভিনয় করিয়া থাকে, না হাট্ কোট্‌ধারী পুরুষ মাত্রকেই তাহারা সুন্দর দেখিয়া থাকে !!!

প্রায় পাঁচটা বাজে,—সারা রাত আহার নাই, নিদ্রা নাই, তাহার উপর ক্লান্তি—কেবল কথা—কেবল কথা; মাথা ঘুরিতে লাগিল; চক্ষু বেদনা করিতে লাগিল,—সঙ্গিনীর অবস্থাও সেইরূপ—আমি দেখিয়া শুনিয়া বাক্স হইতে ক্ষুদ্র কিরসিন ষ্টোব্ বাহির করিয়া জল গরম করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "জল গরম করিতেছেন কেন?" আমি "ক্ষুধা পাইয়াছে ও অনিদ্রা হেতু শরীর খারাপ হইয়াছে সুতরাং কফি খাইব," ইহা কহিয়া কফি—চিনি ও প্রিজর্ভ দুগ্ধ ও পেয়ালা বাহির করিলাম, এই অবসরে তিনিও কয়েকখানি প্যাটি বাহির করিয়া বলিলেন—"দেখুন যদি খাও যায়, আপনার সহিত কথোপকথনে—খাইবার জিনিষ যে সঙ্গে আছে তাহা ভুলিয়া গিয়াছি।" উত্তম হইল—উভয়ে কফি খাইলাম, প্যাটিও খাইলাম। শরীর সুস্থ হইল। বোধ হইতে লাগিল, ইহার উপর একটু ব্রাণ্ডি হইলে বুঝি আরও ভাল হয়; সুরাপায়ীদের এইরূপ বোধ হইয়াই থাকে—বলিতে লজ্জা করে, আমার সামান্য অভ্যাস আছে। এতক্ষণ কেবল ব্রাহ্ম ভগিনীর ভয়ে চুপ করিয়া ছিলাম, এখন আর পারিলাম না। আস্তে আস্তে ষ্টোব্ পেয়ালা প্রভৃতি যথা স্থানে রাখিয়া বোতল গ্লাস বাহির করিলাম। কিন্তু আগে আমার ভয় হইয়া ছিল, কিন্তু সঙ্গিনীর অবিকৃত ও প্রসন্নময় মুখমণ্ডল দেখিয়া সাহস হইল। সঙ্গিনী মধুর ভাষায় মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"কি ব্রাণ্ডি খাইবেন ?" আমি গ্লাসে ঢালিতে ঢালিতে বলিলাম, "একেত পেটের

পীড়া, তার উপর কফি খাইয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছি সুতরাং কিছু এ ট্রিমেন্ট না খাইলে বাঁচিব না। আমাকে মাপ করিবেন।” সঙ্গিনীও অমনি বলিলেন, “তাই ত আমারও পেটের অসুখ, তার উপর কাফি খাওয়া ভাল হয় নাই”, আমি আশয় বুঝিয়া গ্লাস তাঁহার হাতে দিয়া খাইতে অনুরোধ করিলাম; তিনি যথারীতি দুই তিন বার ‘অভ্যাস নাই’ প্রভৃতি আপত্তি করিয়া অনায়াসে এক চুমুকে আমার ঢালিত সেই (Herculian Bumper) এক পো পরিমিত হলাহল পান করিলেন। মনে মনে কহিলাম, ‘আমি কোথায়’!!!

তৎপর হৃদয় প্রসন্ন হইলে শুনিতে পাইলাম, তাহার পরমাত্মীয় • • • • • • যিনি কোন উচ্চ উদ্দেশ্যে আবার বিলাত গিয়াছেন, তিনিই ইহাকে হলাহল পানের প্রথম শিক্ষা প্রদান করেন। আর ইহাও শুনিলাম, তাঁহার অনেক স্বজাতীয়া বন্ধুও এই নির্দ্দোষ পানানন্দে দীক্ষিতা। আজি কালি টইলেটে কিছু বেশী ল্যাবেণ্ডর ও ইউডিকোলোঞের ব্যবহার হয়।

• • • • •

প্রাতঃকাল হইল গাড়ি আসিয়া পদ্মা তটে গোয়ালন্দে থামিল। আমরা নামিলাম। পথে আমার সেই পূর্ব্ব পরিচিত সাহেবের সহিত দেখা হইল, তিনি মালামাল গুছাইয়া লইতে ব্যস্ত তথাপি একটু হাসিয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “আমি দেখিতেছি, আডামের ন্যায় তুমিও শূন্য গাড়িতে আত্মশরীর হইতে একটি ইব্ সৃজন করিয়া লইয়াছ, থাকবন্ধু! আমিও ইন্ফরনাল সার্পেণ্ট রূপে তোমার ইডেনে আসিতেছি।”

সাহেবের এহেন মোটা রসিকতায় আমি কিছু বিরক্ত হইলাম। কেননা, সাহেব কদাপি স্বদেশীয় একজন ভদ্র মহিলাকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহারই সম্মুখে এরূপ পরিহাস করিতে সাহস করিতেন না। কিন্তু সঙ্গিনীকে এই কথা শুনিয়া ভাব-মুগ্ধার ন্যায় সাহেবের দিকে বিড়াল লালসায় দৃষ্টি করিতে দেখিলাম। ইহাতে আরো বিস্মিত হইলাম।

ইতি মধ্যে আমরা ষ্টিমারে আসিয়া উঠিলাম; ষ্টিমারে আসিয়া সঙ্গিনী আমাকে বলিলেন, “সাহেবটি কে?—বড় ভদ্র লোক, উনিও কি ষ্টিমারে যাইবেন?”

• • • • • •

ষ্টিমার যাত্রার কাহিনী “ধূম্রযান—অধ্যায়ে” বর্ণিত হইবে।

## হোলকার মলহর রাওর রাজ্য।

মালব প্রদেশ অর্থাৎ মধ্যভারতে হোলকার রাজ্য অবস্থিত। ইন্দোর নগর এই রাজ্যের রাজধানী। এক্ষণে ইন্দোর নগরের নাম হইতে প্রায় রাজ্যের নাম ইন্দোর রাজ্য হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে এই রাজ্য অতি বিস্তৃত ছিল; কিন্তু অনেক বার ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধ হওয়ায় মলহর রাও হোলকারের বংশধরগণ ঐ রাজ্যের অনেকাংশ হারাইয়াছেন। এখন এই রাজ্যের পরিমাণ ৮,০৭৫ বর্গ মাইল; লোক সংখ্যা প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ। হোলকার রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত—একলপ্ত নহে। তবে ১৮৬১ খৃঃঅব্দ অবধি সমস্ত রাজত্ব এক কাট্টা করিবার জন্য হোলকারের বিশেষ চেষ্টা জন্মিয়াছে এবং সিন্ধিয়ার সহিত কতকগুলি স্থানের পরিবর্ত্তন করাতে এখন অনেকাংশে ঐ উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে।

চম্বল ও নর্ম্মদা—এই রাজ্যের প্রধান নদী। ভূমি স্থানে স্থানে পর্ব্বতময় এবং জঙ্গলপূর্ণ হইলেও অত্যন্ত উর্ব্বরা। এই রাজ্যে গোধুম, চাউল, নানা প্রকার দাইল, ইক্ষু, কার্পাস, তামাক ও অহিফেণ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়; কিন্তু অহিফেণ চাষেরই কিছু বাহুল্য। ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রক বন্য জন্তু ও বিষাক্ত সর্প ও এখানে বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

দাক্ষিণাত্যে নীরা নামে একটী নদী আছে। ঐ নদীর কূলে হোল বা হল নামে গ্রাম অবস্থিত। ঐ গ্রামে এক ঘর ধাঙ্গড় বা মেষ পালক বাস করিত। ১৬৯৩ খৃঃঅব্দে সেই মেষপালকের এক পুত্রসন্তান হয়। পুত্র বড় হইলে পিতা তাহাকে গোপালনের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। সেই বালক প্রত্যহই মেষ চরাইতে যায়। কিন্তু সে কাজ তাহার ভাল লাগে না, সে সর্ব্বদা অন্যান্য রাখালদের সঙ্গে কলহ বিবাদ ও কুস্তি করে। এইরূপে কিছুকাল কাটিয়া গেল।

এক দিবস এই রাখাল মেষ চরাইতেছে,—দেখিল এক সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় বীর নিজ সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে বীর সাজে সাজিয়া যুদ্ধার্থ গমন করিতেছেন। অমনি সেই মেষ পালকের বীর-হৃদয় উল্লসিত হইয়া উঠিল—তাহারও সেইরূপ বীরসাজে সাজিয়া যুদ্ধে যাইতে সাধ হইল। ঐ মেষপালকের নাম মলহররাও—হোলকার রাজবংশের আদিপুরুষ। তাঁহার

পিতা মলহর রাও নাম রাখিয়াছিলেন কিম্বা তিনি ঐ নাম গ্রহণ করিয়া প্রথম সেই মহারাষ্ট্রীয় সম্ভ্রান্ত বীর পুরুষের সৈন্য বিভাগে প্রবেশ করেন, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

যাহা হউক সেই রাখালের আর মেষ চরাণ ভাল লাগিল না। অল্পকাল পরেই তিনি এই নীচবৃত্তি একেবারে পরিত্যাগ করিয়া কোন মহারাষ্ট্রীয় রাজার সৈন্য বিভাগে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় তিনি স্বল্পকাল মধ্যে নিজ প্রতিভা ও যুদ্ধ নৈপুণ্যে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেন। পরিশেষে ১৭২৪ খৃ শব্দে একত্রিশ বৎসর বয়সে সুপ্রসিদ্ধ পেশোয়ার ৫০০ অশ্বসেনার সেনাপতি পদে নিযুক্ত হন। তৎপরেই তিনি দ্রুতপদে উন্নতিশিখরে আরোহণ করিতে লাগিলেন। তিনি যে যুদ্ধে গমন করেন, জয়শ্রী সেই খানেই তাঁহাকে সহাস্য বদনে সাদরে আলিঙ্গন করে। তাঁহার দূরদৃষ্টি, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সমর-দক্ষতা ও মন্ত্রণাচাতুর্য্য দর্শনে বিখ্যাত বীরপুরুষগণও চমৎকৃত হইলেন। মলহর রাও এখন আর সেই রাখাল নন। পেশোয়া তাঁহাকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন, তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত কোন কাজই করেন না। পেশোয়া দেখিলেন সেই বীরপুরুষের পদমর্য্যাদা রক্ষার জন্য ধনসম্পত্তির আবশ্যক। তিনি চারি বৎসর পরেই প্রীত হইয়া তাঁহাকে বিস্তর ভূমি ও অর্থদান করিয়া রাজশ্রীতে বিভূষিত করিলেন।

১৭৩১ খৃঅব্দে মলহর রাও পেশোয়ার সর্ব্বপ্রধান সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মোগল সম্রাটের দাক্ষিণাত্যের প্রতিনিধিকে তুমুল সংগ্রামে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তিকলাপে মুকুট মণ্ডিত করেন। পেশোয়া তাঁহার এই বীরত্ব ও পরাক্রম দর্শনে নিতান্ত প্রীত হইয়া ইন্দোর নগর ও অধিকৃত দেশের অধিকাংশ মলহর রাওকে তাঁহার সৈন্যদলের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দান করিলেন। এই সমস্ত বিষয় ভাবী একটি প্রতাপশালী স্বাধীন রাজ্যের ভিত্তিমূল। মলহর রাও সেই ভিত্তির উপর এই বিখ্যাত হোলকার রাজ্য সংস্থাপন করেন।

১৭৩৫ খৃঅব্দে মলহর রাও নর্ম্মদা নদীর উত্তরস্থিত প্রদেশ সমূহের মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য সম্প্রদায়ের সেনাপতিপদ প্রাপ্ত হন। পরবর্ত্তী দ্বাদশ বৎসর তাঁহার জীবন ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহে কাটিয়া যায়। একবার মোগলদিগের সঙ্গে ঘোর সংগ্রামে প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন; কখন বা বাসিন হইতে পর্ত্তগীজদিগকে বাহুবলে নির্ব্বাসিত করিয়া দিতেছেন; আবার বা রোহিলা-

দিগের দৌরাত্ম্যে উৎপীড়িত অযোধ্যার নবাব উজীর সফদরজঙ্গকে সাহায্য করিতে যাইতেছেন। সর্ব্বদাই ব্যাপৃত—বিশ্রাম বিরাম কিছুমাত্র নাই। তারত কেন না চমকিত ও বিস্মিত হইবে! এই সময়ে তাঁহার বিষয় সম্পত্তি ও প্রতাপ ক্রমশ যার পর নাই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—এখন তিনি সম্পদের, যশের, গৌরবের,—অতি উচ্চ শিখরে আরোহিত। সুতরাং অল্প কাল মধ্যেই যে মলহর রাও ভারতবর্ষের একজন প্রধান ও প্রবল প্রতাপশালী রাজা বলিয়া পরিগণিত হইবেন তাহাতে বিচিত্র কি? সকলেই যে তাঁহাকে ভয় করিবে—অনেকেই যে তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত হইবে, তাই বা আশ্চর্য্যের বিষয় কি? সেই ধাঙ্গড় পুত্র—নিকৃষ্ট রাখাল এখন প্রবল প্রতাপশালী মহারাজা মলহর রাও হোলকার! এখন তাঁহার নামে বড় বড় মহারাজাদেরও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! এখন তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ভারতবর্ষ কম্পিত। তাঁহার পিতা মাতা জীবিত ছিলেন কি না, ইতিহাসে তাহার কোন উল্লেখ নাই। মনে কর জীবিত ছিলেন এবং মহারাজা মলহর রাও হোলকারও তাঁহাদিগকে বিস্মৃত হন নাই, তবে আজ তাঁহাদের কি আনন্দ, কি পরম সৌভাগ্য! কি শুভক্ষণেই সেই জননী এই পুত্রকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, আর কি শুভক্ষণেই এই পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল! আজ সেই মেষপালক প্রায় এক কোটী লোকের অধিপতি! মলহর রাও পূর্ব্বাবধি হোলকার উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন বা হোলকার নামে বিখ্যাত ছিলেন কি না তাহার বিষয় জানিবার উপায় নাই। কিন্তু তাহা কোন ক্রমেই সম্ভব নহে। ইন্দোর নগরে স্বরাজ্য সংস্থাপন করিয়া তিনি যে মহারাজা হোলকার এই উপাধি গ্রহণ করেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হোলকার—অর্থাৎ "হোল," তাঁহার জন্মভূমি, "কার", নিবাসী। সুতরাং মলহর রাও হোলকার, অর্থাৎ "হোল" গ্রাম নিবাসী—এই অর্থ বুঝায়। এতদ্দারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, জন্মভূমির উপর হোলকারের ঐকান্তিক অনুরাগ ও ভক্তি ছিল। তিনি সৌভাগ্য শৈলের উন্নততম শিখরে আরোহণ করিয়াও সেই বাল্যলীলা ভূমি—সেই গোচারণের মাঠ—হোলগ্রাম বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণও বরাবর সেই অবধি "হোলকার" উপাধি গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন।

১৭৬১ খৃ অব্দে পানিপথের যুদ্ধে মলহর রাও ও সিন্ধিয়া মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য দলকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুই জনে এক এক সম্প্রদায়ের সেনাপতি

পদ গ্রহণ করেন। কথিত আছে, মলহর রাও এই সময়ে স্বীয় স্বাভাবিক সাহস বা বলবীর্য্য বা বুদ্ধিকৌশল কিছুই দেখাইতে সমর্থ হন নাই, বরং স্বীয় সৈন্যদল লইয়া কাপুরুষের ন্যায় পরাজয়ের পূর্ব্বেই পলায়ন করেন। এরূপ করিবার অবশ্যই কোন গূঢ় অভিপ্রায় ছিল। কেহ কেহ বলেন তিনি পূর্ব্বেই যুদ্ধের পরিণাম ফল বুঝিতে পারিয়া ঐরূপ করিয়াছিলেন। তিনি অতি চতুর ও বুদ্ধিমান ছিলেন, ভাবিলেন পরাজয় হইলে তাঁহার বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, সুতরাং সময় থাকিতে সাবধান হওয়া আবশ্যক, এইরূপ বিবেচনা করিয়াই তিনি পলায়ন করেন। যুদ্ধের পর তিনি স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক শাসন প্রণালীর সুশৃঙ্খলা স্থাপনে মনোনিবেশ করেন। রাজ্যভিত্তি দৃঢ়মূল করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া উঠে। কিছুকাল শান্তিভোগ করিয়া প্রায় ১০০০০০০ টাকা রাজস্বের একটী রাজ্য রাখিয়া মলহর রাও ১৭৬৫ খৃঅব্দে ৭২ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পৌত্র মালী রাও রাজা হইলেন বটে, কিন্তু অধিক কাল রাজ্য ভোগ করিতে পান নাই। তিনি বাতুল হইয়া অল্পকাল মধ্যেই ইহজগৎ পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বীরাঙ্গনা জননী প্রাতঃস্মরণীয়া সুপ্রসিদ্ধ অহল্যাবাই স্বহস্তে রাজ্যশাসন ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রধান সেনাপতি তুকাজি রায়ের সঙ্গে সুমন্ত্রণা পূর্ব্বক ত্রিশ বৎসর যার পর নাই সুনিয়মে প্রজাপালন ও রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ১৭৯৫ খৃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়, সুদক্ষ সেনাপতি ও মন্ত্রী তুকাজি রাও ও অচিরে তাঁহার পশ্চাদগামী হন; এই দুইজনের মৃত্যুতে এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগের গৃহ বিবাদে হোলকার বংশের প্রতাপের অনেক হ্রাস হইয়া আসে।

এই সময়ে তুকাজি রাওয়ের জারজপুত্র যশোবন্ত রাও হোলকার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তিনি দেখিয়া শুনিয়া কতকগুলি ইউরোপীয়কে আপনার সৈন্য দলের শিক্ষার্থে নিযুক্ত করিলেন। ১৮০২ খৃ অব্দে সিন্ধিয়া ও পেশোয়া উভয়ে মিলিত হইয়া তাঁহার সহিত শত্রুতাচরণ করিলে তিনি উভয়কেই তুমুল সংগ্রামে সম্পূর্ণ পরাজয় করিয়া পুনা নগর অধিকার করেন। বাসিনে ইংরাজের সহিত পেশোয়ার সন্ধিতে যশোবন্ত রাও পেশোয়াকে পুনানগরর প্রত্যর্পণ করেন।

১৮০৩ খৃঅব্দের মহারাষ্ট্রীয় সমরে যশোবন্ত রাও হোলকার কোন পক্ষই অবলম্বন করেন নাই। তিনি নিবিষ্টচিত্তে যুদ্ধের ফলাফল ও পরিণাম

প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। তাঁহার মনের ভাব বোধ হয় এইরূপ ছিল যে সিন্ধিয়ার উপর দিয়া তিনি আপনার কোন অভিসন্ধি পূর্ণ করিয়া লইবেন। কিন্তু তাঁহার সে উদ্দেশ্য সফল হইল না। সিন্ধিয়া ইংরাজগবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধি করিলেন। তখন যশোবন্ত রাও ইংরাজের সহিত সৌহৃদ্যতা সংস্থাপনের জন্য নানা অসম্ভব প্রস্তাব করেন, ইংরাজ তাহা গ্রাহ্য করেন না। হোলকারের কুবুদ্ধি ঘটিল; তিনি ইংরাজের সহিত বিবাদের সূত্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধও সত্বর বাধিল। হোলকার সগর্ব্বে একা——অন্য কোন রাজার সাহায্য অপেক্ষা না করিয়াই মহা বিক্রমশালী বৃটীশ কেশরীর সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথম প্রথম জয়লাভও করিয়াছিলেন। কর্ণেল মনসন পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন। হোলকার জয়োৎফুল্ল হইয়া ইংরাজ অধিকারে প্রবিষ্ট হইলেন। কিন্তু অদৃষ্ট তাঁহার প্রতি অপ্রসন্ন; তিনি পুনঃ পুনঃ পরাস্ত হইয়া পরিশেষে পঞ্জাবাভিমুখে পলায়ন করিলেন। লর্ড লেক অসংখ্য সৈন্য লইয়া দ্রুতবেগে অর্ণব প্রবাহের ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। অনন্যোপায় হইয়া যশোবন্ত রাও ১৮০৫ খৃঅব্দের ডিসেম্বর মাসে লর্ডলেকের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। সন্ধি হইল——ইংরাজ এই যুদ্ধে হোলকারের যে সমস্ত স্থান জয় করিয়া লইয়া ছিলেন, তাহা প্রত্যর্পণ করিলেন না। অল্পকাল পরেই ঐ মনের দুঃখে যশোবন্ত রাও উন্মত্ত হইয়া উঠেন এবং ১৯১১ খৃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তৎকালে তাঁহার পুত্র মলহর রাও নাবালগ। তুলসী বাই নাম্নী এক কামিনীকে যশোবন্ত রাও রাজ্যশাসনের ভার দিয়া যান। ক্রমে রাজ্যমধ্যে মহা গোল মাল উপস্থিত হইল; পিণ্ডারী দস্যুগণ যার পর নাই উপদ্রব আরম্ভ করিল। তুলসী বাই ইংরাজের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন——লেখা লেখি চলিতেছে, এমন সময় পেশোয়ার সহিত ইংরাজের যুদ্ধ বাধিল। হোলকারের কর্ম্মচারিগণ সুযোগ পাইল, ভাবিল আর কি? ইংরাজদের আর সাহায্য প্রয়োজন নাই; সুতরাং তাঁহাদের বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইল এবং তুলসী বায়ের প্রাণ সংহার করিল। যুদ্ধ বাধিল; হোলকারের সৈন্যগণের সম্পূর্ণ পরাজয় হইল; হোলকার সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। ১৮১৮ খৃঅব্দে জানুয়ারী মাসে মন্দিসুর নামক স্থানে এই সন্ধি হয়। হোলকারের রাজ্যের অধিকাংশ ইংরাজ অধিকার করিয়া লইলেন এবং হোলকারের প্রতাপ সূর্য্য এইখানেই প্রায় অস্তগমন করিল। তিনি নাম মাত্র স্বাধীন রাজা হইয়া

রহিলেন। এখনও হোলকার সেই সন্ধিসূত্রে বদ্ধ। কিন্তু হোলকার বংশের সেই তেজ সেই দর্প ও অভিমান এ পর্য্যন্ত কিছুমাত্র কমে নাই। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে হোলকারের বিশেষ সম্ভ্রম করিয়া চলিতে হয়।

২৮ বৎসর বয়সে ১৮৩৩ খৃঅব্দে দ্বিতীয় মলহর রাও হোলকারের মৃত্যু হয়। তাঁহার সন্তানাদি ছিল না। বিধবা রাণী মার্ত্তণ্ড রাওকে পোষ্য পুত্র লইলেন, কিন্তু তাহ সকলের প্রীতিপ্রদ হইল না। অল্পকাল পরেই তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া হরি রাও রাজা হইলেন। হরি রাও ইতি পূর্ব্বে রাজ-বিদ্রোহী হওয়ায় ১৮১৯ খৃ অব্দ অবধি কারারুদ্ধ ছিলেন। যদিও তিনি রাজা হওয়ায় সকলেই আনন্দিত হইয়াছিল কিন্তু অধিক কাল কারাবাস জনিত তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট ও মানসিক বৃত্তি সকল এক কালীন স্ফূর্তিবিহীন হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার রাজত্ব কালে প্রজাবর্গ সুখসচ্ছন্দতা ভোগের অধিকারী হইতে পারে নাই। ১৮৪৩ খৃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনিও পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই পোষ্যপুত্র হোলকার সিংহাসন পাইলেন সত্য, কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই অবিবাহিতাবস্থায় কালগ্রাসে পতিত হন; বর্ত্তমান মহারাজা তুকাজিরাও হোলকার ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নির্ব্বাচিত। ইনি ভাস হোলকারের দ্বিতীয় পুত্র, তৎকালে ইহাঁর বয়ঃক্রম একাদশ বৎসর মাত্র। ১৮৫২ খৃ অব্দে ইনি সাবালগ হইয়া স্বহস্তে রাজ্য শাসন ভার গ্রহণ করেন।

১৮৫৭ খৃঅব্দে সিপাহী বিদ্রোহে ইহার কয়েক দল সৈন্য বিদ্রোহী হইয়া ইন্দোরস্থ ইংরাজ দূতকে আক্রমণ করে। সেই দূত আর কেহই নহেন, সুপ্রসিদ্ধ ডুরান্দ সাহেব। এই মহাপুরুষ হোলকারের সর্ব্বনাশের মূল। তিনি ইংরাজজাতির বীরত্ব, সাহস ও আত্মত্যাগ বিস্মৃত হইয়া নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় সপরিবারে পলায়ন করেন। মহারাজা হোলকার স্বয়ং বরাবর ইংরাজগবর্ণমেণ্টর সম্পূর্ণ সপক্ষতাচরণ করেন, এবং বিদ্রোহদমনের জন্য যতদূর সাধ্য চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। তবে ভাগ্য যাহার প্রতি অপ্রসন্ন, তাহার সুখের সম্ভাবনা কোথা? ডিউরাণ্ড সাহেব কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন না করিয়া হোলকারের সহিত পরার্শ করিয়া চেষ্টা করিলে অনায়াসে বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতে পারিতেন। কিন্তু সে সাহস, সে বুদ্ধি তাঁহার হইল না। পলায়ন করিয়াছেন, বড় লজ্জার কথা, গবর্ণমেণ্ট ও ইংরাজ বীর পুরুষগণ কি বলিবেন? পরিশেষে তাঁহার এই চিন্তা

এই ভয় হইল। তিনি নিজের মান বজায় রাখিবার জন্য, সমুস্ত দোষ-নিরপরাধী হোলকারের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিলেন। অথবা হোলকার বিপক্ষতা করিলে তাঁহার যে পরিত্রাণ পাইবার কিছুমাত্র উপায় ছিল না, তাহা একবারও ভাবিলেন না। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট হাড়ে হাড়ে হোলকারের উপর চটিয়া গেলেন--সে রাগের অদ্যাপি শান্তি হয় নাই। হোলকার কত লিখিলেন, কত সাধিলেন, কত বলিলেন, তাঁহার কি দোষ গবর্ণমেণ্ট দেখাইয়া দিউন। গবর্ণমেণ্ট সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

হোলকারের সম্মানার্থ ১৯টি তোপ হইয়া থাকে। তাঁহার সর্ব্বশুদ্ধ ৫২৫০ পদাতি, ৩,৩০০ অশ্ব, ২৪০ জন কামান্দার এবং ২৪টি কামান আছে। কিন্তু এসমস্ত যুদ্ধোপকরণ নাম মাত্র—রাজ পরিচ্ছদ বিশেষ। সৈন্যগণ সুশিক্ষিত অথবা কামানগুলি কার্য্যোপযোগী নহে।

হোলকারের বর্ত্তমান রাজস্ব ৫,১২৩,০০০ টাকা এবং ব্যয় ৪১,৬৬,০০০। কিন্তু এই তালিকাটি নির্ভুল নাহে। এটি ইংরাজগবর্ণমেণ্টের জানিত আয়—এতদ্ব্যতীত হোলকারের অন্য প্রকার আয় আছে। সর্ব্বশুদ্ধ হোলকারের রাজস্ব ৮০।৯০ লক্ষ টাকার ন্যূন নহে।

রাজকুমার ও রাজবংশীয়দিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য ইন্দোর নগরে একটি বিদ্যালয় আছে, তাহাতে প্রায় ২০০ ছাত্র অধ্যয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত আরো কয়েকটি ইংরাজী ও মহারাষ্ট্রী বিদ্যালয়, একটি বালিকা বিদ্যালয় ও একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় আছে।

ইন্দোর নগর ক্ষুদ্র, কিন্তু দেখিতে অতি সুন্দর। ১৭৭০ খৃঅব্দে এই নগর রাণী অহল্যা বাই কর্ত্তৃক সংস্থাপিত। প্রাচীন রাজধানীর নাম কম্পাইল, ঐ নগর এক্ষণে একটি সামান্য গ্রামে পরিণত হইয়াছে। ইন্দোর নগরের লোক সংখ্যা প্রায় ১৫।১৬ হাজার। ১৮১৮ খৃঅব্দে হোলকার স্বীয় রাজধানী এই নগরে স্থাপিত করেন। এখানে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা আছে, তন্মধ্যে রাজপ্রাসাদই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা অতি প্রশস্ত, সুন্দর ও বৃহৎ। এই নগরে লালবাগ নামে একটি পরম রমণীয় উদ্যান, একটি হাঁসপাতাল, একটী বাজার ও সুতার কল আছে। রেলওয়ে ষ্টেসন রাজবাটী হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ।

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়।

# মহামায়া।

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

### জানাজানি।

এক দিন সন্ধ্যার সময় সর্ব্বানন্দ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান, অমূল্য তাঁহার কিঞ্চিৎ পশ্চাতে অবস্থিত, এমত সময় একটি লোক জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় অমূল্য কেমন আছে?"

সর্ব্বানন্দ। আছে ভাল।

অমূল্যর দিকে ফিরিয়া কহিলেন "অমূল্য ইনিই তোমার রক্ষাকর্ত্তা।"

অমূল্য দ্রুতপদে তাঁহার নিকট গমন করিয়া বলিলেন; "আমার মহা—"

অমূল্যর আর কথা ফ্ুরিল না; তিনি সংজ্ঞা শূন্য হইয়া লোকটির পদতলে নিপতিত হইলেন। লোকটি নিত্যানন্দ স্বামী।

সর্ব্বানন্দ ও স্বামী উভয়ে অমূল্যকে গৃহ মধ্যে লইয়া গেলেন, তাঁহার বদন মণ্ডলে জল-সিঞ্চন করিতে লাগিলেন; অনেকক্ষণ পরে চক্ষু চাহিয়া অমূল্য সজল চক্ষে বলিলেন,

"মহামায়া কেমন আছেন?"

স্বামী। আপাতত ভাল।

অমূল্য। আপাতত!

স্বামী। মধ্যে তাঁহার সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছিল।

অমূল্য একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সর্ব্বানন্দ এ সকল কথোপকথনের কিছুই ভাব গ্রহণ করিতে পারিতে ছিলেন না। চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান ছিলেন; কেবল ভাবিতে ছিলেন "আমার মহামায়া"—মহামায়া কে?

অমূল্য সর্ব্বানন্দের দিকে ফিরিয়া সজলচক্ষে বলিলেন "বাবা ইনিই আমায় নিশ্চয় কারামুক্ত করিয়াছিলেন।"

স্বামী কহিলেন "না অমূল্য ইহা তোমার ভ্রম, আমি সামান্য ব্যক্তি তোমায় কারামুক্ত কি প্রকারে করিব? ঈশ্বর করিয়াছিলেন!

অমূল্য। আপনি এবং মহামায়া উপলক্ষ।

সর্ব্বানন্দ কতক কতক বুঝিতে পারিয়া বিস্মিতভাবে বলিলেন, "অমূল্য তুমি কি বলিতেছ, প্রভাবতী শুনিলে কি বলিবে?"

অমূল্য। প্রভাবতী একথা অনেক দিন হইতে জানে।

সর্ব্বানন্দ অবাক্ হইলেন, বলিলেন "তবে এতদিন আমায় এ কথা বল নাই কেন?"

অমূল্য। প্রভা নিষেধ করিয়াছিল, আপনি হতাশ হইবেন বলিয়া। কেননা আপনার আশা ভরসা বিষয় বিভব,—সমস্তই সেই বিবাহের উপর নির্ভর করিতেছিল।

এমত সময় প্রভাবতী সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বামীকে গললগ্ন-বস্ত্রে প্রণাম করিয়া কহিলেন "দেব! ইঁহার সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দিন, এরূপ পবিত্র হৃদয় সংসারে দুর্লভ, আর মহামায়া সর্ব্বাংশে ইঁহার উপযুক্তা।" পরে সর্ব্বানন্দের দিকে ফিরিয়া কহিলেন "পিতা! এ বিবাহে আপনি আপত্তি করিবেন না। যে টাকা আপনি পাইতেন, সেই টাকা আমি মহামায়াকে যৌতুক দিব।"

স্বামীর চক্ষে জল আসিল; সর্ব্বানন্দের দিকে ফিরিয়া কহিলেন "প্রভাকে কিছু দিতে হইবে না, মহামায়ার পিতার মৃত্যুকালে তিনি আমার নিকট তিন লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন—আমি সেই টাকা অমূল্যকে দিব।"

অমূল্য। মহামায়া আপনার কন্যা নন।

স্বামী, "না, কিন্তু এ কথা যেন মহামায়া শুনেন না।" বলিয়া তাঁহার পিতৃকুলের পরিচয় দিলেন, তিনি এ সমস্ত তত্ত্ব প্রয়াগে শ্রবণ করিয়াছিলেন।

সর্ব্বানন্দের মন হাসিল, প্রভাবতী সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দিত হইলেন। অমূল্যের বহু দিনের আশার সুসার হইল, তাঁহার শুষ্ক বৃক্ষ মুঞ্জরিল।

---

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

### শুভ বিবাহ।

শুভদিনে শুভক্ষণে অমূল্যরতনের মহামায়ার সহিত বিবাহ হইল। অমূল্যর বিষাদ-মাখা বদন কমলে এত দিন পরে মধুর হাসি দেখা দিল। এ বিবাহে প্রভাবতীর আর আনন্দের পরিসীমা নাই,—কিন্তু দুর্গাবতীর অতুল আনন্দ উপজিল না; যদিও সন্তানের সুখ দেখিয়া দুর্গাবতী

সুখী হইলেন বটে, কিন্তু প্রভাবতীর অবস্থা ভাবিয়া তাঁহার কোমল হৃদয় অবিরত ব্যথিত হইতে লাগিল।

দুর্গাবতী প্রভাবতীর বিবাহের কথা আর উথাপন করিতে পারিলেন না। সর্ব্বানন্দ অনেক বুঝাইলেন, অনেক অনুনয় করিলেন, কিন্তু প্রভাবতী কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

সর্ব্বানন্দ পুত্র ও পুত্র-বধূকে লইয়া বাঁকিপুরে যাইবার মনস্থ করিলেন; নিত্যানন্দ স্বামীকেও তাঁহাদের সহিত যাইতে অনেক অনুরোধ করিলেন,— কিন্তু তিনি স্বীকৃত হইলেন না। তবে বলিলেন যে মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ হইবে। মহামায়া স্বামীকে অনেক বলিলেন, অনেক জেদ করিতে লাগিলেন। স্বামী অনেক বুঝাইয়া তাঁহাকেও নিরস্ত করিলেন।

সর্ব্বানন্দের সপরিবারে বাঁকিপুর যাইবার পূর্ব্বদিন স্বামী তাঁহার গৃহে সমাগত। সর্ব্বানন্দ—স্বামীকে প্রভাবতীর নিকট তাঁহার বিবাহের কথা উথাপন করিতে অনুরোধ করিলেন। স্বামী প্রভাবতীকে বলিলেন "মা প্রভা তোমার বিবাহ করিতে অসম্মতি কেন?"

প্রভাবতী স্থির গম্ভীর ভাবে কহিলেন "পিতা! ভদ্রকুলনারীর বিবাহ কয়বার হয়?"

স্বামী। তোমার কি বিবাহ হইয়াছে?

প্রভা। আমি জানি মনে মনে আত্ম-সমর্পণের নামই বিবাহ।

স্বামী স্নেহভরে প্রভাবতীর কপাল চুম্বন করিয়া কহিলেন "প্রভা, তুমিই ভারতের যথার্থ ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণা সতী! এ জগতে তোমার তুলনা নাই।"

প্রভাবতী নিরুত্তর।

স্বামী আবার বলিতে লাগিলেন "প্রভা, এ সংসারে, ইহ জগতে একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত আর আমার কেহই নাই— আমি বৈরাগী; মহামায়া সংসারী হইল, বড় সুখের কথা, মহামায়ার সুখ দেখিয়া যে আমি মহাসুখী হইয়াছি তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তোমাকে দেখিয়া আমি আরও সুখী হইয়াছি, প্রভা, আমি তোমার পিতৃ সদৃশ, আমার মহামায়াও যে, তুমিও সে;—প্রভাবতী তুমি আমার আশ্রমে থাকিবে?"

প্রভা। থাকিব।

স্বামী প্রভাবতীর কথা সর্ব্বানন্দকে কহিলেন। সর্ব্বানন্দ অগত্যা

তাহাতে স্বীকৃত হইলেন, যাইবার সময় সর্ব্বানন্দ প্রভাবতীকে কহিলেন, "প্রভা, তোমার টাকা গুলি লও।"

প্রভা। পঞ্চাশ হাজার ত মহামায়ার।

সর্ব্বা। বাকি।

প্রভা। আপনার নিকট থাকুক। মহামায়ার সন্তানের পুত্র-বধূকে আমার হইয়া যৌতুক দিবেন।

সর্ব্বানন্দ অবাক হইলেন, প্রভাবতীর বদন ভাব দেখিয়া কোন কথা কহিতে পারিলেন না, পার্শ্বে স্বামী দণ্ডায়মান ছিলেন! তিনি মনে মনে প্রভাবতীকে শত ধন্যবাদ দিলেন।

বিদায় কালে দুর্গাবতী প্রভাবতীকে বক্ষে ধারণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয় আকুল হইল। এমত সময়ে স্বামী আসিয়া বলিলেন "আপনারা তৎপর যাত্রা করুন, সময় বহির্ভূত হয়।" অগত্যা এই হৃদয় বিদারী দৃশ্যের শেষ হইল, কিন্তু দুর্গাবতীর হৃদয়গত যাতনার শেষ হইল না; বোধ হয় ইহ জীবনে কখন হইবেও না। দুর্গাবতী প্রভাকে কন্যা-নির্ব্বিশেষে স্নেহ করেন, সে স্নেহ অকপট অকৃত্রিম।

স্বামী প্রভাবতীকে আপন আশ্রমে লইয়া গেলেন, অতি যত্নে অতি সাবধানে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, স্বামীর উপদেশে তাঁহার মন সমধিক উন্নতি লাভ করিল, প্রভাবতী বিচিত্র বিশ্বানন্দে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলেন ও যোগ-শিক্ষা-পরায়ণা হইলেন।

---

## অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

### নিত্যানন্দ স্বামীর নিত্যধাম যাত্রা।

সর্ব্বানন্দের আশা ফলবতী হইল, তাঁহার স্থাবর সম্পত্তি উদ্ধার হইল, অমূল্য রতন ঋণ হইতে অব্যাহতি পাইলেন, দুর্গাবতী প্রাণাধিক পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া সুখী হইলেন। সকলের সুখের মাত্রা পূর্ণ হইল, কিন্তু দুর্গাবতীর হইল না, প্রভাবতীর বিরহ, প্রভাবতীর নির্ম্মল নিরাশ হৃদয়ের বিষণ্ণভাব তাঁহার হৃদয়ে চিরঅঙ্কিত রহিল।

এই ঘটনার দশবৎসর পরে একদিন সন্ধ্যার সময় সহসা সর্ব্বানন্দ ভবনে নিত্যানন্দ স্বামী ও প্রভাবতী আসিয়া উপস্থিত। এই সময়ে

মহামায়ার তিনটি সন্তান; বড়টি ৯ বৎসরের, তাহার ছোটটির বয়স ৬ বৎসর, সর্ব্ব কনিষ্ঠের ২ বৎসর মাত্র। প্রভাবতী চক্ষের জলে ভাসিয়া পুত্রগুলিকে একে একে ক্রোড়ে করিয়া মুখ চুম্বন করিলেন—সে ক্রন্দন হিংসার বা দুঃখের নয়—আনন্দের। স্বামীও সকল গুলির মুখ চুম্বন করিলেন। দুর্গাবতী প্রভাবতীকে পাইয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, তাঁহার হৃদয় স্নেহরসে আর্দ্র হইল। নিত্যানন্দ স্বামীর আর সে দেহ নাই, সে লাবণ্য নাই, সে স্ফূর্ত্তি নাই—তাঁহার সেই তেজোময় দেহের সর্ব্বত্র যেন নির্জ্জীবতা বিরাজমান। পর দিবস স্বামী একখানি সুন্দর খট্টোপরি বিচিত্র শয্যায়, সুন্দর উপাধানে মস্তক রক্ষিত করিয়া শায়িত, এমন সময়ে তথায় তাঁহার মহামায়া পুত্রগণ সহ উপস্থিত হইলেন। মহামায়া নিত্যানন্দ স্বামীর বদন প্রতি স্থির-দৃষ্টি হইয়া বলিলেন "এখন কেমন আছেন?"

স্বামী। বেশ আছি। তোমাদের দেখিলে কবে মন্দ থাকি!

মহা! তবে আমাকে কেন দেখিতে আসেন না?

স্বামী। তুমি সুখে আছ জানি বলিয়া, সতত আসিয়া বিরক্ত করিতে চাহি না।

মহা। আপনি আসিলে বিরক্ত হব?

স্বামী। হওয়া কি অসম্ভব!

মহামায়া সজল নেত্রে বলিলেন "আপনি আমার জন্য যা করেছেন, আপনার বাপেও ততদূর করেন না, করতেও পারেন না,—আপনি তিন লক্ষ টাকা——"

স্বামী। সে ত তোমার পিতৃধন।

মহা। আমায় কেন ওকথা বলেন, আমি ত সকলি জানি। আমার পিতার ত কিছুই ছিল না।

স্বামী। তোমায় এ কথা কে বল্‌লে।

মহা। রহমত পুরার কে এ কথা না জানে, আমার মা——

স্বামী সে কথায় বাধা দিয়া বলিলেন "আর সে কথায় কাজ নাই—আর যদি তাহাই হয়, তাহাতে কি হইয়াছে—টাকাটা কি বড় জিনিষ!"

মহা। আর আমি আপনাকে যেতে দিব না।

স্বামী মৃদু হাসিয়া বলিলেন "আর যাবো না।"

মহা। আর রহমত পুরা যাবেন না।

স্বামী। না—তবে আর একটি স্থানে যাব।

মহা। কোথায়?

স্বামী। নিত্যধামে।

মহামায়া সবিস্ময়ে কহিলেন "সে কি?"

স্বামী মৃদু হাসিয়া কহিলেন 'মহামায়া, তোমার স্বামীকে ডাক, আমার সময় উপস্থিত।"

মহা। সে কি? সময় উপস্থিত কি?

স্বামী। আমার মৃত্যুকাল নিকট।

মহামায়া কাঁদিয়া উঠিলেন, এমত সময় কক্ষ মধ্যে অমূল্যরতন প্রবেশ করিলেন, তাঁহার বালকগণ তখন সবিস্ময়ে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান।

স্বামী অমূল্যরতনকে বলিলেন—"অমূল্য বাবা! প্রভাবতী আর তোমার বাপ মাকে ডাকিয়া আন।"

অমূল্য এ কথার কোন মর্ম্ম বুঝিলেন না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে ডাকিয়া আনিলেন। স্বামী সর্ব্বানন্দকে বলিলেন "আমার ব্যাগে তিন লক্ষ টাকার নোট পাইবেন, সেগুলি আমার মহামায়ার ঐ তিনটি ননীর পুতলী-দিগের জন্য।" প্রভাবতীকে বলিলেন "মা প্রভা, তোমায় বলিবার কিছু নাই—তোমাকে শিক্ষা বা উপদেশ দিবার লোক সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহ নাই—আমার শিয়রদেশের বালিসের নীচে এক লক্ষ টাকার নোট আছে, সেগুলি তোমার ইচ্ছামত দরিদ্রদিগকে দান করিও।"

স্বামী এই কথা বলিয়া অমূল্যর সন্তানদিগকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। সকলেই তখন রোদন করিতে ছিলেন, রোদন পরায়ণা মহামায়া সন্তানগুলির হাত ধরিয়া তাঁহার নিকট হইয়া গেলেন। স্বামী সন্তানগুলির মুখচুম্বন করিয়া, তাহাদের মস্তকে হস্ত প্রদান করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিলেন। মহামায়াও অমূল্যকে বলিলেন "এস তোমাদের জন্মের মত মুখ চুম্বন করি।"

তাঁহারা উভয়ে নিকটে আসিলেন; স্বামী তাঁহাদের মুখচুম্বন করিলেন। দম্পতি যুগল নতজানু হইলে তিনি তাঁহাদের মস্তকে উভয় হস্ত স্থাপন করিলেন। স্বামীর অধরে মৃদু হাসি দেখা দিল। তিনি স্থির দৃষ্টিতে প্রথমে অমূল্যের দিকে, পরে আস্তে আস্তে মহামায়ার দিকে চাহিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় সতেজ গম্ভীর স্বরে, অনুমতির ভঙ্গিতে বলিলেন;

"মহামায়া আসন দাও।"

মহামায়ার সহিত অমূল্য রতনের প্রথম সাক্ষাতের কথা, অমূল্য এবং মহামায়ার—উভয়েরই—মনে পড়িল। অমূল্য মহামায়ার দিকে চাহিলেন; মহামায়া বহুকাল পরে আবার পূর্ব্বের ন্যায় ব্রীড়াবনতমুখী হইলেন। ধীরে ধীরে নিত্যানন্দ স্বামীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন; দেখিতে দেখিতে তাঁহার বিশাল বিস্ফারিত লোচনদ্বয় স্থির হইয়া আসিল, তাঁহার সেই মায়াময় পাঞ্চভৌতিক দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। স্বামীর ভবলীলা সাঙ্গ হইল। স্বর্গের অপ্সরাগণ সেই পবিত্র প্রেতাত্মাকে প্রেমভরে আহ্বান করিল, স্বর্গে স্বর্গীয় লোকের সমাগম জনিত দুন্দুভিধ্বনি হইল! জড়জগৎ একটি অমূল্য রত্ন হারাইল। প্রভাবতী সেই মহাপুরুষের প্রাণশূন্য কায়ায় পাদমূলে উপবেশন করিয়া নিবিষ্টচিত্তে সেই জগত-নিধান জগত-পাতার অচিন্তনীয় চিন্ময় মূর্ত্তির ধ্যান পরায়ণা হইলেন। অপরদিকে সর্ব্বানন্দ হইতে মহামায়ার শিশুসন্তানটি পর্য্যন্ত রোদন করিতে লাগিল।

---

## পরিশিষ্ট

প্রভাবতীকে সান্ত্বনা করিতে হইল না, প্রভাবতী আর সকলকে অশেষ প্রকার সান্ত্বনা দিলেন। কিন্তু মহামায়া বড় দারুণ শোক পাইলেন। দুর্গাবতী প্রভাকে বড়ই যত্ন করিতে লাগিলেন, তাঁহাকে একদণ্ড না দেখিয়া তিনি থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু প্রভাবতী মধ্যে মধ্যে বলেন, মা আমার জন্য আপনি অত করিবেন না। দুর্গাবতী এ কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন বটে কিন্তু ইহার কোন মর্ম্মাবগত হইতে পারিলেন না।

একদিন প্রাতঃকালে সকলে উঠিয়া দেখিল গৃহে প্রভাবতী নাই। প্রভাবতীর কত অনুসন্ধান করা হইল; কিন্তু কোন তত্ত্ব পাওয়া গেল না, দুর্গাবতীর চক্ষের জলে বক্ষস্থল ভাসিল।

কিন্তু কএক বৎসর পরে অমূল্যরতনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ হইল। নবোঢ়া বধূ গৃহে সমাগত, সর্ব্বানন্দ প্রভৃতি বর কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন মাত্র, এমন সময় একটি যোগিনী সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া হীরাময় হার ও অঙ্গুরীয়ক দিয়া বর কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। দুর্গাবতী আহ্লাদ সহকারে "প্রভা, প্রভা,—" বলিয়া তাঁহার নিকট গেলেন। যোগিনী—প্রভাবতী!

দুর্গাবতী প্রভাবতীকে বক্ষে ধারণ করিয়া কতই কাঁদিলেন, বলিলেন

"প্রভা আমায় কি এত কাঁদাতে হয়—আমি মরি ; তার পর তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেও।"

প্রভাবতী তাহার কোন প্রতিউত্তর না দিয়া নীরবে অধোবদন হইয়া রহিলেন। মহামায়া আহ্লাদে প্রভাবতীর হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন "দিদি আর আমি তোমায় ছাড়বো না। তুমি আমাদের ভাল বাস না।"

প্রভা। কেন দিদি।

মহা। তা হলে ফেলে যেতে পার।

প্রভা। আমি যেখানেই থাকি, তোমরা সুখে আছ, এ সংবাদ ত পাই।

মহা। তুমি কেমন থাক, তাত আমরা জানতে পারি না।

প্রভা। সুখে না থাকিলে, তোমাদের ছেড়ে থাকতে পারি।

মহামায়া আর কোন কথা না কহিয়া প্রভাবতীর হস্ত ধারণ করিয়া কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন।

প্রভাবতী আবার দুইটি দিন তথায় রহিলেন। সকলের সুখের পূর্ণোচ্ছাস হইল,—কিন্তু তাহা দীর্ঘকালের জন্য নহে—প্রভাবতী আবার সহসা নিরুদ্দেশ হইলেন, কোথায় গেলেন সে সংবাদ আর পাওয়া গেল না। দেখিতে দেখিতে অনেক দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু প্রভাবতীর দর্শন সুখলাভ আর কাহারও ঘটিল না।

মধ্যে মধ্যে প্রভাবতীর কথা উঠিলে, অমূল্য বলিতেন "প্রভাবতী দেবী" সঙ্গে সঙ্গে মহামায়া সহাস্য গম্ভীর আস্যে উত্তর দিতেন, আমি বলি, প্রভাবতীই প্রকৃত মানবী।

সমাপ্ত।

৬।

ইংরেজ পক্ষের যে সকল সৈন্য নবাবের বিরুদ্ধে পলাশীর অভিমুখে যাত্রা করিল, তাহাদের মধ্যে ৯৫০জন ইউরোপীয় পদাতিক (ইহার মধ্যে ২৮০ জন ইউরেশীয় সৈন্য ছিল), ১৮০ জন ইউরোপীয় কামান রক্ষক, ৫০ জন ইংরেজ সৈনিক এবং ২১০০ সিপাহি ছিল। সেনাপতির আদেশে এই ক্ষুদ্র সৈনিক দল ১০টি মাত্র কামান লইয়া ২২শে জুন প্রাতঃকালে কিয়ৎক্ষণ ভাগীরথীর তটভূমি অতিবাহন করিয়া, পরে নদী পার হইতে উদ্যত হইল। বেলা চারিটার সময় সকলে বিনা বাধায় ভাগীরথীর বাম তটে আসিল। এইখানে ক্লাইব মীরজাফরের নিকট হইতে আর একখানি পত্র পাইলেন। এই পত্রে মীরজাফর ক্লাইবকে লিখিয়াছিলেন যে, নবাব কাশীম বাজারের ছয় মাইল দূরে একটি পল্লীতে অবস্থিতি করিতেছেন। ইংরেজ সৈন্য স্থলপথে ঘুরিয়া আসিয়া, অনায়াসে এইস্থানে নবাবকে আক্রমণ করিতে পারে। বিশ্বাস ঘাতক মীরজাফরের এই প্রস্তাব ক্লাইবের কাছে সঙ্গত বোধ হইল না। যেহেতু ইহাতে ক্লাইবকে একটি বৃত্তাকার পথ পরিবেষ্টন করিয়া নবাবের অভিমুখে যাইতে হইত। এদিকে নবাব অনায়াসে সোজা পথে আসিয়া ইংরেজ পক্ষের অনিষ্ট সাধন করিতে পারিতেন। সুতরাং ক্লাইব মীরজাফরকে উত্তর দিলেন যে, তিনি আর কাল বিলম্ব না করিয়া পলাশীর অভিমুখে যাত্রা করিবেন। এবং পরদিন ছয় মাইল পথ অতিক্রম করিয়া দাউদপুর নামক স্থানে উপনীত হইবেন। মীরজাফর যদি এই স্থানে তাঁহার সহিত মিলিত না হন, তাহা হইলে তিনি নবাবের সহিত সন্ধিস্থাপনে অগ্রসর হইবেন।

যেস্থানে ক্লাইব মীরজাফরের পত্রবাহক লোককে বিদায় দেন, সে. স্থান হইতে পলাশী ১২ মাইল। ২২শে জুন গোধূলি সময়ে ইংরেজ সৈন্য এই বার মাইল পথ অতিবাহনে প্রবৃত্ত হইল। পথে তাহাদের বিস্তর কষ্ট হইয়াছিল। আট ঘণ্টাকাল অবিশ্রান্ত ভাবে চলিয়া রাত্রি ১টার সময় পরিশ্রান্ত সৈনিক দল পলাশীতে উপনীত হইল এবং গ্রাম অতিক্রম করিয়া, অদূরবর্ত্তী আম্রকাননে শিবির সন্নিবেশ করিল।

এই আম্রকানন ভাগীরথীর নিকটে অবস্থিত; ইহার দৈর্ঘ ১৬৮০ হাত এবং বিস্তার ৬০০ হাত। বৃক্ষগুলি শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সজ্জিত। বৃক্ষ শ্রেণী একটি মৃৎপ্রাচীর ও পরিখায় (পগারে) পরিবেষ্টিত ছিল। ক্লাইব এই সুন্দর আম্রকাননে আপনার পরিশ্রান্ত সৈন্যদিগকে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে অদূরে সমর-সঙ্গীত তাঁহার শ্রুতি প্রবিষ্ট হইল। সেই সামরিক গীতি তাঁহার হৃদয়ে বিস্ময় ও আতঙ্কের সঞ্চার করিল। তিনি সেই সঙ্গীত শুনিয়াই আপনাদের সন্নিবেশ ভূমি সুব্যবস্থিত করিতে যত্নশীল হইলেন।

নবাব আপনার সৈন্যদল লইয়া ১৯এ জুন মুর্শিদাবাদ হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। ঐদিন তিনি শুনিতে পাইলেন যে, ইংরেজ সৈন্য কাটোয়ায় উপস্থিত হইয়াছে। নবাব ক্লাইবের প্রকৃতি জানিতেন। সুতরাং তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল যে, ইংরেজ অবিলম্বে ভাগীরথী পার হইয়া পলাশীর অভিমুখে অগ্রসর হইবে। এই বিশ্বাস প্রযুক্ত তিনি সহসা পলাশীর দিকে না যাইয়া কাশীম বাজারের ৬ মাইল দূরে একটি পল্লীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যে মীরজাফর ক্লাইবকে যথা সময়ে এই সংবাদ জানাইতে ত্রুটি করেন নাই। যাহা হউক, ২১এ জুন নবাব যখন শুনিতে পাইলেন যে, ইংরেজেরা তখনও কাটোয়ায় অবস্থিতি করিতেছে, তখন তিনি পূর্ব্ব সঙ্কল্প অনুসারে পলাসীতে যাইতে উদ্যত হন এবং অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া আম্রকাননের এক মাইল উত্তরে সৈন্য স্থাপন করেন। ইংরেজদিগের উপস্থিতির বারঘণ্টা পূর্ব্বে নবাব পলাশীতে আসিয়া সৈন্য সন্নিবেশ করিয়াছিলেন।

নবাবের সৈন্যসংখ্যা অধিক ছিল। ৩৫ হাজার পদাতিক যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া নবাবের পক্ষ সমর্থন করিতেছিল। কিন্তু এই পদাতিক সৈন্য তাদৃশ সুশিক্ষিত ছিল না, এবং ইহাদের অস্ত্র শস্ত্রও তাদৃশ উৎকৃষ্ট ছিল না। নবাবের অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা ১৫ হাজার ছিল। ইহারা সুশিক্ষিত, বলসম্পন্ন ও তেজস্বী অশ্বে অধিষ্ঠিত ছিল। ইহাদের প্রধান অস্ত্র তরবারি ও বড়শা। কামান-সজ্জা ও কামান পরিচালকগণ অশ্বারোহী সৈন্যদল অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ছিল। নবাব ৫৩ টি কামান আনিয়াছিলেন। ৪০।৫০ জন ফরাসী একজন ফরাসী সেনাপতির অধীনে ঐসকল কামান পরিচালনা করিতেছিল।

নবাবের সৈন্য যেমন অধিক সংখ্যক ও অধিকতর বলশালী, তেমনি তাহারা অধিকতর উৎকৃষ্ট ও সুব্যবস্থিত স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। নবাব যে স্থানে সৈন্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা পরিখায় ব্যাপ্ত ছিল। ভাগীরথী এইখানে অর্দ্ধবৃত্তাকারে উত্তর পূর্ব্বদিকে আসিয়া, দক্ষিণাভিমুখ হইয়াছে। সুতরাং ভাগীরথী প্রবাহের এই উত্তর পূর্ব্বদিক কোণাকৃতি হইয়া উঠিয়াছে। কোণাকৃতিস্থলের নিকটে একটি ছোট গড়ে কামান সকল সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। উহার ৬০০ হাত পূর্ব্বে পরিখার সম্মুখ ভাগে একটি পাহাড়ি জঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল। ঐ গড়ের ১৬০০ হাত দক্ষিণে ইংরেজ সৈন্য যে আম্রকাননে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিল, তাহারই নিকটে একটি পুষ্করিণী এবং ঐ পুষ্করিণীর ২০০ হাত অন্তর আর একটি বড় পুষ্করিণী ছিল। উভয় পক্ষের সৈন্যের গতিবিধি বুঝিতে হইলে এই বর্ণিত স্থানের দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

২৩শে জুন প্রাতঃকালে নবাবের সৈন্য আপনাদের পরিখা পরিবেষ্টিত সন্নিবেশ স্থল হইতে যাত্রা করিল। ফরাসীরা চারিটি কামান লইয়া ইংরেজদিগের অতি নিকটে পূর্ব্বোক্ত বড় পুষ্করিণীর পার্শ্বে আসিল। ভাগীরথী ও তাহাদের মধ্যভাগে আর দুইটি কামান একজন ভারতবর্ষীয় সৈনিক পুরুষের অধীনে রক্ষিত হইল। কামান পরিচালক ফরাসীদিগের পশ্চাতে নবাবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৈন্য পাঁচ হাজার অশ্বারোহী, সাত হাজার পদাতিক, তাঁহার পরম বিশ্বস্ত সেনাপতি মীরমদনের অধীনে অবস্থিতি করিতে লাগিল। তাঁহারই পার্শ্বে সেনাপতি মোহনলাল ইংরেজের সম্মুখে আপনার বীরত্ব গৌরবের পরিচয় দিবার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের পার্শ্বভাগে নবাবের ৩৮ হাজার সৈন্য অর্দ্ধচক্রাকারে ইংরেজদিগের সম্মুখে রহিল। নবাবের বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি রাজা দুর্লভরাম, ইয়ার-লতিফ খাঁ ও মীরজাফরের অধীনে ঐ সকল সৈন্য রক্ষিত হইয়াছিল। দুর্লভরাম, দক্ষিণভাগে, ইয়ারলতিফ মধ্যভাগে এবং মীরজাফর ইংরেজ-দিগের অতি নিকটে বামভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, নবাব সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত স্থানে সৈন্য স্থাপন করিয়া-ছিলেন। ক্লাইব যে পথে অগ্রসর হইয়া, নবাবের শিবির আক্রমণ করিবেন, সেই পথ কামান পরিচালক ফরাসীগণ এবং সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি মীর-মদন ও মোহনলাল অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অধিকন্তু ক্লাইবের

একদিকে ভাগীরথী খরবেগে তরঙ্গবাহু আস্ফালন করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছিল, আর দিকে নবাবের বিপুল সৈন্য চক্রাকারে তাঁহার পথ অবরুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইংরেজেরা এইরূপে শত্রু সৈন্যে প্রায় পরিবেষ্টিত ছিলেন। এই সুদৃঢ় বিপুল ব্যূহভেদ করিতে পারেন, তাঁহাদের সেরূপ সৈনিকবল বা ক্ষমতা ছিল না। যদি হতভাগ্য সিরাজের সেনাপতিগণ বিশ্বাসঘাতক না হইত, দুর্নিবার ভোগ লালসা ও আত্মসুখ কামনা যদি এ সময়ে তাহাদিগকে পবিত্র কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচলিত না করিত, তাহা হইলে ইংরেজ সৈন্য পলাশীর ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহ নির্ম্মূল হইয়া যাইত।

আম্রকাননের বহির্ভাগে ভাগীরথীর তটদেশে নবাবের, শীকার করিবার একটি মঞ্চ ছিল। ক্লাইব যখন আম্রকাননে উপস্থিত হইয়া অদূরে সমর সঙ্গীত শুনেন, তখন তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া ঐ শীকার মঞ্চ অধিকার করিতে কয়েকজন সৈনিক পুরুষ পাঠাইয়া দেন। মঞ্চ অধিকৃত হয়। ক্লাইব এখন মঞ্চ হইতে নবাবের সৈন্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিয়া, বিস্ময় ও আশঙ্কার তরঙ্গে মুহুর্মুহু আন্দোলিত হইয়া উঠিলেন। নবাবের বল-বহুলতা, সৈন্য-সন্নিবেশের পারিপাট্য, মীরমদন ও মোহনলালের সেই অদম্য তেজ ও উৎসাহ, সমস্তই ক্লাইবের হৃদয়ে তুমুল ঝটিকার সূত্রপাত করিল। ক্লাইব এক একবার গভীর আশায় বুক বাঁধিয়া মীরজাফরের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, আবার আশঙ্কার সহিত আপনার ক্ষুদ্র দলের প্রতিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, বিস্ময় ও বিরাগে অভিভূত হইতে লাগিলেন। নবাবের সৈন্য যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল, তখন ক্লাইব আর কাল বিলম্ব না করিয়া আপনার ক্ষুদ্র সৈন্যদলকে আম্রকানন হইতে বাহির হইতে আদেশ দিলেন। সেনাপতির আদেশে সৈন্যগণ আম্রকান হইতে বহির্গত হইল। ক্লাইব তাহাদিগকে আম্রবনের সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ করিলেন। সৈন্য শ্রেণীর মধ্যভাগে ইউরোপীয়গণ এবং উভয় পার্শ্বে সিপাহিগণ স্থাপিত হইল। ইউরোপীয় সৈন্যের উভয় পার্শ্বে শত্রুব্যূহ ভেদের জন্য কামান সকল প্রস্তুত রহিল।

ইংরেজের ইতিহাসের এই চিরস্মরণীয় দিনে বেলা পূর্ব্বাহ্ণ আটঘটিকার সময় উভয়পক্ষ, উভয় পক্ষের আক্রমণে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইল। ফরাসীরা আপনাদের সুদক্ষ সেনাপতি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া প্রথমে একটি

কামান হইতে গোলা চালাইতে লাগিল। ইংরেজ পক্ষ হইতেও গোলা বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ইংরেজের গোলা যদিও অব্যর্থ সন্ধানে শত্রুদলে আসিয়া পড়িতে লাগিল, তথাপি ইংরেজ পক্ষের কোনরূপ সুবিধা দেখা গেল না। নবাবের সৈন্য সংখ্যায় অধিক ছিল, সুতরাং তাহারা আপনাদের নির্দিষ্ট স্থান হইতে অণুমাত্রও বিচলিত হইল না। এদিকে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে ক্লাইবের এরূপ ক্ষতি বোধ হইল যে ক্লাইব পশ্চাৎ হটিয়া আসিয়া সৈন্যদিগকে আম্র কাননে আশ্রয় দিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন। এই সঙ্কল্প অনুষ্ঠিত কার্য্য হইল। ক্লাইব শৃঙ্খলা সহিত, পশ্চাদ্গমন করিয়া, আম্রকাননে সৈন্য স্থাপন করিলেন। ইহাতে নবাবের সৈন্য এত উৎসাহযুক্ত হইয়া উঠিল যে, তাহারা কামান সকল শত্রুপক্ষের আরও নিকটে লইয়া গিয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সত্বরতার সহিত গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন ফল হইল না। যে হেতু গোলা সকল উর্দ্ধে আসিয়া পড়াতে আম্র বনেরই ক্ষতি হইতে লাগিল, বৃক্ষের নিম্নদেশে যে সকল সৈন্য ছিল, তাহাদের তত টা ক্ষতি হইল না। এদিকে ইংরেজেরা আম্রকাননের অন্তর্ভাগ হইতে গোলা চালাইতে লাগিল। কিন্তু ইহাতেও নবাবের সৈন্য পশ্চাৎপদ হইল না। তিন ঘণ্টাকাল এইরূপে গোলায় গোলায় যুদ্ধ হইল; কিন্তু ইংরেজদিগের কোন সুবিধা দেখা গেল না। নবাবের সৈন্য পূর্ব্বের ন্যায় সমভাবে গোলা চালাইতে লাগিল। তাহারা নির্দিষ্ট স্থান হইতে রেখামাত্রও বিচলিত হইল না। এসময়েও ক্লাইবের সহিত মীরজাফরের সম্মিলনের কোন চিহ্ন দেখা গেল না। মীরমদন যেস্থান অবরোধ করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন, সে স্থান অধিকার করিতে ক্লাইব সাহসী হইলেন না, সুতরাং ক্লাইব উদ্বিগ্ন হইলেন। আত্মপক্ষের কোন সুবিধা না দেখিয়া, তিনি বেলা এগারটার সময় আপনার প্রধান প্রধান সৈনিক পুরুষদিগকে নিকটে আহ্বান করিলেন, ইহাঁদের সহিত পরামর্শের পর অবশেষে স্থির হইল যে, রাত্রিপর্য্যন্ত আম্রকাননে অবস্থিতি করিয়া, নিশীথে শত্রুশিবির আক্রমণের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

এইরূপ স্থির হইলে, ইংরেজ সৈন্য পূর্ব্বের ন্যায় সেই সুবিস্তৃত আম্রকাননেই অবস্থিতি করিতে লাগিল। ইহার মধ্যে একটি প্রাকৃতিক ঘটনা ইংরেজের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইয়া দাঁড়াইল। বর্ষাকালে সর্ব্বদা যেরূপ হইয়া থাকে, হঠাৎ এক ঘণ্টাকাল প্রবলবেগে সেইরূপ বৃষ্টি হইল। ইংরেজেরা

আপনাদের বারুদ প্রভৃতি ঢাকিয়া রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল, সুতরাং তাহাদের ততটা ক্ষতি হইল না; কিন্তু নবাবের সৈন্য এরূপ সাবধান না হওয়াতে তাহাদের সমস্ত বারুদ ভিজিয়া গেল। ইহাতে তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় গোলা চালাইতে পারিল না। ভীষণ সমরানলের তেজ ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিল। ইংরেজদিগের বারুদও এইরূপে নষ্ট হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া সেনাপতি মীরমদন একদল অশ্বারোহী লইয়া, প্রবল বেগে আম্রকাননের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ইংরেজ সৈন্য ইঁহাদের উপর গুলি বৃষ্টি করিতে লাগিল। গুলির বেগে আক্রমণকারিগণ হটিয়া গেল। সেনাপতি মীরমদন সাংঘাতিক রূপে আহত হইলেন।

এই ঘটনাতেই সিরাজের কপাল একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। ২৩শে জুনের এই ঘটনাই অনেকাংশে ইংরেজের বিজয় গৌরবের প্রচারে সুবিধা করিয়া দিল। যদি মীরমদন জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলেও সিরাজের একটা আশা ভরসার স্থল থাকিত। সিরাজউদ্দৌলা বিশ্বাসঘাতকগণে বেষ্টিত ছিলেন বটে, কিন্তু ঐ সাহসী প্রভুভক্ত সেনাপতি, মোহনলালের সাহায্যে তাঁহাকে কোনরূপে রক্ষা করিতে পারিতেন। এরূপ সেনাপতির মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইল, কোনওরূপে আর সে ক্ষতির পূরণ হইল না। হতভাগ্য ঊনবিংশ বর্ষীয় যুবক আপনার সুদক্ষ ও বিশ্বস্ত সেনাপতির মৃত্যুতে অধীর হইলেন; অধীরভাবে মীরজাফরকে ডাকিয়া আনিলেন। মীরজাফর উদাসীন ভাবে নবাব সমক্ষে উপনীত হইলেন। নবাব আপনার পাগড়ি তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া কাতরতার সহিত বাষ্পনিরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন—"আমি যাহা করিয়াছি, তাহার জন্য এখন আমার অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু তোমার সহিত আমার ও স্বর্গীয় মাতামহ আলিবর্দ্দী খাঁর দুশ্ছেদ্য বন্ধন আছে। আমি এখন তোমাকেই সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষের প্রতিনিধি বলিয়া চাহিয়া দেখিতেছি। আমার আশা আছে তুমি আমার পূর্ব্বকৃত অপরাধ ভুলিয়া যাইবে, এবং প্রকৃত সৈয়দের ন্যায়, পবিত্র পার্থিব বন্ধনে আবদ্ধ আত্মীয় স্বজনের ন্যায়, আমার বংশের কৃত মহদুপকার কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। আমি তোমার দিকে চাহিয়া, আমার জীবন ও আমার সম্মান রক্ষার ভার তোমার প্রতি সমর্পণ করিলাম।" ইহার পর নবাব ভূমি স্থাপিত স্বীয় উষ্ণীষ লক্ষ্য করিয়া, সজল নয়নে কহিলেন, "জাফর! এই পাগড়ি তুমি অবশ্য রক্ষা করিবে।" আপনার অনুগত প্রজা ও প্রতি-

পালিত কর্মচারীর নিকট রাজ্যাধিপতির এরূপ কাতরতা, এরূপ করুণাপূর্ণ সাহায্য প্রার্থনা আর সম্ভবে না। ঊনবিংশ বর্ষীয় তরলমতি যুবক আপন প্রাণের দায়ে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, বিশ্বাসঘাতক প্রতিপালিতের সমক্ষে এইরূপে গভীর মর্ম্মবেদনা জানাইলেন।

কিন্তু এইরূপ কাতরতায় কঠোর প্রকৃতি বিশ্বাসঘাতকের কঠোরতা দূর হইল না, প্রতিপালক রাজ্যাধিপতির এরূপ বিনয় অনুনয়েও তাহার কিছুমাত্র সমবেদনা জন্মিল না। মীরজাফর যেরূপ উদাসীন ভাবে নবাবের শিবিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ উদাসীন ভাবে, কিন্তু বাহিরে সমধিক ও আনুগত্যের নিদর্শন দেখাইয়া কহিলেন "বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এখন আক্রমণের আর সময় নাই। যে সকল সৈন্য অগ্রসর হইয়াছে এবং যাহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদের সকলকেই ফিরিয়া আসিতে আদেশ প্রচার করুন। ঈশ্বরের প্রসাদে আগামী কল্য আমি সমস্ত সৈন্য লইয়া, বিপক্ষ-পক্ষ আক্রমণ করিব।" সিরাজ আবার কাতরতার সহিত কহিলেন, "রাত্রিতে বিপক্ষগণ আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে।" মীরজাফর পূর্ব্বের ন্যায় উদাসীন ভাবে তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে, বিপক্ষগণ রাত্রিকালে কখনও আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না।

সেনাপতি মোহনলাল মীরমদনের সহিত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে বিপক্ষদিগকে যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন; তাঁহার কামানের গোলা এই সময়ে বিশেষ কার্য্যকর হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তাঁহার পদাতিক সৈন্য অবিশ্রান্ত গুলি বৃষ্টি করিয়া, ইংরেজ সৈন্যের ক্ষমতা প্রায় পর্য্যুদস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এই সময়ে যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার আদেশে মোহনলাল বিরক্ত হইয়া কহিলেন "এখন যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া ফিরিয়া যাওয়ার সময় নয়। উপস্থিত যুদ্ধে যাহা ঘটিতে পারে, এখনই তাহার সংঘটন প্রার্থনীয়। আমি ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, সমস্ত সৈন্য সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িবে।" সিরাজউদ্দৌলা মোহন লালের এই কথা মীরজাফরকে জানাইলেন মীরজাফর কিছু বিরক্তির সহিত উত্তর করিলেন, 'আমি যে পরামর্শ দিয়াছিলাম, তাহাই আমার মতে অধিকতর সঙ্গত বোধ হইয়াছিল। এখন আপনি যাহা উচিত বোধ করেন, তাহাই করিতে পারেন।" ভয়াতুর হতভাগ্য যুবক বিশ্বাসঘাতক সেনাপতির কথায় আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। তিনি মীরজাফরের কথাতেই সম্মতি দিয়া, আপনার দুরদৃষ্টকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হইলেন।

এদিকে দুরাশয় মীরজাফর নবাবের নিকট বিদায় লইয়া অশ্বারোহণে বিদ্যুদ্বেগে আপনার সৈন্যদলে উপস্থিত হইলেন। এই খানে আসিয়াই তিনি অবিলম্বে ক্লাইবকে সমস্ত কথা লিখিয়া পাঠাইলেন। ঐ পত্রে ক্লাইবকে এরূপ ও অনুরোধ করা হইল যে, তিনি যেন আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া তাঁহার সৈন্যদল সহ অগ্রসর হইতে থাকেন। এদিকে মীরজাফরের উদাসীনভাবে সিরাজউদ্দৌলা অধিকতর উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বস্ত সেনাপতির মৃত্যু হইয়াছিল, বারুদ সকল ভিজিয়া গিয়াছিল, সুতরাং তিনি গভীর আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া, কাতর ভাবে দুর্ল্ভরামের নিকটে আসিলেন। এই সেনাপতিও বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের দলভুক্ত ছিলেন। সুতরাং সিরাজ ইঁহার নিকটেও সমুচিত সান্ত্বনা পাইলেন না। দুর্ল্ভরামও সৈন্যদিগকে, পরিখাবেষ্টিত স্থানে হটিয়া আসিতে আদেশ দিতে নবাবকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সমরক্ষেত্রে মীরমদনের পতন হইয়াছিল; মোহনলাল বিশেষ পরাক্রমের সহিত বিপক্ষদিগকে নির্জ্জিত করিতে ছিলেন; অবশিষ্ট তিনজন সেনাপতি দুর্ল্ভরাম, ইয়ারলতিফ ও মীরজাফর ইংরেজপক্ষ সমর্থন করিতে ছিলেন। সুতরাং ইঁহাদের কাহারও নিকট সদ্ব্যবহারের প্রত্যাশা ছিল না। হতভাগ্য যুবক এখন নিরুপায় হইয়া মীরজাফর প্রভৃতিকে সন্তুষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ইঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলে ইহারা সকলেই আগামী কল্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। নবাব এই বিশ্বাসে যুদ্ধে ক্ষান্ত থাকিতে মোহনলালকে পুনঃ পুনঃ আদেশ দিতে লাগিলেন। এই আদেশ দিয়াই তিনি উটে চড়িয়া দুই হাজার অশ্বারোহীর সহিত ভয়ব্যাকুল চিত্তে মুর্শিদাবাদের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

নবাবের পুনঃ পুনঃ আদেশে বিরক্ত হইয়া, মোহনলাল অবশেষে ঐ আদেশ পালন করিলেন। তিনি সহসা যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া, আপনার স্থানে ফিরিয়া আসিলেন। সেনাপতিকে সহসা যুদ্ধক্ষেত্র হটিয়া আসিতে দেখিয়া সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা রহিল না। তাহারা সন্ত্রস্তভাবে এদিকে ওদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তিনজন বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি এখন আপনাদের নির্দ্দিষ্ট স্থলে প্রভুত্ব করিবার সুযোগ পাইলেন। ফরাসী সেনাপতি ইহাতে বিচলিত হইলেন না। তিনি শেষ সময় পর্য্যন্ত প্রাণপণে নবাবের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। মীরমদনের সৈন্য

গণের সাহায্যে এই বিদেশী বিশ্বস্ত সৈন্যাধ্যক্ষ আপনাদের অধিষ্ঠিত স্থান রক্ষা করিতে যত্নশীল হইলেন। কিন্তু মীরমদনের মৃত্যুতে ও মোহনলালের প্রত্যাবর্ত্তনে ঐ সকল সৈন্যও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। ফরাসী সেনাপতি সেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রায় নিঃসহায় ও নিরবলম্ব হইলেন। সুতরাং ইংরেজ পক্ষের জয়লাভ হইল। বেলা পাঁচটার সময় ইংরেজ সৈন্য নবাবের পরিখা-বেষ্টিত শিবির অধিকার করিল।

এইরূপে ইংরেজ বর্ণিত বিখ্যাত পলাশী মহাসংগ্রামের অবসান হইল। যে যুদ্ধ ইংরেজকে বণিকবেশ ছাড়াইয়া বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার রাজ-সিংহাসনে বসাইয়াছে, ক্রয় বিক্রয়ে ক্ষতিলাভ গণনা পরিত্যাগ করাইয়া, সন্ধিবিগ্রহ ঘটিত মন্ত্রণায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছে, ইংরেজ ইতিহাসলেখকগণ শত-মুখে যে যুদ্ধের গৌরবের কথা ঘোষণা করিয়াছেন, এইরূপে তাহা শেষ হইয়া গেল। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধ মহাযুদ্ধের সম্মানিত নামের যোগ্য নহে। প্রবন্ধের সূচনাতেই এই কথা বলা হইয়াছে। পলাসীর যুদ্ধ ঘোর নীচাশয় বিশ্বাসঘাতকের চাতুরীমাত্র। এই চাতুরীতেই হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌলার অধঃপতন হয়, এবং এই চাতুরীতেই বঙ্গে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠে।

পরদিন প্রাতঃকালে ক্লাইব মীরজাফরকে আপনার শিবিরে আনিবার জন্য স্ক্রাফ্‌টন সাহেবকে পাঠাইয়া দিলেন। মীরজাফর হাতীতে চড়িয়া যথাসময়ে ক্লাইবের শিবিরে উপনীত হইলেন। ক্লাইব তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার বলিয়া অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। ক্লাইব পাছে সিরাউদ্দৌলার ন্যায় তাঁহারও সর্ব্বনাশ করেন, মীরজাফর এই আশঙ্কায় বড় উদ্বিগ্ন ছিলেন। এখন ক্লাইবের ঐরূপ অভি-নন্দনে মীরজাফরের আশঙ্কা দূর হইল। মীরজাফর ক্লাইবের পরামর্শে সেই দিনই মুর্শিদাবাদে উপনীত হইলেন।

মীরজাফরকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া ক্লাইব স্বয়ং তথায় যাত্রা করিলেন। পথ হইতে ২৫শে জুন তিনি ওয়াটস্ ও ওয়াল্‌স্ সাহেবকে, একশত সিপাহি সঙ্গে দিয়া মীরজাফরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মীরজাফর অঙ্গীকার পত্রানুসারে যে যে হিসাবে টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, ইঁহারা সেই সমস্ত টাকার বন্দোবস্ত করিতে আদিষ্ট হইলেন। এইরূপ আদিষ্ট হইয়া ওয়াটস্ ও ওয়াল্‌স সাহেব মুর্শিদাবাদে আসিলেন। এদিকে ধনা-

পারে বেশী টাকা ছিল না; যাহা ছিল, তাহাতে অঙ্গীকৃত অর্থ সমষ্টির তিন ভাগের কিছু কম দুই ভাগ মাত্র শোধ হইতে পারিত। সুতরাং ইংরেজের অর্থলালসা চরিতার্থ করা অসাধ্য হইয়া উঠিল। এই সঙ্কট-কালে শেঠবংশ ও রাজা দুর্লভরাম মীরজাফরের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। ইহাদের সাহায্যে অবশেষে স্থির হইল যে, নগদ ও মণি-মুক্তা-তৈজস-পত্রে* নিরূপিত সমষ্টির অর্দ্ধেক এখন দেওয়া হইবে, অবশিষ্ট কিস্তিবন্দী করিয়া তিন বৎসর তিন কিস্তীতে শোধ করা যাইবে। বিদেশী বণিকজাতি এইরূপে রাজকোষ শূন্য করিয়া, অভিনব অনুগত নবাবকে ঋণজালে জড়িত করিয়া বঙ্গে আপনাদের অধিকারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিল।

টাকা কড়ির বন্দোবস্ত হইলে, ক্লাইব মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিলেন। অবিলম্বে দরবারের আয়োজন হইল। মীরজাফর এই দরবারে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব বলিয়া অভিনন্দিত হইলেন। অভিনব নবাবের নামে ঘোষণাপত্র প্রচার হইল। এই অবধি ইংরেজ প্রকৃত পক্ষে বঙ্গের অধিপতি হইলেন। অভিনব নবাব তাঁহাদের ক্রীড়া-পুতুল-স্বরূপ হইয়া রাজসিংহাসনে বসিয়া রহিলেন।

ইংরেজের আশাপূর্ণ ও ভোগলালসা চরিতার্থ হইল। বিশ্বাসঘাতকেরা আপাত মনোরম দৃশ্যে সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। এই সন্তোষ ও তৃপ্তির মধ্যে কেবল একজন মাত্র হতাশার তীব্রদংশনে কাতর হইয়া, আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিল। ৩০শে জুন মীরজাফর অঙ্গীকার পত্রানুসারে অর্থ দিবার বন্দোবস্ত করেন। উমিচাঁদ আশা করিয়াছিলেন, এই দিনে তিনিও নির্দ্দিষ্ট অর্থ পাইবেন। উমিচাঁদ এই আশায় বুক বাঁধিয়া আমোদের তরঙ্গে দুলিতেছিলেন, এমন সময়ে ক্লাইব ও স্ক্রাফ্‌টন তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। ক্লাইব স্ক্রাফ্‌টনকে বলিলেন, "এখন উমিচাঁদকে আসল কথা বলিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।" অমনি স্ক্রাফ্‌টন হিন্দুস্থানীতে উমিচাঁদকে কহিলেন, "উমিচাঁদ! লোহিত বর্ণের অঙ্গীকার পত্র ভুয়া কাগজ সুতরাং তুমি কিছুই পাইবে না।" স্ক্রাফ্‌টনের কথা বজ্রবৎ উমিচাঁদের হৃদয়ে আঘাত করিল। উমিচাঁদ অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। যদি তাঁহার একজন অনুচর তাঁহাকে না ধরিত, তাহা হইলে তিনি অচেতন হইয়া ভূতলে পড়িয়া যাইতেন। অনুচরেরা ঐ অবস্থায় উমিচাঁদকে পাল্কিতে

* দুই তৃতীয়াংশ নগদ, এক তৃতীয়াংশ মণিমুক্তা ও বাসন ইত্যাদিতে।

করিয়া গৃহে আনিল। এইখানে তিনি গভীর বিষাদে নিমগ্ন রহিলেন। ক্রমে তাঁহার বাতুলতার লক্ষণ প্রকাশ পাইল। কিছুদিন পরে ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ক্লাইব তাঁহাকে তীর্থস্থলে যাইতে পরামর্শ দেন। উমিচাঁদ এই পরামর্শ অনুসারে তীর্থযাত্রায় গিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাহার মানসিক যাতনার বিরাম হয় নাই। তিনি তীর্থক্ষেত্রে আসিয়া পাগল হইলেন। সময়ে সময়ে তাঁহার জ্ঞান একবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। তিনি এক এক দিন বহুমূল্য শোভিত সুদৃশ্য পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আপনা আপনিই আহ্লাদ প্রকাশ করিতেন। এই অবস্থাতেই, হতাশাস হওয়ার দেড় বৎসর পরে, তাঁহার মৃত্যু হয়।

উমিচাঁদকে প্রতারিত করা, ক্লাইবের স্বার্থ-পরতা-ময় নিকৃষ্ট চরিত্রের নিকৃষ্টতম অংশ। তাঁহার স্বদেশীয়গণও এই নিকৃষ্ট চরিত্রের অপার কলঙ্কে ঘৃণা ও বিরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। উমিচাঁদের সংসৃষ্ট অঙ্গীকার পত্রে যে, ওয়াট্‌সনের নাম জাল করা হইয়াছিল, তাহা ওয়াটসন্ পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই। শেষে মৃত্যু শয্যায় এই কথা তাঁহার শ্রুতিপ্রবিষ্ট হয়। কথা শুনিয়া, তিনি বিরাগের সহিত কহিয়াছিলেন "মানবজাতির মধ্যে যখন এরূপ অসাধুতা রহিয়াছে, তখন তিনি তাহাদের মধ্যে আর থাকিতে ইচ্ছা করেন না।"

সকল শেষ হইল। ইংরেজের অর্থলালসা তৃপ্ত হইল। বাঙ্গালায় তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল। মীরজাফর তাহাদের অনুগত হইয়া, আপনার শূন্য উপাধিতে তৃপ্তি-সুখ অনুভব করিতে লাগিল। উমিচাঁদ অর্থ লাভের আশার সহিত আপনার জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিল। আর হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌলা? যে নির্দ্দোষ তরুণমতি যুবকের জন্য এত চাতুরী, এত প্রতারণা, এত ষড়যন্ত্র হইল, শেষে তাহার দশায় কি ঘটিল? এই হতভাগ্য বালকের জীবনের অন্তিম শোচনীয় কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনীয়। ২৩শে জুন সন্ধ্যার সময় সিরাজউদ্দৌলা পলাশী হইতে মুর্শিদাবাদের শূন্য প্রাসাদে আসিলেন। এই দুঃসময়ে কেহই তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল না। এক সময়ে যাহারা তাঁহার অনুগ্রহ ভিখারী ছিল, এ সময়ে তাহারাও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। অধিক কি, তাঁহার শ্বশুর পর্য্যন্ত নানা ছল করিয়া, তাঁহাকে ছাড়িয়া আপনার গৃহে গেলেন। পরিবারের সকলে ভয়ে অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিল। অন্তঃপুর-চারিণী নারী-

দিগের আর্ত্তনাদে হতভাগ্য বালকের হৃদয় অধিকতর বিচলিত হইল। সিরাজ পরদিন কুলকামিনীদিগকে মণিমুক্তার সহিত হাতীতে করিয়া পাটনায় পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, পলাশী হইতে শেষ সংবাদ পঁহুছিলে তিনিও ইহাদের অনুগমন করিবেন। কিন্তু ইহার মধ্যে মীরজাফরের আগমন সংবাদ জানিয়া, তিনি, ফরাসী সেনাপতি "লর" সহিত মিলিত হইতে তাড়াতাড়ি ভাগলপুরের অভিমুখে যাত্রা করিতে উদ্যত হইলেন। সিরাজ এই অভিপ্রায়ে সেই রাত্রিতে প্রিয়তমা প্রণয়িনী লুৎফুল-নেশাকে সঙ্গে করিয়া, ছদ্মবেশে একজন বিশ্বস্ত খোজার সহিত প্রাসাদ হইতে যাত্রা করিলেন। নৌকা প্রস্তুত ছিল। সিরাজ সেই নৌকাতে চড়িয়া, মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। পথে তিনি ধরা পড়িলেন। যাহারা তাঁহাকে ধরিয়া মুর্শিদাবাদে আনিল, তাহারা পথে তাঁহার প্রতি অবিনয় ও অসৌজন্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে ত্রুটি করিল না। যে আত্মীয়ের ষড়যন্ত্রে ও বিশ্বাস-ঘাতকতায় তাঁহার অধঃপতন ঘটিয়াছে, হতভাগ্য সিরাজ বন্দীভাবে ২রা জুলাই তাহারই সম্মুখে আনীত হইলেন। এই দৃশ্য বড় শোচনীয়। সুনিপুণ চিত্রকরের কৌশলময়ী তুলিকায় এই শোচনীয় দৃশ্যের শোচনীয় ভাব প্রতিফলিত হওয়ার যোগ্য। সিরাজ অতি সুশ্রী ছিলেন। কিশোর বয়সে তাঁহার দেহকান্তি লোকলোচনের বড় প্রীতিকর ছিল। অপূর্ণ যৌবনে সৌন্দর্য্যের অপূর্ণ মাদকতায় তাঁহার মুখমণ্ডল বিভাসিত থাকিত। কিন্তু এখন সে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে কালিমার সঞ্চার হইয়াছিল। উদ্ভিন্ন কমলদলের ন্যায় সে প্রসন্ন মুখমণ্ডল, নয়নের সে প্রশান্ত ভাব, হীনপ্রভ হইয়া গিয়াছিল। দুঃসহ দুঃখে, কঠোর যাতনায়, প্রাণেরভয়ে উনবিংশ বর্ষীয় বালকের কান্তি, বৃন্তচ্যুত বিশুষ্ক কুসুমের ন্যায় পরিম্লান হইয়া পড়িয়াছিল। মীরজাফর, আপনার সৌভাগ্য, আপনার সম্মান, আপনার ক্ষমতা,—সমস্তই এই হতভাগ্য বালকের মাতামহ আলিবর্দ্দী খাঁর অনুগ্রহে লাভ করিয়াছিল। এখন সেই আলিবর্দ্দীর বাৎসল্যের ধন, স্নেহের অদ্বিতীয় অবলম্ব, প্রীতির একমাত্র পুত্তলী—দৌহিত্র—হীন বেশে, বন্দীদশায় তাঁহার অনুগৃহীতের পদানত হইয়া,কাতর ভাবে আপনার জীবন—কেবল জীবনমাত্র—ভিক্ষা করিতে লাগিল। এসময়ে তাহার বয়স কুড়ি বৎসরও হয় নাই। এই তরুণ বয়সে সুকুমার মতি বালক কেবল জীবনটি আপনার অমূল্য

সম্পত্তি মনে করিয়া, সেই অমূল্য সম্পত্তি রক্ষার জন্য আপনার অনুগৃহীত ব্যক্তির পদানত হইয়া, কাঁদিতেছিল। তাহার সুবিস্তৃত রাজ্য গিয়াছিল, বিপুল ধনসম্পত্তি পরহস্তগত হইয়াছিল, সম্মান ক্ষমতা, আধিপত্য—সমস্তই "প্রলয় পয়োধির' জলোচ্ছাসে ভাসিয়া গিয়াছিল, কিন্তু বালক তাহাতে অধীর না হইয়া, এখন কেবল প্রাণের জন্য কাতর ভাবে কাঁদিতে লাগিল। অভিনব নবাব, এই কাতর প্রার্থনার সম্বন্ধে কোন কথা কহিলেন না। তিনি বন্দীকে স্থানান্তরিত করিতে আদেশ দিয়া তাহার বিষয়ে কর্ত্তব্য অবধারণ জন্য অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ করিতে ইচ্ছা করিলেন।

অমাত্যগণ সিরাজকে প্রাণে না মারিয়া বন্দী করিয়া রাখিতে কহিলেন। কিন্তু মীরজাফরের পুত্র দুর্বৃত্ত মীরণ ইহাতে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করিতে লাগিল। অবশেষে মীরজাফর, পুত্রের অনুরোধে, সিরাজকে সে রাত্রি পুত্রের তত্ত্বাবধানে রাখিতে স্বীকৃত হইলেন। মীরণ এই রাত্রিতেই সিরাজউদ্দৌলাকে বধ করিতে ঘাতক নিযুক্ত করিল। ঘাতক অসি হস্তে সিরাজের গৃহে উপনীত হইল। সিরাজ বিস্ফারিত চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। আর তাঁহার কোনরূপ সন্দেহ রহিল না। তিনি অন্তিম সময়ে মুদ্রিত নয়নে অনন্তপদ ধ্যান করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে ঘাতকের অসি উপর্য্যুপরি কয়েকবার তাঁহার দেহে নিপতিত হইল। দেখিতে দেখিতে বঙ্গবিহার ও উড়িষ্যার অধিপতি কঠোর প্রকৃতি ঘাতকের কঠোর অস্ত্রাঘাতে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। ঘোর বিশ্বাস-ঘাতকতায় মিরজাফরের বঙ্গরাজ্যে অধিষ্ঠান; তাহার প্রথম দিনেই আশ্রিত-হত্যা,—রাজ-ঘাতকতা। এই সকল কথা স্মরণ করিয়াই বঙ্গের শেষ নবাব-নাজিম মনসুর আলি বলিতেন, "আমরা যদি উচ্ছিন্ন না যাই, তাহাহইলে জগৎ মিথ্যা হইবে।"

মীরজাফর প্রাতঃকালে সমস্ত শুনিতে পাইলেন। তাঁহার উপকারকের দৌহিত্র তদীয় পুত্রের আদেশে নিহত হইয়াছেন, ইহাতে তিনি কিছুমাত্র ক্ষোভ বা ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। সিরাজের অস্ত্রবিচ্ছিন্ন গতাসু দেহ হাতীতে করিয়া, নগরবাসী ও সৈন্যদিগকে দেখান হইলে, উহা আলিবর্দ্দীখাঁর কবরের পার্শ্বে সমাহিত করা হইল।

এইরূপে উনবিংশ বর্ষ বয়সে হতভাগ্য সিরাজের অনন্ত কষ্টময় ঐহিক জীবনের শেষ হইল। বয়সের তারল্যে ও বুদ্ধির চাঞ্চল্যে সিরাজ সম্বন্ধে

সময়ে অন্যায় পথে ধাবিত হইতেন বটে, কিন্তু তাঁহার গুরুতর শাস্তি তদীয় সমস্ত অন্যায় কার্য্যকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। তিনি ইংরেজদিগের সহিত কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করেন নাই। ৮ঠা ফেব্রুয়ারি যখন ইংরেজদিগের সহিত সন্ধি স্থাপিত হয়, তখন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি কেবল সরলতার পরিচয় দিতে ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে ইংরেজগণ, তাঁহার অমাত্যদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে প্রতারিত ও হত-সর্ব্বস্ব করিতে নিরন্তর যত্ন করিতে ছিলেন, সিরাজ কিন্তু কখনও ইংরেজদিগকে প্রতারিত করিতে উদ্যত হন নাই। অপক্ষপাত ইতিহাস এবিষয়ে কোনও অংশে তাঁহার কোন ত্রুটি দেখাইতে পারে নাই। ঘোর প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ও চাতুরীর মধ্যে এই উনবিংশবর্ষীয় বালকেই কেবল, সরলতা, সাধুতা ও সৌজন্যের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকও স্বীকার করিয়াছেন যে অন্ধ কূপের হত্যায় যাহারা লিপ্ত ছিল,সিরাজ তাহাদিগকে দণ্ডিত না করিয়া একবারমাত্র ইংরেজ দিগের বিপক্ষতা করিয়াছিলেন বটে,কিন্তু ইহার পর তিনি আর কখনও ইংরেজদিগের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। যাঁহারা সিরাজউদ্দৌলাকে ঘোর পাষণ্ড নরাধম বলিয়া বর্ণনা করেন, এই ঐতিহাসিকের কথা তাঁহাদের স্মৃতি পটে অঙ্কিত রাখা কর্ত্তব্য। একদল বাণিজ্য ব্যবসায়ী তাঁহার রাজ্যে বাস করিয়া, তাঁহারই সর্ব্বনাশের সূত্রপাত করে। তিনি ইহাদের অনধিকার চর্চ্চায় ক্রোধ প্রকাশ করিলেও, ইহাদের সহিত যে সন্ধি ছিল, সেই সন্ধির নিয়ম রক্ষা করিতে উদাসীন হন নাই। শেষে ইঁহারাই তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত, সম্পত্তি চ্যুত ও জীবনচ্যুত করিয়া আত্মস্বার্থের তৃপ্তিসাধন করে। ইহাদের স্বদেশীয়গণের অনেকেই হতভাগ্য সিরাজের চরিত্র গভীর কালিমায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। আর আমাদের যে সকল কাপুরুষ স্বদেশীয়গণ সিরাজের অধঃপতনে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ ও ক্ষমতাপন্ন করিবার আশা করিয়া বিদেশী, বিজাতির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহারাও সিরাজের চরিত্র পট কুৎসিত ও সিরাজের সহিত অসদ্ব্যবহার করিতে উদাসীন থাকেন নাই। তাঁহাদের পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। তাঁহারা জীবদ্দশায় বিদেশীর হস্তে প্রণষ্ট-সর্ব্বস্ব হইয়াছেন। তাঁহাদের সন্তানগণ এখন বিদেশীর নিপীড়নে নিষ্পেষণে মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহাদের সেই অপার দুষ্কৃতের অনন্ত ফলভোগ করিতেছেন।

# জন্তু-ধর্ম্মী মানব।

পণ্ডিতপ্রবর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রসাদে বাঙ্গালি বালক 'বোধোদয়' পড়িয়ামাত্র জানিতে পারে, —যে, মনুষ্য একটি জন্তু-বিশেষ। তাহার পর, আর দশবৎসর না যাইতেই করুণাময়ী ঠাকুরমার প্রসাদে যখন একটি পট্ট-বাস-জড়িত, হরিদ্রা-রঞ্জিত নয়বৎসরের বালা-জন্তু আপনার শয্যা-ভাগিনী রূপে প্রাপ্ত হয়, তখন নরনারীর পশুভাব সে আপনার হাড়ে হাড়ে বুঝিতে থাকে। তাহার কিছু দিন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগ্রস্ত যুবা —ডারউইনের মন্ত্রশিষ্য। মনুষ্যের পশুত্ব—এখনত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। কাজেই স্বদেশী বিদেশী মহামহা পণ্ডিতগণের নির্দ্দেশ অনুসারে, আর পিতামহীর প্রখর দৃষ্টিতে, অনেকেই বুঝিয়াছেন, যে আমরা একরূপ জন্তু বিশেষ; আমরা নিতান্তই পশুধর্ম্মী। আমরা সেই পুরাণ কথাটা আবার নূতন করিয়া বলিবার চেষ্টা করিব,—তোমরা কেহ রাগ করিও না; করিলে, আমাদের কথাই প্রতিপন্ন হইবে; রাগ—পশু-ধর্ম্ম। আর রাগই বা করিবে কেন? বালক কাল হইতে উপর্য্যুপরি এত শিক্ষা পাইয়াও, যদি, মনুষ্যের পশুত্বে তোমার সন্দেহ থাকে, তবে তোমার গৃহ প্রতিষ্ঠিত ইষ্টদেবতার সম্মুখে এই প্রবন্ধ পাঠ করিও, তিনি অবশ্য 'বিশেষণে সবিশেষ' তোমাকে বুঝাইয়া দিবেন। তাহাতেও যদি কিছু সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে, তবে এই পবন্ধ লেখকের সহিত একবার দেখা করিও, সকল সন্দেহ মিটিয়া যাবে।

জন্তু নানাবিধ; মনুষ্য-জন্তুও নানাবিধ। পশু, পক্ষী, সরীসৃপ প্রভৃতি নানারূপ মনুষ্য জন্তু আছে। সকল প্রকার পশু-ধর্ম্মীর বা পক্ষী-ধর্ম্মীর লক্ষণ বুঝাইতে গেলে পুঁথী বেড়ে যায়; আমরা দুই একটি উদাহরণ দিব মাত্র। বিচক্ষণ পাঠক পাঠিকা স্বজন বন্ধু বান্ধবের সহিত জু-বাগানে গিয়া উহাদের সহিত আমদানি মিলাইয়া ক্ষোভ মিটাইবেন।

## ভদ্র পক্ষী-ধর্ম্মী।

প্রথমে, পুরাণেতিহাসে প্রসিদ্ধ, সর্ব্ব-পরিচিত শুকপক্ষীকেই দৃষ্টান্ত স্বরূপে গ্রহণ করা যাউক।

শৌকের শ্রেণীস্থ মনুষ্য দেখিলেই বলা যায়। এই শৌকের শ্রেণীস্থ লোককেই লোকে শৌখীন বলে। কিন্তু শৌখীন না বলিয়া শৌকীন বলিলেই ঠিক ব্যাকরণ-দুরস্ত হয়। ইহাদের নাকটি বকফুলের কুঁড়ির মত টীকল, বাঁকাল, ঘোরাল। চোখগুলি ছোট ছোট, কুঁচের মত, যেন মিটি মিটি জ্বলিতেছে। গাটি বেশ চোমরান; মাথাটি বেশ আঁচড়ান; সর্ব্বদাই গাত্র পরিষ্কার রাখিতে ব্যস্ত। প্রায়ই শিকলে বাঁধা আছেন, তখন চাল ছোলা লইয়াই মত্ত; না হয়, মন্দিরের কোটরে, তখন দেব-দেবতার মাথায় নৃত্য করিতেছেন। চিরজীবন শিকলে বাঁধা আছেন, কিন্তু আপনার ভ্রূকুটি ছাড়েন না; ছোলার খোসা না ফেলিয়া খাইতে পারেন না; দুধের সর একটু বাসী হইলে, অমনই সেই বাঁকা নাক আর বাঁকাইয়া বসে। ইহার নাম শৌকীন বা শৌখীন রুচি।

যে বোল শিখাইয়া দিবে, শৌকীন বাবুরা, দেখিবে, তালে, বেতালে,—সময়ে, অসময়ে, কেবল তাহাই জপ-চাইতেছেন। রাধাকৃষ্ণই বলুন, আর কালী-করুণাকরই নাম করুন, অথবা শিব-জগদ্‌গুরু বলিয়াই চীৎকার করুন,—দেব-দেবতার জ্ঞান ইহাদের সকল সময়েই সমান; দেব-দেবতার উপর ভক্তিও সেইরূপ;—ভক্তি করেন, ভাল বাসেন কেবল দাঁড়টি আর ভাঁড়টি। সেই মিটি মিটি কুট্‌কুটে চোখ দুটি দিয়া ধানটি ছোলাটি অনবরতই পরীক্ষা করিতেছেন; সেই বাঁকা ঠোঁট দিয়া 'অপত্য নির্ব্বিশেষে' ছোলাগুলির খোসা ছাড়াইতেছেন; আর নিকটে কেহ আসিলেই, সেই চক্ষুতে একবার আড় চোখে দেখিয়া বলিতেছেন—"রাধাকৃষ্ণ" "রাধাকৃষ্ণ।" ইহাকেই বলে, শৌকীন বা শৌখীন ভক্তি।

ছেলে পিলে, কাছে গেলে, কঠোর ঠোকরে রক্তপাত করিতে শুকলাল বড় মজবুত। শৌকীন বাবুরা বলেন, যে বালক বালিকার শাসনই গৃহ সংসারের সার ধর্ম্ম; নিকটে বাগে পাইলেই ঠোকর দিবে। আর সবল লোকে ধরিলেই, চ্যাঁ চ্যাঁ করিয়া চীৎকার করিবে; তখন রাজনীতিজ্ঞরা বলেন, যে চীৎকারই শৌকীন পলিটিক্স। শুকরাজ চিরজীবন শিকল কাটিতেই নিযুক্ত; পরিশ্রম

প্রায়ই বৃথা হয়; কচিৎ যদি শিকল কাটা হইল, তাহা হইলে হয়ত নিজে তাহা বুঝিতে পারেন না; কর্ত্তা আসিয়া হাসিতে হাসিতে ধরিয়া ফেলিলেন, আর শিকলটি খুব মজবুত করিয়া দিলেন। আর না হয়ত, কাটা শিকল পায়ে বাঁধা একবার উড়িয়া গাছে বসিতেই, ডালে জড়াইয়া গেল। আবার ধরিয়া আনিল; অথবা অনাহারে মরিলেন; কিম্বা শিকারীতে মারিয়া ফেলিল। পায়ে শিকল লাগান শৌখীন স্বাধীনতা এই রূপই জানিবে।

শুক-সংবাদের একটি পুরাণ গল্প মনে পড়িল। একজন জুয়াচোর একটি শুক পাখীকে একটি মাত্র বোল শিখাইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে লইয়া যায়। পাখীটি কেবল মাত্র বলিতে পারিত—"তাহাতে সন্দেহ কি?" একজন ক্রয়ার্থী জিজ্ঞাসা করিল; "এই পাখীটির দাম কত হইবে?" বিক্রেতা বলিল, "পাঁচ শত টাকা; হয়, না হয়, পাখীকেই জিজ্ঞাসা করুন।" ক্রয়ার্থী বলিল, "কেমন, তুতি! তোমার মূল্য অত হইবে কি?" পাখী বলিল, "তাহাতে সন্দেহ কি?" লোকটি বিস্মিত হইয়া, পাঁচশত টাকা দিয়াই পাখীটি বাড়ী লইয়া গেল; তাহার পর বুঝিল, যে পাখীটি ঐ একটি মাত্র বোল জানে। তখন একই বোলে কাণ ঝালা পালা হইলে; পাখীর নিকটে দাঁড়াইয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল, "আমি কি নির্ব্বোধ!" পাখী বলিল, "তাহাতে সন্দেহ কি?" ইহা শুনিয়া পক্ষী-ক্রেতা যেমন কপালে ঘা মারিয়া হাস্য করিয়াছিল, আজি আমরাও সেইরূপ কপালে ঘা মারিয়া, সেইরূপ হাসিয়া বলিতেছি—"আমরা এত টাকা দিয়া যে একটি মাত্র বোল কিনিতেছি, আমরা কি নির্ব্বোধ!" ঐ শুন চারিদিক হইতে শৌকীন ভায়ারা এককোটে বক্র ঠোঁটে বলিতেছেন,—"তাহাতে আর সন্দেহ কি?"

এইরূপ কাক, পেচক, কুকুট প্রভৃতি নানা জাতীয় পক্ষী-ধর্ম্মী মানব আছে।

তত্র পশু-ধর্ম্মী।

পশুর দৃষ্টান্ত স্বরূপ গৃহ-পালিত বিড়াল গৃহীত হইল।

বাঙ্গালায় বিড়াল-ধর্ম্মী পুরুষ বিস্তর আছেন; তবে চতুষ্পদ ও দ্বিপদ বিড়ালে একটু প্রভেদ আছে। চতুষ্পদের এলাকা, অধিকার, ও আবদার,—ভিতর বাড়ীতেই বেশী; আর দ্বিপদের দখল, দাবি, দৌরাত্ম্য—

বহির্বাটিতে অধিক। অন্তর বাটিতে দেখিবেন, একটু বেলা হইয়াছে, আর বিড়াল অমনই গৃহিণীর গোলমলে ঠেশ্ দিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলই তাঁহার পদ-যুগলের মধ্যদিয়া যাতায়াত করিতেছে; আর বিনম্র সলোম লাঙ্গূল সঞ্চালনে তাঁহার পদ-সেবা করিতেছে। বাহিরে দেখিবেন, কর্ত্তার দক্ষিণে বামে দুই জন পুরুষ-মার্জ্জার বসিয়া আছেন; একজনের হস্তে 'বঙ্গবাসী;' তিনি মধ্যে মধ্যে কর্ত্তার চুলকণা গুলি খুঁটিয়া দিতেছেন। চক্রবর্ত্তীর উহাতে বড় আমোদ হয়; অপর দিকে পাল মহাশয় স্বয়ং পাখার বাতাস খাইতেছেন বটে, কিন্তু দূতীর গুণে বীজনী কর্ত্তার দিকেই অভিসারিকা। গৃহস্থ রোমশের লাঙ্গূল-সেবার, আর বহিঃস্থ চক্রবর্ত্তীর চুলকানি খুঁটিতে স্পৃহার, এবং পাল মহাশয়ের পাখার ভঙ্গির—একই কারণ।—সময়ে—কাঁটাটা, গুঁড়াটা; মাছটা, মুড়াটা।

বিড়াল বড় বাস্তু-প্রিয়। বাস্তুতে বস্তু থাকিলে বিড়াল কখন তাহা ছাড়িতে বা ভুলিতে পারে না। থোলের ভিতর পূরে, নানা লাঞ্ছনা করে,' উড়ে মালীর মাথায় দিয়া, (বিড়াল কাল তাহার মাছ খাইয়াছিল, তাই তাহার এত ত্যাগ-স্বীকার) বিড়ালকে গ্রামান্তর করিয়া দিয়া আইস; একদিন পরে দেখিবে, বিড়াল শুষ্ক মুখে, রুক্ষদেহে, একটু ভয়ে, একটু আহ্লাদে, অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষে অন্তর বাটির গোঁজলা দিয়া মুখ বাড়াইতেছে। এদিকেও দেখ, চক্রবর্ত্তীকে শত গঞ্জনা দিয়া, নবীন বাবুর সঙ্গে পাড়াকে চাপাইয়া, বেহারে কণ্ট্রাকটের কার্য্য করিতে দেশান্তরিত করা গেল; দশ দিন পরে দেখিবে চক্রবর্ত্তী, তেমনই শুষ্ক মুখে, রুক্ষদেহে, বৈটক খানায় উঁকি মারিতেছেন। বলেন, "পটোল নাই, উচ্ছে নাই,—কেবল কাঁকুড়, বারত্রদিন পেট গড়্ গড়্ করে, সেখানে কি থাকা যায়?"

বিড়াল বড় বেহায়া। ঘৃণা পিত্ত নাই বলিলেই হয়। খোকার দুধের বাটিতে মুখ দিয়াছিল বলিয়া, এইমাত্র গৃহিণী তাঁহার সেই দুর্জ্জয়-দমন পানবালার বাবমুখো খোবনা দিয়া তাহার থোঁতামুখ ভোঁতা করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু আবার ঐ দেখ,—এখনই ফিরিয়া আসিয়াছে; স্কুলের ছেলেদের পাতের পার্শ্বে জানু গাড়িয়া বসিয়া আছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয়েরও কম খোয়ার হয় না! সেদিন বড় বাবুর বৈটক খানায় গিয়া চক্রবর্ত্তী বরফ খাইয়াছিলেন বলিয়া, কর্ত্তা কি লাঞ্ছনাই না করেন! সকলেই মনে করিয়াছিল, ব্রাহ্মণ আর দশ দিন এ মুখো হবে না।—তা কৈ? সন্ধ্যার পর সেই সমানে

আসিয়া কর্ত্তার পার্শ্বে তেমনই অনুযোগ হইল। আহা পেটের দায়ে যাহারা এত নির্ঘৃণ তাহারা চতুষ্পদই হউক, আর দ্বিপদই হউক, কে তাহাদের উপর দয়া না করিবে বল?

বিড়াল বড় আয়েসী। খাওয়া আর শোয়া—এই দুইটাই তাহার জীবনের প্রধান কর্ম্ম। যে টুকু বসিয়া থাকা—তাহা হয়, কেবল খাবার প্রত্যাশায় বা উমেদারীতে; না হয় আঁচাইবার জন্য। অন্তঃপুরে দেখিবে, এই গ্রীষ্মের দিনে, বিড়াল নীচে তলার নিভৃত ঠাণ্ডা মেজেতে পড়িয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে; বহির্বাটিতে দেখিবে, পাল মহাশয় নীচের বৈঠকখানার পাশের ঘরে, পাটি বিছাইয়া নাসিকা-ধ্বনি করিতেছেন। শীতকালে দেখিবে, অন্তঃপুরে আধছায়া আধরৌদ্রে শুইয়া বিড়াল লেজ নাড়িতেছে; বহির্বাটিতে পাল মহাশয় রৌদ্রে পীঠ দিয়া তামাকুর অন্ত্যেষ্টি করিতেছেন। হা পেট! তোমার দায়ে এ হেন বিলাসীকেও ইন্দুরের বিবর পার্শ্বে ওত করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়! তোমার দায়ে পাল মহাশয়কেও পাক করিতে দেখিয়াছি!

বিড়াল ভণ্ড-তপস্বী। রান্নাঘরের বারান্দার কোণে চক্ষু মুদিয়া বসিয়া চতুষ্পদ বিড়াল কিসের ধ্যান করে, তা কি তোমরা জান না? না, কর্ত্তার জল খাবারের ঘরে গিয়া সন্ধ্যার সময় চক্রবর্ত্তী মহাশয় কিসের আহ্নিক করেন, তাহা তোমরা বুঝ না? তোমরা জানও সব, বুঝও সব; কেবল জাতীয় অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই না, দ্বিপদে ও চতুষ্পদে প্রভেদ কর। বাস্তবিক পাল চক্রবর্ত্তীর সহিত পুষি, মেনীর কোন প্রকৃতিগত প্রভেদ আছে কি?

এইরূপ ছাগ, মেষ, শূন, খর প্রভৃতি নানাবিধ-গৃহ-পালিত পশুজাতীয় মানব বঙ্গদেশে যত্র তত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পূতিগন্ধময় পঙ্ক-পল্বল-প্রিয় পুরুষ-শূকরেরও অভাব নাই; লীলাময়ী পাতিত পুরুষ-শৃগালও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। এমন বিচিত্র বিস্তীর্ণ চিড়িয়াখানায় দুই একটি সিংহ শার্দ্দূলও আছে।

### ৩। সর্পধর্ম্মী।

সর্প-স্বভাব মানবেরও অভাব নাই। একহারা, লিক্‌লিকে, ছিপ্‌ছিপে চেহারা; সে শরীর যেন কিছুতেই ভাঙ্গেও না, মচ্‌কায়ও না। গায়ের চামড়া—পাতলা, চিক্কণ ও মসৃণ, অথচ চাকা চাকা দাদে ভরা; হাতের পায়ের নলি সরু সরু; আঁত কখন ভরা থাকে না;—চির দিনই পাত

খোনার মত পড়িয়াই আছে; চলিবে,—আঁকা বাঁকা; দাঁড়াইবে—ঘাড় বাঁকাইয়া; কথা কহিবে অতি ক্ষীণস্বরে; হাসিবে—একদিকে, এক পাশে একটু খানি; আর যখন চাহিবে—তাহার সেই চাহনীতেই তাহার খল-স্বভাবের পূর্ণ প্রতিমা প্রতিভাত হইবে। সেই তীব্র, তীক্ষ্ণ, বক্রগতি বিষ-বিদ্যুতের চাহনীতেই বুঝা যায়, সে তাহার অন্তরের অন্তর হইতে কণামাত্র বিষ উদ্গীরণ করিয়া, তোমার অন্তরে অমৃত, গরল, যাহাই থাকুক সে সেই বিষ তোমার অন্তরে ইঞ্জেক্ট করিয়া, তোমার পরীক্ষা করিবে। তুমি সংসারের নূতন ব্রতী,—সেই বিষে তোমার শিরা সকল সড়্ সড়্ করিবে, মাথায় মৃদু ঝিম্‌কিনি আসিবে; সেই বিষচক্ষু তোমার অমৃতময় বলিয়া বোধ হইবে, খলের পীরিতি তখন তোমার কাছে সরলের প্রণয় বলিয়া মনে হইবে। আর তুমি সংসারের ঘাগী, সাত হাটের কাণাকড়ি,—সর্পধর্ম্মী মানবের ঐরূপ বিষ-পিচকারী তোমার উপর কতবার হইয়াছে; তুমি ভুক্তভোগী; সেই পরিচিত দৃষ্টিতে তুমি মনে মনে হাসিবে, মনে মনে বলিবে, 'দাদা উহাতে আর আমাদের কিছু হয় না, বহুদিন হইল, আমরা উহার কাটান ঔষধ (antidote) খাইয়া আগুসার করিয়া রাখিয়াছি।

খলস্বভাব মানব কখন রাজপথের মধ্য দিয়া চলিতে পারে না। ঐ অলিতে গলিতে; আশে পাশে; আনাচে কানাচে। সন্ধ্যার পর ইঁহাদের সখের বিহার, ও সুখের বিচরণ। বিষ-বায়ু-ভক্ষণেই ইহাদের শরীরেই পূর্ত্তি এবং হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি। যেখানে কুৎসা, নিন্দা, কলহ, রেষারেষি, ঈর্ষারীষি, সেইখানেই বিষজীবন বোধ বসিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছে; আর মধ্যে মধ্যে মহানন্দে চিরজিহ্বা চুক্‌ চুক করিতেছে। কিন্তু এক স্থানে কখনই দুই দণ্ড স্থির থাকিতে পারিবে না। সুড়ি সুড়ি, গুড়ি গুড়ি আসিয়া বসিবে, আর একটু পরেই তেমনই সুড়ি সুড়ি অলক্ষিত ভাবে চলিয়া যাইবে। পথে হাওয়া খাওয়া—তাও তদ্রূপ। পথের ধারে ধারে, প্রাচীরের পাশে পাশে চলিবে। যেথাও গান বাজনা হইতেছে, সেই-খানে একবার থমকিয়া দাঁড়াইবে, একবার জানালা দিয়া উঁকি মারিবে, একবার গায়কের প্রতি সেই তীব্রদৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিবে; সহসা কাহারও সহিত চোখে চোখে হইলে অমনই Good Evening, Babu! বলিয়া সরিয়া পড়িবে। খল কখন মজলিসি হয় না। আবার, কোথাও দীন দুঃখী ছিন্নাঙ্গ দুটি অন্নের জন্য বসিয়া আহার করিবার উদ্যোগ করিতেছে।

সেই সময় সর্পধর্ম্মী গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে 'দুখী-রাম তোমার বড় মেয়ে মরেছে—সে আজ কতদিন হে?'' প্রশ্নকারির উত্তরের কোন প্রয়োজন নাই; কিন্তু দুখীরামের অর্দ্ধ অন্ন উদরস্থ হইল না। খলের চরিত্র এইরূপ।

বলিহারি, বাইবেলের কবিকে। সয়তানকে সর্পধর্ম্মী করিয়া সংসারের কি গুহ্য কথাই কবিতে প্রকাশ করিয়াছেন। খলই সয়তান। চোর, লম্পট, মিথ্যুক, ঘাতুক,—সংসারে শতবিধ পাপী আছে; কিন্তু খলকে পাপী বলিলে হয় না, মহাপাপী বলিলেও কুলায় না। খল—সয়তান। যে পাপ করে, সেই পাপী; আর যে পাপ হয়, তাহাকে কি পাপী বলিলে বুঝা যায়? সে সয়তান। তোমার ভাল দেখিয়া খল ব্যক্তি যে সকল সময়েই তোমার মন্দ করিবে, এমন কথা নাই; কিছুই করিবে না; পাপের বাহ্যিক কার্য্য কিছুই করিবে না; কিন্তু সে নিজে আপনাকে আপনি পাপে পরিণত করিবে; পাপের দহনে আপনি দগ্ধ হইতে থাকিবে; খলের জীবনই এইরূপ।

বাইবেলের কবির বর্ণনা এইরূপ;—যে সয়তান বিশ্ববিধাতার বিরোধী। সে আভা সহিতে পারে না, শোভা দেখিতে পারে না, কোথাও সুখ দেখিলে তাহার কষ্ট হয়। কাজেই সয়তান, এই অনন্ত অজস্র সুখ-প্রস্রবণ সংসারের বিধাতার বিরোধী। কিন্তু বিরোধী হইয়া কি করিবে! সেত তাঁহার মহা-মহিমা স্পর্শ করিতে পারে না, সুতরাং সয়তান স্রষ্টার উপর আক্রোশ করিয়া সৃষ্টির সার মানবের অধঃপতন সাধন করিল; তোমার চতুষ্পার্শ্বস্থ ছোটখাট সয়তানেরা অদ্যাপি দেখ, তাহাই করিতেছে। তোমার কিছু করিতে না পারিলেই, তোমার কৃতিত্ব নষ্ট করিতে ব্যগ্র।

বিধাতার বিচিত্র রহস্যময় সংসারে সর্পধর্ম্মীর সর্ব্বত্রই গতিবিধি। কোন স্থান দিয়া তোমার নন্দনকাননে সে আসা যাওয়া করে, তাহার তুমি কিছুই জান না। তাহার পর তোমার সরলা সহধর্ম্মিণীকে ভুলাইয়া সে যখন তোমার সর্ব্বনাশ সাধন করে, তখনই তোমার চমক হয় ও টনক নড়ে। তোমার অধঃপতনেই সর্পধর্ম্মীর অভীষ্ট সিদ্ধি এবং পরম আহ্লাদ। এই যে রঙে কুট্‌কুটে, চোখে ফুট্‌ফুটে, চেহারায় ছিপ্‌ছিপে, মেজাজে ভিজে ভিজে—মন্থরা দাসী, সন্ধ্যার সময় তোমার গৃহে শয্যা করিতে গিয়া তোমার সরলা সহধর্ম্মিণীর কাছে দাঁড়াইয়া ফিসি ফিসি

প্রত্যহ কি কথা বলে—উহাকে তুমি কখন বিশ্বাস করিও না। সর্প-ধর্ম্মিণীদের মত অমন ঘর ভাঙ্গানি আর নাই। সোণার সংসার ছারখার করিয়াই উহাদের আনন্দ; যত শীঘ্র পার, তোমার নন্দনকানন হইতে ঐ সয়তান সর্পিণীকে দূর করিবে।

সর্পধর্ম্মীর ন্যায়, গোধা, গিরগিটে, ইন্দুর, ছুছুন্দরী প্রভৃতি নানারূপ সরীসৃপধর্ম্মী মানব আছে।

---

তুমি নিজে যদি মানবধর্ম্মী মানব হও, তাহা হইলে এই অপূর্ব্ব চিড়িয়াখানা তোমার আনন্দের উপবন। উহার বৈচিত্রেই তোমার আনন্দ হইবে। টিয়াকে দুটি ছোলা, ময়নাকে একটু ছাতু, বুলবুলিকে একটি তেলাকুচ—বিড়ালকে একখানি কাঁটা, কুকুরকে একটু হাড়, হরিণকে দুটি ঘাস—দিতে পারিলেই আরও আনন্দ, আরও মজা। যথাসাধ্য সকলকেই পালন করিবে; ভবের চিড়িয়াখানায় অমন মজা আর কিছুতে নাই—তবে বাইবেলের কবির উপদেশ কখন ভুলিও না; দুধ দিয়া কখন কাল-সাপ পুষিও না। খলকে কখন প্রশ্রয় দিও না। সর্পধর্ম্মীর উপর অভি-সম্পাত স্মরণ করিয়া, তুমি তাহাকে পদাঘাতে দূর করিও।

---

# অক্ষয়কুমার দত্ত।*

বাঙ্গালা ১২২৭ সালে বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বস্থলীর চুপী গ্রামের বঙ্গজ পাড়ায় অক্ষয়কুমার দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। এই বঙ্গজ পাড়া সম্বন্ধে দত্তজ স্বয়ং বাল্যকালে পদ্য লিখিয়া ছিলেন;—

"তাহাতে বঙ্গজপাড়া, সে গ্রামের চূড়া।
সবার সমান তেজ, কিবা যুবা বুড়া।"

একজন বঙ্গজ আমাকে বলেছেন, বহুদিন হইল একবার বঙ্গদেশ প্রতাপ-

---

* শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক প্রণীত শ্রীযুক্তবাবু অক্ষয় কুমার দত্তের জীবন বৃত্তান্ত নামক গ্রন্থ হইতে এই জীবনচরিত প্রধানতঃ গৃহীত হইল।

শালী হইয়াছিল, মহামোগল আকবরের টনক নড়িয়াছিল, ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ হইয়াছিল; আর এই দরিদ্র বঙ্গজ কায়স্থ সন্তানের তেজে বঙ্গভাষা আজি অক্ষয়-বলে বলীয়সী, ওজস্বিনী ও তেজস্বিনী। বঙ্গজ কায়স্থের তেজ, তোমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। অক্ষয় কুমার মনের তেজে তেজীয়ান ছিলেন।

দত্তজ দশবৎসর বয়স পর্য্যন্ত, স্বগ্রামে পাঠশালায় বাঙ্গলা পড়িয়াছিলেন, এবং বাড়ীতে কিছু পার্শীও পড়িয়াছিলেন। তাহার পর খিদিরপুরে পিতা পীতাম্বর দত্তের বাসায় আসেন। সেই সময়ে ইংরেজি শিখিতে ইঁহার বলবতী ইচ্ছা হয়। একাদশ বর্ষ বয়ক্রমে আপনি স্বয়ং ভবানীপুরে মিশনরি দের ইউনিয়ন স্কুলে ভর্ত্তি হন। মিশনরিরা পাঠ্যপুস্তক দিতেন, এবং ছাত্রগণের বেতন লাগিত না। পীতাম্বর দত্ত ইংরেজি জানিতেন না, অক্ষয়কুমারের পিতৃব্য-পুত্র হরমোহন দত্ত ইংরেজি জানিতেন; ইংরাজ শিক্ষা বিষয়ে, সুতরাং তিনিই অক্ষয় কুমারের মুরব্বি ও পরিচালক। তিনি দত্তজকে মিশনরি স্কুলে পড়িতে নিষেধ করিলেন; কলিকাতায় গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েণ্টাল সেমিনরিতে পড়িতে পরামর্শ দিলেন। এই পরামর্শ মত অক্ষয়কুমার আপনার পিসতুত ভাই রামধন বসুর বাসায় আসিয়া রহিলেন, এবং ওরি-য়েণ্টাল সেমিনরির পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন। সাতমাস পরে বার্ষিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়া একেবারে তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন; তাহার পরবৎসর দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ সাঙ্গ করিবার সময়, অক্ষয়-কুমারের হঠাৎ পিতৃবিয়োগ হওয়ায় অর্থচিন্তায় তিনি স্কুল ছাড়িতে বাধ্য হইলেন। স্কুল ছাড়িলেন বটে, কিন্তু লেখাপড়া ছাড়িলেন না। বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল, পুরাবৃত্ত, প্রত্নতত্ত্ব, নিয়মিতরূপে সকল বিষয়েরই আলোচনা করিতে লাগিলেন। চৌদ্দবৎসরের সময় পিতৃহীন হইয়া অক্ষয়কুমার নিজে নিজে যে লেখা পড়া শিখেন, সেই লেখাপড়া হইতে আমরা অন্তত লক্ষলোক লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছি, বা শিখিতেছি।

শোভাবাজারের রাজবাটীর শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ ঘোষ, আনন্দকৃষ্ণ বসু এবং অমৃতলাল মিত্র দত্তজের লেখা পড়া শিক্ষার বিশেষ সাহায্য করেন; অক্ষয়-কুমার বলিয়াছেন, ইঁহারা "আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন, আপনাদের ভূরি ভূরি পুস্তক আমাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন ও আমার জন্য অকাতরে ও অক্লিষ্টচিত্তে কতই পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন।"

অক্ষয়কুমারের লেখা পড়া শিক্ষার সাহায্যকারী ঐ তিনজন, কিন্তু পদ্য পদ্য লেখার উৎসাহদাতা—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট—আমরা সকলেই শত পরত, সাক্ষাৎভাবে ও পরোক্ষ সম্বন্ধে ঋণী। অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বারকানাথ, দীনবন্ধু—প্রমুখ শত গ্রন্থকারের ঈশ্বরচন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত সহায় এবং উৎসাহদাতা। গুপ্ত কবির প্রসিদ্ধ দুই পংক্তি,—

'ছিঁড়ে কেন 'বাহ্যবস্তু,' টেনে মার কুম্।
পেট পুরে মাছ খেয়ে, কসে মার ঘুম॥*

স্মরণ করিয়া অনেকেই ঈশ্বরচন্দ্রকে অক্ষয়কুমারের বিরোধী মনে করিয়া থাকেন; সেটি ভুল। অক্ষয়কুমারকে গুপ্তকবি বড় ভাল বাসিতেন। অক্ষয়-কুমারের দারুণ শিরোরোগ হইলে, ঈশ্বরচন্দ্র প্রভাকরে লিখিয়াছিলেন "আমি যাঁহাকে অগ্রে শিষ্যের পদে অভিষিক্ত করিয়া এইক্ষণে গুরু বলিয়া বরণ করিতে ইচ্ছা করি, এই মানসিক শ্রমের অধীন হইয়া, সেই অক্ষয়ের দৈনিকবল অক্ষয় হইতে পারিল না।"

ঈশ্বরচন্দ্র অক্ষয়কুমারকে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত পরিচিত করিয়া দেন; তাহার পর বৎসর ১২৪৭ সালে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত হয়। দত্তজ এই পাঠশালার ভূগোল ও পদার্থ বিদ্যার শিক্ষক হন। এক বৎসরের মধ্যেই ১৪ টাকা মাসিক বেতন হয়। এই সময়ে ইনি একখানি ভূগোল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

১২৪৯ সালে অক্ষয়কুমার টাকী নিবাসী প্রসন্ন কুমার ঘোষের সহিত মিলিত হইয়া 'বিদ্যাদর্শন' মাসিকপত্র প্রচার করেন। উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। ১২৫০ সালে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা বাঁশবেড়িয়ায় উঠিয়া গেল, অক্ষয়কুমার কলিকাতা ছাড়িয়া মফস্বলে যাইতে স্বীকার করিলেন না, সুতরাং তাঁহার কর্ম্ম গেল। ঈশ্বরগুপ্ত অক্ষয় বাবুকে টাকীর চৌধুরীবাবুদের সহিত পরিচিত করিয়া দেন। তাঁহাদের বরাহনগরের বাটিতে প্রতিষ্ঠিত নীতিতরঙ্গিনী সভাতে অক্ষয়কুমার মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ পাঠ করিতেন।

---

* ইহার অর্থ;—অক্ষয়কুমার দত্তের বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার গ্রন্থ (অসার,) ছিঁড়িয়া ফেল; যে কুম্ব সাহেবের গ্রন্থ (Combe's Constitution of Man) হইতে উহা গৃহীত, তাহাও টানিয়া ফেলিয়া দাও। বাহ্যবস্তু গ্রন্থে আমিষ ভক্ষণ ও অতিনিদ্রা নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা শুনিও না, আচ্ছা করে মাছ খাইয়া, দিব্য করে ঘুম দাও।

পাঠশালা উঠিয়া যাওয়ার কয়েক মাস পরেই অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনী সভার সহকারী সম্পাদকের পদ প্রাপ্ত হইলেন। এই সময়ে, ১২৫০ সালের ভাদ্রমাসে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারিত হইল। অক্ষয়কুমার প্রথম প্রথম মধ্যে মধ্যে অ, কু, দ, নাম দিয়া ইহাতে প্রবন্ধ লিখিতেন। শ্রেয় ও প্রেয় দুই ভগিনীর শাস্ত্রোক্ত গল্প এই সময়েই লেখেন। দুই বৎসরের পর অক্ষয় কুমার তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক হইলেন। ইহার পরের দশবৎসর কাল, নবমুঞ্জরিতা ওজস্বিনী বঙ্গভাষা, বিবিধতত্ত্বে সমৃদ্ধি-শালিনী তত্ত্ববোধিনী, এবং সাহিত্য পরিপালনে ব্রতী অক্ষয়কুমার দত্ত,—এই তিনটি প্রায় একই পদার্থ বলিলেই চলে। একের জীবনী জানিলেই, সেই দশবৎসর কালের তিনের জীবনী জানা হয়।

এই দশবৎসর কাল অক্ষয়কুমার অগাধ এবং অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া, ইয়ুরোপের প্রাণীবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, দর্শন, বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব ও ধর্ম্মনীতি এবং ভারতের প্রত্নতত্ত্ব আলোড়িত করিয়া, সামান্য অসামান্য সকলরূপ রত্নোদ্ধার করত, তত্ত্ববোধিনীকে বিবিধ ভূষায় ভূষিত, এবং উজ্জ্বলীকৃত করিতে লাগিলেন। এইসময়ে তরুণ কিশোর-পাঠ্য চারুপাঠের, যুবক-প্রৌঢ়-পাঠ্য ধর্ম্মনীতির ও বাহ্যবস্তুর এবং প্রত্ন-প্রিয়-পণ্ডিত পাঠ্য ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় গ্রন্থের "ভ্রূণ-তত্ত্ববোধিনী গর্ভে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।* কেমন দক্ষ, ব্রত-পরায়ণ, নিষ্ঠাবান, শ্রম-সুধী প্রতিপালকের উপর তরুণ বঙ্গ-গদ্যের লালনের ভার না পড়িলে, আজি আমাদের কি দুর্দিশাই না হইত!

এই সময়ে প্রধীণঙ্গনে দ্বারকানাথ অধিকারী বঙ্গভাষার মুখে, এইরূপ উক্তি বসাইয়াছিলেন।

"কালে না পারিবে কিছু করিতে আমার।
পেয়েছি কপাল গুণে অক্ষয়কুমার॥
তাঁহার বাসনা সবে শুনিবারে পায়।
অক্ষয় যশের মালা পরাইবে মায়॥"

আমি অক্ষয়কুমার পাইয়াছি, কালে আর আমার ক্ষয় করিতে পারিবে না, বঙ্গভাষার এই ভবিষ্যদ্বাণী—বাস্তবিক সার্থক হইয়াছে।

| ১২৫৮ | সালের | মাঘমাসে | বাহ্য | বস্তুর | প্রথমভাগ; |
|---|---|---|---|---|---|
| ১২৫৯ | " | " | " | " | দ্বিতীয়ভাগ; |

* নবজীবনের সূচনা।

১২৫৮ সালের শ্রাবণমাসে চারুপাঠের প্রথমভাগ;
১২৬১ „ „ „ „ দ্বিতীয়ভাগ;
১২৬৩. „ „ „ পদার্থবিদ্যা;
১২৭০ সালে চারুপাঠের তৃতীয়ভাগ;
১২৭৭ সালে ভারতবর্ষীয়উপাসক সম্প্রদায়ের প্রথমভাগ;
১২৮৩ সালের মাঘ মাসে ধর্ম্মনীতি;
১২৮৯ „ চৈত্র „ উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয়ভাগ;
প্রচারিত হয়।

সন ১২৬২ সালে কলিকাতাব নর্ম্মাল স্কুল সংস্থাপিত হইল; অক্ষয়কুমার দত্ত প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। কাজেই তত্ত্ববোধিনীর গুরু-ভার হইতে ইঁহাকে অবসৃত হইতে হইল; কিন্তু যতদিন ইনি সুস্থকায় ছিলেন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ইঁহার স্নেহে বঞ্চিত হয় নাই।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দুরূহ সম্পাদকতা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও ইনি মেডিকেল কলেজে গমন করিয়া প্রথম বর্ষে রসায়ন ও দ্বিতীয় বর্ষে উদ্ভিদ্বি-দ্যার উপদেশ শ্রবণ করেন।" পরে, ফরাসীও জর্ম্মান ভাষার এবং ভূতত্ত্ব-বিদ্যার রীতিমত অনুশীলন করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন দৈবদুর্বিপাক উপস্থিত হয় "১২৬২ সালের আষাঢ় মাসে সন্ধ্যার পরে একদিন ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা কালে তথায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে অত্যধিক দুর্ব্বল হইয়া একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। * * * * পরে ইঁহার আত্মীয় লোকেরা * * * * নানারূপ শুশ্রূষা দ্বারা ইঁহার চৈতন্য সম্পাদন করেন। দুই দিবস পরে, তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে বসিয়া কোন প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময়ে ইঁহার মস্তকে এমন একরূপ জ্বালা উপস্থিত হইল, যে, তাহাতে তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, ইঁহার এক উৎকট রোগের সৃষ্টি হইয়াছে।"

ক্রমেই রোগের বৃদ্ধি হইতে থাকে; ধর্ম্মনীতি প্রকাশের সময় শেষ প্রুফ দেখিতে পারেন নাই। ক্রমে এমন হইল, যে অক্ষয়কুমার আর বিশেষ শীতল সময় না হইলে, কোন একটি বিষয়ে দুই মিনিট কালও আর চিন্তা করিতে পারিতেন না। দত্তজ দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন,—"সকল বাসনাই নির্ম্মূল হইল। অঙ্কুরেই আঘাত ঘটিল। আমার হৃদয়স্থ পুষ্পোদ্যানটি একবারেই শুষ্ক হইয়া গেল।" অহো! কি দুঃখ।

এই জীবন্মৃত অবস্থায় অক্ষয়কুমার ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয়ভাগ প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। সে এক অসাধ্য সাধনা।

"মনোমধ্যে কোন বিষয়ের উদয়েও কষ্ট, তাহার চিন্তন ও আন্দোলনেও কষ্ট, নিজে দূরে থাকুক, অন্যদ্বারা তাহা লিপিবদ্ধ করাইতেও কষ্ট, এবং যে পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ না করা হয়, সে পর্য্যন্ত তদপেক্ষা অধিক কষ্ট অনুভূত হইতে থাকে। সেই যন্ত্রণা নিবারণ উদ্দেশেই লিপিবদ্ধ করাইতে হইয়াছে এবং ইহাতেই অতীব অল্পে অল্পে পুস্তকখানি একরূপ প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে। * * * * * * * এইরূপ করিয়া কখন পাঁচ সাত পংক্তি কখন দুই চারি পংক্তি, কখন বা দুই চারিটি বা দুই একটি শব্দমাত্র এবং কদাচিৎ কিছু অধিক বিরচিত হয়। * * * * * কোন্ বাক্যটি কোন্ স্থানে, বা কোন্ বাক্যের পর বিনিবেশিত হইবে, উক্তরূপ লিপিবদ্ধ করাইবার সময়, তাহা কিছুই স্থির থাকে না। সে সমুদায় যে দিবস একত্র সঙ্কলন করা হয়, সেই দিনেই বিভ্রাট্। পূর্ব্বোক্তরূপে, শরীরের অবস্থানুসারে, দিন বিশেষে ও সময় বিশেষে তদর্থ ঔষধ বিশেষ সেবন ও অন্য অন্য নানারূপ প্রক্রিয়া করিয়া—বহুকষ্টে সেটি কথঞ্চিৎ সম্পন্ন করিয়াছি।*

আপনরা অধ্যবসায়ে—পঙ্গুর পর্ব্বত লঙ্ঘন, স্পর্শজ্ঞানে—অন্ধের বর্ণপরীক্ষা, মানস বলে—অশক্তজানু মানবের অশ্বারোহণে নিপুণতা প্রভৃতি অনেক অলৌকিক সাধনার কথা শুনিয়া থাকিবেন, কিন্তু এরূপ পীড়িত মস্তিষ্ক মানবের এরূপ মস্তিষ্ক-ব্যায়াম আর কখন শুনিয়াছেন কি? তাহাতেই বলিতেছিলাম অক্ষয়কুমারের সেই এক অসাধ্য সাধনা! তাই কি দুই একটি প্রবন্ধ? না এক আধটি গল্প? বেদ বেদান্ত,—দর্শন উপনিষৎ—পুরাণ ইতিহাস,—তন্ত্র, জেন্দ,—প্রভৃতি হইতে নানা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, বিচিত্র গবেষণাপূর্ণ ৬১৩ পৃষ্ঠা পরিমিত বৃহৎ এক গ্রন্থ প্রকাশ। সেই গ্রন্থের সম্যক পরিচয় দিতে আমরা পারিলাম না; তোমাদিগকে অনুরোধ করি, তোমরা একবার বিকৃত মস্তিষ্কের মস্তিষ্ক ব্যায়াম পরীক্ষা করিও; পাঠ করিলে, আমাদের আত্মভক্তি হয়; আমরা বুঝিতে পারি, বাঙ্গালি অসাধ্য সাধন করিতে পারে।

দারুণ শিরোরোগে অভিভূত হইয়া, অক্ষয়কুমার কিছু কাল পরে ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে বালীগ্রামে গিয়া বাস করেন। সেই বাড়ীটি আমরা

* ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগের উপক্রমণিকা।

দেখিয়াছি, ক্ষুদ্র একটি উদ্যান মধ্যে ক্ষুদ্র একটি দ্বিতল ভবন; কিন্তু সেও এক অদ্ভুত কাণ্ড; কোন সহৃদয় ব্যক্তি সেই উদ্যানটি দেখিয়া বলেন, এইখানি চতুর্থ ভাগ চারুপাঠ; বাস্তবিক চারুপাঠই বটে। নানাবিধ দেশী বিদেশী, পার্ব্বতীয় সাগর-তটস্থ বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, বল্লরী সেখানে বৈজ্ঞানিক পর্য্যায়ে পাশাপাশি কাছাকাছি রোপিত; অথচ কেমন এক অপূর্ব্ব ব্রিত্বে, শ্যামল সৌন্দর্য্যে, সরস মাধুর্য্যে—সমস্তই মণ্ডিত। এলা, লবঙ্গ, দারুচিনী, মরিচ কর্পূর, হিঙ্গু, সাগু, ভূর্জ্জপত্র—কত গাছই সেখানে আছে, আবার কোথাও একটি লতা-বিতান, কোথাও একটি তরুকুঞ্জ, কোথাও শষ্পশয্যা, কোথাও পুষ্প বাটিকা। যেন জগতিবিশনের জন্য জীবন্ত তরুলতার সংগ্রহ হইয়াছে; যেন উদ্ভিদের অক্ষর যোজনা করিয়া স্বভাবের একখানি মহাকাব্য রচিয়াছে; যেন কোন মহাঘটক বিজ্ঞানে কবিতায় বিবাহ দিয়া স্বভাবের একটি নিভৃত বাসর ঘরে নব-দম্পতীকে বসাইয়া দিয়াছে।

এই উদ্যানমধ্যস্থ দ্বিতল ভবনে অক্ষয় কুমারের বসিবার ঘরটি—কি বলিব? বলি—পঞ্চমভাগ চারুপাঠ। উদ্যানে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা মূর্ত্তিমতী, গৃহে সাঙ্গোপাঙ্গ ভূতত্ত্বজ্ঞান জাজ্বল্যমান্। নানাবিধ শঙ্খ শম্বূক, প্রবাল পঞ্জর, প্রস্তর পুঞ্জ, জীব-কঙ্কাল, ধাতু নিঃস্রব বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা মত চারিদিকে সুসজ্জিত রহিয়াছে; আর উপর হইতে নিউটন, হক্সলি, ডারউইন, মিল, মহাত্মা রামমোহন রায়কে মধ্যবর্ত্তী করিয়া এই সকল অদ্ভুত সজ্জা এক দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। চারিদিকে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক মানচিত্র। একখানি চিত্রপটে চিত্রিত আছে;—

অফ্‌সোস্‌কে দিল্‌কো কংবল খিল্‌নে ন পায়া।
কোয়ি দিনকে চলে যাতেহেঁ মাটীকে তলে হম্ ॥

আমার এই হৃদয়-পদ্ম বিকসিত হইতে পাইল না, এইটি মনস্তাপের বিষয়। কিছু দিনের মধ্যেই আমি ধূলিসাৎ হইতে চলিলাম।

সেইদিন আসিয়াছে; ভাগীরথীর সমীপস্থ ঐ নিভৃত নিবাসে, বিগত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ—বৃহস্পতিবার, রাত্রি তৃতীয় প্রহর গতে, অক্ষয়কুমার তাঁহার তেজীয়ান জীবনের শেষ দশার নিস্তেজ লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার সেই নিদারুণ কষ্টের অবসান হইয়াছে—আহ্লাদের কথা। আর আমরা এই লক্ষ লোক আমাদের দেশগুরু হারাইয়াছি; তিনি যত কষ্টেই থাকুন, তবুত এতদিন আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম, আজ আমরা

তাঁহাকে কখন দেখিতে পাইব না! ইহাতেই আমাদের নিদারুণ দুঃখ হইতেছে! অহো ভক্তি! তুমিও স্বার্থপরা!

অক্ষয়কুমার দত্তের নিকট আমরা অনেকেই অনেক বিষয় শিখিয়াছি; আপনা আপনি মধ্যে সে পরিচয় আর কি দিব। তাঁহার জীবনী হইতে আমাদের যাহা শিক্ষার আছে—তাহাই বলিব।

অক্ষয়কুমার পরিশ্রমী, অধ্যবসায়শীল, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, তেজস্বী, মনস্বী, জ্ঞানবান্, নিষ্ঠাবান্,—অক্ষয়কুমার অসাধারণ লোক, কিন্তু আমরা সকলে যে বিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত, অক্ষয়কুমার অসাধারণ হইয়াও স্বয়ং সেই বিড়ম্বনার অবতার।

শারীরিক ও মানসিক নিয়ম প্রতিপালন করা, মনুষ্য মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য—এই কথা যিনি বাঙ্গালিকে বুঝাইবার জন্য, সংহিতার পর সংহিতা প্রণয়ন করিলেন, তাঁহাকেই ভগ্ন শরীরে, রুগ্ন-মানসে অর্দ্ধজীবন অতিবাহিত করিতে হইল! বৃদ্ধ বয়সে সন্তানাদির সুখকর সাহায্য যাহাতে অনায়াস লভ্য হয়, এবং পিতা মাতার কাছে সন্তানগণের বশ্যতা যাহাতে তাহাদের আশৈশব অভ্যস্ত হয়, সন্তানগণকে এইরূপ শিক্ষা দান করিতে যিনি, নানা যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক, বঙ্গের পিতা মাতাকে পুনঃপুনঃ উপদেশ প্রদান করেন, পারিবারিক বিঘটন ঘটনায় তিনিই অর্দ্ধমৃতজীবনে মহাবিব্রত ছিলেন, আর "সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বাবস্থায়, সকল সময়ে, পরাৎপর করুণাময়, পরমেশ্বরকে সাক্ষীস্বরূপ দেখিয়া ভক্তিভরে দ্রবীভূত হইতে" যিনি আমাদিগকে শিক্ষা দান করেন, তিনিই ঈশ্বরাধনার উপযোগিতা, উপকারিতা, আনন্দ এবং উল্লাস মানিতেন না, ও জানিতেন না! তাহাতেই বলিতেছিলাম আমাদের অনেকের মত অক্ষয়কুমার বঙ্গের বিড়ম্বনার অবতার। ইহাতে যিনি মনে করিবেন, আমরা স্বর্গীয় শিক্ষা গুরুর সৎকার করিতে আসিয়া তাঁহার জ্বলন্ত চিতা সম্মুখে তদীয় অযশ কীর্ত্তন করিতেছি, তিনি বঙ্গের মর্ম্মদুঃখ কি, তাহা জানেন না। আমাদের মর্ম্মদুঃখ এই যে, আমরা নিয়ম জানি, পালন করিতে ইচ্ছুক—কিন্তু তথাপি পালন করিতে পারি না। ইহার নাম বিড়ম্বনা, ইহারেই নাম অদৃষ্ট—ইহারইনাম অক্ষয় কুমার।

অক্ষয় কুমারের তেজস্বিনী, ওজস্বিনী, মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষার বা গভীর, সুখময়, হৃদয়-প্রসারক ভাবের পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। আজি কালি রাজনীতির তরঙ্গে বঙ্গদেশে উৎসাবিত হইতেছে, অক্ষয় কুমারের সেই রাজ-

নৈতিকতার পরিচয় স্বরূপ তাঁহার দ্বিতীয়ভাগ উপাসক সম্প্রদায় হইতে তাঁহার

## ইংলণ্ডের নিকটে আবেদন।

উদ্ধৃত হইল।

ইংলণ্ড! তুমি অক্লেশে দুঃসাধ্য বিষয় সিদ্ধ করিয়াছ। বহুদূরস্থিত লক্ষ্য অনায়াসে বিদ্ধ করিয়াছ। জগজ্জনের চির-বাঞ্ছিত সম্পত্তি সুকৌশলে করস্থ করিয়াছ। বলিতে কি, তুমি অসাধ্য-সাধন ও অঘটন-সংঘটন করিয়া বিশ্ব-জনের নয়ন যুগল বিস্ফারিত করিয়াছ। সমগ্র ভারত ভূমিকে একচ্ছত্রা করিয়া ভারতবর্ষীয় কবীন্দ্রগণের মনঃকল্পনা সফল করিয়াছ এবং বাল্মীকি, কালিদাস, কণাদ ও আর্য্যভট্টের স্বজাতীয়বর্গকে পদাবনত করিয়া নিজ সিংহাসন উজ্জ্বল ও উন্নত করিয়াছ। আমরা মন্ত্রণাবলে তোমাকে রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় করিয়া রাজমুকুট প্রদান করিয়াছি ও প্রীত মনে তোমারে ধন-প্রাণ সমর্পণ করিয়া তোমার বশতাপন্ন হইয়া রহিয়াছি। একবার ভাবিয়া দেখ, কত কোটি লোকের সুখ দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, ভদ্রাভদ্র, মানাপমান ও এমন কি জীবন-মরণও তোমার হস্তে সমর্পিত রহিয়াছে। তোমার অধিকারে আমাদের স্বাস্থ্য-ক্ষয়, বল-ক্ষয়, আয়ুঃ-ক্ষয় ও ধর্ম্মক্ষয় ঘটিতেতেছে। তুমি অধিক বিতরণ, কি সংহরণ করিতেছ, কে বলিতে পারে? তুমি শিক্ষা দান করিতে গিয়া স্বাস্থ্য হরণ করিতেছ, অর্থোপার্জ্জনের বিবিধ পথ প্রস্তুত করিতে গিয়া শ্রমাতিশয় ও তাহার বিষময় ফলপুঞ্জ উৎপাদন করিতেছ, বাণিজ্য-বৃত্তি প্রসারণ করিতে গিয়া, অশেষ দোষাকর দুর্ম্মূল্যতা-দোষ ও তৎসহকৃত অধর্ম্ম-বংশের বৃদ্ধি করিতেছ এবং সভ্যতা-সুখের পরিচায়ক সুখ-সামগ্রী সকলের সংঘটন করিতে গিয়া ভোগাভিলাষ প্রদীপন পূর্ব্বক পাপের স্রোত প্রবল করিতেছ। ভারত-রাজ্যের আবগারি ব্যবস্থার কলঙ্কময় ফলপুঞ্জে তোমার রাজমুকুট বিরাজিত উজ্জ্বল হীরকখণ্ড সমুদায়কে গাঢ়তর কলুষ কালিমায় প্রকৃত অঙ্গারখণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে। ফলত তোমার প্রজারা সচ্ছন্দে নাই। প্রায় যাবৎ জাগ্রত-কাল নানারূপ ক্লেশ করিয়া কষ্টেশ্রেষ্টে দিনপাত করা কোটি কোটি ব্যক্তির জীবনব্রত হইয়া উঠিয়াছে। বহুতর স্থলেই দেখিতে ও শুনিতে পাই, সকলেই রুগ্ন, সকলেই বিব্রত এবং সকলেই নানা চিন্তায় চিন্তাকুল। একটু আরাম নাই, আরাম নাই,

আরাম নাই। দুর্মূল্যতা দোষ অনেকেই উচিতমত ও আবশ্যক মত আহার-সামগ্রী প্রাপ্ত হয় না। ইহাতে, ধর্ম্ম-চিন্তা, ধর্ম্মানুশীলন ও ধর্ম্মনিষ্ঠা যেন একেবারে উঠিয়া যাইতেছে। নর কুলের নিতান্ত আবশ্যক নিয়মিত ধর্ম্ম আলোচনা ও ধর্ম্মোপদেশ-শ্রবণের তো সম্পর্কই নাই। বিদ্যালয়ে অধর্ম্মের সঞ্চার, লোকালয়ে তাহার সুপ্রকাশ ও বহু বিস্তার এবং বিচারালয়ে তাহার পরীক্ষা ও প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। দুর্ব্বিনীত বাল্যকালের পাপ, যৌবনে পরিপক্ক হয় এবং সঙ্গের সঙ্গী হইয়া বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে। কেবল বিদ্যালয়ের কথা কেন? তাহার বাহিরেই বা কি?—ততোধিক। ইতর লোকের কুব্যবহারে ভদ্র-লোকে অস্থির হইতেছে। পল্লী মধ্যেই প্রবিষ্ট হই, বা রাজপথেই ভ্রমণ করি, প্রায়ই স্বার্থ-সূচক, বিরোধ-বোধক ও ব্যসন-বিজ্ঞাপক বই অন্য শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না। যাবতীয় জাগ্রত-কাল পয়সা টাকা, দর দাম আকাল আক্রা, দলিল দস্তাবেজ, সাক্ষী সাবুদ, উকিল কৌন্সিলি, কোর্ট মোক-দ্দমা, জাল জালিয়াত—এই সমস্ত অভিচার মন্ত্রাদি জপ পুরশ্চরণ করাই কি মানব কুলের পরম পুরুষার্থ হইল? ধর্ম্ম চিন্তা ও ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণের অবসর ও অভিলাষ উভয়ই অন্তর্হিত হইতেছে। এই সমুদায় প্রত্যক্ষভূত বাস্তবিক ব্যাপার। ইহার অন্যথা হইবার বিষয় নাই। যে সুসভ্য বা সভ্যতাভিমানী রাজার রাজ্যতন্ত্রে মানবীয় মনের এরূপ দুরবস্থা সংঘটিত হয়, সে রাজারও কলঙ্ক, সে রাজ্যেরও কলঙ্ক, সে সভ্যতারও কলঙ্ক।—দেখিতে দেখিতে কি পরি-বর্ত্তনই ঘটিয়া উঠিল। সে বিষয়ের পূর্ব্বাপর অবস্থা পর্য্যালোচনা ও প্রদর্শন করা আমার এ নিস্তেজ মনের কার্য্য নয়। তাহা করিতে হইলে, সুদীর্ঘকায় সতেজ জনসমাজের পরিবর্ত্তে মানব-নামের অযোগ্য একটি রোগজীর্ণ বামন সমাজের উৎপত্তি প্রসঙ্গ ও তদীয় ভয়ঙ্কর পরিণাম সম্ভাবনা কীর্ত্তন করিতে হয়; সুমূল্যতা সুখে সুখী, সচ্ছন্দ চিত্ত, প্রশান্ত লোকের শান্তভাব প্রকাশের পরিবর্ত্তে দুর্মূল্যতারূপ অগ্নি শিখায় চিরদগ্ধ, রাজকীয় করপুঞ্জ-ভারাক্রান্ত, ব্যতিব্যস্ত, অস্থির প্রজা-মণ্ডলের হাহাকার ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিতে হয়; গুণগ্রাহী, গুণোৎসাহী, গুণাশ্রয়, আত্ম-পর-হিতৈষী, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, দানশীল, পূর্ব্বতন ধনি সম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তে—আহার্য্য-শোভানুরক্ত, বিলাস-প্রিয়, স্বকীয় স্বাস্থ্য ও সম্পত্তি-বিনাশক অন্য একরূপ লঘু-চেতা ধনি-সম্প্রদায়ের জীবন বৃত্তান্ত প্রণয়ন করিতে হয়; নদী তরঙ্গে নিমজ্জমান তরী-সমূহের

ন্যায় সুরা-নদীর তরঙ্গ-প্রবাহে প্লবমান ও মজ্জমান লক্ষ লক্ষ সুরাসক্ত লোকের অঙ্গভঙ্গী, মুখ-বৈকল্য এবং শারীরিক, মানসিক, বৈষয়িক, নিতান্ত অধঃপাতের চিত্রপট প্রস্তুত করিতে হয়; অস্থি-পঞ্জর ও চিতা-ভস্ম দ্বারা বারংবার দুর্ভিক্ষ পীড়ায় প্রপীড়িত, উৎকল-দেশাদি-সমন্বিত, বর্ত্তমান ভারত রাজ্যের অত্যুন্নত কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে হয়; এবং মারিভয় সমাক্রান্ত অশ্বত্থ মূল বিদ্ধ বন্য তৃণাদি সমাকীর্ণ, বিষাদ চ্ছায়ায় সমাবৃত, পরিত্যক্ত গৃহসমূহের ভগ্নভাব দর্শনে শোক মুগ্ধ ও বিক্ষিপ্ত চিত্ত হইয়া বক্ষ স্থলে করাঘাত পূর্ব্বক হাহাকার রবে নিরন্তর মাতম্ করিতে হয়। এ সমুদায়ই মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক দুরবস্থার পরিচায়ক। আহার্য্য-শোভা ও বাহ্য আড়ম্বরে কি ইহার প্রতিকার হইতে পারে? স্বাস্থ্যনাশ ও ধর্ম্মনাশের কি প্রতিশোধ আছে? উভয়ের কি ভীষণ পরিণাম! কি ভীষণ পরিণাম! যাহা হউক ইংলণ্ড! তোমার দয়া প্রকাশ ব্যতিরেকে আর আমাদের উপায় নাই। আমরা কৃপা-পাত্র; আমাদিগকে কৃপা দৃষ্টে দৃষ্টি কর, এই প্রার্থনা। আমাদের রীতিমত রোদনস্বর নির্গত করিবারও সামর্থ্য নাই। তুমি অনুসন্ধান করিয়া আমাদের বেদনা সমুদায় নিরূপণ ও নিবারণ কর। তুমি আমাদের প্রতি নির্দ্দয় নও, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। তোমার বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, রাজপথ, বাষ্পীয় রথ, অপূর্ব্ব সেতু ইত্যাদি কতবস্তু ও কত ব্যাপার—সে বিষয়ে সাক্ষ্য[illegible]ন করিতেছে। কিন্তু আমাদের সন্নিপাতের তৃষ্ণা। প্রদোষ কালের কি[illegible]ব [illegible]ন বিহঙ্গম সূর্য্যাভিমুখে বৃক্ষ শাখায় উপবিষ্ট হইয়া মধুর স্বরে [illegible] করিতেছিল শুনিয়া ভাব-সিন্ধু ফরাসী গ্রন্থকার মিশলে ভুবন বিখ্যাত পণ্ডিত শিরোমণি কবীন্দ্র গেটির মৃত্যু-কালীন একটি কথা স্মরণ পূর্ব্বক মানব কুলের অজ্ঞান বিমোচন প্রার্থনায় বলিয়া উঠেন, "জ্যোতি! জগদীশ! আরও জ্যোতি!" সেইরূপ, ইংলণ্ড! আমরাও ঘোর রজনী সম্মুখীন দেখিয়া "দয়া! আরও দয়া" বলিয়া তোমার চরণ সান্নিধানে রোদন করিতেছি।

# নবজীবন।

২য় ভাগ } আষাঢ় ১২৯৩। { ১২শ সংখ্যা।

## প্রাকৃতিক প্রলয়।

প্রকৃতির বিক্ষেপ ও ব্যক্তাবস্থা হইতে সাম্য ও অব্যক্তাবস্থায় উপসংহৃত হওয়াকে প্রাকৃতিক প্রলয় কহে। ৩৬০০০ নৈমিত্তিক সৃষ্টি ও ৩৬০০০ নৈমিত্তিক প্রলয়ের অন্তে আব্রহ্ম-স্তম্ব-পর্য্যন্ত-ব্যাপী সার্ব্বভৌমিক প্রাকৃতিক ধাতুক্ষয়-নিবন্ধন অতিমহান তৈবশাগত্ত-পরমায়ু অবসন্ন হইলে প্রাকৃতিক প্রলয় উপস্থিত হইয়া থাকে। অন্তিম কল্পের শেষ কলিযুগের অন্তে অনাবৃষ্টি ও প্রলয়াগ্নি দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড যখন ভস্ম হইয়া যাইবে, যখন প্রচণ্ড বায়ু সহকারে মেঘ সকল শত বর্ষ বর্ষণ করিয়া সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডকে জলে প্লাবিত করিবে, তখন সপ্তপাতাল ও সপ্তলোক বিনষ্ট হইলে ক্রমে প্রাকৃতিক সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল লয়প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। মৃত্তিকা, জল, জ্যোতিঃ, বায়ু এবং আকাশ ক্রমে ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য মহাসূক্ষ্ম ভাব ধারণ করিবে এবং সৃষ্টির বিপরীত ক্রমে ক্রমপূর্ব্বক প্রকৃতির অব্যক্তাবস্থায় পরিণত হইবে। (শাঃ সূ ২।৩।১৪) "বিপর্য্যয়েণতু ক্রমোঽত উপপদ্যতে চ।" উৎপত্তির বিপর্য্যয়েতে লয়ের ক্রম হয়। যেমন তেজ হইতে জলের উৎপত্তি হইয়াছিল, কিন্তু প্রলয়কালে জল তেজেতে লীন হইবে। (রাঃ মোঃ রাঃ) মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রাণাদি মিলিত সূক্ষ্মদেহ সকল ভঙ্গ হইয়া ক্রমে মহত্তত্ত্বে বিলীন হইবে। মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি গুণসাম্যাবস্থায় বিলীন হইবে। কুত্রাপি গ্রাহক-মনোবুদ্ধি, করণ-ইন্দ্রিয়, এবং গ্রাহ্য বিষয়ের চিহ্নমাত্র থাকিবে না। সমস্ত গিয়া পরব্রহ্মের মায়াশক্তিতে লয় প্রাপ্ত হইবে।

ব্রহ্মার ৩৬০০০ দিন অর্থাৎ ১০০ বর্ষ পরিমিত পরমায়ুতে বিষ্ণুর এক দিবা পরিকল্পিত হয়। সেই এক দিনের কাণ্ড প্রাকৃতিক সৃষ্টি, ব্রহ্মার জন্ম, ৩৬০০০ বার কল্প প্রবাহ, ৩৬০০০ বার নৈমিত্তিক প্রলয় ব্রহ্মার বিনাশ এবং প্রাকৃতিক-প্রলয়। সেই দিবাবসানে বিষ্ণুর যে রাত্রি হয় তাহাই ঐ প্রাকৃতিক প্রলয়ের কাল। তখন এই ব্রহ্মাণ্ড মহত্তত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মা অবধি সমগ্র স্থূল সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের সহিত বিমলা প্রকৃতিতে লয় হইয়া যায়, এবং বিমলা প্রকৃতি পরব্রহ্মশক্তিতে সাম্যাবস্থা লাভ করে। পরে যখন বিষ্ণুর দিন হয় তখন ব্রহ্মা পুনর্ব্বার জন্মেন, তাঁহার সমষ্টি-সৃষ্টি-ধাতুকে আশ্রয় পূর্ব্বক আবার চিজ্জড়াত্মক সৃষ্টি প্রকাশ পায়। এইরূপে অব্যক্ত-ব্যক্তাত্মক ব্রহ্মাণ্ডরূপ মহাক্রিয়া চক্র চলিতেছে। ইহা একেবারে বীজান্ত ধ্বংসও হয় না এবং একভাবেও চিরকাল থাকে না। যখন প্রকাশ পায় তখন সৃষ্টি নামে এবং যখন অপ্রকাশ হয় তখন প্রলয় নামে কথিত হয়। জগদীশ্বরের নিত্য কার্য্য-কারণ-যুক্ত, বিক্ষেপ ও আকর্ষণ শক্তি-বিশিষ্ট অনির্ব্বচনীয় মায়াশক্তি হইতে উহা বারবার প্রকাশ পাইয়া থাকে। সে নিত্যশক্তি বর্ত্তমান থাকিতে সৃষ্টির অত্যন্তাভাব হওয়া অসম্ভব। যেরূপ মহাপ্রলয় হইলে ভাবি সৃষ্টির বীজস্বরূপিণী ব্রাহ্মিশক্তির বিনাশ উপস্থিত হয়, তাহা সম্ভব নহে।

যদিও শাস্ত্রে নানাস্থানে আছে যে সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ অসৎ ছিল, কিন্তু আচার্য্যেরা মীমাংসা করিয়াছেন "যদসচ্ছব্দেনাভিধানং তদব্যাকৃতত্বাভিধানা-ভিপ্রায়ং নতুঅত্যন্তাভাবাভিপ্রায়ং।" শাস্ত্রে যে অসৎ শব্দের উল্লেখ আছে তাহার অর্থ অব্যক্ত-সৎ, অত্যন্ত অভাব নহে। সুতরাং বীজান্ত মহাপ্রলয় নাই। জগৎনিত্য ও কর্ম্মনিত্য বাদীগণ, বিশেষত যাঁহারা সৃষ্টিনাশ আশঙ্কা করিয়া প্রলয় স্বীকার করেন না, তাঁহারা শাস্ত্রের এই গূঢ়তাৎপর্য্যকে যুক্তিযুক্ত বোধ করিবেন। তবে যে, শাস্ত্রে নানাবিধ প্রলয় উক্ত হইয়াছে তাহা স্বাভাবিক রোগ বা দীর্ঘনিদ্রা মাত্র। কেন না জগৎ যদি অনাদি অনন্ত কাল স্থায়ী হইল, তবে তাহাতে নানা প্রকারের বিপদ ও বিপ্লব সমূহ যথাঋতুতে উপস্থিত হইবেই হইবে। পরিবর্ত্তনশীল স্বভাবের লক্ষণই তাহা।

ফলত একদিকে প্রলয় নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করা, অন্যদিকে শীঘ্র প্রলয় হইবে ইহা অনুমান করা এ উভয় পক্ষই ভ্রান্ত। প্রলয় ব্যতীত

সমলা প্রকৃতি সংশোধিত হইতে পারে না, অগ্নি ও জল দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে পরিশুদ্ধ না হইলে পৃথিব্যাদি লোক সমূহের ক্ষয়শীল ধাতু পুনঃ উন্নতি-শীল ও উর্ব্বরা হয় না। কালরূপী কর্ত্তা কখন কোন অণ্ডকটাহের মধ্যগত সকল গ্রহনক্ষত্র ও সর্ব্বভূতকে পরিপাক পূর্ব্বক প্রকৃতিতে লীন করিয়া দিতেছে, কখন বা কোন কটাহস্থ অণ্ড সমূহকে তাদৃশ লয়কাল ভোগান্তে পুন জাগ্রত করিয়া দিতেছে। কিন্তু কোন ব্রহ্মাণ্ড অল্পদিনের মধ্যে নষ্ট হইতে পারে না। কোটি কোটি গ্রহনক্ষত্র ও ভোগস্থান সম্বলিত এক এক বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড যে দশ সহস্র বা শত সহস্র বর্ষে ধ্বংস হইবে এরূপ অমূলক চিন্তা কখনই ভারতীয় শাস্ত্রকার দিগের মনে উদিত হয় নাই। একটী অণ্ডকটাহের মধ্যগত কোন গ্রহ বা লোক তত্রত্য অন্যান্য গ্রহাদি থাকিতে অর্থাৎ তাদৃশ অণ্ডকটাহ ব্যাপী সর্ব্ব-সামঞ্জস্য-কর বিধি বর্ত্তমান থাকিতে কখনই বিনষ্ট হইতে পারে না। তাহারা সকলেই পরস্পর শৃঙ্খলাবদ্ধ। সুতরাং প্রাকৃতিক প্রলয়ার্থ তাহাদের কাহারো অগ্রপশ্চাৎ ভোগক্ষয় হয় না। নৈমিত্তিক প্রলয় কালে স্থূলভোগের স্থান সমূহ স্থূল-প্রলয় কর্ত্তৃক গ্রাসিত হইলেও অণিমাদৈশ্বর্য্য ভোগের রাজ্য প্রাকৃতিক প্রলয়কে অপেক্ষা করে। সে সকল সূক্ষ্ম তত্ত্বের নাশ শীঘ্র হইতে পারে না। পুষ্পের নাশ হইলেও তন্নির্বাসিত গন্ধদ্রব্যের বিনাশ শীঘ্র হয় না। স্থূল স্থূল ঐশ্বর্য্য ভোগ শীঘ্র সমাপ্ত হইলেও, সূক্ষ্ম ঐশ্বর্য্য সকল অধিক কাল ভোগ হইয়া থাকে। সুতরাং নৈমিত্তিক প্রলয় বার বার হইলেও প্রাকৃতিক প্রলয় অতিদীর্ঘ কালান্তে হইয়া থাকে। সেই নৈমিত্তিক প্রলয়ও অল্প দিনে হয় না। প্রত্যেক নৈমিত্তিক সৃষ্টির সময় হইতে ৪৩২০০০০০০০ বর্ষ কাল গত হইয়া গেলে তবে নৈমিত্তিক প্রলয় হয়। যখন এই দীর্ঘকালই বুদ্ধিতে ধারণ করিতে পারি না, তখন তদপেক্ষা ৭২০০০ গুণ অধিক প্রাকৃতিক সৃষ্টির পরমায়ু-কাল কিরূপে ধারণ করিব?

আমাদের অণ্ডকটাহের অন্তর্গত অনেক গ্রহনক্ষত্রের গতি স্মরণ করিলে অনুমান হইবে যে, তাহাদের পরমায়ু এক কল্পকালের অপেক্ষা অনেক বেশী। শাস্ত্রানুসারে তাহারা কতিপয় বর্ষমাত্র স্ব স্ব কক্ষে ভ্রমণান্তে বিনষ্ট হইতে পারে না। প্রত্যেক গ্রহ, প্রত্যেক তারা, স্ব স্ব কক্ষাতে ভ্রমণ পূর্ব্বক যতদিন পর্য্যন্ত ব্রহ্ম-জাগরণ-কালরূপ প্রাকৃতিক-স্থূল-ধাতু ভোগ না করিবে, ততদিন তাহারা নৈমিত্তিক প্রলয়রূপ নিদ্রাভিভূত হইবে না, এবং যতদিন পর্য্যন্ত না সুদীর্ঘ

ব্রহ্ম-পরমায়ুরূপ প্রাকৃতিক-সূক্ষ্ম ধাতু নিঃশেষে ভোগ করিবে, ততদিন তাহারা প্রকৃতি প্রলয়রূপ মৃত্যুর অধীন হইবে না। এই অণ্ডকটাহের মধ্যে এমন সকল নক্ষত্র আছে যে তাহারা স্বীয় কক্ষাকে একবার পরিভ্রমণ করিতে সহস্রাধিক কল্পকাল গত হইয়া যায়। তাদৃশ বহুসংখ্যক কল্পকালই তাহাদের স্ব স্ব মাপে এক এক বর্ষ তুল্য। তাহারা আপাততঃ অচলতারা শব্দে কথিত হয়, কিন্তু বস্তুত সচল। এখান হইতে তাহাদের গতি চর্ম্মচক্ষুর গোচর হয় না, বা হইলেও বড় মন্দগতি অনুভূত হয়। কিন্তু বস্তুত তাহারা মহাবেগবান। তাহাদের বেগ এবং কক্ষাক্ষেত্র মনেতে ধারণ হয় না। তাহারা মানব মাপের ৫।৬ সহস্র কল্পকালের মধ্যে স্বীয় মাপে এক এক বর্ষ পরিক্রম করে। যদি তাহাদিগকে স্বীয় পরিমাপে ৬।৭ সহস্র বর্ষ পরিক্রম করান যায়, তাহা হইলেই প্রাকৃতিক সৃষ্টির পরমায়ুভুক্ত ৩৬০০০ কল্পকালকে সমাপ্ত করিবে। অতএব আমাদের অণ্ডকটাহের মধ্যে এমত সকল দীর্ঘ-কক্ষা-সেবী মহাপরমায়ুধর গ্রহ নক্ষত্র থাকিতে অল্পদিনের মধ্যে বা এই কলিযুগের অবসানে যে প্রলয় হইবে, এমত আশঙ্কাই হইতে পারে না। তাদৃশ আশঙ্কারূপ রোগের পক্ষে ঋষিগণের সুদীর্ঘ অঙ্কপাতই ঔষধ স্বরূপ। এই অঙ্ককে স্মরণপূর্ব্বক জগৎকে নিত্য বল তাহাতে ক্ষতি নাই, আবার এত দীর্ঘ পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতি-স্রোতে ভাসিয়া কেবল যাতায়াত করিব এই চিন্তাপূর্ব্বক যদি বেদান্ত বিজ্ঞান দ্বারা একেবারেই মায়াময়ী প্রকৃতিকে ত্যাগ করিতে পার, তাহাও তোমার অত্যন্ত মঙ্গলকর।

বাইবেল মতে এই পৃথিবী ৫৮৮৭ বর্ষ পরমায়ু ভোগ করিয়া এখনও বর্ত্তমান আছে। উক্ত ৫৮৮৭ বর্ষের মধ্যে প্রথম ১৭০৪ বর্ষ নুঃপয়গম্বরের জল প্লাবনের পূর্ব্ববর্ত্তী। অবশিষ্ট ৪১৮৩ বর্ষ তাহার পরবর্ত্তী। যাহারা উক্তরূপ ৫৮৮৭ বর্ষমাত্র সৃষ্টির গতাব্দা স্বীকার করেন, তাহারা প্রায় কলিগতাব্দাকেই সৃষ্টিগতাব্দা বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। যাহাহউক ঐ প্রকার অল্প সংখ্যক সৃষ্টিগতাব্দা-বাদী ব্যক্তিরা ইহা তো স্বীকার করিতেছেন যে, সৃষ্টি হইয়া অবধি পৃথিবী এ যাবৎকাল স্বীয়মাপে ৫৮৮৭ বর্ষ অথবা প্রায় ৬০০০ বার স্বীয় কক্ষাকে পরিক্রম করিয়াছে। যখন পৃথিবীকে ৬০০০ বর্ষ স্বীয় কক্ষাতে পরিভ্রমণ করিতে দিলেন, তখন সেই সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহনক্ষত্র গুলিকে কি অন্তত স্ব স্ব মাপে তৎপরিমিতকাল স্ব স্ব কক্ষা পরিক্রম করিতে দিবেন না? তাহারা কি জগতে দেখা দিয়াই

লুপ্ত হইবে? 'অর্কতর' নামে একটি তারা আছে। সেটি ১৮০০ মানবীয় বর্ষে রাশিচক্রের ৩৬০ অংশের একাংশ গমন করে। সুতরাং তাহার একবার কক্ষা পরিক্রমে ৬,৪৮০০০০ মানবীয় বর্ষ বিগত হয়। সেই সুদীর্ঘ কালই তাহার এক বর্ষ। যদি তাহাকে ৬০০০ বা ৭০০০ বার রাশিচক্রে ভ্রমণ করান যায় অর্থাৎ যদি তাহার স্বীয় পরিমিত ৬০০০ বা ৭০০০ বর্ষকাল স্থিতিভোগ করিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে মানবীয় ৩৮৮৮০০০০০০০ অথবা ৪৫৩৬০০০০০০০ বর্ষ প্রয়োজন হইবে ফলত কল্পকালের সংখ্যা প্রায় তত্তুল্য। তাহা মানবীয় ৪৩২০০০০০০০ বর্ষ। সুতরাং উক্ত তারার অপেক্ষা দূর-কক্ষা-পরিক্রমী যে সকল তারা আপাতত অচল বলিয়া বোধ হয় এবং বহু সংখ্যক কল্পকালে যাহাদের পরিক্রম একবার মাত্র সমাধা হয় তাহারা যদি ঐরূপে স্বায়মানে ৬০০০ বা ৭০০০ বর্ষ যাবৎ স্বস্ব কক্ষায় ভ্রমণ করে তাহা হইলেই ৩৬০০০ কল্পকাল গত হইয়া প্রাকৃতিক প্রলয়ের সময়কে স্পর্শ করিবে। অতএব সহজ বুদ্ধিতে বুঝা যাইতেছে যে, সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অথবা তদুপাধিক বিধাতার পরমায়ু বলিয়া ঋষিরা যোগবলে যে ৩৬০০০ সংখ্যক কল্পের ও তত্তুল্য সংখ্যক নৈমিত্তিক প্রলয়ের সংখ্যাপাত করিয়াছেন, তাহা অসম্ভব নহে। যতক্ষণ পর্যান্ত অণ্ডকটাহের মধ্যে একটি নক্ষত্রেরও সূক্ষ্ম-প্রাকৃতিক-ভোগকাল অবশিষ্ট থাকিবে, ততদিন তন্মধ্য-ভুক্ত কোন গ্রহ নক্ষত্র সম্বন্ধে প্রাকৃতিক-প্রলয় উপস্থিত হইবে না। কেন না তাহাদের সকলের মধ্যে সাধারণতঃ সমষ্টি ভাবে, যে প্রকৃতি ও বিধি বর্ত্তমান থাকে উক্ত ৩৬০০০ কল্প ও ৩৬০০০ নৈমিত্তিক প্রলয়ের অন্তে নিঃশেষে তাহার ভোগক্ষয় হইলেই একেবারে বিধিরূপ মহত্তত্ত্বাদিক্রমে সকলেই প্রাকৃতিক প্রলয়-কবলে কবলিত হইবে।

প্রকৃতির সূক্ষ্ম প্রপঞ্চগত যে সকল উৎকৃষ্ট ধাতু তাহারই ভোগক্ষয় হওয়াতে প্রাকৃতিক-প্রলয় ঘটে। সুতরাং সূক্ষ্ম ঐশ্বর্য্য ভোগের স্থান স্বরূপ ব্রহ্ম-ভুবন চতুষ্টয় কেবল ঈদৃশ প্রলয়েই লীন হয়। নৈমিত্তিক প্রলয়ের প্রকৃতির কেবল স্থূলধাতু সমূহের ভোগক্ষয় হওয়াতে স্থূল ভোগ স্থান স্বরূপ পৃথিব্যাদি ত্রৈলোক্যের প্রলয় হয় মাত্র, তৎকালে যোগধাম স্বরূপ ব্রহ্ম-ভুবন সমূহ অনাহত থাকে, কিন্তু প্রাকৃতিক প্রলয়ে ভোগৈশ্বর্য্য ও যোগৈশ্বর্য্য উভয়ই বিনষ্ট হইয়া সার্ব্বভৌমিক ভূত সংপ্লব সংঘটিত হয়। প্রকৃতির সূক্ষ্মধাতু ও যোগৈশ্বর্য্যরূপ পরিণামও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ভোগ্যবস্তু এবং যোগীগণও এক

প্রকার ভোগী। ভোগমাত্রেই ক্ষয় আছে। সুতরাং প্রাকৃতিক প্রলয়ে প্রকৃতির সমস্ত সূক্ষ্মতত্ত্ব সূক্ষ্মভোগী, সূক্ষ্মভোগ, যোগপ্রভাব প্রভৃতি সমুদয়ই লয় প্রাপ্ত হয়।

প্রাকৃতিক প্রলয় কালে সমস্ত সূক্ষ্ম ঐশ্বর্য্য ও সমস্ত ভেদজাত সমলা প্রকৃতির তমঃ প্রধান বিক্ষেপ শক্তিতে উপসংহৃত হইলে সামান্য রাত্রি হইতে ভিন্ন এক মহাঘোরা কালরজনীর আকার ধারণ করিবে। সৃষ্টির বীজ স্বরূপিণী সেই প্রকৃতি তমঃ প্রভাবে নিশ্চেষ্ট থাকিবে। সূর্য্যচন্দ্রতারাগণ প্রকৃতির আদিম সূক্ষ্মধাতুতে বিলীন হইবে। ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্ব রূপ মহত্তত্ত্ব বা ব্রহ্মার বিরাম বা মৃত্যু উপস্থিত হইবে। আব্রহ্ম-স্তম্ব-পর্য্যন্ত যাবন্ত ভূত লয় প্রাপ্ত হইবে। তখন ভৌতিক প্রকৃতিও যেমন সমলা প্রকৃতির তমোগুণে বিলীন হইবে, মানসিক প্রকৃতিও সেইরূপ তাহাতে বিলীন হইবে। তাহার কারণ এই যে সমলা প্রকৃতির তদুভয়েরই উপাদান। প্রকৃতির যে মূল অংশ সৃষ্টিকার্য্যে পরিণত হয় নাই তাহা মূল প্রকৃতি শব্দের বাচ্য। সেই মূলপ্রকৃতি বিমলা ও শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা। মহাপ্রলয়ে সমলা প্রকৃতি ক্ষয়প্রাপ্ত ভৌতিক ধাতু ও মানসিক ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত উক্ত বিমলা মূল প্রকৃতিতে প্রবেশ পূর্ব্বক ঐশিনিয়মাধীন দীর্ঘনিদ্রাসূত্রে সংশোধিতা হয়। এই প্রলয়রূপিণী রজনী বা প্রাকৃতিক নিদ্রাকালকে শাস্ত্রে বৈষ্ণবীরাত্রি, যোগনিদ্রা, প্রভৃতি শব্দে কহেন। সেই কালযামিনীর স্থিতিকালের পরিমাণ উক্ত হয় নাই, কিন্তু শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে তাহার অবসানে পুনঃসৃষ্টি হইয়া থাকে।

প্রলয়ের অর্থ চিরবিনাশ নহে। 'প্রত্যুত সর্ব্বক্লেশ নিবর্ত্তকত্বাৎ' নিদ্রাতে যেমন সর্ব্বক্লেশ নিবৃত্ত হইয়া দেহ ও মন প্রকৃতিস্থ হয় প্রলয়ের সেইরূপ সার্ব্বভৌমিক, দৈবিক ও ভৌতিক প্রকৃতি সংশোধিত হইয়া নবতর জীবন লাভ করে। ধরণী, চন্দ্র, সূর্য্য, তারাগণ পুন নব অনুরাগে বিরাজমান হয়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ এই মঙ্গলকর ফলচতুষ্টয় জীব কর্তৃক নব উৎসাহে সাধিত হয়।

শ্রীচন্দ্র শেখর বসু।

# রথযাত্রা।

'জয় জগন্নাথ।' কি মহান্ আজ
আকাশ ভাঙ্গিয়া উঠে গণ্ডগোল,
কিছুই শুনি না বজ্র ভয়ঙ্কর—
গর্জ্জে যে বেলায় সাগর কল্লোল! ১

মহান্ জলধি বিশাল প্রবাহ
মহাজল স্রোত পরাভব করি,
দর্পের উপরে মহাদর্পে যেন
উঠিছে তরঙ্গ তরঙ্গ উপরি! ২

ভক্তির উচ্ছ্বাসে প্রেমের প্রবাহে
জীবন্ত জীবনে বহিছে হৃদয়,
আনন্দ তরঙ্গে উঠিছে কল্লোল,
'জয় জগন্নাথ জয় জয় জয়!' ৩

ভারত শ্রীক্ষেত্র মহাপুণ্য স্থান,
নাহিক দ্বিতীয় পৃথিবীতে তার,
হেন সাম্যভাব—এ হেন মিলন—
মহা জাতীয়তা—অনন্ত উদার! ৪

ত্রিভুবনে নাই হেন তীর্থ স্থান
বড় অহঙ্কার ভারত রে!
বড় অহঙ্কার জননী আমার
তুই পুণ্যময়ী ভারত রে! ৫

বড় অহঙ্কারে মাতিল হৃদয়
বড় অহঙ্কারে হইনু বিহ্বল,
বড়ই আহ্লাদে নাচিছে ধমনী,
বড়ই আহ্লাদে পরাণ পাগল! ৬

যদিও জনম হয় নি সফল
নিরখি সে দিব্য মহা পুণ্যস্থান,
তবু অহঙ্কারে,তথাপি আহ্লাদে
করিছে কল্পনা উদাস পরাণ! ৭

দেখি যেন আজ সাক্ষাতে সে দৃশ্য
প্রেমার্দ্র ভক্তের অশ্রু বিগলিত,
শুনি যেন আজ সাক্ষাতে সে দিব্য
অনন্ত কণ্ঠের মহান্ সঙ্গীত! ৮

কোটি কোটি হস্ত করি উত্তোলন
ডাকে উচ্চে ভক্ত 'জয় জগন্নাথ!'
ভয়ে ভয়ে যেন নীরব নিস্পন্দ
ভারত সাগর—বঙ্গীয় অখাত! ৯

মহা মহোৎসবে, আনন্দ ভৈরবে,
বাজিছে অজস্র খোল করতাল,
ছোটে দশদিকে মত্ত প্রতিধ্বনি
ভীমা ভয়ঙ্করী বিরাট বিশাল! ১০

ভীম ভূমি-কম্পে কাঁপিছে মেদিনী
টল টল টল ভক্ত পদভরে,
আকাশে কাঁপিছে শুক্র সোম শনি
গ্রহ উপগ্রহ সভয় অন্তরে! ১১

মহা মহোৎসব মহাতীর্থ স্থানে
পৃথিবীতে হেন দ্বিতীয় নাই,
পবিত্র ভারত জননী আমার
এ সুখ রাখিতে নাহি রে ঠাঁই! ১২

চীৎকার ঘর্ঘরে গর্জ্জে রথচক্র
অই পুনরায় বধিরি শ্রবণ,
'জয় জগন্নাথ! জয় বলরাম!'
'জয়দা সুভদ্রা!' ডাকে ভক্তগণ! ১৩

দেখ নর আজি নয়ন মিলিয়া
পুনর্জ্জন্ম ভবে হইবে না আর,
দেখ রথোপরে বামন মুরতি
ইহ পরকালে পাইবে উদ্ধার! ১৪

আগ্রহে উল্লাসে দেখায় কল্পনা,—
কিন্তু দেখি হায় এ কি ভয়ানক,
হস্তপদ হীন অসমর্থ দেব!
চলিছে যে দিকে চালায় চালক! ১৫

চমকি আতঙ্কে উঠিল পরাণ,
হৃদয়ের রক্ত হ'ল অচল,
আশার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিল
নিরখি নয়নে আকাশ কেবল! ১৬

কালা পাহাড়ের ঘোর অত্যাচার
এতদিন পরে হ'ল স্মরণ,
বুঝিলাম কিসে দেবের উপরে
প্রকাশিল ক্ষুদ্র মানবে বিক্রম! ১৭

দেখিলাম যেন সাগরের ভয়ে
ব্যাকুলা হইয়ে সুভদ্রা সুন্দরী,
ভ্রাতৃ যুগলের নিয়েছে আশ্রয়,
তবু কাঁপে ভয়ে থর থর করি! ১৮

সম্মুখে সরোষে গর্জ্জিছে জলধি
বিরাট তরঙ্গ বাহু বিস্তারিয়া,
মহা আস্ফালনে—মহাদর্পে যেন
চাহে সুভদ্রারে লইতে কাড়িয়া! ১৯

বুঝিলাম হায় কি করিয়া এত
শক্রর গরিমা শক্র অপমান,
কাপুরুষ প্রায় দেবতার প্রাণে
সহে জগন্নাথ, সঙ্গে বলরাম! ২০

নিরেট নির্ব্বোধ পাষণ্ড বিশাল
ভারতেরে হায় দিতে রসাতল,
গড়ে নাই হস্ত, গড়ে নাই পদ,
কি করিতে পারে নিভুজ বিকল? ২১

ঝরিল নয়ন, কাঁদিল হৃদয়,
আকুল অন্তরে কহিনু ডাকিয়া,
'হে ভারতবাসী!' হে ভ্রাতৃ সকল,
কি ফল ও রথ টানিয়া লইয়া? ২২

কি ফল ও রথ টানিয়া লইয়া,
ও দেবে হইবে কি কার্য্য সাধন?
পারে না চলিতে, পারে না ধরিতে,
খঞ্জ পঙ্গু নিয়ে কোন্ প্রয়োজন? ২৩

দেও ও নিভুজ ভাসায়ে সাগরে
অথবা চিল্কার সলিল অতলে,
কিম্বা পোড়াইয়া কর ভস্মশেষ,
ধোও চিতাস্থল নয়নের জলে! ২৪

অথবা—
যদি ভ্রাতৃগণ জননীর তরে
কাঁদে তোমাদের আকুল পরাণ,
এস তবে ভুজ ছেদি অকাতরে
করি দেবতায় সকলে প্রদান! ২৫

চতুর্ভুজে শংখ চক্র গদা পদ্ম
দেব জগন্নাথ করিতা ধারণ,
আজি কোটি হস্তে কোটি অস্ত্র শস্ত্রে
করুক্ শ্রীপাত দৈত্য বিমর্দ্দন! ২৬

বিশাল বিরাট আকর্ষিয়া হল,
হলায়ুধ ধরা করুক বিদার,
পাপের ধরণী যাক্ রসাতলে,
হোক্ দূরীভূত দৈত্য অত্যাচার! ২৭

মহাবীর্য্য-বতী সুভদ্রা সুন্দরী
উল্লাসে অশ্বের বল্গা আকর্ষিয়া,
প্রমত্ত উৎসাহে ঘোর রণাঙ্গনে,
রণরঙ্গে রথ দিক্ চালাইয়া! ২৮

সেরূপ তখন নিরখিলে ভাই!
যাবে শোক, দুঃখ, যাতনা অপার,
সেরূপ তখন নিরখিলে রথে
পুনর্জ্জন্ম ভবে হইবে না আর! ২৯

# বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের ইতিহাস।

সপ্ততি বর্ষ অতীত হইল বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের সৃষ্টি হইয়াছে; সুতরাং তাহার ইতিহাসের আলোচনা করা, এ সময়ে, বোধ করি, অসাময়িক হইবে না। ইতিহাসটি দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে, (১) আদি অবস্থা এবং (২) বর্ত্তমান অবস্থা।

কিন্তু বাঙ্গালা সংবাদপত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। বাঙ্গালা-ভাষার সহিত বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। ভাষা এবং সংবাদপত্র উভয়ের স্বার্থ এক সঙ্গে বাঁধা। সে বাঁধুনী বড় সহজ নহে। উভয়েই উভয়কে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, উভয়েই উভয়ের প্রাণ।

বলিতে গেলে বাঙ্গালা ভাষার সকল অঙ্গ যথাযথরূপে সুন্দর প্রণালীতে আজিও গঠিত হয় নাই। এখনও ভাষার নবকলেবরের—নবজীবনের সময়। যে সময়ে বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের সৃষ্টি হয়, সে সময়ে বাঙ্গালা ভাষার সকল অবয়ব প্রস্তুত হয় নাই; তখন কেবল উপকরণ সংগ্রহ হইতেছিল মাত্র। বাঙ্গালা সংবাদ পত্র সৃষ্টির পূর্ব্বে আমাদের দেশে গদ্যময় গ্রন্থ একখানিও ছিল না।—বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সকলগুলিই কবিতায় লিখিত হইত। তখনকার লোকেরা কেবল চিঠিপত্র গদ্যে লিখিতেন। সেই চিঠিপত্রের অর্দ্ধেক সংস্কৃত এবং অর্দ্ধেক বাঙ্গালা। লেখকের ক্ষমতা থাকিলে কবিতায় চিঠি লিখিতেন। ভারতচন্দ্র রায়, নাগের অত্যাচারে যে নাগাষ্টক পত্র লেখেন, সকলেই তাহা জানেন। বাঙ্গালা সংবাদ পত্র সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই এ দেশে গদ্য লিখিবার প্রথা বাহুল্যরূপে প্রচলিত হয়। সেই জন্যই বলি যে, সংবাদ পত্রের সহিত ভাষার একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সংবাদ পত্রে গদ্য লিখিবার প্রথা প্রচলিত হইলে পর, একে একে কয়খানি গদ্য গ্রন্থ প্রচার হয়।

বাঙ্গালা সংবাদ পত্র বাঙ্গালা ভাষার অনেকটা পুষ্টিসাধন করিয়া আসিতেছে। বাঙ্গালায় ভিন্ন ভিন্ন জেলার ভাষা ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিবিশিষ্ট ছিল, এবং এক এক শব্দ জেলা ভেদে ভিন্ন ভিন্নরূপে উচ্চারিত হইত। সংবাদ পত্র সেই বিভিন্নতার বিলোপ সাধন করিয়া দিয়াছে এবং দিতেছে।

সন ১২৪৩ সালে বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা কিরূপ ছিল, নিম্নের উদ্ধৃত অংশ পাঠে তাহা জানা যায় ;—

"এতদ্দেশীয় অর্থশূন্য ক্ষুদ্র বিদ্যার্থিবর্গের প্রতি নিতান্ত করুণাবিহীন হইয়া গবর্ণমেণ্ট যে দ্বিতীয় নিয়ম নির্দ্ধার্য্য করিয়াছেন তদ্দৃষ্টে আমরা বিবিধ বিলাপ বারিধি তরল তরঙ্গে নিমগ্ন হইলাম যেহেতু আপন গর্ভোদ্ভবা ভাষা ও বিদ্যা নাম্নিকা কন্যাদ্বয়কে হারা হইলে সেই শোকে ভারতবর্ষ স্নিগ্ধ শোভা বিশিষ্ট যশঃ সৌরভ শীলতাদি সুচারু অলঙ্কার সমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনাথার প্রায় হাহাকার করিবেন।" *

এই সময়ের ইংরাজির অনুবাদের একটু নমুনা নিম্নে দেওয়া গেল ;—

"গবর্ণর বাহাদুরের হুজুর কৌন্সিলে এই নির্দ্ধারিত হইল যে ইংরাজ-দিগের উচিত কর্ম্ম যে বঙ্গদেশীয় ব্যক্তিদিগেকে ইংরাজি জ্ঞান বিদ্যা ও নীতি শাস্ত্রের উপদেশ দ্বারা সভ্য করেন।" †

একমাত্র সর্ব্বশেষে দাঁড়ি ভিন্ন কমা প্রভৃতি কোন চিহ্ন এ সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করিতে পায় নাই।

সন ১২৫৯ সালে বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা নিম্ন লিখিত কয় পংক্তি প্রকাশ করিয়া দিতেছে ;—

"গোকুলধামে বকুল কুঞ্জে মনোহর বসন্তকালের সুখময় প্রভাত সময়ে কোকিল-কুলের কুহু কুহু কীর্ত্তি কলনা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে আর কি কুৎসিৎ কাকেব কর্ণ-ভেদী কঠোর কা কা শব্দ ভাল লাগে? তবে এই বঙ্গদেশে যে সকল রঙ্গদর্শী নিন্দা প্রিয় বাবু আছেন, তাঁহাদিগের কথা স্বতন্ত্র, কারণ সুরভী রসরসিকা রসনা তৃণরসের আস্বাদন ব্যতীত অমৃতরসে তৃপ্ত হয় না।" ‡

এতদিনের পর আমরা ভাষার মধ্যে কমা প্রভৃতি চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি এবং ভাষার অবয়বও পরিবর্ত্তিত দেখা যাইতেছে। এই সময়ে এইরূপ লেখাই অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য ছিল। এক্ষণে ইতিহাসের অনুসরণ করা যাউক। ||

* সংবাদ প্রভাকর, ২১এ অগ্রহায়ণ, ১২৪৩ সাল।

† ঐ

‡ ঐ ১লা বৈশাখ, ১২৫৯ সাল।

|| মৃত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের যে বিবরণ ১২৫৯ সালের ১লা বৈশাখের সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশ করেন, তদ্দ্বারা আমরা প্রাচীন ইতিবৃত্ত সঙ্কলনের সম্পূর্ণ সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি।

সাহেবদিগের কথায় আমাদিগের বড়ই বিশ্বাস। তাঁহারা আমাদিগের দেশের ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে এমন কি আমাদিগের বেদ পুরাণ সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহাও আমরা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, সেইজন্যই আমাদের দেশের কৃতবিদ্যগণেরও ধারণা যে, পাদরি সাহেবেরাই আমাদিগের বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম সংবাদ পত্র প্রচার করেন। সেটি বড় ভুল বাঙ্গালীর দ্বারাই বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের প্রথম সৃষ্টি হয়। ১২২২ বা ১২২৩ সালে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য নামক একজন পণ্ডিত কলিকাতা নগরে সর্ব্বপ্রথমে "বাঙ্গালা গেজেট" নামে সংবাদ পত্র প্রচার করেন। উক্ত ভট্টাচার্য্য একজন যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে ভারতচন্দ্র রায়ের "বিদ্যাসুন্দর" এবং "অন্নদামঙ্গল" মুদ্রাঙ্কিত করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করেন। "বাঙ্গালা গেজেট" অল্পকালের মধ্যেই লয়প্রাপ্ত হইলেও এইখানিই আমাদিগের দেশের প্রথম সংবাদ পত্র বলিতে হইবে।

১২২৪ সালে শ্রীরামপুরের পাদরি সাহেবেরা "সমাচারদর্পণ" নামে সংবাদ পত্র প্রচার করেন। প্রচারকগণ নানা কারণে সম্পাদকীয় ভার ত্যাগ করিলে, বিখ্যাত পাদরি জন মার্সমান সম্পাদক হইয়া, বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত সমাচার-দর্পণের উন্নতি সাধন করেন। মার্সমান সাহেব "ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া" পত্রের সম্পাদক হইলে, তিনি ১২৪৮ সালের ২রা পৌষ শনিবার হইতে "সমাচার দর্পণ" প্রচার রহিত করিতে বাধ্য হয়েন। পরে কলিকাতা, কলুটোলা নিবাসী বাবু দীননাথ দত্তের সাহায্যে বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মার্সমান সাহেবের অনুমতি লইয়া কিছুকাল "সমাচার দর্পণ" পুনরায় প্রকাশ করেন। দীন বাবু প্রাণত্যাগ করিলে, "সমাচার দর্পণ" আবার উঠিয়া যায়। পরে ১২৫৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে বিখ্যাত টাউনশেণ্ড সাহেব পুনরায় সমাচারদর্পণের জীবনদান করেন বটে, কিন্তু দুই বর্ষ পরে সেখানি একেবারে বিলুপ্ত হয়।

সন ১২২৭ সালে কলুটোলা নিবাসী বাবু তারাচাঁদ দত্ত এবং পূর্ব্বোক্ত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, "সংবাদ কৌমুদী" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। রাজা রামমোহন রায় উক্ত পত্রে সতীদাহ প্রচার বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করায়, ভবানী বাবু সম্পাদকীয়তা ত্যাগ করেন। রাজা রামমোহন রায় অগত্যা কৌমুদীর সমস্ত ভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন। যদিও তিনি ইহাতে প্রবন্ধ লিখিতেন, কিন্তু সম্পাদক নামে

পরিচয় দান করিতেন না। রাজার মৃত্যুর তিন বা চারি বর্ষ পরে এখানি উঠিয়া যায়।

উপরোক্ত ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সন ১২২৮ সালে "সমাচার চন্দ্রিকা" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। কিছু দিন পরেই রাজা রাম মোহন রায় হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইলে, নগর মধ্যে মহা গোল পড়িয়া যায়। নগরের হিন্দু বড় লোকেরা দল বাঁধিয়া ধর্ম্মসভা স্থাপন করেন। ভবানী চরণ সেই সভার সম্পাদক হইয়া চন্দ্রিকায় হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে তাব্র প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। এই সময়ে চন্দ্রিকার প্রাধান্য বিশেষ রূপে বিস্তৃত হয়, এমন কি ইতিপূর্ব্বে অন্য কোন বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের এতদূর প্রতিপত্তি ও গ্রাহক ছিল না। ১২৫৪ সালের ৩রা ফাল্গুন রবিবারে ভবানী বাবু প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার পুত্র বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দ্রিকা চালাইতে থাকেন। কিন্তু ঋণ জালে জড়িত হওয়ায় কয়েক বর্ষ পরে চন্দ্রিকা প্রকাশ রহিত হয়। কয়েক বর্ষ পরে পুনরায় নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া, সমাচার চন্দ্রিকা আজ পর্য্যন্ত জীবিতা আছে। চন্দ্রিকা প্রথমে সাপ্তাহিক ছিল, পরে সপ্তাহে দুইবার করিয়া প্রকাশ হইত; এক্ষণে প্রাত্যহিক হইয়াছে, এবং কলেবরও বর্দ্ধিত হইয়াছে, কিন্তু চন্দ্রিকার আর সে স্নিগ্ধ জ্যোতি নাই। বাঙ্গালায় যত সংবাদ পত্র আছে, তন্মধ্যে এই সমাচার চন্দ্রিকাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।

চন্দ্রিকা প্রকাশের পর মৃজাপুর নিবাসী কৃষ্ণমোহন দাস "সংবাদ তিমির নাশক" নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। প্রকাশকের রচনা শক্তি ছিল না, কতিপয় যোগ্য লেখক লিখিতেন। কয়েক বর্ষ পরে এখানি উঠিয়া যায়।

বর্ত্তমানে মহারাজ, রাজা, রায়বাহাদুর প্রভৃতি দেশের বড় লোকেরা বাঙ্গালা লেখা পড়ার চর্চ্চা করা দূরে থাক, বাঙ্গালা সংবাদ পত্র পাঠও করেন না, কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সে সময়ে বাঙ্গালী বড় লোকেরা বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বড়ই শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহারা নিজেও লিখিতেন এবং অর্থব্যয় করিয়া সংবাদ পত্রের উন্নতি করণে যত্নবান হইতেন। "তিমির নাশক" প্রকাশ হইবার পর রাজা রাম মোহন রায়, বাবু দ্বারকা নাথ ঠাকুর, এবং বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের উদ্যোগে "বঙ্গদূত" নামক সংবাদ পত্রের জন্ম হয়। উক্ত তিনজনেই দেশের মস্তক

স্বরূপ' ছিলেন। ইহার সম্পাদন ভারও সেইমত সর্ব্বাংশে যোগ্য পাত্রের হস্তে অর্পণ করা হয়। এ সময়ে নিমক বোর্ডের দেওয়ানি পদই বাঙ্গালীর প্রাপ্য সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বাপেক্ষা মান্যের পদ ছিল। স্বনাম খ্যাত বাবু নীলরত্ন হালদার সেই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনিই বঙ্গদূতের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। নীলরত্ন বাবু সংস্কৃত, বাঙ্গালা, আরবী, পারসী, উর্দ্দু, লাটীন, এবং গ্রীক ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার কবিত্ব শক্তিও বিলক্ষণ ছিল। ইনি "শ্রুতিগান রত্ন" "পার্ব্বতী গীত রত্ন", "কবিতা রত্নাকর", "বহুদর্শন" এবং "সর্ব্বামোদ তরঙ্গিনী" নামে কয়খানি গ্রন্থ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। "বহু দর্শন" খানি সংস্কৃত, বাঙ্গালা, লাটীন, এবং আরবী ভাষায় লিখিত। ইঁহার রচিত অনেকগুলি সংস্কৃত গীত আজিও কোন কোন কথকের মুখে শুনা যায়। ইঁহার দ্বারা বঙ্গদূতের গৌরব অচিরেই সর্ব্বত্র বিস্তৃত হয়। বাঙ্গালা সংবাদ পত্র সৃষ্টি অবধি একপ কোন যোগ্য ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের সম্পাদক পদে নিযুক্ত হয়েন নাই। নীলরত্ন বাবু, বিষয় কার্য্য ব্যস্ততা জন্য অবকাশাভাবে উক্ত পদ ত্যাগ করিলে, কাসারী পাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সেন "বঙ্গদূত" সম্পাদন করেন। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র রায় নামক একব্যক্তি সহকারী সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু নীলরত্ন বাবু ইহার সহিত সংস্রব ত্যাগ করিলে, দূত একবারে শ্রীহীন হইয়া পড়ে। শেষ ১২৩৬ সালে অদৃশ্য হয়।

সন ১২৩৮ সালের ১৬ই মাঘ শুক্রবার সংবাদ প্রভাকরের জন্ম হয়। পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী বাবু গোপী মোহন ঠাকুরের পৌত্র বাবু নন্দকুমার ঠাকুরের পুত্র বাবু যোগেন্দ্র মোহন ঠাকুর সংবাদ প্রভাকর প্রকাশের প্রধান উদ্যোগী। তাঁহারই উৎসাহে এবং ব্যয়ে বিখ্যাত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকর প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়া, অতি অল্প বয়সেই দক্ষতার সহিত সম্পাদন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্র মোহন বাবু প্রাণ-ত্যাগ করিলে, ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত অগত্যা সহায়্যাভাবে প্রভাকর প্রচার করিতে ক্ষান্ত হয়েন কিন্তু এই বর্ষেই "সংবাদরত্নাবলী" নামে একখানি নূতন সংবাদ পত্র প্রকাশ হইলে, ঈশ্বরচন্দ্র তাহার সম্পাদক পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি কিছুদিন পরে উক্ত পদ ত্যাগ করিয়া কটকে চলিয়া যান। তথা হইতে ১২৪৩ সালে কলিকাতায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্বীয় পরিশ্রম এবং অদৃষ্টের উপরে নির্ভর করিয়া, উক্ত সালের ২৭এ শ্রাবণ হইতে পুনরায়

স্বাধীনভাবে সংবাদ প্রভাকর প্রকাশারাম্ভ করেন। এই সময়ে প্রভাকর সপ্তাহে তিন দিন করিয়া প্রকাশ হইত। পরে ১২৪৬ সালের ১লা আষাঢ় প্রভাকর প্রত্যহিক রূপে প্রচার হয়। এই সংবাদ প্রভাকরই আমাদিগের দেশের সর্ব্ব প্রথম প্রাত্যহিক পত্র।

ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের সময় হইতেই বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের যুগান্তর উপস্থিত হয়। ঈশ্বর চন্দ্রের কবিত্ব শক্তি বিলক্ষণ ছিল। তাঁহার সেই শক্তি যতই পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, প্রভাকরও সেই সঙ্গে সঙ্গে কেবল কলিকাতা বা উপনগর নহে, সমস্ত বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে স্বীয় প্রাবল্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। ইতিপূর্ব্বে যে সকল সংবাদপত্র প্রকাশ হইয়াছিল, সেগুলি কেবল কলিকাতা ও নিকট-বর্ত্তী গ্রাম সমূহে পঠিত হইত মাত্র। মফস্বলের লোকেরা "বাঙ্গালা সংবাদ পত্র" শব্দটি শুনিয়াছিল, কখনও চক্ষে দেখে নাই। প্রভাকর সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া, সর্ব্ব প্রথমে বাঙ্গালী জাতির বাঙ্গালা সংবাদ পত্র পাঠের আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করিয়া দেয়। প্রভাকর পাঠ করিবার জন্য সাধারণের আগ্রহ এই সময়ে এতদূর বৃদ্ধি হয় যে, নগরের অনেক গ্রাহক প্রভাকর মুদ্রিত হইবার সময় যন্ত্রালয়ে লোক পাঠাইয়া অগ্রে কাগজ লইবার চেষ্টা করেন এবং মফস্বলের গ্রাহকেরা ডাকের অপেক্ষা করিতে থাকেন। ১২৬০ সালে প্রভাকরের গ্রাহক পাঁচ হাজারের অধিক হয়। এই সময়ে প্রাত্যহিক প্রভাকরে মনোমত সমধিক কবিতা প্রকাশের সুবিধা না হওয়ায়, ঈশ্বরচন্দ্র একখানি স্বতন্ত্র মাসিক প্রভাকর প্রকাশ করেন। তাহার আদর আবার প্রাত্যহিক অপেক্ষা সমধিক হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাঙ্গালা ভাষার অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন। গত ৪০ বর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশে যে সকল প্রধান প্রধান কবি, উপন্যাস রচয়িতা নাটককার এবং লেখক বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই ঈশ্বরচন্দ্রের একরূপ শিষ্য। বাঙ্গালা ভাষা চর্চ্চার জন্য যাহাতে সাধারণের আগ্রহ জন্মে, তজ্জন্য ঈশ্বরচন্দ্র যথেষ্ট চেষ্টা করেন। তাঁহারই উৎসাহে হিন্দু কলেজ, হুগলী কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ এবং ঢাকা কলেজের শিক্ষিত ছাত্রগণ রচনা করিতে শিক্ষা করেন এবং সেই ছাত্র মণ্ডলীর জন্যই ঈশ্বরচন্দ্র "সাধুরঞ্জন" নামে একখানি স্বতন্ত্র সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করিতে থাকেন। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রিয় শিষ্যগণের মধ্যে এক্ষণে তিন চারি জন

মাত্র জীবিত আছেন; তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র দেশ বিদেশে মহান্ যশ সংগ্রহ করিতেছেন।

সংবাদ প্রভাকর এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ অবয়বে প্রকাশ হইতেছে। কিন্তু ইহার অবস্থা তাদৃশ প্রীতিপ্রদ নহে।

সন ১২৩৭ সাল হইতে ১২৫৯ সাল পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রগুলি প্রকাশ হয়;—

সন ১২৩৭ সাল।

| নাম | প্রকাশক বা সম্পাদক | স্থিতিকাল। |
|---|---|---|
| "সংবাদ সুধাকর"— | প্রেমচাঁদ রায় | ৪ বর্ষ। |

সন ১২৩৮ সাল।

"অনুবাদিকা"—ইহাতে কেবল ইংরাজি "বিফরমার" পত্রের অনুবাদ প্রকাশ হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হইত। ২ বর্ষ।

"জ্ঞানান্বেষণ"—দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রভৃতি হিন্দুকলেজের প্রথম ইংরাজি শিক্ষিত ছাত্রগণ ইহা সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশ করেন— ৯ বর্ষ।

"সংবাদ রত্নাকর"—রাধানাথ পাল ১ বর্ষ।

"সমাচার সভা"—

"রাজেন্দ্র"—দুর্ল্লভচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক ছিলেন, কিন্তু একজন মুসলমানের ব্যয়ে ইহা প্রকাশ হইত। কয়েক মাস।

"শাস্ত্র প্রকাশ"—লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার (মাসিক) ১ বর্ষ।

"বিজ্ঞান সেবধি"—গঙ্গাচরণ সেন (ঐ) কিছুকাল।

"জ্ঞানসিন্ধু তরঙ্গ"—রসিককৃষ্ণ মল্লিক (ঐ) ঐ

"জ্ঞানোদয়"—রামচন্দ্র মিত্র (ঐ) ঐ

"পশ্বাবলী"— ঐ (ঐ) ঐ

সন ১২৩৯ সাল।

"সংবাদ রত্নাবলী"—সংবাদ প্রভাকর এই সময়ে প্রচার রহিত হইলে, আন্দুলের জমিদার জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিকের উদ্যোগে ইহা প্রকাশ হয়, এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তসম্পাদক হয়েন। ঈশ্বরচন্দ্র কটকে চলিয়া যাইলে, রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ইহার সম্পাদক হয়েন। এই সময়ে ইহা অর্দ্ধ সাপ্তাহিক হয়।

দুই বর্ষ পরে ইহার প্রচার রহিত হইলে,১২৫২ সালে শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহা প্রকাশ করেন। কিছুদিন পরে একেবারে উঠিয়া যায়। ৫ বর্ষ।

"সংবাদ সংগ্রহ"—বাগির সিমুলিয়া নিবাসী বেণীমাধব দে অন্যান্য সংবাদ পত্রের সার সংগ্রহ করিয়া ইহা প্রকাশ করেন। অল্পদিন।

সন ১২৪২ সাল।

"সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়"—প্রথমে প্রতি পূর্ণিমায় প্রকাশ হইত। ৪৩ সালে সাপ্তাহিক এবং কয়েক বর্ষ পরে দৈনিক হইয়া আজও জীবিত আছে। অদ্বৈত চন্দ্র আঢ্য এবং উদয় চন্দ্র আঢ্য ইহার প্রতিষ্ঠাতা। ইহার বর্ত্তমান অবস্থা শোচনীয়।

১২৪৩ সাল।

"সংবাদ সুধাসিন্ধু"—বটতলার কালীশঙ্কর দত্ত ১ বর্ষ।

১২৪৪ সাল।

"সংবাদ দিবাকর"—গঙ্গানারায়ণ বসু কয়েক মাস।

"সংবাদ গুণাকর"—গিরিশ চন্দ্র বসু ঐ

"সংবাদ সৌদামিনী—ইংরাজি ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় প্রকাশ হইত। কলুটোলার কালা চাঁদ দত্ত সম্পাদক ছিলেন ৩ বর্ষ।

সন ১২৪৫ সাল।

"সংবাদ মৃত্যুঞ্জয়ী"—পার্ব্বতী চরণ দাস কর্ত্তৃক ইহা বিজ্ঞাপন হইতে সংবাদ পর্য্যন্ত কবিতায় প্রকাশ হইত; নিম্নে উক্ত পত্র হইতে কয়পংক্তি উদ্ধৃত করা গেল;—

"আমাদের পত্রে যে বিজ্ঞাপন দিবে গো।
তাহার পংক্তির প্রতি মূল্য চারি আনা গো॥

"চারি ঘোড়ার গাড়ী চোড়ে গত দিন বৈকালে গো।
গিয়াছেন গবনর সাহেব চাণকের বাগানে গো॥"

"কলিকালে যত সব ভাল মানুষের ছেলে গো।
লেখা পড়া শিখে কেহ ধর্ম্ম কর্ম্ম মানেনা গো॥"

এখানি অতি অল্পকাল মাত্র জীবিত ছিল।

"সম্বাদ ভাস্কর"—সিমলের রাধাকৃষ্ণ মিত্রের চতুর্থ পুত্র জীবন কৃষ্ণ মিত্রের আনুকুল্যে শ্রীনাথ রায় ইহা প্রকাশ করেন। ১২৪৭ সালে শোভা-

বাজারের শ্রীযুক্ত মহারাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের হস্তে ইহার সম্পাদন ভার অর্পণ করেন। মহারাজ নিজেও ইহাতে লিখিতেন। ১২৫৪ সালে এখানি অর্দ্ধ সাপ্তাহিক হয়; পরে সপ্তাহে তিনবার প্রকাশ হইত। অনুমান ৯।১০ বর্ষ হইল এখানি উঠিয়া গিয়াছে।

"রসরাজ"—উক্ত ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "পাষণ্ড পীড়নের" সহিত ইহার লড়াই হইত। এখানিও অনেক দিন হইল উঠিয়া গিয়াছে।

"সংবাদ অরুণোদয়"—জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায়। কয়েক মাস।

"সংবাদ সুজন রঞ্জন"—হেরম্বচরণ মুখোপাধ্যায়। রসরাজের সহিত এই পত্রের লড়াই চলিয়া ছিল। ৬ বর্ষ।

১২৪৬ সাল।

"গবর্ণমেণ্ট গেজেট"—গবর্ণমেণ্ট—ইহার ভাষা আজিও দুর্ব্বোধ্য রহিয়াছে। এখনও জীবিত।

১২৪৭ সাল।

"মুরশিদাবাদ পত্রিকা"—কাশীম বাজারের মহারাজ কৃষ্ণনাথ ইহা প্রকাশ করেন, এবং গুরুদয়াল চৌধুরী সম্পাদকীয়তা করেন; একবর্ষ পরে ইহা উঠিয়া যায়। বহু বর্ষ পরে পুনরায় জীবিত হইয়া আজিও সাপ্তাহিক রূপে প্রকাশ হইতেছে। অবস্থা ভাল নহে।

"জ্ঞানদীপিকা"—ভগবতীচরণ বট্টোপাধ্যায় ২ বর্ষ।

১২৪৮ সাল।

"ভারতবন্ধু"—শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অল্প দিন।

১২৪৯ সাল।

"ভৃঙ্গদূত"—নীল কমল দাস। দেড় বর্ষ।

"বিদ্যা দর্শন"—স্বনামখ্যাত লেখক বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত এবং প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ ইহা প্রকাশ করেন। অর্দ্ধবর্ষ।

১২৫০ সাল।

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"—আদি ব্রহ্মসমাজ দ্বারা ইহা প্রকাশ হয়। বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত যতদিন ইহার সম্পাদক ছিলেন, ততদিন ইহার গৌরব ছিল। এখন বৃদ্ধ বয়সে নব রঙ্গীন বসনে তত্ত্ববোধিনী শরীর আচ্ছাদন করিলেও সে লাবণ্য আর দেখা যায় না।

১২৫১ সাল।

"সংবাদ রাজরাণী"—গঙ্গানারায়ণ বসু অল্পদিন।

"সর্ব্বরসরঞ্জিনী"—কতিপয় শিক্ষিত নব্য যুবক প্রভাকর যন্ত্রালয় হইতে ইহা প্রকাশ করেন। অল্পদিন।

১২৫৩ সাল।

"জগবন্ধু পত্রিকা"—সীতানাথ ঘোষ, ব্রজলাল কারফরমা এবং উমেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি হিন্দু কলেজের কতিপয় শিক্ষিত যুবক ইহা মাসিক প্রকাশ করেন। ২ বর্ষ।

"সত্য সঞ্চারিণী"—শ্যামাচরণ বসু দেড় বৎসর।

"পাষণ্ড পীড়ন"—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রভাকর যন্ত্রে ইহা প্রকাশ হয়। গুড়গুড়ে অর্থাৎ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের সহিত এই পত্র দ্বারা লড়াই হইত। ২ বর্ষ।

"সমাচার জ্ঞানদর্পণ"—উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য ৪ বর্ষ।

"জগদ্দীপক ভাস্কর"—মৌলবী বজর আলি নামে একজন মুসলমান ইহা প্রকাশ ও সম্পাদন করেন। ইহাতে ইংরাজি, বাঙ্গালা, হিন্দি এবং পারসীক ভাষায় প্রবন্ধ প্রকাশ হইত। অল্পদিন।

"নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা"—নন্দকুমার কবিরত্ন ইহা পাক্ষিক রূপে প্রকাশ করেন। ইহাতে হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ প্রকটিত হইত। ১০ বর্ষাধিক।

"জ্ঞানাঞ্জন"—চৈতন্যচরণ অধিকারী ৯ মাস।

"দুর্জ্জন দমন মহানবমী"—মথুরানাথ গুহ কিছুকাল।

১২৫৪ সাল।

"কার্য্যরত্নাকর"—উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য দেড় বর্ষ।

"হিন্দুধর্ম্ম চন্দ্রোদয়"—হরিনারায়ণ গোস্বামী (মাসিক) ১ বর্ষ।

"রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ"—রঙ্গপুরের মৃত জমীদার কালীচন্দ্র রায়ের ব্যয়ে গুরুচরণ রায় ইহা প্রকাশ করেন। কয়েক বর্ষ।

"জ্ঞান সঞ্চারিনী"—গঙ্গানারায়ণ বসু ৩ বর্ষ।

"সংবাদ সাধুরঞ্জন"—ছাত্র মণ্ডলীর কবিতা শিক্ষার সুবিধার জন্য ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত ইহা প্রকাশ করেন। প্রায় ১৫ বর্ষ।

"দিগ্বিজয়"—দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় অল্পকাল।

"সুজনবন্ধু"—নবীনচন্দ্র দে ঐ

"হিন্দুবন্ধু"—উমাচরণ ভদ্র কয়েক সপ্তাহ।

"আক্কেল গুড়ুম"—ব্রজনাথ বসু ৪ মাস।

"মনোরঞ্জন"—গোপালচন্দ্র দে অল্পদিন।

সন ১২৫৫ সাল।

"কৌস্তুভ"—মহেশচন্দ্র ঘোষ অল্পদিন।

"জ্ঞানচন্দ্রোদয়"—রাধানাথ বসু ২ মাস।

"জ্ঞানরত্নাকর"—ব্রজনাথ বসু ১ বর্ষ।

"সংবাদ অরুণোদয়"—পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ

"সংবাদ দিনমণি"—শম্ভুচন্দ্র মিত্র কয়েক সপ্তাহ।

"সংবাদ রত্নবর্ষণ"—মাধবচন্দ্র ঘোষ ঐ

"সংবাদ রসসাগর"—বাগবাজারের ৺ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহা প্রকাশ করেন। পদ্মিনী উপাখ্যান প্রভৃতির লেখক শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৫৭ সালে ইহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়া কয়েক বর্ষ জীবিত রাখিয়াছিলেন।

"মুক্তাবলী"—কালীকান্ত ভট্টাচার্য্য অল্পদিন।

সন ১২৫৬ সাল।

"বারাণসী-চন্দ্রোদয়"—উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য ৩ বর্ষ।

"রসমুদ্গর"—গুড়গুড়ের রসরাজের সহিত, লড়াই করিবার জন্য ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইহা প্রকাশ করেন। অল্পকাল।

"ভৈরব দণ্ড"—বারাণসীতে প্রকাশ হয়। ঐ

"রসরত্নাকর"—যদুনাথ পাল ঐ

"সজ্জনরঞ্জন"—গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত ঐ

"মহাজন দর্পণ"—জয়কালী বসু কয়েক মাস।

"কৌস্তুভ কিরণ"—রাজনারায়ণ মিত্র ৩ বর্ষ।

"বর্দ্ধমান জ্ঞান প্রদায়িনী"—বর্দ্ধমানের মহারাজের ব্যয়ে প্রকাশ হয় কয়েক বর্ষ।

"সত্যধর্ম্ম প্রকাশিকা"—গোবিন্দচন্দ্র দে ১ সংখ্যা।

সন ১২৫৭ সাল।

"সর্ব্বশুভকরী"—মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ৩ মাস।

"সত্যপ্রদীপ"—মিঃ টাউনশেণ্ড ১ বর্ষ।

"সংবাদ বর্দ্ধমান"—বর্দ্ধমানের মহারাজের সাহায্যে প্রকাশ হয়। কয়েক বর্ষ।

"বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয়"—রামতারণ ভট্টাচার্য্য কয়েক সংখ্যা।

"সংবাদ সুধাংশু"—মৃত ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইহা প্রকাশ করেন। ইহাতে কেবল খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ প্রকাশ হইত। ১ বর্ষ।

"উপদেশক"—পাদরি টমসন কয়েক বর্ষ।

"সত্যার্ণব"—পাদরি লং সাহেব ঐ

"সংবাদ নিশাকর"—নীলকমল দাস কয়েক বর্ষ।

"ধর্ম্মকর্ম্ম প্রকাশিকা"—কোন্নগরের ধর্ম্মসভা কর্ত্তৃক প্রকাশ হয় কয়েক সংখ্যা।

"ভক্তিসূচক"—রামনিধি দাস অল্পদিন।

"দূরবীক্ষণিকা"— • •

সন ১২৫৮ সাল।

"জ্ঞানোদয়"—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় কয়েক বর্ষ।

"জ্ঞানদর্শন"—শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় ১ সংখ্যা।

"কাশীবার্ত্তা প্রকাশিকা"—কাশীদাস মিত্র অল্পদিন।

"মেদিনীপুর ও হিজিলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ"—কতিপয় ইংরাজ ঐ

"বিবিধার্থ সংগ্রহ"—শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র। এইখানিই বাঙ্গালার প্রথম সচিত্র মাসিক পত্র। কয়েক বর্ষ।

"জ্ঞানারুণোদয়"—কেশবচন্দ্র কর্ম্মকার ঐ

"বিদ্যারত্ন"—তারাচরণ সিকদার অল্পদিন।

"সাম্যদণ্ড মার্ত্তণ্ড"—যুগলকিশোর শুকুল ঐ

সন ১২৫৯ সালে নিম্নলিখিত কয়খানি পত্র প্রকাশ হইয়া ঐ বর্ষেই লয়-প্রাপ্ত হয়;—

শশধর, বিশ্ববিলোকন, রসসাগর এবং ধর্ম্মরাজ।

সন ১২২২ সাল হইতে সন ১২৬০ সাল পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত ৯৬খানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশ হয়। ইহার মধ্যে ১২৬০ সালের ১লা বৈশাখ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত ১৯খানি পত্র জীবিত ছিল। যথা;—

দৈনিক।

(১) সংবাদ প্রভাকর, এবং (২) সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়।

সপ্তাহে তিনবার।

(৩) সম্বাদ ভাস্কর।

অর্দ্ধ সাপ্তাহিক।

(৪) রসরাজ, (৫) সংবাদ বিভাকর, এবং (৬) সমাচারচন্দ্রিকা।

সাপ্তাহিক।

(৭) সংবাদ সাধুরঞ্জন, (৮) রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ, (৯) বর্দ্ধমান জ্ঞান প্রদায়িনী, (১০) সংবাদ বর্দ্ধমান, (১১) সম্বাদ জ্ঞানোদয়, (১২) কাশীবার্ত্তা প্রকাশিকা, এবং (১৩) গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

পাক্ষিক।

(১৪) নিত্য-ধর্ম্মানুরঞ্জিকা, (ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়।)

মাসিক।

(ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়)

(১৫) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, (১৬) উপদেশক, এবং (১৭) সত্যার্ণব।

নানাবিষয়ক।

(১৮) বিবিধার্থ সংগ্রহ এবং (১৯) ধর্ম্মরাজ।

প্রাচীন সংবাদ পত্র সমূহের মধ্যে এক্ষণে কেবল নিম্নলিখিত তিনখানি সংবাদ পত্র জীবিত আছে;—

(১) সংবাদ প্রভাকর, (২) সমাচারচন্দ্রিকা এবং (৩) সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়। প্রাচীন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পত্রের মধ্যে কেবল তত্ত্ববোধিনীকে দেখিতে পাইতেছি।

---

# জড় জগতের বিকাশ।

পরমাণুগণের পরস্পর ঘনিষ্ঠতা ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে উহাদের গতির হ্রাস, এই দুইটি বিকাশের প্রধান লক্ষণ,—একমাত্র লক্ষণ বলিলেও চলে। তবে যে এই ঘনিষ্ঠতা কেবল মাত্র সরল ভাবে চলিতেছে এমত নহে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার জটিল ভাবের ঘনিষ্ঠতাও ঘটিতে থাকে; অর্থাৎ পরমাণুগণ যেমন পরস্পর সন্নিহিত হইতে থাকে, অনেক

স্থলেই সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন রূপ সমাবেশও ঘটিয়া পড়ে; বিকাশে যেমন পরমাণগণের পরস্পর দূরত্বের হ্রাস হয়, তেমনি অধিকাংশ স্থলেই তাহাদের সমাবেশেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। এই দূরত্ব-হ্রাস-জনিত, সরল-ঘনিষ্ঠতা-ঘটিত যেরূপ বিকাশ তাহাকেই সরল বিকাশ, আর সমাবেশের বৈচিত্রে যেরূপ বিকাশ তাহাকেই জটিল বিকাশ বলা যাউক। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, যে বিকাশ ও বিনাশ সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ঘটে না, দুই জড়িত ভাবে চলিতেছে।* তবে কখনও একের আধিপত্য, কখনও বা অন্যের। এখানেও সেইরূপ একটু বুঝিতে হইবে যে, সরল বিকাশ ও জটিল বিকাশ পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্ট হয় না। কোন পদার্থে বিকাশ-ক্রিয়া যে কেবলই সরল ভাবে চলিতেছে, কেবলই তাহার পরমাণুগণের পরস্পরের দূরত্ব কমিতেছে, আবার অন্য কোন পদার্থে বিকাশ কেবলই জটিল, কেবলই তাহার পরমাণু সমাবেশের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, এরূপ ব্যাপার ঘটে না। পদার্থের বিকাশকালে দুই প্রকারের বিকাশই জড়িতভাবে ঘটিতে থাকে, কম আর বেশী। তবে কেবল বুঝিবার সুবিধা হয় বলিয়াই, আমরা বিকাশের এই দুইটি রূপ পৃথক্ পৃথক্ পর্য্যালোচনা করিব। প্রথমে, সরল-বিকাশের কথাই পাড়া যাউক।

সমগ্র জগতের রূপ আমরা অল্পই জানি। অধিকাংশই অজ্ঞাত পড়িয়া রহিয়াছে। তথাচ মোটামুটি যে টুকু জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যেন নাক্ষত্রিক জগতে এই পারমাণবিক ঘনিষ্ঠতা রূপ একটা মহা ব্যাপার চলিতেছে। বিচ্ছিন্ন নক্ষত্র মণ্ডলী কোথাও সুদূর ব্যবহিত, কোথাও বা ঘন সমাবিষ্ট; আবার সে দূরত্বও নির্দ্দিষ্ট নহে,—অনির্দ্দিষ্ট দূরে থাকিয়া অগণ্য তারকামণ্ডলী জগতে বিরাজ করিতেছে। আবার, অনির্দ্দিষ্ট দূরে থাকিয়াই মণ্ডলান্তর্গত অগণ্য তারকাগণ মণ্ডল মধ্যে বিরাজ করিতেছে। এ ছাড়া, ঘন, বিরল, নানা প্রকারের নীহারিকা জগৎ-পটে দেখা যায়। সে গুলি দেখিতে কুহেলিকার মত বটে; তবে উহার মধ্যেই আবার কোনটি ঘন, কোনটি বা বিরল; কোনটি অধিক ঘন, কোনটি বা অল্প ঘন; কোনটি অধিক বিরল, কোনটী বা অল্প বিরল;—ঘনত্বের এইরূপ নানা ক্রম উহাদের মধ্যে লক্ষিত হয়। এই সকল দেখিয়া বোধ হয় যেন জগতে বিচ্ছিন্নতা ঘুচিয়া ক্রমশঃ একটা ঘনিষ্ঠতা ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে।

* নবজীবন, দ্বিতীয় ভাগ, ১৯ পৃষ্ঠা।

নাক্ষত্রিক জগতের অপেক্ষা সৌর জগতের কথা আমরা অধিক জানি। সৌর জগতে এই ঘনিষ্ঠতা-কাণ্ড আরও স্পষ্ট প্রতীয়মান্। সৌর জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি প্রসিদ্ধ মত এই যে, বিশাল বিস্তৃত ঘূর্ণ্যমান বাষ্পমণ্ডল ক্রমে ঘনীভূত হইয়া সৌর জগৎ হইয়াছে। কেবল যে সমগ্র সৌর জগৎটী ক্রমশই ঘনীভূত হইতেছে এমত নহে, সৌর পরিবারমণ্ডলীর প্রত্যেকেই, —গ্রহ, উপগ্রহাদি সকলেই—ঐরূপ ক্রমশ ঘনিষ্ঠতা প্রাপ্ত হইতেছে। সকল গ্রহ উপগ্রহকেই বিরল বাষ্পাকার হইতে, তদপেক্ষা ঘন বাষ্পাকার, তার পর তরল, তার পর কঠিন, এইরূপ অবস্থা পরম্পরা পরিগ্রহ করিতে হইয়াছে। এখনও কোনটি তরল, কোনটি কঠিন, কোনটি বাষ্পাকার দৃষ্ট হয়। সৌর জগতে ও সৌরজগতের পরিবারমধ্যে ঘনিষ্ঠতার এ নিদর্শন জাজল্যমান্। এ ছাড়া সৌরজগতের ঘনিষ্ঠতার আরও প্রমাণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সূর্য্য চতুর্দ্দিকে কিরণ বিকীরণ করিতেছে। এই বিকীরণে, এই তেজের হ্রাসে, সৌরপরমাণুগণের গতিহ্রাস হইতেছে; এবং তৎফলে তাহার পরমাণু সকলের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা সংঘটিত হইতেছে। তেজ বিকীরণে সৌর-দেহের সঙ্কোচ, ঘনিষ্ঠতার একটি স্পষ্ট প্রমাণ। আরও দেখ। গ্রহগণের প্রদক্ষিণ কাল ক্রমশই একটু একটু বেশী হইতেছে ইহা অনুমিত হইয়াছে; আর, ধূমকেতু গণের প্রদক্ষিণ কাল সম্বন্ধেও ঐরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। জ্যোতির্ব্বিদগণ এ কাল-বিলম্বের এই কারণ নির্দ্দেশ করেন যে আকাশ ক্রমশই ঘন হইতেছে, তাই গ্রহগণের ও ধূমকেতুগণের গতির ক্রমশ অধিকতর ব্যাঘাত, তাই তাহাদিগের প্রদক্ষিণ ক্রমশ বিলম্বিত। আকাশে এ ঘনিষ্ঠতা ধীরে ধীরে চলিতেছে।

সৌরজগৎ ছাড়িয়া আমাদের বাসভূমি এই পৃথিবীর কথা ভাবিয়া দেখ। ভূতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর ইতিহাসে সরল-বিকাশ অতি সুন্দররূপে উদাহৃত। প্রথমাবস্থায় সমগ্র পৃথিবী একটী বিশাল বিস্তৃত জলন্ত বাষ্প গোলক ছিল। এখন যাহা স্থল, জল, পাহাড়, পর্ব্বত প্রস্তর, মাটি, সকলই তখন তাপের তাড়নে দূরগতি-সম্পন্ন বাষ্পের আকারে ছিল। ক্রমে তেজের বিকীরণে গতির হ্রাস হইল; পরমাণু সকলের সমাহার হইতে লাগিল। জলীয়-বাষ্প. পরমাণু সমাহার নিবন্ধন বাষ্পাকার ত্যাগ করিয়া জলাকার ধারণ করিল,—পৃথিবী জলে প্লাবিত হইল।*

* এখনও বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প যৎকিঞ্চিৎ আছে, সে কেবল

পৃথিবী শীতল হইয়াছে বলিয়াই পৃথিবীতে জল। পৃথিবী তেজ বিকীরণ করিয়াছে বলিয়াই, সেই তেজ-হ্রাস-ফলে জলীয় বাষ্পের পরমাণুগণের ঘনিষ্ঠতা ও স্তূপীকরণ সম্পাদিত হইয়া জলের বিকাশ হইয়াছে। স্থল-বিকাশ সম্বন্ধেও ঐরূপ। জলন্ত অবস্থায় যে সকল স্থলীয় উপকরণ বাষ্পাকারে ছিল, বিকীরণ জন্য তাপের যখন হ্রাস হইতে লাগিল, তখন বাষ্পাকার সেই সকল স্থলীয় উপকরণের পরমাণুগুলি ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে যতই তেজের হ্রাস হইয়াছে, ততই সেগুলি অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইয়া তরলতম অবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান এই কঠিনাকার ধারণ করিয়াছে। * এখন যাহা শীতল ও কঠিন ভূমি, পূর্ব্বে তাহা তপ্ত ও দলদলির মত নরম ছিল; তাহার পূর্ব্বে আরও তপ্ত ও তরল ছিল, এবং তাহারও পূর্ব্বে অগ্নিময় বাষ্পাকার ছিল। তেজের হ্রাসে পরমাণুর ঘনিষ্ঠতা হইয়া বাষ্প এখন মাটি হইয়াছে,—পৃথিবী দাঁড়াইবার স্থল হইয়াছে। শীতল হওয়ায় পৃথিবীর আরও রূপান্তর হইয়াছে। তাপক্ষয়ে কঠিনস্তরের সঙ্কোচ, ঘটিয়াছে; আর সেই সঙ্কোচেই কোন স্থান উচ্চ, কোন স্থান নিম্ন। সঙ্কোচে, ঘনিষ্ঠতায় পৃথিবীর উপরিস্তরের এই উঁচু নিচু আকার। এ সকল ছাড়া, পৃথিবী-পৃষ্ঠে স্থানীয় অবান্তর ঘনিষ্ঠতা অনেক ঘটিয়াছে। এই অবান্তর ঘনিষ্ঠতা হইতেই বড় বড় দ্বীপের উদ্ভব, বিশাল মহাদেশের বিস্তার, পলিময় স্তরভূমির বিন্যাস।

আমরা এখন কেবল বিকাশের সরল ভাব টুকু দেখিতেছি। বস্তুত ইহার সহিত জড়িত জটিল ভাবই বেশী। কেবল সরল ভাবটুকু দেখিলে খুব মোটামুটি দেখা হয় মাত্র। কিন্তু এই মোটামুটি দেখাই আগে চাই। জড় জগতের বিকাশের জটিল ভাবটি পরে দেখা যাইবে।

---

সূর্য্যের তাপেরগুণে। নতুবা, হয় ত এতদিনে বায়ুমণ্ডল একেবারে জলীয় বাষ্পহীন নীরস হইয়া যাইত।

* পরিধি হইতে কেন্দ্র পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবী কঠিন হইতে পায় নাই, সে কেবল উপরিতন স্তরের কাঠিন্য প্রযুক্ত। উপরিভাগ হইতেই অবশ্য অধিক তেজ বিকীরিত হইয়াছে; তাই ভিতর অপেক্ষা উপর অধিক শীতল হইয়া পড়িয়াছে। উপরের স্তর আগেই কঠিন হইয়া ভিতর হইতে তেজ বিকীরণের ব্যাঘাত দিয়াছে। অন্তর—স্তর হইতে বেশী তাপ বিকীরিত হয় নাই; উহা এখনও উত্তপ্ত, জলন্ত; এখনও তরল, অগ্নিময়।

# সুখ ও শোক।

"যাও যাও সখি মাধব পাশে
শ্যামক আনহ ডাকি,
কহিও বনময় ফুটল ফুলদল
গায়ত শত শত পাখী।
কহিও সারা জগত হরখ-ময়
হাসত উনমদ প্রাণে,
দুঃখিনী রাধা— হাসব হরখে
হেরয়ি তছু মুখ পানে।
ভরমিব দুঁহু মিলি সারা বনময়
মোহন যমুনা তীরে,
মাতল মানস আকুল ভইবে
অতি মৃদু মন্দ সমীরে।
নীরব রাতে ধীর ধীর অতি,
বাঁশী বাজাওবে শ্যাম,
উলসিত ফুলদল পুলকিত যমুনা
জাগবে কানন ধাম।"

এ গান সুখের। সুখ, সোহাগ-সারঙের সুর সপ্তমে চড়াইয়া প্রেমের গান ধরিয়াছেন। ভালবাসা, আশার সঙ্গে আঁচলে আঁচল বাঁধিয়া সুখের পিছুপিছু ছুটিয়াছে। এমন ছুট ছুটিয়াছে,—যে রূপসৌন্দর্য্যের পিন্ধন-বাস প্রায় বক্ষ-চ্যুত, কুন্তল-গুচ্ছ কবরীর কক্ষ-চ্যুত;—একে অপরকে হারাইয়া উড়িয়া উড়িয়া কি জানি কেমন এক মোহকরী সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতেছে। সুখের হৃদয়ে দুঃখের লেশমাত্র নাই। তাঁহার মরমে মলয়ানিল ছুটিয়াছে, মল্লিকা যুঁই ফুটিয়াছে, আর সেই ফুটন্ত ফুলগুলির উপর, ততোধিক ফলের মুঞ্জরীগুলির উপর, মধুকর নিকর, আসিয়া জুটিয়াছে; মাথা কুটিয়া মধু লুটিবার ফিকিরে আছে। সুখের হৃদয়রূপ নিকুঞ্জে ঘন ঘন কোকিল ডাক্‌ছে, অনুরাগ সরোবরে বিলাস রস উথলে পড়েছে। সুখ প্রেমভরে "ঢল ঢল বিহ্বল প্রাণ;" আহা সুখের কাছে এখন—

নিখিল জগত জনু হরখ-ভোর ভরি
গাওই প্রেমক গান।

সুখ, এই অনুপম সঙ্গীতের সুরে গলা মিলাইয়া "উনমদ প্রাণে" গাই-তেছেন।

যাও যাও সখি মাধব পাশে,
শ্যামক আনহ ডাকি।

কেননা এমন হর্ষের দিনে সুখের আরও সুখকর, আরও প্রিয়তর পদার্থ চাই। নহিলে সুখ ষোল-আনা হয় না। কাজেই সুখ সখী মারফতে বলিয়া পাঠাইতেছেন—

কহিও সারা জগত হরখময়
হাসত উনমদ প্রাণে,
দুঃখিনী রাধা হাসব হরখে,
হেরয়ি তছু মুখ পানে।

এই "তছু মুখ পানে" সুখের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপ। প্রেমের অতি পবিত্র মূর্ত্তি। এত সুখের মধ্যেও সেই মুখখানি নহিলে সুখ সুখী হইতে পারিবেন না। কেবল সেই মুখখানি পাইলেই সুখ হরখে হাসিতে পারিবেন, নচেৎ নহে। পরন্তু সেই মুখখানি মনে পড়িতেই সুখের প্রাণে যুগপৎ কতই না সাধ উঠিতেছে। কখনও 'দুঁহু মিলি সারা বনময়" ফিরিবেন। কখনও গলাগলি হইয়া "মোহন যমুনা তীরে" ভ্রমিবেন। আর সেই 'নীরব রাত্রে' শ্যামের ধীর - অতি ধীর—বংশীধ্বনি শুনিবেন। কি করিবেন কি না করিবেন—সুখ, ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এক কথায়,- সুখ শশব্যস্ত।

উপরেরটি গভীর রাত্রে সুখের গান। নীচেরটি গভীর রাত্রে শোকের গান;—

From short (as usual) and disturbed repose
I wake: how happy they who wake no more!
Yet that were vain, if dreams infest the grave.
I wake emerging from a sea of dreams
Tumultuous; where my wrecked desponding thought,
From wave to wave of fancied misery

At random drove, her helm of reason lost ;
Though now restored, 'tis only change of pain
(A bitter change !) severer for severe.
The day too short for my distress ; and night,
E'en in the zenith of her dark domain
Is sunshine to the colour of my fate.

ভাঙ্গিল সে কাক-নিদ্রা দুঃস্বপ্ন জড়িত ;
আর না ভাঙ্গিলে পরে, কি সুখী হতাম ;—
শ্মশানে স্বপন যদি ; সুখ কোথা তায় !
ভীষণ দুঃস্বপ্ন সিন্ধু ভেদি উঠিলাম,—
হতাশে বিচূর্ণ মন মানস তরণী
হারায়ে জ্ঞানের হাল, হালচাল হয়ে,
কল্পনা-প্রসূত শত কষ্টের তরঙ্গে
উঠিতে পড়িতে ছিল, এ দিকে সে দিকে ;
যদিও সুস্থির এবে, এই জাগরণে,
ততোধিক নিদারুণ এ পরীবর্ত্তন !
সারা দিবা ভোগে কেশ পর্য্যাপ্ত না হয়।
করাল রাত্রির সেই তামসী বিভীষা,
পোড়া ভাগ্য তুলনায় দিবা-বিভময়ী।

পুনশ্চ—

Night, sable Goddess ! from her ebon throne,
In rayless majesty now stretches forth,
Her leaden sceptre o'er a slumbering world.
Silence how dead ! and darkness how profound ;
Nor eye nor listening ear, an object finds ;
Creation sleeps. 'Tis as the general pulse
Of life stood still, and nature made a pause ;
An awful pause ! prophetic of her end.
And let her prophecy be soon fulfilled
Fate! drop the curtain ! I can lose no more !

মহাকালী তমস্বিনী, কৃষ্ণাজিনে বসি,
বিভাহীন মহিমায় বিরাজিছে এবে,
শাসিছে করাল দণ্ডে সুষুপ্ত জগতে।
নির্ব্বাণ-নীরব বিশ্বে গভীরান্ধকার!
চক্ষু কর্ণ গ্রাহ্য কোন বস্তু মাত্র নাই।
বিশ্ব সুপ্ত; নাড়ী হীন, হিম কলেবর।
চলৎ জগৎ হয়ে, হঠাৎ অচল
ভবিষ্য প্রলয়চ্ছবি বিকাশ করিছে!
এ বিশ্ব বিলীন হোক, হোক সে প্রলয়!
ক্ষান্ত রে অদৃষ্ট! আর, সহ্য নাহি হয়।

ইহা শোকের হৃদয়ভেদী, মর্ম্মান্তস্পর্শী—রোদন। শোক হৃদয়ে করাঘাত করিয়া আর্ত্তস্বরে কাঁদিতেছেন। গভীর রাত্রে উঠিয়া নিভৃতে নির্জ্জনে নিবিড় নিস্তব্ধতার মধ্যে অন্ধকারের ছায়ায় বসিয়া অশ্রুপাত করিতেছেন। শোকের এই ক্রন্দন—আর ক্রন্দনকে সংগীত বলা যদি একান্তই অন্যায় না হয়,—এই সংগীত—নিতান্ত নিদারুণ। কেবল নিদারুণ নয়, ইহা শ্মশানিক। এ সংগীতের সাংঘাতিক স্বর শুনিবা মাত্র শরীর সিহরে, প্রাণ কাঁপিয়া উঠে।

শোক সহসা সুপ্তোত্থিত। ইহা শোকের সুপ্তি। সুখের সুপ্তির ন্যায় এ সুপ্তিতে তৃপ্তি নাই, স্বাস্থ্য নাই, গাঢ়তা নাই, জীবনীশক্তি নাই। এ সুপ্তি অপ্রফুল্ল, বিষণ্ণ. ক্ষণ-মাত্র-স্থায়ী এবং সাংঘাতিক স্বপ্নময়ী। এ সুপ্তিতে যে একটু বিস্মৃতি আছে, তাহাও বিষাক্ত। এই অতৃপ্তিকর সুপ্তি ক্ষণেকের জন্য শোকের আঁখি দুটি অধিকার করিয়াছিল। শোক ক্ষণিক বিস্মৃতিতে আত্মহারা হইয়া স্বপ্ন-সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে কখনও ডুবিতেছিলেন, ক্বচিৎ ভাসিতেছিলেন। আচম্বিতে সুপ্তি ছুটিয়া গিয়াছে। শোক সহসা সুপ্তোত্থিত। বিস্মৃতির বন্দর হইতে পুনরায় স্মৃতির সাম্রাজ্যে উপস্থিত। স্মৃতি কর্ত্তৃক নিদারুণ নিপীড়িত—আক্রান্ত। শরীরের সহিত প্রাণের মর্ম্মান্তিক কথা যুগপৎ জাগিয়া উঠিয়াছে। বুকের ভিতর গুড়্ গুড়্ দুড়্ দুড়্ করিতেছে। মর্ম্মের উপর সঘনে সূচ্ ফুটিতেছে। সমগ্র সংসার শূন্যময়,—নিবিড় আঁধারে আবৃত। শোক ব্যাকুল হইয়া কাঁদিলেন,——

How happy they who wake no more!

কি সুখী তাহারা, চির সুপ্ত যারা
জাগে না জীবন যাদের আর।

স্মৃতি তখন আবার চাপিয়া ধরিল। বিষম বিভীষিকাপূর্ণ স্বপ্নপূর্ণ অতৃপ্তি-কর সেই কাকনিদ্রা টুকুর কথা মনে পড়িল। চিরসুপ্তির ক্রোড়ে শয়ন করিয়া, এ যাতনা হইতে পরিত্রাণ পাইবেন, এরূপ একটু কল্পনা ঈষন্মাত্রায় চকিতে অজ্ঞাতে মনে উঠিতেছিল,—তৎক্ষণাৎ উঠিতে না উঠিতে তাহার মূলে কুঠারাঘাত হইল। আশার ঈষন্মাত্র আলোক-ছায়া কাছে আসিবার উপক্রম করিতে না করিতেই অন্তর্হিত হইল। শোক স্মৃতিপীড়িত সন্দিগ্ধ আতঙ্কিত হইয়া আবার কাঁদিলেন—

Yet that were vain if dreams infest the gave.

শ্মশানে স্বপন যদি সুখ কোথা তায়!

দিনের পর রাত্রি, আলোকের পর আঁধার, জাগরণের পর নিদ্রা, আসি-তেছে, যাইতেছে, আবার আসিতেছে। নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন প্রবাহ সম-ভাবে চলিয়াছে। শোকের প্রাণের সেই গুরুভার কিন্তু অটল। সন্তপ্তহৃদয় অহর্নিশি সমান জ্বলিতেছে। নিরাশ অন্ধকার সেই একই ভাবে জীবনের দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। রাত্রে দিনে পার্থক্য নাই। ইহাদের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, যাতনারই ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি—কঠিন হইতে কঠিনতর মূর্ত্তি—উদিত হইতেছে। শোক কাঁদিতেছেন, কাঁদিয়া স্বকীয় দিবারাত্রের পরিচয় দিতেছেন—

The day too short for my distress; and night,
E'en in the zenith of her dark domain
Is sunshine to the colour of my fate.

সারা দিবা ভোগে ক্লেশ পর্য্যাপ্ত না হয়,
করাল রাত্রির সেই তামসী বিভীষা,
পোড়া ভাগ্য তুলনায়, দিবা-বিভাময়ী।

ইহা ভয়ানক। মনুষ্য যাতনার অত্যন্ত জীবন্ত চিত্র। নিরাশার তীব্র তীক্ষ্ণ প্রতিকৃতি। শোকের মূর্ত্তিমান রূপ। দিনমান ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র, শোকের সুদীর্ঘ যাতনা ধারণ করিতে অসমর্থ,—আর ঐ যামিনী,—ত্রিযামা তামসময়ী যামিনী! শোকের অদৃষ্ট লিপির কালিমাময় বর্ণের তুলনায়,

গম্ভীরা যামিনীর ঐ নিবিড়তম, আঁধারতম অন্ধকাররাশি পরিষ্কার দিবালোক সদৃশ।

শোক কোথাও একবিন্দু জুড়াইবার জায়গা,—লুকাইবার স্থান—পাইতেছেন না। দিবারাত্রি নিদ্রা জাগরণে, আকাশ-পাতাল-পৃথিবী, সকলই যেন তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে;—অথচ গ্রাস করিতেছে না। শোকে অধীর, অস্থির, ব্যাকুল। প্রচণ্ড হইয়া কখনও আপনার মাংস আপনি টানিয়া টানিয়া ছিঁড়িতেছেন। কখনও নীরবে আপনার হৃদয় আপনি কুরিয়া কুরিয়া খাইতেছেন।

শোক অবসন্ন, মুহ্যমান। আপনার ভারে আপনি প্রপীড়িত। অস্থির অধীর,—আবার অতিশয় স্থির ও গম্ভীর। সে গাম্ভীর্য্য অতলস্পর্শী।

সুপ্তোত্থিত শোক সেই নিশীথ সময়ে একবার জগতের নাড়ী টিপিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, প্রায় নাড়ী নাই। প্রকৃতি নিদ্রিত, সমগ্র সংসার সুষুপ্ত। কালিমাময় আঁধার—আর করাল নিস্তব্ধতা—কেবল জাগিতেছে। কালরজনী স্বীয় কর বিস্তার করিয়া যেন সুপ্ত পৃথিবীকে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন।

শোক, বোধ করি, এইখানে স্বকীয় হৃদয়ের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য পাইলেন। ভাবিলেন ইহা মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বলক্ষণ বটে। কাতর প্রাণে, গম্ভীরস্বরে ভবিতব্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন।

Fate ! drop the curtain ; I can lose no more.

ক্ষান্ত রে অদৃষ্ট ! আর সহ্য নাহি হয় !

অহো শোক ! ভবিতব্য যে "অচল অটল" !

আর অধিক বিশ্লেষ করিয়া, চঞ্চল লেখনীদ্বারা শোক সংগীতের অসাধারণ গাম্ভীর্য্য ও বিশাল সৌন্দর্য্যের উপর আঘাত করিব না। শোকের পবিত্র ছায়া স্পর্শ করিয়া তাহার প্রগাঢ় ধ্যান ভঙ্গ করা কর্ত্তব্য নহে।

এখন আর একটি সুখের গান ;——

বধুঁয়া, হিয়া পর আও রে,
মিটি মিটি হাসয়ি, মৃদুমধু ভাষয়ি,
হমার মুখপর চাও রে !
যুগ যুগ সম কত দিবস বহিয়ে গল,
শ্যাম তু আওলি না,

চন্দ্র-উজর মধু মধুর কুঞ্জপর
মুরলি বজাওলি না!
লয়ি গলি সাথ বয়ানক হাস রে,
লয়ি গলি নয়ন-আনন্দ!
শূন্য বৃন্দাবন, শূন্য হৃদয় মন
কথি ছিল ও মুখ-চন্দ?
ইথি ছিল আকুল গোপ নয়ন জল,
কথি ছিল ও তব হাসি?
ইথি ছিল নীরব, বংশীবট তট,
কথি ছিল ও তব বাঁশী।
আওলি যদি রে ঠারলি কাহে,
সরমে মলিন বয়ান!
আপন দুঃখ কথা কছু নহি বোলব
নিয়ড় আও তুঁহু কান!
তুয়া মুখ চাহয়ি শত-যুগ-ভর দুখ
নিমিখে ভেল অবসান।
এক হাসি তুয়া দূর করল রে
সকল মান অভিমান!

এ সংগীতের সুকুমার সৌন্দর্য্য, পাঠক তাঁহার সুকুমার হৃদয়ের মধ্যেই সম্ভোগ করুন। আমাদের কর্কশ করস্পর্শে ইহার কুসুমাদপি কুসুম কমনীয়তা দলিত করিতে আমরা নারাজ।

বিচ্ছেদের পরেই পূর্ণমিলন। এ সংগীতের সুখ বড় সহজ পাত্র নহেন। এ দুঃখের পর সুখ। দুই হস্তে নন, চারি হস্তে তিনি মূর্ত্তিমান। সুখ এখানে স্বাধীনভর্তৃকা। প্রেম-পুষ্পকে, ডাগর এন্‌জিন্ চড়াইতেছেন। আবার বিনাইয়া বিনাইয়া, কতই না বিনাইয়া বিচ্ছেদের বিষাদ কাহিনী বিবৃত করিতেছেন; আর এতদিন এসুখ, এতসুখ—'কোথা' ছিল,—কেমনে ছিল, কোথায় কি করিতেছিল, ছলছল চক্ষে, টল টল বক্ষে, সহস্র কণ্ঠে শতবার তাই শুধাইতেছেন;

ইথি ছিল গোপ নয়ন জল,
কথি ছিল ও তব হাসি,

ইথি ছিল নীরব বংশীবটতট,
কথি ছিল ও তব বাঁশী!

কিন্তু বিচ্ছেদ কাহিনীতে কি আর এখন বিষাদ আছে? বিষাদের বিষ দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বিচ্ছেদের সে বিষাদ এখন সাধে, অদর্শনের সে দুঃখ এখন সুখে—পরিণত। পরশ-মণিস্পর্শে সব সোনা হইয়া গিয়াছে। অতীতের দুঃখ কাহিনীর বিবৃতিতেও এখন পরম আনন্দ।

সুখ একটু আক্ষেপ করিয়া কিন্তু বড়ই আদর আর আবদার করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে ইষৎ অভিমানের বাতাস তুলিয়া বলিতেছেন,—

যুগ যুগ সম কত দিবস বহয়ি গল
শ্যামতু আওলি না,
চন্দ উজর মধু-মধুর কুঞ্জপর
মুরলি বজাওলি না!

ছি ছি এমনও করে! তা এখন

আওলি যদি রে ঠারলি কাহে,

তা বটে ত। যা হবার হয়েছে। তা বলে, লজ্জা কিসের? কাছে এস,—

বঁধুয়া হিয়া পর আও রে
মিটি মিটি হাসয়ি, মৃদু মধু ভাষয়ি
হমার মুখ পর চাও রে।

ঠিক। ইহাকেই বলে ত সুখ।

পুনশ্চ একটি শোকের গান শুনুন!

Sweet harmonist! and beautiful as sweet!
And young as beautiful! and soft as young!
And gay as soft! and innocent as gay!
And happy (if ought happy here) as good!
For fortune fond had built her nest on high,
Like birds, quite exquisite of note and plume,
Transfixed by fate (who loves a lofty mark,)
How from the summit of the grove she fell,
And left it unharmonious! all its charm
Extinguished in the wonders of her song;

Her song still vibrates in my ravished ear,
Still melting there, and with voluptuous pain
(O to forget her !) thrilling through my heart !
Song, beauty, youth, love, virtue, joy ! this group
Of bright ideas, flowers of paradise,
As yet unforfeit ! in one blaze we bind,
Kneel and present it to the skies, as all
We guess of heaven ; and these were all her own ;
And she was mine ; and I was—was !—most blest——
Gay title of the deepest misery !

* * * * *

O the soft commeree ! O the tender ties,
Close twisted with the fibers of the heart !
Which broken, break them, and drain off the soul,
Of human joy, and make it pain to live.—
And is it then to live ? when such friends part,
'Tis the survivor dies,—my heart ! no more.

(কিবা লয়, কিবা মিল, মরি কি সুস্বর।)
মধুর মিলনী মরি, মধুরে সুন্দর !
সুন্দরে কিশোরী সেই, কিশোরে কোমলা,
কোমলে প্রফুল্ল ফুল, প্রফুল্লে সরলা।
যদি কেহ সুখী থাকে এ মর্ত্ত ভুবনে ;
পবিত্র চরিত্রে সেই সুখিনী জীবনে।
যতনে সৌভাগ্য তারে অতি উচ্চে রাখে ;
সুবর্ণ সুন্দর পাখী যথা উচ্চে থাকে ;
দুর্ভাগ্যের দূর লক্ষ্য, তাহারে বিঁধিল,
কুঞ্জ তরু শিরহতে, ভূতলে পড়িল।
থামিল কুঞ্জের গান, ঘুচিল সে শোভা ;
জুড়াল সে কলস্বর জগ-মনো-লোভা ;
মুগ্ধ মম কর্ণে কিন্তু লাগে সেই তান

হিয়ায় আকুল হই—প্রাণে আন চান।
কেমনে ভুলিব তারে, ভুলিব রে হায়!
কুসুম-অশনি-পাত লাগিছে হিয়ায়।
সুন্দর সৌন্দর্য্য, আর বয়স-লাবণ্য
প্রীতি, পুণ্য, আনন্দের, সমষ্টি সে ধন্য;
স্বর্গের কুসুমগুলি,—নর ব্যবহার
করে নাই কলুষিত,—গুচ্ছ করি তার,
জোড় জানু-ভূমি ন্যস্ত জোড়হস্ত বুকে
উৎসর্গ করিয়াছি স্বর্গ অভিমুখে;
কত গুণ ছিল তার, সে ছিল আমার,
আমার আছিল—ছিল,—আনন্দ অপার,
তখন—তখন—ছিল,—আছিল রে সুখ,
ঐ রূপে বলিতে হয়, এ গভীর দুখ।

* * * * *

মধুর মিলন মরি, কোমল বন্ধন!
মর্ম্মগ্রন্থী সঙ্গে তার, সুদৃঢ় গ্রন্থন।
ছিঁড়িল বন্ধন যবে, ছিঁড়ে মর্ম্ম মূল,
বাহিরিলি সুখস্রোত হইয়া আকুল,
রহিল দুখের ভাগ—মর্ম্মে লাগি তায়,
বাঁচিয়া কেবল তার দুখ সহা যায়।
বাঁচিয়া? বাঁচিয়া কই? সঙ্গিনী বিহীনে,
যে থাকে, সেইত মরে,——আর না,—পারি নে।

শোকের এ ক্রন্দন অতি কোমল—অতি করুণ। করুণ কিন্তু নিদারুণ। যে স্মৃতি—যে সুখের স্মৃতি দ্বারা শোক নিপীড়িত—মর্ম্মাহত, সেই স্মৃতিরই আবার তিনি উপাসক। যে স্মৃতিতে কেবল কাঁদায়, যে স্মৃতিতে প্রাণ পাগল করে, হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া লয়, যে স্মৃতির সামগ্রী শ্মশানে শায়িত, ইহ সংসারে অস্তিত্ব মাত্র বিবর্জ্জিত, যে স্মৃতি কেবল কাঁদায় আর যাতনা জাগায়, শোক স্বতই সেই স্মৃতির, সেই দুরূহ দারুণ স্মৃতির আন্দোলন আলোচনা অর্জ্জনা উপাসনা করিতেছেন। নাড়িয়া চাড়িয়া ঘুবাইয়া

ফিরাইয়া নানা ভাবে, নানা মূর্ত্তিতে সেই স্মৃতির চিত্র হৃদয় পটে উদিত করিয়া ধারণ করিতেছেন।

যাহাতে কেবল যাতনা, তাহার এত আলোচনা কেন? এইজন্য,—যে যাতনা-দায়ক বস্তু—দুর্জয়। শোকত বলেন স্মৃতি দূর হও। আশা শূন্য, আনন্দ শূন্য স্মৃতি—দূর হও।

Turn hopeless thought! turn from her;

ফিরে এসো নিরাশা রে প্রিয়া-চিন্তা ছাড।

কিন্তু স্মৃতি-স্রোত—অতীতের চিন্তা প্রবাহ—কি বাধা মানে? বাধা পাইলে দু'কুল ভসাইয়া দ্বিগুণ বেগে ছুটে।

———— ————Thought repelled
Resenting rallies and wakes every woe,

ব্যাহত হইলে চিন্তা দ্বিগুণিত হয়,
শিরে শিরে শির তুলে দুঃখ সমুদয়।

সেই জন্যই কি তবে, যাতনার জ্বালা কমাইবার জন্যই কি তবে,—

Each tear mourns its own distinct distress.

প্রতি অশ্রু কেঁদে বলে, আপন যাতনা।

—স্মরণ, আন্দোলন, অশ্রু-বিসর্জ্জন! সেই জন্যই কি তবে শোক বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদে?

এই এক কারণ বটে। তবে আর এক কারণও আছে। কারণ এই যে আগুণ যেমন পোড়ায়, তেমনি একটু জুড়ায়ও বটে। আগুণ যাহাকে পোড়ায় কেবল তাহাকেই জুড়ায়।

সুখ দুঃখের স্মৃতিতেও সুখী। শোক সুখের স্মৃতিতেও মর্ম্মাহত। তাই এক জনের নাম সুখ, আর এক জনের নাম শোক।

তবে অগ্নির শীতলতার ন্যায়, যাতনার মধ্যেও এক প্রকৃতির সান্ত্বনা আছে। শোচনার মধ্যেও এক প্রকার শান্তি আছে। যাতনা ও শোচনা মন্থন দ্বারা সান্ত্বনা ও শান্তি পাওয়া যাইতে পারে। সে সান্ত্বনা —সে শান্তি কিরূপ—কেহ কাহাকে বুঝাইতে পারে না, যেহেতু তাহা স্বত বুঝিবারই বিষয়,——বুঝাইবার নয়। তাহা অনেকাংশে বুদ্ধি বাক্যের অতীত। ফল কথা শোকের মধ্যেও এক প্রকৃতির সুখ আছে, কিন্তু তাহার

সাহচর্য্য বা জ্ঞাতিত্ব এ সংসারের সুখ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয় না। অতএব তাহাকে সুখ নামে অভিহিত না করিলেও চলে। না করাই ভাল।

শোক সুখের বিপরীত কক্ষে অবস্থিত। শোকের বাস শ্মশানে, সুখের বাস সংসারে। শ্মশানে সংসারে—সুমেরু কুমেরু ভেদ।

সুখের সহচর বিলাস, পরিণাম শোক; শোকের সহচর বৈরাগ্য, পরিণাম শান্তি। সুখ,—মোহ। শোক,—শান্তি।

শোক সুখ চায়, শোককে সুখ চায়না; কিন্তু সুখ শোক পায়।

সুখ চাঞ্চল্য, শোক গাম্ভীর্য্য; সুখ আশা, শোক নিরাশা। সুখ ইহকাল, শোক পরকাল। শোকের মধ্যে পরকালের আশা। সুখ ইহকালে আলোক; শোক আঁধার, যেহেতু পরকাল চর্ম্ম-চক্ষের অগোচর।

সুখ মনোহর, শোক ভয়ঙ্কর। সুন্দর উভয়েই বটে। দৃষ্টি ভেদে সৌন্দর্য্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ ভেদ মাত্র। সুখ সুরা। শোক সুধা। উন্মত্ত উভয়েই করে। তবে সুরায় তৃষ্ণা বাড়ায়, সুধায় তৃষ্ণা কমায়।

সুখ শীতল করিয়া উন্মত্ত করে, শোক উন্মত্ত করিয়া শীতল করে। সুখ জুড়াইয়া পোড়ায়, শোক পোড়াইয়া জুড়ায়। সুখ ভ্রম করে। শোক সংশোধন করে। সুখ লালসার সঙ্কলন। শোক তাহার ব্যবকলন। সুখ সংসারকে সংযোগ করিয়া ভগবানকে বিযোগ করে। শোক সংসারকে বিযোগ করিয়া ভগবানকে যোগ করে।

সুখ বাঁশী বাজাইয়া গভীর রজনীর নিস্তব্ধতা নষ্ট করে, শোক সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে অদৃষ্টলিপির অস্পষ্ট অক্ষর পাঠ করিয়া অবাক হয়।

সুখ, জন কোলাহল। শোক—নিভৃত নিরালয়।

সুখ হাট। শোক মঠ। হাটে লোকে দেখে দেখায়, বেচা কেনা করে। মঠে লোকে ধর্ণা দেয়, ধেয়ায়, পূজা অর্চ্চনা করে।

সুখ, সংসারী. শোক, সন্ন্যাসী। সুখ, ভোগী। শোক, যোগী। সুখ, আবিলতা। শোক, পবিত্রতা। প্রয়োজনীয়তা উভয়েরই আছে। এ সংসারে সুখের যদি আবশ্যকতা থাকে, শোকের আবশ্যকতা আরও অধিক আছে।

Blessed are they that mourn,

যে দুঃখ করে, সেই সুখী।

এটি সন্ন্যাসীর কথা।

How wretched is the man who never mourned;
I dive for precious pearl in sorrow's stream.

যে কখন কাঁদে নাই, কি অভাগে সে;
দুখের সাগরে ডুবি সুখ রত্ন আগে।

এটি শোক সন্তপ্ত কবি-হৃদয়ের কথা। দুইই এককথা;—অতি গভীর, নিগূঢ়, যথার্থ কথা। সন্তাপ-অগ্নি-পরীক্ষিত হৃদয়ই প্রেমের প্রশস্ততা দেখিতে পায়। শোকের শোধন-যন্ত্রে সংস্কৃত না হইলে, প্রণয়ের পবিত্র সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয় না। স্নেহের অনুপম মাধুর্য্য বিকশিত হয় না। পরন্তু শোক মানুষকে পশুভাব হইতে দেব-ভাবে লইয়া যায়। সংসার হইতে স্বর্গের দিকে টানে। এ সকলই স্বীকার্য্য;—এ সকলই সত্য। শোকের অত্যন্ত উপকারিতা আছে। আবশ্যকতা আছে। কিন্তু সে আবশ্যকতা উপকারিতা অনুভব করিতে—কল্পনা করিতেও—মনুষ্য হৃদয় স্বত সিহরে কেন?

জীবনের সহিত দেহের বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী; নিত্য প্রত্যক্ষ ঘটনা। অথচ জীবন গ্রন্থি ছেদের কথা মনে হইলেই মানুষের প্রাণ আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠে। মানুষ ইহা স্বভাবতই যেন ধারণ করিতে, সহ্য করিতে, অসমর্থ। ইহার তাৎপর্য্য কি? তোমার নিকট ইহার অনেক উত্তর অনেক ব্যাখ্যা আছে, আমি জানি। বৈজ্ঞানিক দার্শনিক কাল্পনিক শাস্ত্রীয় অশাস্ত্রীয় অনেক ব্যাখ্যা তোমার নিকট আছে, সে সব ব্যাখ্যা আমি অনেক বার শুনিয়াছি। কিন্তু শুনিয়া তেমন তৃপ্তি লাভ করি নাই। তুমি যাহা বল, তাহা ছাড়া যেন আরও কিছু আছে আছে বলিয়া ঠেকে। সেই কিছু টুকুর কথা কেহই বলেন না। বোধ করি এখানকার কেহই জানেন না। কেবল তিনিই জানেন।

দেহের সহিত আত্মার, মানুষের সহিত দেবতার—কলহ ত লেগেই আছে। অথচ একজন আর একজনকে ছাড়িতে নারাজ। কবি খুব সুন্দর উপমা দিয়াছেন,—

Body and soul like peevish man and wife,
United jar, and yet are loth to part.

সর্ব্বদা কন্দলে মত্ত দেখেছ দম্পতি—
দেহ আর আত্মা তাই, জানিবে তেমতি
মিলনে মহান্ কষ্ট, অসুখে থাকয়ে,
নাহি ছাড়ে সঙ্গ কিন্তু বিরহের ভয়ে।

বটে বটে। কিন্তু দেহ আত্মায়—এ কুঁদুলের কোলাকুলির মানে কি? কোঁদল সত্য, কিন্তু পিরিত টুকুও ত—প্রাণের বটে।

স্বদেশ হইতে সুখের ও বিদেশ হইতে শোকের কয়েকটা সংগীত সঙ্কলন করিয়া আমরা পাঠককে উপহার দিয়াছি। তার পর সুখ শোকের সমালোচনা প্রসঙ্গে একটা একটা করিয়া কয়েকটা পুরাণ কথা পুনরুক্ত করিয়াছি। এখনও তবু একটু বাকি আছে। বাল্যকালে বড় পিসি মার নিকট সুখ—শোকের এক গল্প শুনিতাম। এখন সেই গল্পের একটু বলিলেই এই প্রবন্ধ সাঙ্গ হয়। বলা আবশ্যক যে পূজনীয়া পিতৃস্বসার শোকের প্রতি প্রবল বিদ্বেষ ছিল। তিনি সুখ—শোকের আদি বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া, শেষোক্তকে ভদ্রাসন ভিটার নিকট হইতে দূর করিতেন। আর বলিতেন যে তাঁহার এই কাহিনী যে বলিবে বা শুনিবে, নিশ্চয়ই শোক তাহার নিকটে ঘেঁসিবে না। ভাগ্যদোষে পিসি ঠাকুরাণীর কথা ভবিষদ্বাণীতে পরিণত না হইলেও, আমাদের এই প্রবন্ধ সেই কাহিনীর নিকট বিশেষ ঋণী। আমরা তাঁহার সেই কাহিনীর অনেক কথা চুরি করিয়া, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, ইহার ভিতর পূরিয়া দিয়াছি। এখন তাঁহার সেই গল্পের একটুও উল্লেখ না করা,—নেহাত মহা পাতক।

ব্রহ্মা সকল সংসার সৃষ্টি করিয়া, সুখকে এক নৌকায় ও শোককে আর এক নৌকায় পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিলেন। তাদের পিছু পিছু আরও দুই জন লোক পাঠাইয়া দিলেন। তাদের একজনের নাম বিলাস, আর এক জনের নাম বৈরাগ্য। সুখের নৌকা আগে আসিয়া ঘাটে লাগিল। শোকের ডিঙ্গি তার পর পৌঁছিল। শোক পৌঁছিয়া সুখকে ডাকিয়া বলিল,—"সুখ এস না, আমরা এখানে দুই জনে একত্রে এক সঙ্গে ঘর সংসার করি।"

সুখ শোকের এই কথা শুনিয়া সিহরিয়া উঠিল। বলিল;—"বালাই বালাই। শোক তুমি অমন সর্ব্বনেশে কথা মুখেও এনো না। যার নামে

উপবাস! তার সঙ্গে সহবাস! তোর সঙ্গে আমি একত্রে ঘর করিব? পোড়া কপাল তোর। তোর ছায়া মাড়াইলেও অশৌচ হয়। তুই আমার সোনার সংসারের নিকট দিয়াও যাইতে পাইবি না। তুই আমার বাস্তু বাগানের ত্রিসীমা হইতে দূর হ।”

শোক মুখ আঁধার করিয়া নীরবে সব কথা শুনিল। শেষে যেন একটু শাসাইয়া বলিল, “আচ্ছা ভাই! তুমি আমাকে তোমার সংসারের মধ্যে একটু জায়গা দিলে না। আমি চলিলাম। কিন্তু তুমি সাবধানে থেকো।”

সুখ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, “তুই এখনও গেলি না। এখনও এইখানে দাঁড়াইয়া বাক্‌চাতুরী করিতেছিস। এখনি দূর হ, নহিলে ঝাঁটা-পেটা করিয়া দূর করিব।”

সুখ এই কথা বলিয়া তাড়াতাড়ি বিলাসের সঙ্গে গলাগলি হয়ে বাড়ির ভিতর গেল। শোক অধোবদনে, বৈরাগ্যের হাত ধরিয়া শ্মশান-মুখ হইল।

সেই অবধি সুখে শোকে আদা-কাঁচকলা। কিন্তু লীলা খেলা দুই জনেরই ত, দেখি, একই জিনিস লইয়া। সুখও প্রেম-গত-প্রাণ। শোকও প্রেম-গত-প্রাণ। একজন, না হয় প্রেম লইয়া সংসারী, আর এক জন না হয় প্রেম লইয়া বৈরাগী। জিনিসটা ত একই বটে।

সুখেও প্রেম। শোকেও প্রেম। সংসারেও প্রেম, স্বর্গেও প্রেম। সর্ব্বত্রই প্রেম। প্রেম নাই কেবল নরকে। প্রেম নাই বলিয়াই, বোধ করি, নরক—নরক হইয়াছে।

---

# কবি না পাচক।

আমি কবিদিগকে খাদ্যকার ব্রাহ্মণ মনে করি। যখন তাঁহাদের কাব্য পড়ি, তখন আমার ভোজন পাত্রের কথা কেবলই মনে পড়ে। মনে হয় বুঝি চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় কতরূপ রসেই পাত্র পূর্ণ রহিয়াছে। মনে মনে,

“চুক চুক চুক চুষ্য চুষিয়া, কচর মচর চর্ব্ব্য চিবিয়া,
লিহ লিহ জিহে লেহ্য লেহিয়া, চুমকে চক্ চক্ পেয় পিয়া,—

হরিষে অবশ অলস অঙ্গ হইয়া পড়ি। তাই ইচ্ছা হয় একবার সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া সে ভোজনের ব্যাপারটা দেখাই। কিন্তু ভয় হয় পাছে এত রকম বরকম, তর বতর আয়োজন দেখিয়া তাঁহাদের রসনা লালায়িত হয়।

কথাটায় কেহ হাসিও না। রস লইয়াই কাব্য—আর রস লইয়াই ভোজন। প্রকৃতি একদিকে আমাদের রসনা সৃষ্টি করিলেন—আর সেই সঙ্গে তাহার ভোগের জন্য—তাহার তৃপ্তির জন্য—সৃষ্টি হইল—রস তন্মাত্র। সুতরাং রসনার সহিত রসের বড় নিকট সম্বন্ধ (অর্থাৎ খাদ্য খাদক সম্বন্ধ।) সেইরূপ আমাদের মনের রসনেন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য সৃষ্টি হইল—কাব্য। রস-তন্মাত্র হইতে মোটে ছয়টা মূলরস সৃষ্টি হইয়াছে। তাহারপর তাহার নানারূপ সংমিশ্রণ বিমিশ্রণ দ্বারা রস হইল—তেষট্টি প্রকার। আবার মানুষের হাতে পড়িয়া ভাল পাচকের পাকে রস অনন্ত, হইল—শেষে রস গড়াইল। তাই বুঝি নানারসের খাদ্য দেখিলে, রসনার রসও গড়ায়।

সেইরূপ কাব্যের রসও প্রথমে হইল নয়টি। প্রকৃতির নিয়ম—যত তাহা ক্রম পরিবর্ত্তন দ্বারা উন্নত হইতে থাকে—ততই একের বহুত্ব হয়—বিশ্লেষণের কিছু বাড়াবাড়ি হয়। সুতরাং এই নয়টি রস আবার সংমিশ্রণাদির দ্বারা নানা প্রকার মিশ্ররসের সৃষ্টি হয়। শেষে কবি সুপকারের হাতে পড়িয়া রসের অনন্ত পরিণতি হইয়াছে। এত কাব্য রসে আর আস্বাদন রসে আবার অনেক সাদৃশ্য আছে। পাঠকের যদি রসাস্বাদনে ইচ্ছা থাকে তবে তাহার দুই একটি নমুনা দিই। আদিরস আর অম্লরস—আমি দুই এক ধাতুর মনে করি। দুই বেশ মুখরোচক—কিন্তু অধিক পরিমাণে খাইলে পীড়া দায়ক হয়—দাঁত টকে, আঁত টকে,—নানা গোলযোগ বাধে। আবার যাহারা অম্বলে রোগী বা রুচি বায়ুগ্রস্ত—তাহাদের পক্ষে অম্ল বা আদিরস বড়ই অনিষ্টকর। সেইরূপ করুণ রস আর মধুর রস দুই এক ধাতুর। ভোজনে যেমন মধুরেণ সমাপয়েৎ করিতে হয়—মিষ্ট না হইলে যেমন জল গ্রহণ করা চলে না—কাব্যেও সেইরূপ কিঞ্চিৎ করুণরস দিয়া শেষ করিতে হয়। মিষ্ট ব্যতীত বাঙ্গালীর আহার বৃথা—আর করুণরস ব্যতীত বাঙ্গালীর কাছে কাব্য বৃথা। কিন্তু বাঙ্গালীর মধ্যে বহুমুত্র রোগী বা অম্বুলেরোগী বড় বেশি। পঞ্চানন্দ বলিয়াছেন বিনামূল্যে অম্বলের ঔষধ বিতরণের বিজ্ঞাপন দিলেই বাঙ্গালার লোক সংখ্যা ঠিক করা যায়।

সুতরাং এ হেন বাঙ্গালীকে আমরা কিছু অল্প করিয়া আদিরস ও করুণরস আস্বাদন করিতে ব্যবস্থা দিই।

এইরূপ বীররসটা আমাদের তিক্তরসের সমান। বসন্তকালে যেমন তিক্ত খাইতে হয়—শরীরটা একটু গরম করিবার জন্য; সেইরূপ জীবনের বসন্তকাল যৌবনেও কিঞ্চিৎ বীররস আস্বাদনের প্রয়োজন—প্রাণটা একটু মাতান চাই। আবার যেমন চির জ্বরা বাঙ্গালীর এক্‌স্‌ট্র্যাক্ট অব নিম ঔষধ, সেইরূপ ভীরু, প্যানপেনে, করুণরসের আধার বাঙ্গালীর পক্ষে একটু বীররস মন্দ ঔষধ নহে। তবে নাটুকে ও যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি হাতুড়ের হাতে পড়িয়া ঔষধটায় বড় গুণ দেখিতেছে না। হাস্য রসটাকে আমরা লবণরস মনে করি। তুইটাই শুধু খাওয়া যায় না—কিন্তু সকল রসের সহিতই বেশ মিশ খায়। তবে লবণে আর মধুরে যেমন বিরোধ,—হাস্যে ও করুণায় সেইরূপ বিরোধ আছে। এইরূপ বীভৎসরসে আর কষায় রসে, শান্তরসে আর অম্লমধুর রসে, অদ্ভুত রসে আর লবণাম্ল রসে, রৌদ্র রসে আর কটু রসে, এবং ভয়ানক রসে আর কটু কষায় রসে—বিশেষ সাদৃশ্য আছে। যাহা হউক, এখন রসের কথায় আর কাজ নাই। এক বার বাঙ্গালী কবি-সুপকারদের রন্ধন ব্যাপারটা দেখা যাউক। আর যদি তাহা আস্বাদন করিতে ইচ্ছা হয়—তবে সাবধানে করা চাই যেন পরিপাক হয়।

১। আমাদের প্রথম কবি-পাচক বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। কিন্তু ইঁহাদের কাব্যে পাকের কার্য্য বড় অধিক নাই। মানুষগুলা প্রথম অবস্থায় রাঁধিতে জানিত না—তখন মানুষ (Cooking animal) পাচক জন্তু হয় নাই। তাই বুঝি বাঙ্গালীর আদি কবিদের কাব্যে রন্ধন ব্যাপারটা দেখিতে পাই না। পূর্ব্বে বাঙ্গালীর সকের খাবার ছিল চিঁড়া দই। বাঙ্গালীর তখন তাহাতেই ভোরপুর হইত। সুতরাং বিলাতী মতে,—অনুমান খণ্ডের সাহায্যে—ডারউইনের আবিষ্কৃত তত্ত্বের বলে—আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, বাঙ্গালী তখন পুরা সভ্য হয় নাই। যাহা হউক আজিও অনেক বনেদি ঘরের বনেদি পর্ব্বোৎসবে ফলারের ব্যাপারে চিঁড়া দৈয়ের ব্যবস্থা হইয়া থাকে—বিশেষ পল্লিগ্রামের বড়ঘরে এখনও এ নিয়ম বলবৎ। এখনও পাড়াগাঁয়ে বিবাহের বরযাত্রে গিয়া—অনেকের ভাগ্যেই লুচির পরিবর্ত্তে—চিঁড়ার ফলার মাত্র জুটে।

সুতরাং বাঙ্গালীর প্রথম কবি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস যে আমাদিগকে ইহা অপেক্ষা অধিক পরিতোষ করিয়া ভোজন করাইতে পারিবেন, ইহা সম্ভব নহে। তাই বলি, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কাব্য আমাদের চিঁড়ার ফলার। ইহার মধ্যে বিদ্যাপতির ফলার কিছু ভাল রকমের। ইহাতে দৈয়ের বদলে ক্ষীর আছে—গুড়ের বদলে সন্দেশ আছে। যাঁহারা ফলারে ব্রাহ্মণ তাঁহাদের নিকট এ ফলার বড়ই মধুর। যাঁহারা আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব, তাঁহারা ইহার মধ্যে ভক্তিরস ছাড়া আর কিছুই দেখেন না। তবে যাহারা সে রসে রসিক নহেন—তাঁহার জন্য কবিবর কিঞ্চিৎ চিনি-পাতা দই—ও ভাল আনারসের চাট্‌নিও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপ চণ্ডীদাসের কাব্যও আমাদের চিঁড়ার ফলার। ইহাতে বিদ্যাপতির ন্যায় ক্ষীর সন্দেশ নাই বটে, কিন্তু ভাল আম কাঁঠালের রস আছে—সুতরাং ইহাও বড় সুতার। ইহাদের পরবর্ত্তী গোবিন্দদাসের ফলারও বড় মন্দ নহে। সাদা সিদে হইলেও মাথার গুণে বড় মিষ্ট লাগে। আজ কালের দিনে—সভ্যতার খাতিরে—অনেক কাঁচা ফলারে বড় নারাজ। কিন্তু ভুক্তভোগী মাত্রেই স্বীকার করিবেন—ইহা খাইতে যেমন মধুর, যেমন সুতার, তেমনই স্নিগ্ধকারী অথচ আদৌ পীড়াদায়ক নহে।

২। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পরেই চৈতন্যের আবির্ভাব। লোকটা বড় রসিক। নানারূপে সমস্ত দেশময় রস ঢালিয়া গিয়াছেন। এদিকে যেমন প্রেমঘৃতে পাক করিয়া, ভক্তিরসে মজাইয়া, ভক্ত বৈষ্ণবদের উপাদেয় করিয়া গিয়াছেন—যেমন ভোজনে 'মালসী ভোগ,' 'মালপো ভোগ' প্রভৃতি নানারূপ নূতন ভোগের ব্যবস্থা করিয়া—কাঁচা চিঁড়া দৈয়ের ফলারকে ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে একস্তর উঠাইয়া দিয়াছেন—সেইরূপ আবার কতকগুলি প্রেমিক ভক্তকে কবি করিয়া বাঙ্গালার পুরাণ কাব্যরসের এক নূতন অদ্ভুত রকমের পরিবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এই সকল বৈষ্ণব কবিদের কাব্যমধ্যে—জীবগোসাঁইয়ের করচা, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত, আর কৃষ্ণদাসের চৈতন্যচরিতামৃতই প্রধান। সংসারের একটা আশ্চর্য্য নিয়ম এই যে, সময়ে সময়ে একটা শক্তিই নানারূপে কার্য্য করিয়া নানা ভাবে আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। সুতরাং সে কার্য্য গুলির মধ্যে বড় একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে; যে শক্তির ক্রিয়া হইতে মালসি ভোগের উৎপত্তি—সেই শক্তিই রূপান্তর হইয়া চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি কাব্যের

স্বাদ। তাই মালসি ভোগের সহিত এই সকল কাব্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। সুতরাং মালসি ভোগ—এই কাব্যগুলিও তাই। যাঁহারা মালসি ভোগের মজা জানে—তাঁহারাই বুঝিবেন, জিনিসটা কি উপাদেয়। এ রসে রসিক বৈষ্ণবগণ—বোধ হয় অমৃত ফেলিয়া এই মালসি ভোগের আদর করেন। যাহাহউক, যদি চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবতের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে, তবে প্রথম খানি মালসিভোগ আর দ্বিতীয় খানিকে মালপো ভোগের সহিত আমরা তুলনা করিতে পারি। অনুরোধ করি, পাঠকগণ একবার সাম্প্রদায়িকতা ভুলিয়া—সভ্যতার গর্ব্ব ত্যাগ করিয়া এই উপাদেয় মালসিভোগ ও মালপোভোগ ভোগ করিয়া দেখিবেন—আশা করি, একবার খাইলে ছাড়িতে পারুন আর নাই পারুন, কখন ভুলিতে পারিবেন না।

৩। তাহার পর রামায়ণ মহাভারত। আমি মহাভারত রামায়ণে বড় তফাৎ দেখি না। তবে মহাভারতে রকম অনেক বেশী,—বৈচিত্র্যই ইহার প্রাণ; তাই কথায় বলে 'ভারত ছাড়া কথা নাই।' রামায়ণে এত বৈচিত্র্য নাই। কিন্তু রামায়ণের কবিত্ব কিছু উচ্চদরের। রামায়ণ এই ভেতো বাঙ্গালীর সাদা ডাল ভাত; না হলে আমাদের বুঝি এক দিনও চলে না। ভাতের ন্যায় রামায়ণও আমাদের শরীর ও মনের পুষ্টি করে। ইহার দ্বারাই সাধারণ বাঙ্গালীর চরিত্র সংগঠিত ও সংশোধিত হয়। আমরা শিশুকালে বর্ণমালা শিখিয়াই ঠাকুরাণিদিদির কাছে বসিয়া পা ছড়াইয়া সুর করিয়া রামায়ণ পড়িতে বসিতাম—বাটির সকলে আসিয়া কাছে বসিয়া সে অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিত। এখন সে দিন গিয়াছে কিন্তু এখনও সামান্য দোকানদার হইতে সকলেরই রামায়ণ প্রধান পাঠ্যপুস্তক। তাই বলি রামায়ণ আমাদের সাদা ডাল ভাত, নহিলে একদিন চলে না। সভ্য হইয়াছি মনে করিয়া যেন কেহ এই ডাল ভাত উপেক্ষা করিও না—তাহা হইলে বাঙ্গালীজীবন বৃথা হইবে।

আর মহাভারত—সেত গৃহস্থ বাড়ীর মধ্যাহ্ন ভোজের নিমন্ত্রণ। বাস্তবিক ইহাতে সাদা ভাত হইতে আরম্ভ করিয়া—পায়সান্ন মিষ্টান্ন প্রভৃতি সমস্তই আছে—প্রাণ পরিতোষ করিয়া যত পার তত উদরসাৎ কর। কোন অপকার নাই—অথচ বেশ উপাদেয়। তবে রামায়ণের সাদা ভাতে রন্ধনে যেমন একটু বিশেষ রকমের মধুরতা—যেমন উপাদেয়ত্ব আছে—

মহাভারতে তত নাই। আর কর্ম্মবাড়ীর নানারূপ তরি তরকারির মধ্যে যে সবই ভাল হইবে—ইহা তোমার আশা করাই অন্যায়। গৃহিণী স্বামী পুত্রের জন্য কায়মনোবাক্যে অতি সাবধানে অতি সন্তর্পণে যাহা রাঁধিলেন, তাহা সামান্য হইলেও ভোজনে যত তৃপ্তি হয়—কর্ম্মবাড়ীর পাচটার কারবারে গণ্ডগোলে—তাড়াতাড়িতে ততদূর হইবে কেন? যাহা হউক পাঠকগণ কি এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন? আমাদের কিন্তু সাদা ভাতের নিমন্ত্রণ করিতে ভয় হয় পাছে সভ্য মহোদয়গণ সে নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করেন। আমরা জানি ইঁহারা 'যগ্গী' বাড়ী গিয়া সাদা ভাত খাইতে বড় নারাজ। সুতরাং ইঁহাদের নিমন্ত্রণ করাও দায়। আর নিমন্ত্রণ করিলেও হয়ত লোকদিয়া দুই টাকা প্রণামি বা দক্ষিণা (তাও বটতলার অনুগ্রহে দশ আনা মাত্র) পাঠাইয়া দিবেন—নিজে সে মুখ হইবেন না। সুতরাং এরূপ লোকের যে কখন মহাভারত পড়া ঘটিবে সে বিশ্বাস আমাদের নাই। কিন্তু এই সব সভ্য লোককে আমরা নিমন্ত্রণ করি, আর নাই করি,—সাধারণ পাঠকত সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন।

৪। এখন কবিকঙ্কণ চণ্ডীর কথা বলি। চণ্ডী পড়িলেই আমার শ্রাদ্ধ বাড়ীর মধ্যাহ্ন ভোজনের পাকা লুচীর ফলার বা জলপান মনে হয়। লুচী বাঙ্গালীর কাছে বড়ই উপাদেয়, বুঝি এমন ভাল জিনিস আর নাই। ফলারে ব্রাহ্মণ আধক্রোশ দূর হইতে ত লুচীর গন্ধ পায়, তাহার প্রাণ আন্‌চান্ করে, মন আহ্লাদে লাফাইয়া উঠে। শিকলে বাঁধা শিকারী কুকুরগুলা দূরে শীকার দেখিলে—যেমন সমুখের দুই পা তুলিয়া শিকলে জোর দিয়া দাঁড়ায়, লুচির গন্ধে মনও তেমনি করিয়া হামাগুড়ি দিয়া উঠে। এমন লুচী যে আমাদের প্রধান খাদ্য নহে, এ কথা কোন পাষণ্ড বলিতে সাহসী হইবে। চণ্ডী পাঠেও আমাদের মনে ঠিক সেইরূপ আনন্দ হয়, আমার লুচীর ফলারে জুটিল মনে হয়। বাস্তবিক ইহাতে এমনই পরিতৃপ্তি হয় যে, দুই এক দিন ভোজন না জুটিলেও চলিতে পারে। আজকালের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলাতী অখাদ্যভুকের মধ্যেও অনেককে লুচীর বিশেষ পক্ষপাতী দেখা যায়। স্বয়ং দত্তজা মহাশয়ই আমাদের কবিকঙ্কণকে দেশী 'চসার' মনে করিয়া গাল ফেলিয়াছে।

৫। তাহার পর আমাদের 'মনসার ভাসান'। মনসার ভাসান পড়িলেই আমার আরান্ধের (অরন্ধনের) পান্তা-ভোজন মনে পড়ে। জিনিষটা সকলের

ভাল লাগে না। বিশেষত যাহারা ছেলে বেলা শীতকালে সকালবেলা রৌদ্রের দিকে পিঠ দিয়া—আলুপোড়া আর পান্তাভাত না খাইয়াছে—সে হয়ত চিরজীবনে কখন আরান্ধের পান্তা ভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবে না। তবে আজ কাল অনেক বাবুরা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে, আম খাকানে গরমের দিন, সকু করিয়া বিকালে ভিজা ভাতও খাইয়া থাকেন -শরীর ঠাণ্ডা হয়—বায়ুও, পিত্তের প্রকোপ দুর হয়। আশা করি, ইহারা আরান্ধের নিমন্ত্রণ অবহেলা করিবেন না। কারণ সেদিন মা মনসার বরে পান্তাভাত খেতে বড় ভাল লাগে। আর তাতে আমোদও বিলক্ষণ আছে। দেশী লোক, দেশী চালে, দেশী ধরণে, পুরাণ ধরণে যে রীতিটা রক্ষা করে তা তুমি নিজে রক্ষা কর, আর না কর, তাহার উপর কখন নাক তুলিয়া তাকাইও না।

৬। এখন রামেশ্বরের শিবায়ন জিনিসটা কিরূপ দেখা যাউক। আমার বোধ হয় শিবায়ন আর সাড়ে আঠার ভাজা দুই এক পদার্থ। ইহাতে নাই—এমন জিনিস নাই। কোথায় শিবের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইবে—না তাহার সহিত রুক্মিণীর এবং, রামনাম মাহাত্ম্য, সতী মাহাত্ম্য, নানারূপ ব্রত কথা, বাণরাজার উপাখ্যান, প্রভৃতি হরেক রকম পৌরাণিক উপাখ্যান—. আরও কত চুটকি কথাই ইহাতে বর্ণিত আছে। আবার গল্পগুলি ও সহজ-ভাবে লিখিত নহে। নানারূপ রঙ দিয়া, নানা ঢংয়ে সাজাইয়া এক অদ্ভুত ব্যাপার করা হইয়াছে। আমাদের সাড়ে আঠার ভাজাও তাই—নানারূপ জিনিস লইয়া—তাহাদিগকে ভাজিয়া রূপান্তরিত করিয়া একরূপ নূতন আস্বাদ করা হয়। ভাজাগুলি স্বতন্ত্র খাইলে তত ভাল লাগে না ইহাদের সংমিশ্রণেই এত সুস্বাদু বোধ হয়—খাইতে লাগে ভাল। শিবায়নও তাই—ইহার এক একটি স্বতন্ত্র গল্প তত ভাল হউক না হউক—সকলগুলির সংমিশ্রণে যে জিনিসটা হইয়াছে, তাহা বড় সুন্দর। সাড়ে আঠার ভাজা বাদলার দিন বড় ভাল লাগে, আর লোক বিশেষের কাছে তাহার আদরের ত কথাই নাই। সাড়ে আঠার ভাজার প্রধান উপকরণ চালভাজা আর মুড়ি—শিবায়নের মূল কাণ্ড শিবের উপাখ্যান। এক চাউলেই আমাদের চিড়া হয়—পায়েস হয়, পোলাও হয়, খিচুড়ী হয়, সাদা ভাত হয়। এক শিবের উপাখ্যান লইয়াও তেমনি নানা কবি নানারূপ কাব্য লিখিয়াছেন। তবে রামেশ্বর শিবকে কৃষক সাজাইয়া, শাঁখারি সাজাইয়া, কুচনী পাড়ার মধ্যে দেখাইয়া, কখন বা ভগবতীকে বা বাগদিনী সাজাইয়া—নানা রঙ্গ করিয়াছেন। তাই বলি

শিবায়নের শিবচরিত আমাদের সেই চালভাজা; জিনিষটা বড় মজাদার হইয়াছে খাইতে মন্দ লাগে না—কিন্তু আসল জিনিষটা বিকৃত হইয়াছে। সাড়ে আঠার ভাজার আর এক মজা ইহাতে ঝাল আছে, কিঞ্চিৎ তিক্ত আছে, কিছু কিছু সব রসই আছে, নাই কেবল মিষ্ট, আর কিছু অম্বল। শিবায়নেও কিছু কিছু সবই আছে, নাই কেবল করুণরস, আর রীতিমত আদিরস। তাই বলি শিবায়ন আর সাড়ে আঠার ভাজা একই জিনিস।

৭। আজকাল বাঙ্গালা সাহিত্যে একজন প্রাচীন কবি নূতন পরিচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছেন। প্রাচীন 'মহাকবি' ঘনরাম সাহিত্য সংসারে দেখা দিয়াছেন। সুতরাং এই কবি পাঠকের পরিচয় দিতে আমরা বাধ্য। তাঁহার শ্রীধর্ম্মমঙ্গল পড়িলেই আমার পৌষপার্ব্বণের কথা মনে পড়ে। পৌষ পার্ব্বনে পিঠা, পুলি, পায়েস প্রভৃতি নানারূপ খাদ্য ভোজনে যে পরিতৃপ্তি হয়, ঘনরাম পড়িয়া সেই ফল পাওয়া যায়। বিশেষ যাঁহারা পূর্ব্বাঞ্চলের পৌষ পার্ব্বণের নিমন্ত্রণের মহাব্যাপার জানেন,তাঁহার কাছে পৌষপার্ব্বণ বড়ই আদরের সন্দেহ নাই। ঘনরামের চরিত্র গুলি প্রায়ই নীচশ্রেণী হইতে গৃহীত—পিঠে পুলির কোটা চাউলও তাই। তাঁহার কাব্যে বড় অধিক শিল্প-কৌশল আছে বোধ হয় না—পিঠে পুলি প্রস্তুত করিয়াও অবশ্য কোন গৃহিণীকে শিল্পে গর্ব্ব করিতে শুনি নাই। যাহা হউক পিঠে পুলি যেমন খাইতেও মন্দ নহে, বিশেষ পাঁচ একত্রে খাইতে বেশ আমোদ আছে, ঘনরাম পড়িতেও মন্দ নহে, বিশেষ, পড়িলে শিক্ষা হয়, জ্ঞান লাভ হয়, পাঁচজন একত্র হইয়া পড়িতে বা গান শুনিতে, বেশ আমোদও আছে। পিঠে পুলির ভোজে ঝাল আর কটু ছাড়া সকল রসই কিছু কিছু পাওয়া যায়, তবে মিষ্টরসের বড় বাড়াবাড়ি। ঘনরামেও রৌদ্র, বীভৎস ছাড়া আর সব রসই প্রায় কিছু কিছু মিলে, তবে করুণ রসের কিছু বাড়াবাড়ি আছে। আজ কাল এই সভ্যতার খাতিরে যদি কেহ পিঠে পুলি না ঘৃণা করেন, তবে তিনি আনন্দের সহিত ঘনরাম পড়িবেন, সন্দেহ নাই।

৮। সে যাহা হউক, এখন কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের কথা বলি। তাঁহার পদাবলীর ন্যায় মধুর পদার্থ, বুঝি সংসারে, আর কিছুই নাই। পদাবলীর নাম শুনিলে আমাদের কি এক অপূর্ব্ব আনন্দ হয়, কি অদ্ভুত মোহ আমাদের মনকে অভিভূত করে, কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া প্রাণকে কিরূপ আকুল করে। ইহার তুলনা মিলে কি? সমস্ত জগতের সাহিত্যে বুঝি

ইহার জোড়া নাই। যদি আমাদের অমৃত আস্বাদনে, অধিকার থাকিত—তবে বলিতাম এ পদাবলী অমৃত বই আর কিছুই নহে। অন্তত যদি সোমরস কি, তাহা বুঝিতাম, তবে হয়ত এই সোমরসের সহিত ইহার তুলনা দিতাম। বাস্তবিক এই খানেই কবি পাচক সাধারণ পাচককে হারাইয়া দিয়াছে।

কবিরঞ্জনের কালীকীর্ত্তন জিনিসটাও বড় সুন্দর। লোকটা অদ্ভুত রকমের ভক্ত ছিল—ভক্তি রসে নিজে যেমন গলিয়া যাইত, তেমনি অন্যকেও গলাইতে পারিত। কালীকীর্ত্তনে সেই ভক্তি রসের ছড়াছড়ি করিয়াছে, আমরা ভক্তিরসকে খাটি সন্দেশ মনে করি। ইহা প্রধানত করুণ রস দ্বারাই পরিপুষ্ট এবং ছানার কিঞ্চিৎ অম্ল রস দ্বারা প্রস্তুত। সুতরাং যদিও ইহাতে অম্ল মধুর রস পাওয়া যায়, কিন্তু ময়রার পাকের কৌশলে ইহাতে যে একরূপ নূতন সুস্বাদ হয়, তাহা সাধারণ অম্ল মধুর রসে মিলে না। যাহা হউক কবিরঞ্জন কালীকীর্ত্তনও এক শ্রেণীর সন্দেশ মাত্র। কবিরঞ্জন আমাদের নানারূপ সন্দেশের নমুনা দিয়াছেন, যথা,

ভক্ষ্য দ্রব্য নানাজাতি মণ্ডা মনোহরা।

* * * * *

অপূর্ব্ব সন্দেশ নাম এলাইচ দানা। (বিদ্যাসুন্দর)

আমরা এই এলাইচ দানার সহিত তাঁহার কালীকীর্ত্তন তুলনা করিতে পারি।

তাহার পর কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর। আমরা তাঁহার বিদ্যাসুন্দরকে ভুনি খিচুড়ী মনে করি। ইহাতে যেমন ঘি মসলা বেশী আছে, তেমন রন্ধনেও কিছু পারিপাট্য আছে। এই খানে বলিয়া রাখি, ভুনি খিচুড়ীটা নেহাত দেশী রান্না নহে। বাঙ্গালা অনেক দিন ধরিয়া মুসলমানদের অধীন ছিল। এতদিনের সংঘর্ষে যে বাঙ্গালী মুসলমানদের কিছুই অনুকরণ করিবে না, ইহা সম্ভব নহে। বিশেষ মুসলমানী রন্ধন বড় পারিপাটী। নবাবী রান্নার বুঝি কোথাও তুলনা মিলে না। বাঙ্গালী এমন উৎকৃষ্ট রান্না (অজ্ঞাত সারেই হউক, আর জ্ঞাতসারেই হউক।) অনুকরণ করিবে ইহা আশ্চর্য্য নহে। যাহা হউক যে নবাবী বা বিলাসিতার ফল এই নবাবী রন্ধন—সেই বিলাসিতার ফলই মুসলমানি সাহিত্য। সুতরাং পারসী ভাষা বাঙ্গালী কবি অজ্ঞ অজ্ঞাতসারে

সেই কাব্যের অনুকরণ করিবেন ইহা আশ্চর্য্য নহে। তাই ভুনি খিচুড়ী যেমন মুসলমানি বাঙ্গালী রান্না,—কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দরও তেমনি মুসলমানি বাঙ্গালী কাব্য। খিচুড়ীতে যেমন মিসলার সহিত রাঁধিবার কৌশল আছে বিদ্যাসুন্দরেও সেইরূপ ছন্দের পারিপাট্য, রচনার কৌশল বর্ণনার কারিগুরি আছে। খিচুড়ীর যেমন জিনিসগুলি সবই দেশী কোন-টিই হিন্দুর অখাদ্য নহে, বিদ্যাসুন্দরেও তাই। প্রভেদ কেবল রন্ধন কৌশল আর শিল্পকৌশল লইয়া। যাহা হউক বোধ হয় ভুনি খিচুড়ী বা বিদ্যাসুন্দর উপেক্ষা করেন, এরূপ লোক কেহ নাই। আমরা পাঠকদের কবিরঞ্জনের ভুনি খিচুড়ী খাইতে অনুরোধ করি, ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে চাট্‌নি আর শেষে মিষ্টান্নও যথেষ্ট পাইবেন, কোন ত্রুটি নাই।

৯। তাহার পর ভারতচন্দ্র। আমরা ভারতের অপূর্ব্ব কাব্যকে ভাল পোলোয়া মনে করি। ভারত যে সঘৃত পলান্ন খাওয়াইয়া 'হরিষে অবশ অলস অঙ্গ' মহাদেবকে নাচাইয়াছেন...তাঁহার কাব্য পড়িয়া আমরাও সেই রূপ আনন্দে বিভোল হইয়া যাই, তাঁহার নাচনি ছন্দের সহিত আমাদেরও তালে তালে নাচিতে ইচ্ছা করে। বাস্তবিক যেমন পোলায়ের মত ভাল খাবার আমাদের আর নাই, তেমনি প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যের মধ্যে ভারতের অন্নদামঙ্গলের ন্যায় কাব্যও আর নাই। এমন সুতার-মুখপ্রিয় জিনিষ বুঝি আর প্রস্তুত হয় না। তবে পোলাওয়ে কিছু ঘৃতের ভাগ অধিক থাকে, সুতরাং মুখপ্রিয় হইলেও অধিক খাওয়া যায় না, শীঘ্রই মুখ মেরে যায়। কিন্তু যাহা খাওয়া যায়, তাহাই যথেষ্ট তাহাতেই উদর পরিতোষ হয়। সুধু তাহাই নহে, দুই তিন দিন হয়ত: পেট এমনি ভার থাকে, যে আর কিছু খাইতে ইচ্ছা করে না। ভারতের কাব্যে তাই, পড়িলে এত পরিতৃপ্তি বোধ হয়, যে তখন আর কোন কাব্য পড়িতে ইচ্ছা করে না। আবার পোলাও যেমন বড় গুরুপাক, খাইলে সকল লোক তাহা হজম করিতে পারে না, বিশেষ যাহার অভ্যাস নাই, তাহার বড় বিপদ হয়, সেইরূপ অন্নদামঙ্গও। বিশেষ তাহার বিদ্যাসুন্দর অংশ সকলের পক্ষে পাঠ্য নহে, ইহা রুচিবায়ুগ্রস্ত পেট-রোগাদের পক্ষে বড় পীড়াদায়ক। যাহা হউক যদিও আমাদের দেশে পূর্ব্বে পোলাও প্রস্তুত করা জানিত কিন্তু ইদানী সকলে মুসলমান ধরণেই তাহা রাঁধিয়া থাকে। তাহার চাউল, ঘি, মাংস মসলা সকলই দেশী জিনিস সন্দেহ নাই কোন হিন্দুরই তাহা খাইতে

বিশেষ আপত্তি নাই তবে রান্নাটা নিতান্ত মুসলমানি ধরণের। যাহা হউক পোলাও রান্নায় রাঁধুনির বড় বাহাদুরি চাই; শতকে একজন লোকও পোলাও রাঁধিতে পারে না, ভারতের কাব্যেও যে অদ্ভুত শিল্প কৌশল আছে, তাহা কয়খান কাব্যে দেখিতে পাই। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই বলিলেও চলে।

যাহা হউক, আজ কাল নব্য বাবুরা হিন্দুয়ানি মানেন না—পোলায়ে তাঁহাদের পলাণ্ডুর রস নহিলে চলে না--কিন্তু তাহা হইলে গোঁড়া হিন্দুর তাহা অখাদ্য হইয়া পড়ে, তাঁহারা সে পোলাও স্পর্শ করেন না। ভারত তাঁহার অন্নদামঙ্গল পোলাওয়ে পলাণ্ডুর রস দেন নাই বটে -কিন্তু তাঁহার বিদ্যাসুন্দর চাট্‌নিটা মুসলমানি ধরণের করিতে গিয়া, তাহাতে কিঞ্চিৎ ঐ রস দিয়া ফেলিয়াছেন, সুতরাং গোঁড়া রুচি-বীবগণের নিকট তাহা অখাদ্য হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবিক তাঁহার বর্ণনা বিশেষকে আমরা পেঁয়াজের রস মনে করি—তাহার উপর আবার স্থানে স্থানে রসুনের দুর্গন্ধও পাওয়া যায়। ভারতের চাট্‌নির মধ্যে তাঁহার রস মঞ্জরীটা সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু যাহাই বল—অনেকে কেবল চাট্‌নির খাতিরে—বেশি পোলাও খাইতে পারে—সেইরূপ আমরা জানি অনেক লোক শুধু বিদ্যাসুন্দরের খাতিরেই অন্নদা-মঙ্গল পড়িয়া থাকেন। চাট্‌নি নহিলে বুঝি পোলাও ভোজন সম্পূর্ণ হয় না। যাহা হউক নেহাত চাষা ব্যতীত কেহই পোলাওয়ের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করে না—আর নেহাত অরসিক ব্যতীত কেহই ভারতের কাব্য রস পানে উপেক্ষা করে না—সুতরাং এ স্থলে সুপারিস নিষ্প্রয়োজন।

ভারতের পরেই আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান কাল। এ কালে ইংরাজি চাল চলন ধরণ ধারণ সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্য নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। বর্ত্তমান যুগের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই একমাত্র দেশী কবি ছিলেন—তাঁহার কাব্য আর মাছের ঝোল যে একরূপ তাহা পূর্ব্বে নবজীবনে দেখান হইয়াছে—সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কেহ কেহ নবজীবন পড়িয়া বলিয়াছিলেন শুনিয়াছি—না, ও মাছের ঝোল হইতে গেল কেন? ও যে আমাদের চেঁচ্‌ড়া! আমরা কি বলিব? "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ" না—"আত্মবন্মন্যতে জগৎ।"

যাহা হউক আজ আমরা বর্ত্তমান কালের বাঙ্গালী কবিদের সম্বন্ধে কোন কথা বলিব না। সে অনেক কথা। আবার তা বলিতে গেলেও অনেক

গোল আছে—লোকের গায়ে লাগিবে। আজ কাল আর সেকেলে গৃহিণী খুঁজিয়া পাই না। স্বামী পুত্র সেবার জন্য পাঁচ জনের জন্য—কর্ত্তব্য বোধে কায়মনোবাক্যে হেঁসেলঘরের অন্ধকূপে বসিয়া—ধোঁয়ায় নাকের জলে চখের জলে হইয়াও, মহা আনন্দের সহিত রন্ধন করে—এরূপ এখন কয়টা গৃহিণী মিলে॥ এখনকার বাবু গৃহিণীদের রান্না কেবল সক্—কেবল নাম নেবার জন্য;—আমি রাঁধিতে জানি এই বাহাদুরী দেখাইবার জন্য। কালে ভদ্রে কদাচ একদিন তাঁহারা রসুই ঘরে প্রবেশ করেন মাত্র। শুধু তাহাই নহে—তাঁহাদের রান্না যেরূপই হউক, ঢালাও প্রশংসা করা চাই—নহিলে নিস্তার নাই—তাহা না হইলে অভিমানে—রাগে আর রক্ষা থাকিবে না। আজ কালের কবিরাও সেই ধাতুর। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের কাব্য লেখা সখে—কর্ত্তব্য বোধে নহে। তাহার উপর যদি কেহ তাহা মন্দ বলিল, তবে রক্ষা নাই—সে এক মহাবিভ্রাট। এমন স্থলে আজ আমরা তাঁহাদের কাব্য সমালোচনা নাই করিলাম।

তবে উপসংহারে একটা কথা বলিয়া রাখি। যে ইংরাজী শিক্ষার ফলে—বিদেশী আচার ব্যবহার অনুকরণ প্রবৃত্তি আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে—যে কারণে আমরা অখাদ্য ভোজনে লোলুপ হইয়া চুপে চুপে গুপ্তদ্বার দিয়া, উইলসন হোটেলে যাইতে শিখিয়াছি—সেই প্রবৃত্তির বলেই দেশী ধরণে, দেশীভাবে লিখিত বাঙ্গালী কাব্য আমাদের ভাল লাগে না। আমরা চণ্ডী ফেলিয়া চসার পড়ি, ভারত ছাড়িয়া পোপ পড়ি, চরিতামৃত ছাড়িয়া মিলটন পড়ি, রামায়ণ ছাড়িয়া ইলিয়ড্ পড়ি, বিদ্যাপতি ছাড়িয়া সনেট্ পড়ি। যেমন দেশী সূপকার আমাদের অখাদ্য ভোজন স্পৃহা নিবারণ জন্য শকুন্তলা হোটেল' খুলিলেন, গৃহিণী যেমন ফাউল কারি রাঁধিবার জন্য স্বতন্ত্র হাঁড়ি কাড়িলেন—সেইরূপ দেশী কবিও পতিক দেখিয়া কেহ ফাউলকবি, কেহ পোটেটো চপ্, কেহ মটন চপ, কেহ কট্‌লেট, কেহ রোষ্ট রাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অতএব তাঁহাদের জয় হউক।

---

# দেব-ধর্ম্মী মানব।

দিন রাত্রি, আলো অন্ধকার, শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ, সুখ দুঃখ, তিক্ত মধুর শীতল উষ্ণ, পৃথিবীর দুইটি দিক, দুইটি রূপ, দুইটি ভাগ। ইহার মধ্যে একটি মাত্র দেখিলে পৃথিবী দেখা হয় না; পৃথিবীর অর্দ্ধেকও দেখা হয় না। যে শুধু তিক্তরস আস্বাদন করিয়াছে, কখনও মধুর রস আস্বাদন করে নাই, সে তিক্তরস ও আস্বাদন করে নাই। অতএব পৃথিবী বুঝিতে হইলে তাহার দুইটি দিকই বুঝা আবশ্যক, একটি দিক মাত্র বুঝিলে তাহার কোন দিকই বুঝা হয় না। কিন্তু পৃথিবীর যেমনি মানুষেরও তেমনি দুইটি দিক আছে। একটি ভাল দিক একটি মন্দ দিক। মানুষের পদতলে পৃথিবী, মানুষের মস্তকোপরি স্বর্গ। তাই বুঝি মানুষ এক দিকে পশু আর একদিকে দেবতা। কিন্তু কারণ যাহাই হউক, কথাটা ঠিক যে মানুষ এক দিকে পশু আর এক দিকে দেবতা। অতএব মানুষকে বুঝিতে হইলে তাহার পশু-ধর্ম্ম ও বুঝা চাই, দেবতা-ধর্ম্মও বুঝা চাই। গত বারের নবজীবনে পাঠক পশু বা জন্তু ধর্ম্মী মানব দেখিয়াছেন। এবার তাঁহাকে দেব-ধর্ম্মী মানব দেখাইব।

জন্তু ধর্ম্মী মানবের ন্যায় দেব-ধর্ম্মী মানব ও নানা শ্রেণীরও নানা প্রকৃতির। জন্তু প্রকৃতি ও যেমন বহুবিধ, দেব-প্রকৃতিও তেমনি বহুবিধ। জন্তুর মধ্যে সর্প বৃশ্চিক, সিংহ, ব্যাঘ্র, শৃগাল, কুক্কুর, মার্জ্জার, প্রভৃতি সকলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি সম্পন্ন। দেবতাদিগের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গনেশ প্রভৃতি সকলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট। অতএব জন্তু-ধর্ম্মী মনুষ্যের মধ্যে সকল রকমের মনুষ্য যেমন বর্ণনা করিয়া উঠা যায় না দেবতা-ধর্ম্মী মনুষ্যের মধ্যেও তেমনি সকল রকমের মনুষ্য বর্ণনা করিয়া উঠা যায় না। ফলতঃ সকল রকম বর্ণনা করিবার আবশ্যকও নাই। উদাহরণ স্বরূপ দুই তিন রকমের দেব-ধর্ম্মী মানুষের কথা বলিলেই পাঠক সকল রকমের দেব-ধর্ম্মী মানুষ ঠিক করিয়া লইতে পারিবেন। অতএব তাহাই করিব।

## তত্র অন্নপূর্ণা-ধর্ম্মী।

জগন্মাতা অন্নপূর্ণা জগৎকে অন্ন দিয়া রক্ষা করেন। মনুষ্য মধ্যেও অন্নপূর্ণা আছে।

এই সেদিনকার কথা বলিতেছি, সেদিন তুমি আমিও একটু একটু দেখিয়াছি—সেইদিনকার সেই পিতামহ ঠাকুরের কথা বলিতেছি। পিতামহ ঠাকুরের গৃহে লোক ধরে না—স্ত্রী পুত্র কন্যা ভাই ভাইপো আছেই ত। কিন্তু আরো যে কত আছে তাহা বলিতে পারি না। আহা! জ্ঞাতি কুটুম্বের মধ্যে স্ত্রী বল পুরুষ বল যে যেখানে নিরন্ন নিরাশ্রয় হইয়াছে সেই আমার পিতামহ ঠাকুরের গৃহে পুত্র কন্যা অপেক্ষাও প্রিয়, গৃহদেবতা অপেক্ষাও সমাদৃত, গুরুদেব অপেক্ষাও সম্মানিত। পিতামহ ঠাকুরের বেশ ভুষা নাই তাঁহার পায়ে একটি যোড়া খড়ম, পরণে একখানি থান কাপড়, স্কন্ধে একখানি সেইরূপ উত্তরীয়। তাঁহার ভোগবিলাস নাই—তিনি গাড়ী ঘোড়া কখনও চক্ষে দেখেন নাই, আতর গোলাপের নাম শুনিয়াছেন মাত্র, ভোজন করেন আশ্রিত অনাথা অনাথিনীরা যা তাই, তাহার চেয়ে খারাপ ত ভাল নয়। তাঁহার বিষয় বৈভবের ভাবনা নাই—তিনি মনুষ্য মধ্যে অন্নপূর্ণা—তাঁহার একমাত্র ভাবনা,কিসে তাঁহার সেই অন্নের কাঙ্গাল গুলি অন্ন পাইবে। তিনি সকলের পেটের জ্বালা বোঝেন, কিন্তু তাঁহার আপনার পেটের জ্বালা নাই। বেলা দুই প্রহর হইয়াছে, তখনও তিনি আহার করেন নাই, কেন না তখনও তিনি অনুসন্ধান করিতেছেন পাড়ার হাড়ি মুচি কাওরা কৈবর্ত্তের মধ্যে কাহারো অন্ন জুটিল কি না। যাহার অন্ন যুটে নাই তাহাকে অন্ন দিয়া তবে আপান বেলা প্রায় তিন প্রহরের সময় স্বয়ং এক মুটা ভক্ষণ করিলেন। তিনি মনুষ্য মধ্যে অন্নপূর্ণা। তেমন অন্নপূর্ণা আমরা আর দেখিব না। আমাদের সে অন্নপূর্ণার পুরী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে!

আর সেই রাঙ্গা দিদির কথা মনে পড়ে কি? সেই অসামান্য রূপলাবণ্য সম্পন্না সেই কালের-ছায়া-মাখা-রক্তপদ্ম রূপিণী বালবিধবা রাঙ্গা দিদিকে মনে পড়ে কি? যদি না মনে পড়ে তবে সেই কৈলাসবাসিনী ভিখারী ভূতনাথের অন্নপূর্ণাকে মনে কর তাহা হইলেও সেই বঙ্গের বালবিধবা রাঙ্গাদিদিকে মনে করা হইবে "তিনি যখন শুভ্র পট্টবস্ত্র পরিধানে আলুথালু কাল কেশরাশি কপালের উপর ভাগে এলো বন্ধনে, রাঙ্গা হস্তে দর্ব্বী ভরিয়া গৃহপ্রাঙ্গণে শত শত বালক বালিকাকে স্বহস্তে অন্ন বিতরণ করিতেন, সকলে কাণাকাণি করিত যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা অবতীর্ণা হইয়াছেন। বিবাহ, শ্রাদ্ধ ক্রিয়াকলাপে সমস্ত গৃহকার্য্যনির্ব্বাহকারিণী রাঙ্গা ঠাকুরাণীই প্রধান

ভাণ্ডারিণী ছিলেন, তিনি নিজ হস্তে যাহাকে যাহা দিতেন তাহাই তৃপ্তিকর তাহার দ্বিগুণ অপরের হস্ত হইতে প্রাপ্ত হইলেও কেহ সুখী হইত না। আম হউক বা কুল হউক, রাঙ্গাঠাকরুণ বাঁটিয়া না দিলে কাহারো মঞ্জুর নাই। আজ অন্নমেক, কাল তুলা, পরশ্ব সাবিত্রী-ব্রতদানে রাঙ্গাদিদির রাঙ্গা তবু নিয়ত ম্লান মুখটি কখন কখন প্রফুল্লতায় উজ্জ্বল হইত। স্বয়ং নিঃসন্তান কিন্তু দেশের ছেলে তাঁহার সন্তান ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না•।"

এ রাঙ্গাদিদিকে যে মানবী বলে দেবতা কাহাকে বলে সে জানে না। হিন্দুর গৃহে গিয়া অন্নপূর্ণা রূপিণী হিন্দুবিধবাকে দেখিলে সে প্রকৃত দেবতত্ত্ব শিখিতে পারে। রাঙ্গাদিদির ন্যায় অন্নপূর্ণা এখনও আমাদের ঘরে আছে। তাই আমরা এখনও একেবারে উৎসন্ন হই নাই। তাই বিষ্ণু এখনও আমাদিগকে পালন করিতেছেন এবং বিষ্ণুপালিত বিশ্বে আমাদের এখনও দাঁড়াইবার স্থান আছে। তাই মনুষ্য মধ্যে আমাদের মনুষ্য বলিয়া এখনও বেশ মান সম্ভ্রম আছে।

আমার মেজ কাকী আর একটি অন্নপূর্ণা। মেজ কাকীর বয়স চল্লিশের বেশি, কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, পাতলা ছিপছিপে, যেন ক্ষুদ্র চাঁপার কলিটি। মেজ কাকী গৃহের মধ্যে একজন গৃহিণী কিন্তু অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী, ছেলেপুলেরাও তাঁহার মুখখানি ভাল করিয়া দেখিতে পায় না। মেজ কাকীর গলা নাই, তিনি এখনও আস্তে আস্তে ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কন। মেজ কাকীর ছেলেপুলে নাই, কোন্ কালে তাঁহার একটি মেয়ে হইয়াছিল তাহা কাহারো মনে নাই। সে মেয়েটি আজ ষোল বৎসর শ্বশুর ঘর করিতেছে, তাহারও সন্তানাদি হয় নাই। মেজ কাকীর ঝাড়া হাত পা। কিন্তু মেজ কাকীর ঘরে ছেলে ধরে না। ঘোষেদের ছেলে, মিত্রদের ছেলে, সরকারদের ছেলে, গ্রামের সকলের ছেলে মেয়ে মেজ কাকীর ঘরে। মেজ কাকীর ঘরে সদাই ছেলের হাট। মেজ কাকী কোন ছেলেকে খাওয়াইতেছেন, কোন ছেলেকে পরাইতেছেন, কোন ছেলেকে ঘুম পাড়াইতেছেন, কোন ছেলের গা মুছাইয়া দিতেছেন। মেজ কাকী উপর হইতে নীচে যাইতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ সাতটা ছেলে যাইতেছে; নীচে হইতে উপরে আসিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ সাতটা ছেলে

---

• জটাধারীর রোজনামচা নামক গ্রন্থের ৬৩ পৃষ্ঠা। রাঙ্গাদিদি কবির কল্পনা নয়, এক সময়ে একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে রাঙ্গাদিদি যথার্থই জীবিত ছিলেন, একথা আমরা জানি। রাঙ্গাদিদির আসল নাম অন্নপূর্ণা ছিল।

আসিতেছে। মেজকাকী ঠাকুর প্রণাম করিতেছেন, তাঁহার এপাশে ওপাশে সামনে পিছনে ছেলের পালও 'ঠাকুল বাল কল' বলিয়া ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া ঠাকুর প্রণাম করিতেছে। রাত্রি এক প্রহর, তখনও মেজ কাকীর ঘরে পাচটা ছেলে। মেজকাকী তাঁহাদিগকে দুধ খাওয়াইয়া গুণ গুণ স্বরে গান গাইয়া ঘুম পাড়াইলেন, ছেলেদের মায়েরা আসিয়া তাহাদিগকে লইয়া গেল। একটি ছেলে মেজ কাকীর ঘরেই রহিল। সে ছেলেটা বড় দুরন্ত এবং তাহার মার আরো পাঁচটা ছেলে আছে। তাহার মা তাহাকে মেজ কাকীর কাছে রাখিয়া বাঁচিল। মেজ কাকীর একটি পয়সা খরচেরও দরকার নাই। কিন্তু খেলনায় ও সন্দেশ মিঠাই বৈ বাতাসায় তাঁহার মাসে পনর ষোল টাকা ব্যয় হয়। মেজ কাকা একটু একটু আফিঙ্গ খান, তাই তাঁহার প্রতিদিন সেরটাক্ দুধের দরকার, তার বেশি নয়, কিন্তু প্রতি দিন তাঁহার ঘরে পাঁচ ছয় সের দুধ খরচ হয়। মেজকাকীর ঝাড়া হাত পা, কিন্তু দিনে রেতে তাঁহার সাবকাশ নাই—এমন কি মেজ কাকা পাঁচ বার চাহিয়াও একবার একঘটি জল পান না। মেজকাকী জগদ্ধাত্রী, যাহার ধাত্রীর আবশ্যক সেই তাঁহার কাছে আসে। তিনি অন্নপূর্ণা, স্নেহের ভিখারী শিশুকে তিনি দিবারাত্রি স্নেহ সুধা পান করান।

আর ঐ ছোট দাদা? উনিও অন্নপূর্ণা। দশ ঘর জ্ঞাতির মধ্যে উনিও এক ঘর। কিন্তু এক ঘর হইয়াও উনি সকল ঘরেই সমান। আপনার ঘরেও যেমন, জ্ঞাতিদের ঘরেও তেমনি। ওঁর আপনার ছেলে মেয়ে ভাই ভাইপো ও যেমন জ্ঞাতিদের ছেলে মেয়ে ভাই ভাইপোও তেমনি। জ্ঞাতি সুখী হইলে ওঁর সুখ উথলিয়া উঠে। জ্ঞাতি কষ্ট পাইলে ওঁর প্রাণ কাঁদিতে থাকে। ওঁর জ্ঞাতিও যেমন ওঁর আপনার ওঁর গ্রাম শুদ্ধ লোকও তেমনি ওঁর আপনার। উনি সকলেরই ছোট দাদা। বাপও উঁহাকে ছোট দাদা বলে, ছেলেও উঁহাকে ছোট দাদা বলে ছেলের ছেলেও উঁহাকে ছোট দাদা বলে, গ্রাম শুদ্ধ উঁহাকে ছোট দাদা বলে। উনি 'কোম্পানির ছোট দাদা'। ওঁর গুণে সমস্ত গ্রাম খানি একটি কোম্পানি—এক পথে চলে, এক সুরে কাঁদে, এক সুরে হাসে। উঁহাকে ধরিয়া গ্রামখানি বাঁচিয়া আছে। উনি গ্রাম খানির প্রাণ। উনি গ্রামের অন্নপূর্ণা। কিন্তু হায়! উঁহাকে এখন আর বড় দেখিতে পাই না। তখন বঙ্গের গ্রামে গ্রামে কোম্পানির দাদা, কোম্পানির কাকা দেখিতে পাইতাম। এখন আর বড় পাই না। বঙ্গদেশ

এখন দেবতাশূন্য হইতেছে। সত্যই বঙ্গে দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে। তুমি বঙ্গীয় প্রাচীন সমাজের কতই নিন্দা কর এবং বলিয়া থাকে যে ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে সে সমাজ অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু সহস্র দোষ সত্ত্বেও সে সমাজে দেবতা ও দেব-চরিত্র ছিল। সে দেবতা ও দেব চরিত্র হারাইয়া তোমাদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তোমাদের কথিত উন্নতি তাহার এক শতাংশও পূরণ করিতে পারিবে না। গুণ বল, বুদ্ধি বল, বিদ্যা বল, স্বাধীনতা বল, সাম্য বল, চরিত্রের সমান কিছুই নয়। আমরা সেই চরিত্র হারাইতেছি। ভগবান জানেন আমাদের উন্নতি হইতেছে কি অবনতি হইতেছে।

## তত্র দিকপালধর্ম্মী।

হিন্দুশাস্ত্রে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দিক্‌পাল দেখিতে পাই। সকল দিক রক্ষিত না হইলে কোন দিকই থাকে না। আপনার দিকও যায়। সেইজন্য দিক্‌পাল চাই। মনুষ্য মধ্যেও দিকপাল-ধর্ম্মী আছে। গর্দন ও গারিবল্‌দি উচ্চ শ্রেণীর দিকপাল। গর্দন যখন সুদানে ও চীন দেশে যান তখন দিক রক্ষার্থ দিকপাল স্বরূপ গিয়াছিলেন। গারিবল্‌দি যখন গাম্বেতার রিপব্‌লিকের পক্ষে যুদ্ধ করিতে যান তখন তিনি দিক রক্ষার্থ দিকপাল স্বরূপ গিয়াছিলেন। একটা দিক যখন জ্বলিয়া যাইবার উপক্রম হয় তখন দিকপাল বরুণ যেমন বারিবর্ষণ করিয়া সেই দিকটা রক্ষা করেন, তেমনি পৃথিবীর এক একটা দিক যখন উৎসন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল তখন গর্দন ও গারিবাল্‌দি দিকপাল স্বরূপ সেই সেই দিক রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু অত বড় দিকপাল পৃথিবীতে বড় কম। সামান্য সংসারধর্ম্মী মানবের ও অত বড় দিকপালের কথা শুনিয়া বিশেষ লাভ নাই। অতএব সমাজে নিত্য যে সব ছোট ছোট দিকপাল দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের কথা বলাই ভাল। আগে আমাদের সমাজে তেমন ছোট ছোট দিকপাল অনেক ছিল। রঘুনাথ দিব্য জোয়ান পুরুষ—বয়স ৩০।৩৫। রঘুনাথ অসহায়ের সহায়, দুর্ব্বলের বল। তোমার বাড়ীতে আজ একটি বৃহৎ ক্রিয়া। তোমার লোক বল নাই। রঘুনাথ আসিয়া তোমার জিনিস পত্র ক্রয় করিয়া দিল, ঘর বাড়ী পরিস্কার করাইয়া দিল, চালা চুল্লী প্রস্তুত করাইয়া দিল, লোক জন খাওয়াইয়া দিল। দশ দিন ধরিয়া রঘুনাথ এই সব করিল। তুমি রঘুনাথকে আশীর্ব্বাদ করিলে। রঘুনাথ তোমাকে

নমস্কার করিয়া গিয়া তাহার পর দিন হইতে আবার ঐ সিংহ মহাশয়ের কন্যার বিবাহের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল। রঘুনাথ চিরকালই এইরূপ করে—তাহার শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, অসূয়া নাই, অভিমান নাই। রঘুনাথকে কি কখনও দেখ নাই? ঐ যে মিত্র মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধে ঐ প্রশস্ত প্রাঙ্গণে সহস্রাধিক লোক একেবারে ভোজন করিতে বসিয়াছে, আর ঐ যে রঘুনাথ,—যুবা রঘুনাথ, দীর্ঘকায় রঘুনাথ, বলিষ্ঠ রঘুনাথ—কোমরে গামছা বাঁধিয়া পৌষ মাসের দারুণ শীতে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে অসুর বিক্রমে ঐ সহস্রাধিক ভোক্তাকে অন্ন ব্যঞ্জন ক্ষীর দধি মিঠাই মোণ্ডা পরিবেশন করিতেছে। প্রশস্ত প্রাঙ্গণ তাহার পদ ভরে টলমল করিতেছে। বল দেখি রঘুনাথ যথার্থই অগ্নি ইন্দ্র বায়ু বরুণের ন্যায় দিকপাল কি না। আবার মিত্র মহাশয়ের অন্দরে যাও—সেখানে রঘুনাথের মাকে দেখিবে, তিনিও এক দিক্‌পাল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে স্নান করিয়া তিনি রন্ধন আরম্ভ করিয়াছেন। দ্বাদশটা চুল্লী জ্বলিতেছে, রঘুনাথের মা রন্ধন করিতেছেন। এখন বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত, এখনও রন্ধন করিতেছেন। কোমরে অঞ্চল জড়ান, মস্তকোপরি কেশ চূড়ার আকারে বাঁধা, মুখ রক্তবর্ণ, শরীর ঘর্ম্মাক্ত—এখনও রঘুনাথের মা অসীম উৎসাহে অসীম তেজে রন্ধন করিতেছেন। মিত্র বাড়ীর গৃহিনী বারম্বার বলিতেছেন—রঘুর মা, এক ফোঁটা চিনির পানা গলায় দিয়া যাও। রঘুর মা এখন উন্মাদিনী, সে কথায় তাঁহার কাণ নাই। বল দেখি রঘুনাথের মা যথার্থই অগ্নি ইন্দ্র বায়ু বরুণের ন্যায় দিকপাল কি না।

দিক্‌পাল-ধর্ম্মীকে দিবাভাগে কেহ তাহার আপন বাড়ীতে দেখিতে পায় না। পূর্ব্বাহ্নে হউক, অপরাহ্নে হউক, যখন হউক, রঘুনাথের বাড়ীতে গিয়া রঘুনাথকে ডাকিলে। রঘুনাথের সাড়া শব্দ পাইলে না। আবার ডাকিলে, একটি ছেলে আসিয়া বলিল—বাবা বাড়ীতে নাই, ঘোষেদের বাড়ীতে আছেন। ঘোষেদের বাড়ীতে গিয়া দেখিলে রঘুনাথ ভিয়ানশালায় ভোক্তার সংখ্যার সহিত মিষ্টান্নের পরিমাণ হিসাব করিতেছেন। রঘুনাথ কখন একটিবার বাড়ীতে আসিয়া চারিটি ভাত খাইয়া যায় কেহ জানে না, কেহ বলিতে পারে না। রাত্রিকালে দিকপাল ধর্ম্মীর নিদ্রা বড় কম। যে নিদ্রাটুকু হয় তাহাও কাকনিদ্রাবৎ, একটা টিক্‌টিকির শব্দে সে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়। নিদ্রায়ও দিক্‌পাল-ধর্ম্মীর কর্ণ চারিদিকে। রাত্রি ঘোর অন্ধকার,

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, মেঘ গর্জ্জন করিতেছে, বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। দিকপাল রঘুনাথ ঘুমাইয়াও জাগ্রত। রোদন-ধ্বনি শুনিয়া বুঝিলেন, অনাথিনী হরসুন্দরীর পুত্রটি প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অমনি শয্যা ত্যাগ করিয়া আপনার ন্যায় আরো ২।৩টি দিকপালকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া, মৃত পুত্রটির সৎকার্য্য করিয়া আসিলেন। রঘুনাথ দিকপাল বৈ কি,—রঘুনাথ দেবতা। কিন্তু রঘুনাথকে আর বড় দেখিতে পাই না। রঘুনাথ সভ্য হইয়া কিছু সৌখিন হইয়াছেন। রঘুনাথ এখন সর্ব্বত্র উঁকি ঝুঁকি মারেন, কিন্তু ঘাড় পাতিবার ভয়ে কোথাও আর দেখা দেন না। রঘুনাথ এখন বাবু। আমাদের কি ক্রম উন্নতি হইয়াছে?

## তত্র নারায়ণ-ধর্ম্মী

অনন্ত শয্যা-শায়ী নারায়ণ স্বয়ং কিছু করেন না। তিনি সেই অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়া এক রকম নিদ্রিত বলিলেও হয়। সব জানেন, সব দেখেন, কিন্তু নিদ্রিত। দেবতারা যখন বিপদে পড়েন, কি করিলে বিপদের শান্তি হয় ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন না, তখন তাঁহারা নারায়ণের নিকট গমন করেন, এবং তাঁহার পরামর্শ লইয়া বিপদ খণ্ডন করেন। গ্রামবৃদ্ধ গুরুচরণ সরকার মহাশয়ও নারায়ণ-ধর্ম্মী। তাঁহার বড় একটা নড়া চড়া নাই। দিবা রাত্রি সেই বহির্ব্বাটীর বৈটকখানার ঘরটির ভিতর বসিয়া আছেন। একখানি মাদুরের উপর একখানি ক্ষুদ্র তোষক, তদুপরি বসিয়া আছেন। সম্মুখে একটি হুকা, তাহাতে একটি পাতার নল। এক পাশে একটি জলপাত্র, তদুপরি একখানি পাট-করা গামছা। ঘরের দেয়ালে দুই চারিখানি ঠাকুর-দেবতার পট। ঘরে সর্ব্বদাই দুই একটি লোক আছে। গ্রামের ছোট বড় সকলেই তাঁহার নিকট পরামর্শ লইতে আইসে। তিনি গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রবীণ এবং গ্রামের সকল লোকের সকল কথাই জানেন। তিনি গ্রামের মধ্যে গ্রামের সর্ব্বজ্ঞ ও গ্রামের ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ। তাই সকলেই তাঁহার নিকট পরামর্শ লইতে আইসে। তিনিও তাহাদের সমস্ত কথা সমস্ত ইতিহাস জানেন, তাহারাও তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলে, তাঁহার নিকট হইতে কোন কথা গোপন করে না, গোপন করা প্রয়োজনও মনে করে না। তাহাদের তাঁহার নিকট হইতে গোপন করিবার কোন কথাও নাই। যাহারা শাস্ত্রানুসারে ও গ্রামবৃদ্ধদিগের

দৃষ্টান্ত ও উপদেশানুসারে সংসার-ধর্ম্ম করে, তাহাদের কাহারো নিকটে গোপন করিবার কোন কথা থাকে না। তাই গ্রামবৃদ্ধ সরকার মহাশয় বাল্যকাল হইতে তাহাদের সকলের সকল কথা জানিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহার পিতা পিতামহের নিকট তাহাদের সকলের আগেকার সকল কথা শুনিয়াছেন। এখনকার মতন লোকের ঘরের কথা জানিয়া তাহাদের কুৎসা রটাইবার জন্য জানেন নাই। সদুপদেশ দিয়া তাহাদিগকে সৎপথে রাখিবেন বলিয়া তাহাদের সকল কথা জানিয়াছেন। তাই তাহারাও তাঁহার কাছে কোন কথা গোপন করে না এবং তিনি সকল কথা শুনিয়া ঠিক পরামর্শ দিয়া তাহাদের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। সর্ব্বজ্ঞ না হইলে বিধাতা হওয়া যায় না। নারায়ণ সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া জগতের বিধাতা এবং দেবতারাও তাঁহার নিকট ঠিক পরামর্শ পান। গ্রামবৃদ্ধ সরকার মহাশয়ও গ্রাম সম্বন্ধে সর্ব্বজ্ঞ। তাই তিনি গ্রামের বিধাতা এবং গ্রামের সকল লোকই তাঁহার নিকট ঠিক পরামর্শ পায়। সামান্য সংসারী লোকের পক্ষে এমন একটা বিধাতা বা পরামর্শদাতা থাকা কি একটা কম সুখ ও সৌভাগ্যের কথা? ইউরোপ বলেন এবং আমরাও ইউরোপের দেখাদেখি বলিতে আরম্ভ করিয়াছি যে, আপনার বিষয় কর্ম্মে আপনিই আপনার উৎকৃষ্ট পরামর্শদাতা, অন্যে ঠিক পরামর্শ দিতে পারে না। এ কথার গূঢ় অর্থ এই যে, ইউরোপে কেহ কাহাকে আপনার প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলিয়া বুঝে না এবং সে জন্য কেহ কাহাকে বিশ্বাস ও ভক্তি করিয়া আপনার সকল কথা খুলিয়া বলে না। এই কারণে ইউরোপীয় সমাজে কেহ গ্রামবৃদ্ধ সরকার মহাশয়ের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিতে পারে না এবং সেই জন্য ঠিক পরামর্শও দিতে পারে না। তাই ইউরোপীয় সমাজে নারায়ণ বা বিধাতা-ধর্ম্মা মানুষ দেখিতে পাওয়া যায় না। দুঃখের বিষয় আমাদের সমাজ ও ইউরোপীয় সমাজের সমান হইয়া আসিতেছে। আমাদের শিক্ষিত সমাজে নারায়ণ-ধর্ম্মী মানুষের আর স্থান নাই। আমরা ধর্ম্মানুসারে চলি না। তাই আমরা কাহাকেও আমাদের সকল কথা খুলিয়া বলিতে পারি না এবং সেই জন্য কেহ আমাদিগকে ঠিক পরামর্শ দিতে পারেন না। অগত্যা আমরা আপনারা আপনার পরামর্শদাতা হইয়াছি। আপনি আপনার পরামর্শদাতা হওয়াতে যে ভুল ভ্রান্তি হয়, তাহার বিষময় ফল ভোগ করিতেছি। এবং আপনি আপনার পরামর্শদাতা হওয়ায় আপন আপন বিদ্যা বুদ্ধিকে এতই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে অভ্যস্ত হইতেছি যে অন্যে ঠিক

কথা বলিলেও তাহা ঠিক বলিয়া বুঝিতে ও স্বীকার করিতে অক্ষম হইতেছি এবং আপনার ভুল ভ্রান্তি হইলে আপনাকে ভ্রান্ত বলিয়া বুঝিতে অশক্ত হইতেছি। ইহার অপেক্ষা উন্নতির প্রতিকূল অবস্থা আর কি হইতে পারে? নাবাঙ্গা-ধর্ম্মী মনুষ্য হইয়া আমরা দেব-বল হারাইতেছি।

---

আমরা লেখা পড়া করিতেছি, গাড়ি ঘোড়া চলিতেছি, পুস্তক প্রবন্ধ লিখিতেছি, সমাজ সংস্করণ করিতেছি, সংবাদ পত্র লিখিতেছি, এখানে যাইতেছি ওখানে যাইতেছি, সভা সমিতি করিতেছি, বড় বড় বক্তৃতা করিতেছি। এত তাড়াতাড়ি এত কাণ্ড করিলে সকল দেশে সকলেরই মনে হয়, কতই উন্নতি করিতেছি। কিন্তু একবার নিশ্বাস ছাড়িয়া, স্থির হইয়া বসিয়া, ভাবিয়া দেখা উচিত—যে আমরা প্রকৃত পক্ষে উন্নত হইতেছি না অবনত হইতেছি? আমাদের মধ্যে যে দেব-চরিত্র ছিল, যে দেব-চরিত্র মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্পদ ও আভরণ, সে দেব-চরিত্র লয় প্রাপ্ত হইতেছে? কি পূর্ব্বাপেক্ষা স্ফূর্ত্তি লাভ করিতেছে? আমি কিছুরই বিরোধী নহি—গাড়ি ঘোড়া, পুস্তক প্রবন্ধ, সমাজ সংস্করণ, সভা সমিতি—কিছুরই বিরোধী নহি। কিন্তু সে সমস্ত পূর্ণ মাত্রায় পাইয়াও যদি সেই দেব চরিত্র হারাই, তবে অবশ্যই বলিব, আমাদের সে সব পাওয়া বৃথা হইল। সে সব পাইয়া আমাদের লাভ কিছুই হয় নাই, পরন্তু মর্ম্মঘাতী ক্ষতি হইয়াছে।

---

# অপূর্ব্ব ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

## ধুম্রযান অধ্যায়।

### ১ম দৃশ্য।

বিশাল পদ্মার ক্রোড়ে রাজহংসের ন্যায় শ্বেতকায় বিপুল তরণী, "প্রিন্স-এলিস্" মৃদু মন্দ নাচিতেছে। আমরা পরমানন্দে তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম। অগ্রে আমি, মধ্যে সুন্দরী, পশ্চাতে তাঁহার পিতার কেরাণী বাবু এবং তাহার পশ্চাতে আমাদের তল্পিবাহি কুলী।

আমি কিম্বা সুন্দরী কেহই ক্যাবিন ভাড়া করি নাই সুতরাং ডেকের উপরে যেখানে, সাহেবদের ডিনর বা ব্রেকফাষ্ট খাইবার জন্য একটি বৃহৎ টেবিল, এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে কতগুলিন কেদারা ছিল, আপাতত তথায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। কেরাণী বাবু তাহার প্রভুকন্যার আদেশানুসারে মালগুলি লইয়া অতি দূরে এক পাশে যাইয়া বসিয়া অপরাপর আরোহিদিগের সহিত তামাকু সেবনে প্রবৃত্ত হইলেন।

সুন্দরীর মুখকান্তি মলিন, এবং চিন্তা-লাঞ্ছিত দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনাকে কিছু ভাবনা-যুক্ত দেখিতেছি কেন?"—তিনি একটু হাসিলেন, পরে ধীরে ধীরে একখানি গন্ধ-পরিপূরিত রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিয়া ফেলিলেন, মুখ খানি লাল হইল, তখন আবার হাসিয়া বলিলেন, "এখন?"

আমি বলিলাম, "মুখরাঙ্গা করিলে, কি চিন্তার রেখা ঢাকে?"—তিনি বলিলেন, "না এমন কিছু নয়, তবে—"

"তবে কি?"

"এই ঢাকা গেলেই সব ফুরাইল, তাই ভাবিতেছি।"

"কেন তার পর ত আবার বরিশাল আছে?"

"আপনি ত আর বরিশাল যাইবেন না?"

"আমার সঙ্গে ত পথের আলাপ, এরূপ পথিক আরো পাবেন।"

এই কথায় তিনি হাসিয়া তাহার পরে যেন একটু বেজার হইয়া বলিলেন,—"মহাশয়!—

Glittering things are not all gold" *

"কেন অন্তত হীরা চুনীও ত হতে পারে?"

এই সময়ে একটি মেম, একটি বাবু ও একটি সাহেব আসিয়া উপস্থিত। সাহেব বরাবর ক্যাবিনে চলিয়া গেলেন। মেম ও বাবু আমরা যেখানে বসিয়াছি, সেইখানেই বসিলেন। মেম সাহেব, বসিয়াই বাবুটির স্কন্ধে হাত দিয়া চুপি চুপি কি কহিলেন। বাবু গম্ভীর বদনে আমার পরিচিতা রমণীর

---

* মেয়ে মানুষে বেশ ইংরাজি বলিতে পারেন, অথচ আমাদের পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে হয়ত কেহ কেহ এসকল না বুঝিতেও পারেন, কাজেই আমাদিগকে মানে ভাঙ্গিয়া দিতে হইতেছে। ঐ ইংরাজি টুকুর মানে—"সকল চকচকে জিনিশই কিছু সোণা নয়।"

দিকে তাকাইলেন। আর মেম সাহেব—আমার দিকে। এবারে ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিলাম,—তিনি কৃত্রিম মেম সাহেব। তাঁহার সর্ব্বগ্রাসিনী দৃষ্টি দেখিয়া মনে কিছু ভয়ও হইল, ভাবিলাম—এ আবার কি!—কিন্তু সকলেই এখন নির্বাক্।

কিছু কাল পরে বাবু ডেকের উপর পা চারি করিতে লাগিলেন, মেম সাহেবকে কিছু চঞ্চল প্রকৃতি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কেননা তিনি পুরুষের সাক্ষাতে শীলতা-বিরুদ্ধ অঙ্গ সঞ্চালনে * এবং ভ্রুকুটি করিয়া পুন পুন মুখ সঞ্চালনে লজ্জা বোধ করিতে ছিলেন না। আমি এই সময়ে মনে মনে ভাবিতেছিলাম, যে সকল সৌখিন বাবু সৌখিনী মেয়েদিগকে মেম সাজাইয়া পর্দার বাহির করেন, হাবভাব বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগকে একটু সাবধান করিয়া দেওয়া তাঁহাদের অগ্রে কর্ত্তব্য।

যাহা হউক মেম সাহেব কথা কহিতে না পাইয়া বড়ই ব্যস্ত হইলেন। অবশেষ আপনা আপনি, "এখনও জাহাজ ছাড়্ছে না কেন"? বলিয়া পুনঃপুন উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন। আমি বলিলাম "বেশী বিলম্ব নাই প্যাসেঞ্জর ও মালগুলি উঠিলেই ছাড়িয়া দিবে।" এইবারে তিনি আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন "ও বা'চ্লাম আমি মনে ক'রে ছিলুম আপনি বুঝি সাহেব।"

"সাহেব কি এত কালো হয়?"

"আপনি এমন কাল কি।"

এই সময়ে হঠাৎ পূর্ব্ব পরিচিতা রমণীর দিকে আমার দৃষ্টি পড়িল। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমার কথঞ্চিৎ দুঃখও হইল; তাঁহার মুখ খানি বিমর্ষ, চক্ষু দুটি জলভারাক্রান্ত, যেন উহাতে ক্রোধ অভিমান ও সন্দেহের উদ্বেগ প্রকটিত। মনে মনে বলিলাম, 'ভগবান নিস্তার কর!' ভগবান যথার্থই নিস্তার করিলেন। এই সময়ে সাহেবে, বাঙ্গালিতে, খোট্টায় কতকগুলি লোক আসিয়া গোলমাল আরম্ভ করিল। নব পরিচিতা মেম সাহেব ধীরে ধীরে উঠিয়া তাঁহার বাবুর সহিত পা-চারিতে যোগ দিলেন। পূর্ব্ব পরিচিতা রমণী আমাকে চুপে চুপে বলিলেন, "এখানে বসিয়া থাকিতে দিবে ত?'—আমার হাসি পাইল, বলিলাম, "ভয় নাই।"

---

* হাই তোলা, শরীর ভাঙ্গা, প্রভৃতি।

### দৃশ্য।

ধূম্রযান ক্ষিপ্ত সিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়া ছুটিল। খালাসীরা দড়ি, কাছী, শিকল লইয়া দৌড়া দৌড়ি আরম্ভ করিল। নবাগত সাহেবেরা ক্যাবিনে যাইয়া 'বেয়ারা—সর্দ্দার—খানসামা' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, এইরূপে কিছু কাল বিষম কোলাহল হইয়া সকলই নীরব হইল। কেবল ধূম্রযানের গর্জ্জন পদ্মার গম্ভীর গর্জ্জনের সহিত মিশাইয়া ভৈরব রব উত্থিত করিল। নদীজলের সুস্নিগ্ধ সমীরণ আমাদের গাযে সুধা বর্ষণ করিতে লাগিল। দূরে দুপাশে শস্য ক্ষেত্র, গাছ পালা, ঘর বাড়ী, বাজার গ্রাম,—যেন ভয়ে আমাদের বিপরীতে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিল। আমি সেই শোভা নয়ন প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিলাম।

এমন সময় কে আসিয়া আমার স্কন্ধে হাত দিল; চাহিয়া দেখিলাম পূর্ব্ব পরিচিত সাহেব। আমার তখনই "নুকবনল সরপেণ্টের" কথা মনে পড়িল। তিনি হাসিয়া বলিলেন,—

"আমি এই খানে বসিতে পারি?"

"সচ্ছন্দে"

"আপনারা ব্রেক্‌ফাষ্ট খাইয়া সুস্থ হইয়াছেন?"

"না।"

সাহেব অমনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া ক্ষণকালের জন্য অদৃশ্য হইলেন। পাঠক এত আদর অভ্যর্থনার কারণ অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন। সাহেব উঠিয়া যাইবার সময় আমার পরিচিতা রমণী একটু হাসিয়া, আমার দিকে চাহিলেন। ইহাতে বোধ হইল, তিনিও বুঝিতে পারিয়াছেন। যদি বুঝিতে পারিয়া থাকেন তবে তাঁহার পক্ষে ইহা একরূপ (Triumph) বিজয়োল্লাস বটে। আমি এই অবসরে পা-চারি করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। অনেক ক্ষণের পর চাহিয়া দেখিতে পাইলাম, আমার সঙ্গিনী সাহেবের সহিত আলাপ করিতেছেন। আবার অন্যমনস্কে পা-চারি করিতে লাগিলাম। হঠাৎ আমার যেন কাণে আসিল - Come into the cabin, then. you shall have short bread and sherry, whilst you look through the beautiful pictures in my tin case:"* অমনি চক্ষু ফিরাইলাম।

* আমার কুঠারিতে চল, সেখানে রুটি ও শেরি খাইবে, খাইতে খাইতে আমার টিনের বাক্সে যে সকল সুন্দর ছবি আছে, সেগুলি দেখিতে থাকিবে।

কি আশ্চর্য্য !—সাহেব ও আমার সঙ্গিনী হাত ধরাধরি করিয়া ক্যাবিনে ঢুকিতেছেন ! মনে ঘৃণা হইল, বঙ্গ রমণীর এখনকার প্রথামত উচ্চ শিক্ষায় ঘৃণা হইল, তাহাদের অকাল-স্বাধীনতায়ও ঘৃণা হইল। একবার মনে করিলাম, "যাক্ আমারত কেহ নয়," আবার, বাঙ্গালীর মেয়ে বলিয়া, নারী হৃদয়ের দুর্ব্বলতা মনে করিয়া এবং তাঁহাকে সম্পূর্ণ অরক্ষণীয়া অবস্থাপন্ন মনে করিয়া, প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সাহেবের ক্যাবিনের ভিতর নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া—যাইলাম না। নিকটে নিকটে ঘুরিতে লাগিলাম। আবার কাণে এল—"—just so, my dear, - Do you like the carraway comfits on the short bread, or the bits of candied lemon best, eh ?" – সন্দেহ ক্রমেই ঘনিষ্ঠতর দেখিয়া কিছু ভয় হইল। ধীরে ধীরে ডেক হইতে টেবিলের দিকে নামিলাম। সেই সময়ে খানসামা দুই জনের রেকাবী আনিয়া উপস্থিত করিল,— আমি তাহাকে ক্যাবিন দেখাইয়া দিয়া বলিলাম,— 'মেম সাহেবকো জল্‌দি সাম্ দেও ?" কিছু কাল পরে খানসামা এক টুকরা কাগজ আমার হাতে দিয়া আহার সামগ্রী ক্যাবিনে লইয়া গেল। কাগজে নীল পেনসীলে লেখা—"There is no formality here, we are friends, no excuse shall serve, pray, come and join us"

কেরানী বাবু আসিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন 'তিনি কোথায় ?"

আমি ক্যাবিন দেখাইয়া দিয়া বলিলাম "ঐখানে।"

"আর কে ওখানে ?"

"একজন ইংরেজ—"

"সর্ব্বনাশ, আপনি যাইতে দিলেন কেন ?"

"যাইতে না দেওয়ার আমার অধিকার কি।"

বাবু হতভম্ব হইয়া আপনা আপনি বলিলেন—"দেখুন দেখি !"

৩য় দৃশ্য।

ক্যাবিনের ভিতরে একখানি খাট দুখানি কেদারা ও একটি ছোট রকমের টেবিল। আমি প্রবেশ করিবা মাত্রই, একটু সাদরে গৃহীত হইলাম। খাটে আমার সঙ্গিনী বসিয়াছিলেন, তাঁহার হাতে এবং ক্রোড়ে অনেকগুলি ভাল ভাল বিলাতি ছবি, ও খৃষ্টমাস – নিউ-য়িয়র্স্ ডে—কার্ড। সাহেব নিকটস্থ কেদারায় বসিয়া সেইগুলি দেখাইতেছিলেন ; টেবিলে আহারের দ্রব্য, সুরা পূর্ণ ডিকাণ্টার ও গ্লাস। ক্যাবিনস্থ দেব দেবীর রঞ্জিত নয়ন ও প্রফুল্ল বদন

দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, পান ভোজন পূর্ব্বেই একরূপ হইয়া গিয়াছে। আমি যাইয়া শূন্য কেদারা অধিকার করিলাম। এবং অনুরোধ ক্রমে কিঞ্চিৎ পানাগারও করিলাম।

সাহেবের বিদ্যাবত্তার পরিচয়ে এবং অনর্গল বাক্-কৌশলে আমার সঙ্গিনী একবারে মুগ্ধ হইয়া দিশা হারা হইয়াছেন। তাঁহার তথাবিধ অবস্থা দৃষ্টে আমার যথার্থই একটু (jealousy) হিংসা হইয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিলাম চুপ করিয়া থাকি, দেখি শ্রাদ্ধ কত দূর গড়ায়। এদিকে সাহেব উৎসাহে পুনঃ পুনঃ গলিত বহ্নি উদরস্থ করিতে লাগিলেন। ভদ্রতার অনুরোধে আমার সহিত একবোরে আলাপটা না করা বড় ভাল দেখায় না, অথচ আমার সহিত সদালাপ (intellectual talk) করিয়া সঙ্গিনীর সম্মুখে কিছু অপদস্থ করিবেন এরূপও ইচ্ছা ;—আলাপের প্রারম্ভেই তাহা বুঝিতে পারিলাম। নিম্নে তাহার স্থুল স্থুল মর্ম্ম বিবৃত হইতেছে।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ঢাকা যাইতেছেন কি উদ্দেশ্যে, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ?" আমি বলিলাম "শুদ্ধ বেড়াইতে।" সাহেব—"এবেসিনিয়ায় রাজপুত্রের ন্যায় সুখ খুঁজিতে নয়ত ?"—বলিয়াই—সঙ্গিনীরদিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া বলিলেন,—"আপনি রাসেলাশ পড়িয়াছেন ?"— তিনি— কহিলেন "না,"—তৎপর আমার প্রতিও সেই প্রশ্ন হইল। আমি— বলিলাম, "রাসেলাশ পড়িয়াছি—তাহার পরিশিষ্ট ডিনার বাস্ পড়িয়াছি এবং রাসেলাশ যাহার সম্পূর্ণ অনুকরণে লিখিত—তাহাও পড়িয়াছি।" সাহেব ইহাতে কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন—রাসেলাশ নূতনত্বের জন্য প্রশংসিত, আপনি কি সাহসে ইহাকে অনুকৃতি বলেন—authority কি ?—আমি ধীরে উত্তর করিলাম—"Voltaires Condide পাঠ করিয়া দেখিবেন। সাহেব কিছুকাল নির্ব্বাক্ থাকিয়া—I see, I see করিতে লাগিলেন। সঙ্গিনী সহর্ষ হইলেন। আমি মনে মনে বলিলাম আর ভাবনা নাই।

এই সময়ে হঠাৎ ভারি একটা গোল উপস্থিত হইল, সকল লোক কোলাহল করিতে লাগিল, সুতরাং আমরা সকলেই তাড়াতাড়ি বাহিরে যাইলাম। যাইয়া দেখি, কতকগুলি খালাসী ও জাহাজের কাপ্তেন মারামারি করিতেছে—ডেকের আরোহীগণ চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ শীঘ্রই থামিয়া গেল, চাট্ গেঁয়ে খালাসির হাতে কাপতান সাহেবের মাথা ভাঙ্গিয়া রক্তপাত হইতেছে। শুনিতে পাইলাম, একজন খালাসী নেমাজ করিতেছিল সাহেব তাহাকে সেই সময়ে লাথি মারিয়াছিলেন, তাহাতেই এরূপ হইয়াছে। যাহা হউক, গোল থামিল, আপদ গেল। এ দিকে সন্ধ্যাও হইয়া আসিল—আমরা ডেকে বেড়াইতে লাগিলাম। হঠাৎ আমার সেই কৃত্রিম মেম সাহেবের কথা মনে পড়িল। আমি তাঁহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলাম।

———

# সূচিপত্র।

| বিষয়। | পৃষ্ঠা। |
|---|---|


---